ইমতিয়াজ মুহিবুল্লাহ

Enjoy Your Life...

বইওয়ালা

# জীবন উপভোগ করুন

প্রেজেন্টস্

ড.মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী



এক্সক্লুসিভ

উমর ফারুক

# Acknowledgements & Fair Use Notice



Personal Intent & Grace
This digital edition was prepared solely for my own personal use and benefit. If our brothers and sisters find this work beneficial to their own learning and spiritual growth, then this is truly an Ehsan (Grace and Favor) from Allah Sub'hanahoo Wa Ta'ala. Any good within this work is from Allah, and any errors are my own.

Our Gratitude To:

- Zahid Hasan Bhai (@ZahidKhair): Special thanks for your constant support and brotherhood, from you I learned proofreading within the Islamic eBook Creator Team( https://t.me/IslamicEbookCreatorTeam ).

Support & Updates:

If you appreciate this work, please support the author by purchasing a hard copy. To join my personal group for more eBooks and resources, click the link below:
🌐 Boiwala বইওয়ালা

# বইওয়ালা নিবেদন...

এই বইটি এ আই (AI) এবং ম্যানুয়েল চেকআপ এর মাধ্যমে বানানো হয়েছে। যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে প্রুফ রিডিং করার। এরপরেও মূল বইয়ের কিছু শব্দ বা বাক্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমরা মূল বই মিলিয়ে পড়ার সুপারিশ করি। ***বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি কিনে লেখক-প্রকাশক কে সহায়তার ব্যাপারে বিবেচনা করুন।*** আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং আমাদের ভালো গুলো কবুল করে নিন। যা কিছু ভুল ভ্রান্তি সব আমাদের তরফ থেকে আর যা কিছু সঠিক সমস্ত কিছু আল্লাহতালার তরফ থেকে।

# Boiwala Presents...

## নববী আদর্শের আলোকে

# সুখময় জীবনের সন্ধানে

# Enjoy Your Life

**আরবের প্রখ্যাত দাঈ**

## ড. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী

**প্রকাশনায়:**

১৪৩৪-৩৫ হিজরী, ২০১৩-১৪ ঈসায়ী সনের দাওরাতুল হাদীস (মাস্টার্স)

সমাপনী ছাত্রবৃন্দ

আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানীনগর

**পৃষ্ঠপোষক:**

মাওলানা ফয়জুল্লাহ সন্দ্বীপী দা.বা.

মাওলানা আকবর হুসাইন দা.বা.

**উপদেষ্টা:**

১. মুফতী আব্দুল বারী দা.বা.

২. মাওলানা সিরাজুল হক দা.বা.

৩. মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ দা.বা.

৪. মাওলানা ইহসানুল্লাহ দা.বা.

৫. মাওলানা ফারুকুযযামান দা.বা.

**সম্পাদক:**

মাওলানা ওসমান গনী দা.বা.

**সহকারী সম্পাদক:**

মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক

মাওলানা ইলিয়াস খান

মাওলানা আরিফ বিল্লাহ

**অনুবাদ:**

দাওরাতুল হাদীসের (মাস্টার্স) ছাত্রবৃন্দ, ১৪৩৫ হিজরী, ২০১৪ ঈসায়ী

**সার্বিক ব্যবস্থাপনায়:**

মাওলানা কামাল উদ্দীন

মাওলানা আব্দুল মাজেদ

**প্রকাশকাল:** জানুয়ারি ২০১৪ ঈসায়ী, রবিউল আউয়াল ১৪৩৫ হিজরী



**প্রচ্ছদ:** মুহাম্মদ মুনীরুল ইসলাম

**বিনিময়:** ৪২০ টাকা মাত্র

# উৎসর্গ

ইলম ও আমলের যে কাননে আমাদের বেড়ে ওঠা

ইলমে-আমলে, ফিকরে ও আখলাকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা

যেখানে শিখেছি দাওয়াত, তালীম ও তাযকিয়ার মেহনতের সমন্বয় সাধন

অন্ধকারাচ্ছন্ন আমরা যেখানে পেয়েছি অনেক আলো—কোরআনের আলো, হাদীসের আলো

যেখানে পেয়েছি অশ্রুভেজা চোখ

বিশাল ব্যাপ্ত চিন্তা ও দরদী হৃদয়ের যিন্দা নমুনা—সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি

এবং

যিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন এই প্রতিষ্ঠান—সেই মহান মনীষী হযরত শায়খে সন্দ্বীপী রহ.-এর প্রতি; তাঁর দারাজাত বুলন্দির কামনায়।

**জামিয়ার সম্মানিত মুহতামিম, তালীমী বোর্ড মাদারিসে কওমিয়া আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ সাহেব সন্দ্বীপী দা. বা.-এর বাণী ও দোআ**

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি এই জগতসংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। যিনি এক, অদ্বিতীয়। সৃষ্টির ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে যার সীমাহীন দয়া ও রহমত। লাখো দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়েদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। হক্ব ও হাক্কানিয়াতের মশালধারী। যার নবুয়তী আলোক ধারায় পৃথিবী থেকে দূর হয়েছে শিরক ও কুফরের যুলমাত। যার ইশারায় মানুষ পেয়েছে সত্যের দিশা, পেয়েছে সীরাতে মুসতাকীমের হিদায়াত। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গের ওপর, তাঁর অনুসারীদের ওপর এবং তাঁর ভাগ্যবান উম্মতের ওপর, যারা সীমাহীন যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন নবীজীর প্রদর্শিত পথ।

**প্রিয় তালিবানে ইলম!**

আজ এই মুহূর্তে আমার অন্তরজুড়ে তোমাদের জন্য খুব বেশি মায়া-মমতা অনুভব করছি। কত দিন হলো তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ নেই। আমার হৃদয়ের সুপ্ত ব্যথা হয়তো তোমরা অনুভব করবে। আমি তো স্বপ্ন

দেখি তোমাদেরকে নিয়েই। আলোকিত মানুষ গড়ে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নেই তো আমি সদা বিভোর থাকি।

তোমরা আমার স্বপ্নের তালিবুল ইলম। তোমরা কলুষতামুক্ত একটি সমাজ গড়বে। যেখানে মানুষ শান্তির সন্ধান পাবে। শান্তির সমীরণ যেখানে প্রবাহিত হবে অবিরাম অবিরত। মানবতা যেখানে গুমরে কাঁদবে না। যুলুমের কষাঘাতে যেখানে ধুঁকে ধুঁকে মরবে না কোনো আদম-সন্তান। যেখানে থাকবে না সন্তানহারা মায়ের করুণ আর্তনাদ; স্বামীহারা বিধবার নীরব কান্না। যেখানে থাকবে না পিতাহারা এতীম শিশুর বুকফাটা চিৎকার। যেখানে থাকবে না যালিমের জয়জয়কার। আমি স্বপ্ন দেখি তোমরা সেই সমাজ গড়বে। শান্তির সমীরণ যেখানে প্রবাহিত হবে অবিরাম-অবিরত।

**প্রিয় ফারেগীন ছাত্রবৃন্দ!**

এতদিন তোমরা এই জামেয়ায় ছিলে। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ইলমের সাধনায় মশগুল ছিলে। দীর্ঘ এক যুগ বিরামহীনভাবে ইলম ও আমলের চর্চায় নিমগ্ন ছিলে। আজ তোমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের দ্বারপ্রান্তে। ইলমে নববীর আদর্শ উত্তরসূরী। নিজেদেরকে কিছুতেই ছোটো ভাববে না। হীনম্মন্যতায় ভুগবে না। মহান আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান দান করেছেন। তোমাদের বাছাই করে ইলমে ওহীর ধারক বানিয়েছেন। জাতির রাহবার বানিয়েছেন। তোমরা গোটা জাতিকে নিয়ে ভাববে। গোটা জাতির ইহকালীন এবং পরকালীন মুক্তির কথা চিন্তা করবে। মনে রাখবে একটা জাতিকে পরিবর্তন করতে হলে অজপাড়াগাঁয়ে

বাসকারী একজন সাধারণ মানুষকেও মূল্যায়ন করতে হয়, তাকে নিয়েও ভাবতে হয়। শ্রমিক বলে, ছোট বলে, কৃষক বলে কাউকে হেয় করবে না। সমাজ সভ্যতার উন্নতির মূলে কিন্তু তারাই রক্ত-ঘাম ঝরাচ্ছে। তাদেরকে সম্মান করবে। তাদের পরকালীন মুক্তির কথা চিন্তা করবে। ইসলামের মর্মবাণী সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার হিম্মত রাখবে। দূর বাংলার প্রান্ত থেকে আমেরিকা বৃটেনেও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর হিম্মত রাখবে। সাহস করে অগ্রসর হবে। ইনশাআল্লাহ, কুদরতের ইশারায় মানযিলে মাকসাদে তোমরা পৌঁছে যাবে।

**স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ!**

শিক্ষার কোনো শেষ নেই। জ্ঞানের আলো সারা জীবন গ্রহণ করতে হবে। মন দিয়ে শোনো, দেশজুড়ে আজ নাস্তিকতার সয়লাব। অস্ত্র দিয়ে কিন্তু এই সয়লাব প্রতিরোধ করতে পারবে না। গভীর অধ্যয়ন করে ইসলামের সঠিক রূপরেখা এদের সামনে তুলে ধরতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদের মোকাবেলা করতে হবে। এই বিষয়টা বুঝতে যত বিলম্ব হবে তোমরা কিন্তু ততই পিছিয়ে পড়বে।

তোমাদেরকে আল্লাহ ইলমে ওহী দান করেছেন। এই ইলমে ওহী নবীজীর রেখে যাওয়া আমানত। নববী আমানত যারা ধারণ করে তারা নবীর ওয়ারিস। নবীজীর কাজই তাদের কাজ। নবীজীর কর্মপন্থাই তাদের কর্মপন্থা। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। নবীজীর সুন্নত মোতাবেক জীবন গড়বে।

আমাদের জীবনে এমন কোনো উদ্ভূত সমস্যা নেই যার সুন্দর থেকে সুন্দরতম সমাধান আমাদের আকাবির ও আসলাফের জীবনে নেই। এবং তাদের জীবনী থেকে সে সব সমাধান জেনে নেয়া বর্তমানে কঠিন কিছু নয়। আকাবির ও আসলাফের উসূল ও তালীমের উপর নিজেদের কর্মজীবনকে সাজাতে চেষ্টা করবে।

**আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!**

হৃদয় থেকে তোমাদেরকে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হলো—নিজেরা ‘খোদ মুসতাকিল’ হয়ে যেয়ো না। অবশ্যই কোনো ছাহেবে নিসবত কামেল শায়খের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তোলো এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করো। সাথে সাথে আমাদের হযরতজী শায়খ সন্দ্বীপী রহ. এর দাওয়াত, তালীম ও তাযকিয়া—এই তিন মিশনের প্রচার প্রসারে সচেষ্ট থাকবে। দারুল উলূমের শিক্ষা ও আদর্শকে জীবনের লক্ষ্য বানাবে। জীবনকে আমলী এবং অধ্যয়নমুখী করে গড়ে তুলবে। শুনেছি দীর্ঘ পরিশ্রম করে তোমরা শায়খ মুহাম্মদ বিন আ. রহমান আরিফীর ‘ইসতামতি বিহায়াতিক’ কিতাবটি অনুবাদ করেছো। অনুবাদের কিয়দাংশ আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। কিতাবটি নিয়মিত অধ্যয়ন করলে আমাদের মানসিক শক্তি বিপুলভাবে বিকশিত হবে বলে মনে হয়। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বহুমুখী দ্বীনী খেদমতের তাওফীক দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

**বান্দাহ মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ সন্দ্বীপী**

দ্বীনী খাদেম

দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা

## জামিয়ার নায়েবে মুহতামিম, উসতাযুল হাদীস হযরত মাওলানা আকবর হোসাইন সাহেব দা. বা.-এর বাণী ও দোয়া

আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা; যিনি আমাদেরকে মেহেরবানী করে দ্বীনের নিরাপদ অঙ্গনে আশ্রয় দান করেছেন। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি নবীয়ে পাক রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; যার আনীত ধর্ম ও শিক্ষা মানবতার শান্তি ও মুক্তির একমাত্র সনদ।

**আমার সন্তানতুল্য ছাত্ররা,**

আজ আপনারা দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হতে চলেছেন। মনে রাখবেন, এতদিন যে ইলম আপনারা শিখেছেন, এর ওপর যদি আপনাদের পরিপূর্ণ আস্থা না থাকে বা কোনো ধরনের অনীহা থাকে, আর আপনি ভাবেন যে, আপনি ঠকে গেছেন তাহলে আপনার জীবন এবং এ দীর্ঘ সময়ের ইলমচর্চা সবই বৃথা।

পক্ষান্তরে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি যদি আপনার আস্থা থাকে এবং আপনি মনে করেন আপনি জিতেছেন, তাহলে অবশ্যই আপনি কামিয়াব। আমরা সাহাসের সাথে বলতে পারি ইনশাআল্লাহ আপনি তাহলে সফল হবেন।

এই যে জামিয়া, যেখানে আপনারা ইলম শিখেছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আপনি আলেম হয়েছেন, সে সকল উস্তাদদের সাথে যেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপনাদের সম্পর্ক অটুট থাকে। ইলমী এ রিশতা যেন

কায়েম থাকে। দোয়া করি আপনারা বড় হোন। যেন দেখতে পাই সন্তান গুণ ও গরীমায় বাবাকে ছাড়িয়ে গেছে। আপনাদের নিয়ে এই আমার প্রত্যাশা।

আর আপনাদের বই সম্পর্কে কথা হলো, ফারাগাতের বছর গতানুগতিক কিছু না করে একটি মূল্যবান কিতাব অনুবাদের এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। অগ্রজদের এ কাজ অনুজদের জন্য প্রেরণার উৎস হবে। আমি খুবই আনন্দিত। কিতাবটি দ্বারা উম্মতের ব্যাপক ফায়দা হোক, সেই কামনাই করছি।

**মাওলানা মুহাম্মদ আকবর হোসাইন**
দ্বীনী খাদেম
দারুল উলূম মাদানীনগর

**বাংলাদেশের স্বনামধন্য হাদীস বিশারদ, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, জামিয়ার সম্মানিত শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া সাহেব দা. বা.-এর মূল্যবান হেদায়াত**

আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা, ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযি নাসতফা, আম্মা বাদ;

**প্রিয় তালিবানে ইলম!**

শিক্ষাজীবনের এক দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে আজ তোমরা আলিম হতে চলেছো। আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণের রেখে যাওয়া দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্যের উত্তরসূরী। তাই একজন ওয়ারিসে নবী হিসেবে সব সময় হিম্মত ও উচ্চ মনোবল নিয়ে চলবে। নিন্দুকের নিন্দা ও প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসার দিকে না তাকিয়ে যাবতীয় গোমরাহী ও বিদআতের প্রতিবাদ করে যাবে। এবং নিজেরাও সব ধরনের খেলাফে সুন্নাত কাজ পরিহার করে আকাবির ও আসলাফের পদাংক অনুসরণ করে চলবে।

আজ দুনিয়ার কুফরী শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ঘিরে চলছে হাজারো ষড়যন্ত্র। বিভিন্ন এনজিও খ্রিস্টান মিশনারী সাধারণ মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করছে। এছাড়া ইসলামের

লেবাস ধরে বহু ভণ্ডপীর, বাতিল ফেরকা মুসলমানদের ঈমান আকীদা নষ্ট করে চলেছে।

তাই এসবের বিরুদ্ধে তোমাদের সজাগ ও সচেতন হয়ে কাজ করে যেতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে। নীতি ও আদর্শের আলোকেই সকল কাজ করে যেতে হবে। হিম্মত হারাবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন এবং নবী-রাসূলের খাঁটি উত্তরসূরী হিসাবে কবুল করুন।

**স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ!**

দাওরা হাদীস সমাপনী উপলক্ষে তোমরা বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ 'ইসতামতি বিহায়াতিক'-এর অনুবাদ করেছো। বিষয়টি শুনে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। ব্যতিক্রমধারার এ কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়া খুবই জরুরী ছিল। ব্যক্তিজীবনে রাসূলের সীরাত থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য এ বইটি আদর্শ মাধ্যম হতে পারে। ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের সন্ধিলগ্নে তোমাদের এ অনুবাদকর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমত হিসেবে আল্লাহর কাছে কবুল হোক এই দোয়া করি। ভবিষ্যতে হিম্মত করে তোমাদেরকে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

**মুহাম্মদ জাকারিয়া**

দ্বীনী খাদেম

দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা

---

**জামিয়ার সম্মানিত শিক্ষাসচিব, ইফতা ও ফতোয়া বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক উসতাযুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, হযরত** মাওলানা মুফতী আব্দুল বারী **সাহেব দা.বা.-এর বাণী ও দোআ**

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের তরে। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, সমস্ত দোষ ও খুঁত থেকে মুক্ত। হৃদয়ের গভীর থেকে অসংখ্য অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে। যার আদর্শের মাঝে রয়েছে প্রকৃত সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, যার পূর্ণ অনুসরণে রয়েছে উভয় জগতের সফলতা-কামিয়াবী।

**স্নেহের তালিবানে ইলম!**

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বহু প্রতিকূলতা এড়িয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে আজ তোমরা এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছো। জীবনের বড় একটা অংশ তোমরা এই প্রতিষ্ঠানে কাটিয়েছো। এই দীর্ঘ সময়ে কুরআন হাদীস তথা আসমানী ওহীর জ্ঞানসাগরে অবগাহন করে তোমরা এ পর্যন্ত পৌঁছেছো। এটা অবশ্যই মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহ। তাই শুকরিয়া সবটুকু তার দরবারে নিবেদিত।

একটু চিন্তা করে দেখো, এই তো সেদিন তোমরা কোরআন হাতে মকতবে এসেছিলে। কিন্তু বলো, ক'জনের তাওফীক হয়েছে এ পর্যন্ত আসার! দরসে হাদীসে বসার!! এবং 'ক্বালা রাসূলুল্লাহ'-এর মোবারক নিসবতে অংশীদার হওয়ার!!!

**আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!**

'ইলম' হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত এক নূর ও জ্যোতি। এ জ্যোতির মাঝেই রয়েছে মানবজাতির সফলতা ও কামিয়াবী।

দেখো! পৃথিবী আজ বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত। অথচ মানুষ নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয়ভাবে চরম বিপর্যস্ত। আর এমনি এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তোমরা জাতির হাল ধরতে চলেছো। তাই তোমাদেরকে হতে হবে পরম খোদাভীরু, পূর্ণ সচেতন এবং দক্ষ, বিজ্ঞ ও কৌশলী একজন রাহবার। কারণ, তোমাদের একটু অসচেতনতা ও সামান্য গাফলত ডেকে আনতে পারে দ্বীনের জন্য চরম বিপর্যয়।

**আমার স্নেহের ছাত্ররা!**

বিদায়ের এই করুণ মুহূর্তে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তোমাদেরকে আরেকটি কথা বলতে চাই, তোমাদের ওপর এই জামেআর অবদানের কথা কখনো ভুলবে না। পরম হীতাকাঙ্ক্ষী উস্তাদবৃন্দের কথা ভুলে যাবে—এটা তো কল্পনাও করা যায় না। যেখানে যে অবস্থায়ই থাকো, জামিয়ার উস্তাদদের কথা স্মরণ রাখবে, দোয়ায় স্মরণ করবে।

**কিতাব সম্পর্কে কিছু কথা:**

বিদায়বেলা কিছু স্মৃতি-স্মরণিকা রেখে যাওয়ার একটি নিয়ম আমাদের অঙ্গনে ছিলো এবং আছে। মাশাআল্লাহ তোমাদের এবারের এই ইলমী উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তোমরা আরবের বিশিষ্ট আলেম ও দাঈ শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসতামতি বিহায়াতিক' -এর অনুবাদ করেছো। সীরাতে রাসূলের আলোকে আখলাক ও মুআশারা সম্পর্কিত চমৎকার একটি কিতাব এটি। মানসিকতা চর্চা এবং আচরণ উচ্চারণ সমৃদ্ধ করে জীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এ কিতাবটি বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

অনুবাদের বিভিন্ন অংশ আমি দেখেছি, পড়েছি। যথেষ্ট সুন্দর ও সার্থক মনে হয়েছে। আমি আশা করি, কিতাবটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলীর সমাধানে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তোমরা যারা দীর্ঘ পরিশ্রম করে কাজটি শেষ করেছো তাদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আমার আন্তরিক দোআ ও মুবারকবাদ রইলো।

আল্লাহ তোমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর করুন। দ্বীনের সকল ময়দানে তোমাদেরকে সফলভাবে খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল বারী**

দ্বীনী খাদেম

দারুল উলূম মাদানীনগর

# শেষ হয়ে এলো বেলা

মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শোকর, তিনি আমাদেরকে ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবন কাটানোর জন্য মনোনীত করেছেন। আর তাই আল্লাহ ছোট বয়সেই আমাদেরকে মাদরাসায় এনেছেন। তারপর দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেলো। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সময়ও ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এলো। সেই মক্তবের ছোট্ট আমরা আজ দাওরায়ে হাদীস সমাপন করতে যাচ্ছি।

**যাদের অনুগ্রহের ঋণ শোধ করার নয়:**

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের বাবা-মায়ের। যারা আমাদের জন্য সর্বোত্তম ইলমকে বেছে নিয়েছেন। শুধু শিক্ষা নয়, আদরের সন্তানকে যারা মানুষরূপে দেখতে চেয়েছেন। শিক্ষাজীবনের এই প্রান্তে এসে আজ তাদের কথা খুব বেশি মনে পড়ছে। কত দিন কত রাত তারা আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখে চলেছেন। অন্তরের লালিত স্বপ্ন পূরণের আশায় প্রাণের টুকরা সন্তানকে দিয়েছেন দূর দেশে।

দাওরাতুল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছার এই দীর্ঘ পথে সবচেয়ে বড় অবদান তো তাদেরই। আমাদের সকল অর্জনের কৃতিত্ব মূলত তাদেরই। তাই অবুঝ আমরা শুধু দোয়া করি, ‘হে আল্লাহ, তাদেরকে সন্তুষ্ট করে আপনি

আমাদেরকে জান্নাত কামাইয়ের তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে তাদের চোখের শীতলতা হওয়ার তাওফীক দান করুন। এখানে এবং সেখানে সব জায়গায় তাদের সুখে রাখুন। হে আল্লাহ, অবুঝ সন্তানদের এই প্রার্থনা আপনি কবুল করুন।' আমীন।

**যাদের ইহসান ভোলার নয়:**

জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের গড়ে তোলার জন্য দিন-রাত সাধনা করেছেন আমাদের আসাতিযায়ে কেরাম। তাদের ইহসান ও অবদানের কথা কী বলবো! বিশাল সমুদ্রে কত ফোঁটা পানি আছে, তা কি কেউ গুণতে পারে! গোণার কল্পনা করতে পারে! বিশাল পাহাড়ের বালুকারাশি কেউ গুণতে পারে! গোণার কল্পনা করতে পারে! আমাদের আসাতিযায়ে কেরামের ইহসানের তুলনাও এমনই। দরসের মসনদে বসে তারা ভুলে যান জীবনের সব ব্যস্ততা। দরসের আলোচনায় তারা খুঁজে পান জীবনের অমীয় সুধা। হৃদয়ের সবটুকু দরদ আর মমতা ঢেলে তারা দরস দান করেন।

তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার জীবনের প্রিয় মুহূর্ত কোনটি, আমাদের বিশ্বাস, তারা বলবেন, 'যে সময় আমি কোরআন-হাদীস সামনে নিয়ে বসি, আর আমার সামনে বসে থাকে তালিবুল ইলমের জামাত।' আর তাই তো জীবনের সব ব্যস্ততা ভুলে দরসের টানে ছুটে আসা, অসুস্থ শরীরে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে দরসে চলে আসা—এগুলো তো আমাদের নিত্যদিনের দেখা।

আজ এ মুহূর্তে সেসব স্মৃতিরা যেন মিছিল করে করে আমাদের সম্মুখে এগিয়ে আসছে।

এটা সত্য, আসাতিযায়ে কেরামের সেই মুহাব্বত ও ভালোবাসার কখনো কদর করতে পারিনি, এমনকি তাদের সামনে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবেগটুকুও প্রকাশ করতে পারিনি। কখনো গিয়ে মুখ ফুটে বলতে পারিনি, ‘হুজুর! আমাদের সারা জীবনের প্রতিটি অণু-পরমাণু আপনাদের কাছে ঋণী।’ কখনো বলতে পারিনি, ‘হুজুর! আমাদের জীবনের সকল পাওয়া ও অর্জনের সেতুবন্ধন তো আপনারা।’ মক্তব ও হেফজখানার আসাতিযায়ে কেরামের সামনে দাঁড়িয়ে জানাতে পারিনি তাদের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা। তবে আমাদের হৃদয়ের জগতে তাদের আসন অনেক উঁচু। রক্তের আপনদের পরে একজন মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়ে যেমনটা উচ্চ হতে পারে ততটাই। আসলে মা-বাবা সন্তানকে ভালোবাসেন এবং প্রকাশও করতে পারেন মমতা ও ভালোবাসা। কিন্তু সন্তান পারে কেবল হৃদয়জুড়ে মা-বাবার প্রতি গভীর ভালোবাসা লালন করতে। পারে না হৃদয়ের অভিব্যক্তিগুলো মুখ ফুটে বলতে। উসতাদের প্রতি ছাত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা।

সবশেষে আমাদের করজোর নিবেদন, ‘এতদিন যেমন ছিলাম আপনাদের ছাত্র, সারা জীবনও তেমনি আপনাদের ছাত্র হয়েই থাকতে চাই। আপনারাও আমাদেরকে সেভাবেই গ্রহণ করুন’—এই আমাদের শেষ তামান্না। এখানে যত দিন ছিলাম আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেমন শাসন করেছেন,

আমাদেরকে গড়ে তুলেছেন, তরবিয়ত করেছেন চিরকাল যেন এ সম্পর্ক বজায় থাকে। সময়ের তাগিদে জীবনের কর্মক্ষেত্র হয়ত বদলে যেতে পারে এবং সৃষ্টি হতে পারে জিসমানি দূরত্ব, কিন্তু হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের যে যোগাযোগ তাতে যেন দূরত্ব সৃষ্টি না হয়, যেন বদলে না যায় আগের আর পরের আচরণ।

**হৃদয়ের গভীরে তুমি হে জামিয়া:**

জীবনের এই প্রান্তে এসে হৃদয়ের গভীরে খুব বেশী অনুভব করছি তোমায় হে জামিয়া। তোমার কোলে পিঠেই তো কাটিয়েছি আমরা জীবনের অনেকটা সময়। তোমার আলো বাতাসেই তো সৃষ্টি হয়েছে আমাদের রুচি, আমাদের চেতনবোধ। দিনরাত কা-লাল্লাহ, কা-লার রাসূলের সুমধুর গুঞ্জন শুনে তোমাতেই তো আমরা পেয়েছি জীবনপথের আলো। কিন্তু আজ সময় ফুরিয়ে এলো। যেতে হবে, না চাইলেও তোমাকে ছেড়ে আজ আমাদের চলে যেতে হবে।

আমরা চলে যাচ্ছি... বিশ্বাস করো এই মুহূর্তটা অনেক কষ্টের, অনেক বেদনার। বিচ্ছেদের এই বেদনা বলো কী করে সইবো? হৃদয়ে-সাগরে ফুঁসে ওঠা কষ্টের ঢেউগুলো বলো কীভাবে সয়ে নেবো? বিদায়বেলা কামনা করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার রুহানী সন্তানেরা তোমার জ্যোতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ুক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে। গোটা সমাজ তোমার আলোয় উদ্ভাসিত হোক।

**জাতির সোনালী স্বপ্ন অনুজপ্রতিম বন্ধুরা!**

ছায়া সুশোভিত ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূমের মনোরম পরিবেশে দীর্ঘ এক

যুগ অতিবাহিত করেছি তোমাদের সাথে। জামেয়ার ইলমী কাননে আমরা ছিলাম একই মায়ের সন্তানের মত ভ্রাতৃত্বের সুতোয় গাঁথা। কালের খেয়ায় চড়ে আমরা অগ্রজ হয়েছি। দিতে পারিনি তোমাদের যথাযথ আদর ও সোহাগ কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি আশাতীত আনুগত্য আর অশেষ ভালোবাসা। বিদায়ের অশ্রুসিক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ মনে পড়ছে শত সহস্র স্মৃতি। প্রিয় অনুজরা! আমরা এই দ্বীনী শিক্ষাসফরে একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়েছিলাম। আজ ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমাদের কাছে বিদায় চাচ্ছি। বিদায়বেলায় কষ্টের কান্না থামাই কী করে বলো! তবে সান্ত্বনা এটুকু যে, আমরা বিদায় নিলেও আমাদের আত্মার বন্ধন কখনো ছিন্ন হবে না। স্নেহের অনুজরা আজকের পৃথিবী তো তোমাদেরই সামনে। পৃথিবীর এই করুণ মুহূর্তে হাল ধরার জন্য তো তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের কাজের ময়দানের সহযাত্রী তো তোমরাই। সত্য সুন্দরের পথে তোমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক—বিদায় বেলায় এটাই আমাদের কামনা।

‘শেষ হয়ে এলো বুঝি বেলা ফুরালো ফাগুন রাতের মেলা,
চলে গেছে অনেক সোনালী সময়, হোক এ বিদায় প্রভু কল্যাণময়।’

---

**الطرق والأسانيد**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ: اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ لَوْلَا اَلْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

[এখানে আরবী এবং ফারসি কবিতার মাধ্যমে একটি বংশপরম্পরা বা সনদ চিত্রিত হয়েছে যা সাধারণত ইলমে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা সমাপনকালে প্রদান করা হয়। এতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের দেওবন্দী আলেমদের সিলসিলা বা ধারা বর্ণিত হয়েছে।]

---

## ফিকহে হানাফীর সনদ

১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.

৪. আলী ইবনে আবু তালেব রা.

৫. আসওয়াদ

৬. আলকামা

৭. ইবরাহীম নাখায়ী

৮. হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান

৯. ইমাম আযম আবু হানীফা

১০. ইমাম আবু ইউসুফ

১১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শাইবানী

১২. আবু সুলাইমান জুযুজানী

১৩. আবু বকর জুযুজানী

১৪. আবু মানছুর মাতৃরীদী (মাতৃরীদী আকীদার ইমাম)

১৫. শামছুল আইম্মা হালওয়ানী

১৬. শামসুল আইম্মা সারাখসী

১৭. বুরহানুল আইম্মা আবদুল আযীয ইবনে মাজাহ

১৮. সাদরুশ শহীদ উমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মাজাহ

১৯. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী মারগীনানী (হেদায়া গ্রন্থকার)

২০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সাত্তার কারদারী

২১. হাফিযুদ্দীন আবুল বারাকাত নাসাফী (কানযুদ দাকাইক গ্রন্থকার)

২২. হাসান ইবনে আলী আসসিগনাকী

২৩. কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আলকাকী (মি'রাজুদ্দিরায়া গ্রন্থকার)

২৪. আকমালুদ্দীন মুহাম্মদ আলবাবারাতি (আল ইনায়াহ গ্রন্থকার)

২৫. সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী "কারিউল হিদায়া"

২৬. কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল কাদীর এর গ্রন্থকার)

২৭. আবদুল বার ইবনুল শাহনাহ (শরহুল ওয়াইবানিয়্যাহ এর গ্রন্থকার)

২৮. আহমদ ইবনে ইউনুস ইবনুশ শিল্পবী (শরহুল কানন এর গ্রন্থকার)

২৯. যাইন ইবনে মুজাইম (কানযুদ দাকাইক এর ভাষ্যগ্রন্থ আলবাহরুর রায়েক এর গ্রন্থকার)

৩০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আলগাযী (তানবীরুল আবছার এর গ্রন্থকার)

৩১. আবদুল গাফফার “মুফতিউল কুদস”

৩২. মুহাম্মদ ইবনে আলী আলমাকতাবী

৩৩. সালিহ ইবনে ইবরাহীম আলজীনীনী

৩৪. হিবাতুল্লাহ আলবানী

৩৫. আমীন ইবনে আবিদীন শামী (রদ্দুল মুহতার এর গ্রন্থকার, যা “ফতওয়ায়ে শামী" নামে প্রসিদ্ধ)

৩৬. আলাউদ্দীন ইবনে আবিদীন শামী

৩৭. ইবরাহীম হাজী আলআকীনী

৩৮. মুহাম্মদ যাহিদ ইবনুল হাসান আলকাউসারী

৩৯. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ

৪০. আবদুল মালেক ইবনে শামসুল হক কুমিল্লায়ী

# সূচিপত্র

# ভূমিকা

আরব বিশ্বে সাড়া জাগানো বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসতামতি বিহায়াতিক'। লেখক ড. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন সাচ্চা দাঈ। ইসলামের সৌন্দর্যকে সাবলীল ভাষায় উম্মাহর সম্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়। লেখনীর ময়দান ও বক্তৃতার অঙ্গনে বর্তমান আরব বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার একটি অমর সৃষ্টি। আচরণ-দক্ষতাকে পরিস্ফুট করার শত কৌশল তিনি এতে তুলে ধরেছেন।

কিতাবটির বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়ন অসাধারণ। প্রাঞ্জল ও জাদুময় লেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন—আখলাক চরিত্র, চিন্তা-চেতনা ও মানবীয় মহৎ গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে কীভাবে উজ্জ্বল করতে পারি। কীভাবে আমরা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারি। সর্বোত্তম আখলাক ও চরিত্রের অধিকারী হয়ে কীভাবে নিজেদের জীবনকে আলোকিত ও সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি।

**আখলাক মূল্যবান সম্পদ**

আখলাক মানবজীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। ব্যক্তিজীবনে আখলাকের বিপর্যয় হলে সামাজিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। সমাজে অনৈতিক

আচরণ বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সামাজিক নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়।

ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যার আখলাক ভালো, যার চরিত্র সুন্দর।'

তিনি আরো বলেছেন, 'মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ, যার আখলাক ভালো, যার চরিত্র সুন্দর।'

আরো ইরশাদ করেছেন, 'মুমিন তার মহৎ গুণ এবং সুন্দর চরিত্রের কল্যাণে রাতে সালাত ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মর্যাদা ও পুরস্কার লাভ করে।' ^১[সুনানে তিরমিযী: ১০৮২]

উত্তম আখলাক ও সুন্দর চরিত্র সম্পর্কিত কোরআন-হাদীসের বাণীগুলো অধ্যয়ন করলে আমরা মুগ্ধ হবো। নবীজীর সীরাত পাঠ করলে বুঝতে পারবো তিনি মানুষের সঙ্গে কত সুন্দর আচরণ করেছেন। চরিত্রগুণে কীভাবে তিনি মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়াবনত ও বিনম্র ব্যবহারকে তিনি ইবাদত মনে করতেন।

উত্তম আখলাকের অধিকারী ব্যক্তির পুরস্কার ঘোষণা করে তিনি বলেছেন, 'আমি জান্নাতের নিম্নভূমিতে অবস্থিত একটি বাড়ির জিম্মাদার। বাড়িটি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অধিকার থাকা সত্ত্বেও তর্ক করে না, ঝগড়া পরিত্যাগ করে। এবং আমি জান্নাতের সাধারণ উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাড়ির জিম্মাদার ওই ব্যক্তির জন্য, যে মিথ্যা বর্জন করে। ঠাট্টা ও রসিকতা করেও

মিথ্যা বলে না। আর আমি জান্নাতের সবচে উঁচু ও অভিজাত এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়ির জিম্মাদার ওই ব্যক্তির জন্য, যার আখলাক ভালো ও চরিত্র সুন্দর।'

উত্তম আখলাক ইসলামের মূল সৌন্দর্য। শক্তির জোরে নয়, বরং ইসলামের সূচনা থেকে অদ্যাবধি ইসলামী আখলাক ও তাহজীব-তামাদ্দুনের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়েই মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ইসলামের বিজয়-ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বিষয়টি আমাদের সম্মুখে প্রভাত সূর্যের মত আলোকিত হয়ে উঠবে।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অবহেলিত বরং নির্যাতিত হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, আখলাকের বিপর্যয়ই এর অন্যতম কারণ। মুসলমানদের আখলাক দেখে অমুসলিমরা এখন আর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যারা নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করে তারা মুসলমানদের লক্ষ করে এখন বলে, “You are muslim by chance and we are muslim by choice"। অর্থ: তোমরা তো মুসলমান হয়েছো ভাগ্যক্রমে জন্মসূত্রে আর আমরা হয়েছি ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে। এই অবস্থান থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। সকলের সঙ্গে সর্বোত্তম আখলাক প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের আখলাকে অমুসলিমরা অনুধাবন করবে ইসলামের প্রকৃত পরিচয়। মুসলমানরা পাবে সরল-সঠিক পথের দিশা। সর্বোত্তম আখলাক দিয়ে আমরা আবার গড়ে তুলবো আলোকিত এক ভুবন। আমরা আবার ফিরিয়ে আনবো খেলাফতে

রাশেদার সোনালি সেই যুগ; যেখানে অবিরত ধারায় প্রবাহিত হবে শান্তির মৃদু সমীরণ।

হ্যাঁ, কীভাবে সবার সঙ্গে সর্বোত্তম আখলাক প্রদর্শন করা যায় সেটাই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থটিতে। আমাদের এখন সাহস করে শুরু করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া উত্তম সেই আখলাকগুলো। তবেই আমরা ফিরে পাবো সুখময় জীবনের সন্ধান।

### নবী-জীবনে উত্তম আখলাক

রাসূল ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর মত সুন্দর, তাঁর মত উৎকৃষ্ট এবং তাঁর মত কোমল ও মধুময় আখলাক আর কেউ প্রদর্শন করতে পারেনি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

[সূরা কলাম] آيه ﴿٤﴾

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন, ‘আমি তো কেবল প্রেরিত হয়েছি সৎ চরিত্র ও মহৎ গুণাবলীকে পূর্ণতা দান করতে।’ আরব-কবি বড় সুন্দর বলেছেন:

তোমার চেয়ে সুন্দর আর দেখেনি তো কেউ কভু
তোমার চেয়ে উত্তম করে সৃজন করেননি প্রভু,
করলেন সৃজন তোমাকে তিনি সকল ত্রুটি-মুক্ত করে
মনে হয় যেনো সৃজিলেন তিনি চেয়েছো তুমি যেমন করে।

সীরাতে ও সূরাতে বিশ্বনবী বিশ্বের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। আমরা বড় সৌভাগ্যবান, এমন একজন মহামানবকে রাব্বুল আলামীন আমাদের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তার আদর্শকে আমাদের আদর্শ হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

﴿٢١﴾ آيه [সূরা আহযাব]

যে কোনো কাজ সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেয়ার জন্য আমাদের আলাদা করে কোনো ফিকির করতে হবে না। রাসূল যেভাবে করেছেন, যেভাবে তিনি যে কাজ সম্পাদন করেছেন, ঠিক সে পদ্ধতি অবলম্বন করলেই আমাদের কাজগুলো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে হয়ে যাবে। জীবনের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, ব্যক্তিজীবন থেকে পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন, মোটকথা জীবনের প্রতিটি স্তরে একই কথা প্রযোজ্য। প্রতিটি স্তরেই রয়েছে নবীজীর সুনির্দিষ্ট আদর্শ। পৃথিবীর ইতিহাসে এত সুন্দর আদর্শ এবং এত সুবিন্যস্ত পথনির্দেশিকা অন্য কোনো ধর্মে নেই।

তাই আমাদেরকে একটু হিম্মত করে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। রাসূলের সীরাতকে হৃদয় থেকে বরণ করতে হবে। রাসূল কীভাবে পথ চলেছেন, কীভাবে সর্বোত্তম আখলাক প্রদর্শন করে এত সংক্ষিপ্ত জীবনে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বর জাতির ইতিহাস পাল্টে দিয়ে তাদেরকে করেছেন মানুষ ও মানবতার আদর্শ—তা আমাদেরকে জানতে হবে এবং সে পদ্ধতি অবলম্বন করে জীবনের প্রতিটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। কী ছিল সেসব পদ্ধতিগুলো? বক্ষমাণ গ্রন্থটিতে লেখক সেগুলোই তুলে ধরেছেন চমৎকার

উপস্থাপনায়। এগুলো আমাদের চর্চা করতে হবে। আন্তরিকতার সাথে বিষয়গুলো আত্মস্থ করতে হবে। আশা করা যায় তখন আমরা পাবো সুখময় জীবনের সন্ধান।

**মানসিকভাবে শাহজাদা হতে হবে**

জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করতে হলে মন ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি যদি সুন্দর চিন্তা করি, আমার প্রতিটি কর্ম সুন্দর হবে। পক্ষান্তরে চিন্তা ও মনের বাগডোর হাতছাড়া হলে জীবন এলোমেলো হবে নিশ্চিত। নবীজীর কণ্ঠনিঃসৃত হাদীসে এমনই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'শোনো, মানবদেহে একটি অঙ্গ আছে, যখন সেই অঙ্গটি পবিত্র হবে তখন গোটা মানবদেহই হবে পবিত্র। পক্ষান্তরে সেই অঙ্গটি যদি অপবিত্র হয়ে যায়, তবে গোটা শরীর অপবিত্র হয়ে যাবে। শোনো, সেই অঙ্গটি হলো ক্বলব।' ^১[সহীহ বুখারী: ৫০]

ইতিহাসে যারা বড় হয়েছেন, যারা দেশ ও জাতির জন্য কিছু করতে পেরেছেন, জীবনে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়েছেন, তাদের জীবন-ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখবো তাদের সফলতার পেছনে প্রধান চাবিকাঠি ছিলো মানসিক শক্তি। হয়তো কোনো অজপাড়াগাঁয়ে ছিলো তার বসবাস, হয়তো কোনো জীর্ণ কুটির ছিলো তার আশ্রয়, কিন্তু মানসিকভাবে তিনি ছিলেন শাহজাদা। চিন্তায়-চেতনায় তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ময়ূর-সিংহাসনের অধিপতি রাজা-বাদশাকেও। তবেই না হয়েছেন সফল। হয়েছেন আলোকিত মানুষ।

আমাদের অনেককে দেখা যায়, তাদের মাশাআল্লাহ যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কিন্তু মানসিকভাবে অনেক হীনমন্যতায় ভোগে। সাহাসের সঙ্গে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। সবসময় নিজের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। নিজেকে সবসময় তুচ্ছজ্ঞান করে মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, সবার জন্য সম্ভব হলেও অন্তত আমার পক্ষে এমন মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়। জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা আমার জন্য শোভা পায় না। আমার স্বভাব প্রকৃতির মাঝে কোনো ধরণের পরিবর্তন ঘটবে না। এভাবেই আমাকে চলতে হবে।

আরব কবি যেনো এদের সম্পর্কেই বলেছেন:

পর্বত-চূড়ায় উঠতে যার মনে ভয়-কম্পন
ভূমির অতল গহ্বরে সে রয়ে যায় আমরণ।

এভাবে নেতিবাচক মানসিকতা পোষণ করার কারণে জীবনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে না। সাহস করে প্রতিযোগিতার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। তাই তার জীবনে নেই সফল ব্যক্তির বিজয়ের অনুভূতি। নেই ব্যর্থতা কিংবা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে অটল-অবিচল থাকার সুদৃঢ় শক্তি। মানসিকভাবে হয়ে পড়ে সে ঘরকুনো, বিকারগ্রস্ত। সব কাজে ভয়; না জানি কখন কী হয়! এ পরিস্থিতিতে জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ মানসিকতার চর্চা করতে হবে। মানসিকভাবে অনেক বলীয়ান হতে হবে, নিজেদের মন ও চিন্তাকে অনেক অ-নে-ক শক্তিশালী করতে হবে।

কিভাবে সে পথে অগ্রসর হবো, কীভাবে প্রবল মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারবো, সে কথাই লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে। আমরা যদি নিয়মিত এর চর্চা করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা পাবো সুখময় জীবনের সন্ধান।

## সফলতার চাবিকাঠি

চেতনাশীল মানুষ সফলতার স্বপ্ন দেখে। জীবনসংগ্রামে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে কেউ সফলতার আশায় থাকে। কারো উদ্যানে ফুল ফোটে, কারো আবার ফোটে না। সীমাহীন পরিশ্রম করে কেউ হারে, আবার কেউ স্বল্পতেই সফল হয়। তাদের সফলতার পেছনে থাকে কিছু কৌশল। বস্তুত বিপুল মানসিক শক্তি অর্জন করে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারলে সফলতা সুনিশ্চিত। কী সেই কৌশলগুলো? সে কথাই সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটির কিছু শিরোনাম লক্ষ করুন।

- নিজেকে এগিয়ে নিন... প্রতিনিয়ত...
- আপনি হোন ভিন্ন... হোন অনন্য...
- উপভোগ করুন আচরণদক্ষতা
- দুশ্চিন্তায় ভুগে নিজেকে নিঃশেষ করবেন না
- ভুলের সমাধান করুন সহজভাবে
- দুশ্চিন্তা ও ঝামেলাকে এড়িয়ে চলুন
- পাহাড়ের মত অটল হোন

- হাসুন.. মুচকি হাসুন.. এবং হাস্যোজ্জ্বল হোন
- সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব নেবেন না
- বাহ্যিক বেশভূষায় সচেতন হোন
- প্রয়োজন পূরণ করতে না পারুন, বচনগুণে মুগ্ধ করুন

পাঠক! এ ধরণের ৯১ টি কৌশল এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। লেখক দীর্ঘ বিশ বছর সাধনা করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আশ্চর্য হওয়ার মত বিষয়, সব কৌশলগুলোর পক্ষে নবীজীর সীরাত থেকে, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে অথবা কোনো মুসলিম মনীষীর জীবনী থেকে একাধিক উপমা তিনি তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন এভাবে—আমার বয়স যখন ষোল বছর, 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ' নামক ডেল কার্নেগির একটি বই আমার হাতে আসে। চমৎকার একটি বই। বইটি আমি অনেকবার পড়েছি। লেখক প্রতিমাসে একবার করে বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি সেভাবেই পড়েছি। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের সময় তার লিখিত নিয়মনীতিগুলো ধীরে ধীরে অনুশীলন করেছি এবং এর ফলে আশ্চর্য উপকারও পেয়েছি।

ডেল কার্নেগি প্রথমে মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের একটি নীতি লিখেছেন। এরপর এর প্রায়োগিক অনেক উপমা-উদাহরণ পেশ করেছেন। রুজভেল্ট, লিংকন, জোসেফ-এর মত তার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনে ঘটে যাওয়া এ সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনাও তিনি তুলে ধরেছেন। আমি চিন্তা করে দেখলাম, লেখক শুধু পার্থিব সুখ-শান্তি অর্জনের কথাই

লিখেছেন। তিনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতেন, ইসলামী আখলাক সম্পর্কে লিখতেন, তাহলে তো তিনি উভয় জগতের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারতেন।

মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের এই যোগ্যতাকে তিনি যদি ইবাদতে রূপান্তর করতেন, কতো ভালো হতো! কারণ ইবাদতের মাধ্যমে তো বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

কিছুদিন পর জানতে পারলাম, বেচারা 'ডেল কার্নেগি' আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। বুঝলাম, বইটা অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও লেখকের নিজেরই তা কোনো উপকারে আসেনি। আমি ফিরে তাকালাম আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের দিকে। দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত, সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনে সামাজিক আচার-ব্যবহারের এমন অনেক আদর্শ রয়েছে, যা আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য যথেষ্ট। তখন থেকেই আমি এ বিষয়ে লিখতে শুরু করি।

তাই বলা যায়, বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটি এক মাস কিংবা এক বছরের পরিশ্রমের ফল নয় বরং দীর্ঘ বিশ বছরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফসল। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ পর্যন্ত বিশটিরও বেশি গ্রন্থ প্রণয়নের তাওফীক দিয়েছেন। দু'একটি বইয়ের বিশ লক্ষাধিক কপি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সবচে প্রিয়, সবচে মূল্যবান এবং মনে হয় সবচে বেশি জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উপকারী গ্রন্থ এটি।' লেখকের কথা এখানেই শেষ।

রাসূলের সীরাতের আলোকে সফলতার কৌশলগুলো চমৎকারভাবে বিবৃত হওয়ায় সত্যি গ্রন্থটি এক অনবদ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। শামায়েলে তিরমিযীতে একটি হাদীস আছে, হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুসাইন বিন আলী রাযি. বলেছেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী রাযি. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরদের সাথে তাঁর আচরণ কীরূপ ছিল, তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের, স্নেহপরায়ণ, সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। কারো তার সমর্থন-সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সহজেই তিনি তার সহযোগী হয়ে যেতেন। তিনি কটুভাষী (কর্কশভাষী) ও পাষাণহৃদয় ছিলেন না। চিৎকার করে কথা বলতেন না। অশ্লীলভাষী ছিলেন না। ছিদ্রান্বেষীও ছিলেন না (কারো দোষ ধরতেন না)। কৃপণও ছিলেন না। অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অশোভনীয় কথা ও কর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কারো কোনো আবেদন অনাকাঙ্ক্ষিত হলে তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতেন না। আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না।

তিনি তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছেন—ঝগড়া, অহঙ্কার ও নিরর্থক কথা-বার্তা। তিনি মানুষকেও তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন—সামনাসামনি কারো নিন্দা করতেন না। কারো অবর্তমানেও তার দুর্নাম করতেন না। কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না। তিনি শুধু এরূপ কথাই বলতেন, যা থেকে সাওয়াবের আশা করতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, উপস্থিত লোকজন মাথা ঝুঁকিয়ে এমনভাবে নীরব থাকতেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি কথা বন্ধ করলে তারা কথা বলতেন।

তার সামনে তারা কোনো বিষয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন না। তার সাথে কেউ কথা বলতে থাকলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যরা নীরব থাকতেন। তাদের প্রত্যেকের কথা তার নিকট তাদের প্রথম ব্যক্তির কথার মত ছিল। অর্থাৎ মজলিসের শুরু এবং শেষে প্রত্যেকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কোনো কথায় সকলে হাসলে তিনিও হাসতেন। এবং কোনো বিষয়ে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত মুসাফিরের কর্কশ কথাবার্তায় বা অসঙ্গত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। এমনকি তার সাহাবীগণ ও মুসাফিরকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসতেন এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় তার নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি উপদেশ দিয়ে বলতেন, কেউ কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য এলে তোমরা তাকে সাহায্য করো। তিনি চাটুকারিতা পছন্দ করতেন না। অবশ্য উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসায় তিনি নীরব থাকতেন। তিনি কারো কথায় বাধা দিতেন না; যাবৎ না সে সীমালঙ্ঘন করতো। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মুখে বাধা দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন।

গ্রন্থটি অধ্যয়নকালে বর্ণিত হাদীসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে পাঠকসম্মুখে বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে, লেখক কত সুন্দরভাবে সীরাতের সঙ্গে বিষয়গুলোকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি এই কৌশলগুলো চর্চা করতে পারি, আমরা যদি রাসূলের আদর্শকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি, কেবল তখনই আমরা পাবো সুখময় জীবনের সন্ধান।

# কীভাবে উপকৃত হবো এ বই থেকে?

পাঠক! এ বই পড়লে আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে মানুষের সঙ্গে আচরণ ও উচ্চারণসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়। এই বইয়ে আমাদের জীবনের আচরণ ও উচ্চারণসংশ্লিষ্ট প্রায় সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখকের সচেতনতা সত্যিই প্রশংসনীয়। বইটি পড়লেই বোঝা যায়, বিষয়টি ছিলো তার সবসময়ের গভীর ভাবনার বিষয়। এ বইটি তাই কেবল কিছু নীতিকথার সমষ্টি নয়, বরং এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতামালার সমষ্টি। আর বইটি নিয়মিত পড়লে আমাদের মাঝেও সৃষ্টি হতে থাকবে এসব গুণের প্রকাশ।

এ বইয়ের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। পাঠক যত পড়বেন, ততই সেগুলো জানতে পারবেন। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যখনই আমি গ্রন্থটি পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। তাই পাঠক ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারাও কিছু দিন বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। ইনশাআল্লাহ নিজের মাঝে সীমাহীন পরিবর্তন অনুভব করবেন।

এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আমরা কয়েকটি কাজ করতে পারি—

১. বইটি নিয়মিত প্রতিদিন কিছু কিছু করে পড়বো। বইয়ের বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাববো।

২. প্রতিদিন কিছু কিছু কাজ করার সংকল্প করবো। গতকালের সংকল্প করা কোন কাজটি আমি আজ করতে পেরেছি, আর কোনটা পারিনি—

এসব নিয়ে ভাববো। বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর কোন কোনগুলো আজ প্রয়োগ করতে পারতাম কিন্তু করিনি—তা নিয়ে ভাববো।

৩. উপরের কাজগুলো করার জন্য অন্তত ১০ মিনিট সময় খালি করবো। নির্দিষ্ট একটি সময় প্রতিদিন কাজটি করবো। নীরবে বসে ভাববো। আর নির্জন কোনো জায়গা হলে আরো ভালো হয়।

৪. বাসায় কিংবা সাথীদের মাঝে একত্রে বসে তালীম হিসেবে বইটি কিছুক্ষণ পড়তে পারি। আর বইটি যেহেতু রাসূলের জীবনের প্রায়োগিক প্রকাশের অন্যতম ক্ষেত্র, তাই রাসূলের জীবনের ঝলক আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. নিজের জন্য একটি খাতা তৈরি করে নেবো। সেখানে আমাদের বিভিন্ন ভুল আচরণ ও উচ্চারণগুলো লিখে রাখবো। প্রতিদিন অন্তত একবার করে দেখবো সেই খাতা। নতুন করে সংকল্প করবো ভুলগুলো শুধরে নেয়ার। এতে ইনশাআল্লাহ অল্প দিনেই আমাদের মাঝে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করতে পারবো।

**একটি সমস্যা ও তার সমাধান:**

এবার আমরা আরো একটি বিষয়ে পাঠক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বইটিতে যে ধরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো যখন পড়ি, ইচ্ছা হয় এভাবেই জীবনটা কাটাবো। কিন্তু একটু পরে সব ভুলে যাই। তো এ সমস্যার নিরসনের জন্য আমরা কী করতে পারি। এ সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের উচিত হলো, বারবার নতুন করে দৃঢ় সংকল্প করা। এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করে যদি সফলতা পাওয়া না যায়,

তাহলে উচিত নিজের ওপর কিছু জরিমানা ধার্য করা। সমাধান না হলে ধীরে ধীরে জরিমানা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আর জরিমানা যার জন্য যেটা একটু কষ্টের হয়, তেমন কিছুই নির্ধারণ করা উচিত। যেমন: কয়েক রাকাত নামায, তেলাওয়াত, সাদকা, রোযা ইত্যাদি।

আর যারা এভাবে জরিমানার মাধ্যমে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন না তাদের উচিত এভাবে চেষ্টা করার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা এবং নিয়মিত চেষ্টা করে যাওয়া।

**শেষ কথা:**

আমাদের প্রথম কথা এবং শেষ কথা হলো ভয়কে জয় করতে হবে। মলিনতাকে প্রফুল্লতায়, দুশ্চিন্তাকে সুচিন্তায়, কৃপণতাকে দানশীলতায় এবং রাগকে সহনশীলতায় রূপান্তরিত করতে হবে। দুর্যোগ ও দুর্বিপাককে আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। জীবনে দুঃখ থাকবে, বেদনা থাকবে, থাকবে কষ্ট ও কান্না। তাই বলে ভেঙ্গে পড়া যাবে না। এসব বিষয়কে হজম করার শক্তি অর্জন করতে হবে। প্রবল বিশ্বাসকে সঙ্গী করে পথ চলতে হবে।

আমাদের অনেকের মাঝে দেশ ও জাতির জন্য অনেক কিছু করার যোগ্যতা লুকায়িত আছে। এই যোগ্যতাকে অনুভব করতে হবে। সযত্নে লালন করতে হবে। এবং সুপ্ত সেই যোগ্যতাকে বিকশিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

অসুন্দরকে সুন্দরে বদলে দিতে হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন:
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
[সূরা রাদ] آيه ١١

সর্বপ্রথম তাই আমাকে পরিবর্তন করতে হবে। সফলতার স্বপ্ন দেখতে হলে নিজের জীবনকে রাসূলের আদর্শময় জীবনের দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। আমার জীবনে নববী আখলাকের বিকাশ ঘটাতে হবে। নবীজীর আদর্শকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। মানুষকে ভালোবাসতে হবে। তখন মানুষ আমাকে ভালোবাসবে। আমার স্বপ্নগুলো খুব সহজে তখন ফুল হয়ে ফুটবে। এবং তখন খুব সহজেই আমি খুঁজে পাবো সুখময় জীবনের সন্ধান।

চলতি ১৪৩৫ হি./২০১৪ ঈ. শিক্ষাবছরের দাওরাতুল হাদীস ফারেগীন ছাত্ররা বইটির অনুবাদ করেছে। অনুবাদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে যাদের অংশীদারত্ব রয়েছে, 'আমাদের কথা' শিরোনামের ভূমিকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুবাদ শেষে বইটির সম্পাদনা করেছে দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের কৃতি সন্তান, বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ওসমান গনী। আল্লাহ তাদের সবাইকে সুযোগ্য ও সমাদৃত আল্লাহওয়ালা আলেম হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং তাদের মেহনতকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। সর্বোপরি বইটিকে পাঠকবৃন্দের জন্য উপকারী করুন। আমীন!

১৪-০৩-৩৫ হি.

১৫-০১-১৪ ঈ.

**বিনীত, সফিউল্লাহ ফুআদ**

দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা

# সম্পাদকের কথা

‘ইসলাম ধর্মের রয়েছে বিস্ময়কর গতিশীলতা ও শক্তি। আমার দৃষ্টিতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার আছে সৃষ্টি জগতের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা। আর এ কারণে প্রত্যেক যুগেই ইসলাম মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম। আমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধ্যয়ন করেছি, তিনি ছিলেন একজন বিস্ময়কর মানুষ। তাকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলা উচিত। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, মুহাম্মাদের ধর্ম ইসলাম আগামী দিনের ইউরোপে গৃহীত হবে। এ ধর্মকে সাদরে বরণ করে নেয়া এখনই শুরু হয়েছে। আগামী একশ' বছরের মধ্যে যদি কোনো ধর্ম বৃটেনসহ গোটা ইউরোপে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তা হলে সেটা হবে ইসলাম।’

না, এ বিশ্লেষণ আমার নয়। সমকালীন কোনো মহান ব্যক্তিত্বের উক্তিও নয় এটি। প্রাতঃস্মরণীয় কোনো মুসলিম মনীষীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যও এটি নয়। এ উক্তিটি এমন এক ব্যক্তির, ধর্মপরিচয়ে যিনি অ্যাথিস্ট বা নাস্তিক। ইসলাম ও মুসলমানের চরম শত্রু পাশ্চাত্য সমাজ যাকে ভূষিত করেছিলো নোবেল পুরস্কারে। ১৯২৫-এর বিখ্যাত আইরিশ সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০ ঈসায়ী)-এর আত্মোপলব্ধি ও সরল স্বীকারোক্তি

এটি। একজন অমুসলিম বরং স্রষ্টা বিশ্বাসে একজন নাস্তিক ইসলাম ও ইসলামের নবীকে এভাবেই অধ্যয়ন করেছেন, এভাবেই চিনেছেন।

এবার ইসলামের নবীর গুণমুগ্ধ প্রাচ্যের এক অমুসলিম লেখকের (গুরুদত্ত সিং—বার, এট ল' এডভোকেট, লাহোর হাইকোর্ট, সম্পাদক, 'ইন্ডিয়া', লন্ডন) হৃদয়ের আকুতি দেখুন—'হে আমেনার দুলাল! হে প্রিয়তম মুহাম্মাদ! বড় দ্বিধা-সংকোচ ও লাজ-শরম নিয়ে কলম তুলেছি তোমার কথা লিখবো বলে, যদি তাতে মনের বিরহ জ্বালার কিঞ্চিৎ উপশম হয়!'

'কলমের কী সাধ্য তোমার সৌন্দর্য তুলে ধরে, তোমার পূর্ণতার ছবি আঁকে। জানি এ বড় ধৃষ্টতা কিন্তু এত জন এত ক্ষমা পেলো তোমার কাছে, আমি কি পাবো না!'

এ হৃদয়-আকুতি যার, ধর্মবিশ্বাসে তিনি একজন শিখ, যে শিখদেরকে সবাই চেনে চরম মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে।

আর পাশ্চাত্যের বিখ্যাত খৃস্টান লেখক মাইকেল এইচ হার্ট ইসলামের নবী সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন এভাবে—*My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.*

'বিশ্বের সবচে প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের সর্বাগ্রে ইসলামের নবী মুহাম্মাদকে আমি বেছে নেয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হতে পারেন। কারো কারো মনে হয়তো আপত্তিও জাগতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন—উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সফল।'

একজন অবিশ্বাসী, একটি ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাসী এবং একজন ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী মনীষীর এই হলো ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে সরল অভিব্যক্তি, আত্মোপলব্ধি।

প্রশ্ন হলো আমরা যারা মুসলমান, আমরা কি ইসলাম ও ইসলামের নবীকে এমন করে অধ্যয়ন করেছি? আমরা কি উপলব্ধি করতে পেরেছি—কে তিনি, কেমন তিনি? আমাদের চিন্তা-চেতনা, আমাদের নীতি-আদর্শ এবং আমাদের সিদ্ধান্ত ও কর্মের ভিত্তিতে কী হতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর?

স্বীকার করি বা না করি, এটাই চরম বাস্তবতা যে, সব সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে, পাশ্চাত্যের রঙিন চশমা পড়ে। আমাদের আদর্শ আজ চে গুয়েভারা, নেলসন ম্যান্ডেলা, কার্ল মার্কস, লেনিন কিংবা রবি ঠাকুর! তাই বিশ্বাসে অমুসলিম হয়েও আচরণে-উচ্চারণে 'ওরা' মুসলিম, আর নামে মুসলমান হয়েও আচরণে-উচ্চারণে—এমনকি আল্লাহ মাফ করুন—বিশ্বাসেও আমরা অমুসলিম!

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। আচরণে-উচ্চারণে আখলাক ও চরিত্রগুণে, নীতি ও আদর্শে—

সর্বক্ষেত্রে তিনি সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো কালের যে কোনো স্তরের যে কেউ কোনো বিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শ যদি খুঁজে পেতে চায়, তবে তাকে শরণাপন্ন হতে হবে নববী সীরাতের।

একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রপরিচালনানীতি রয়েছে সীরাতে নববীতে, একজন শিক্ষকের জন্য আদর্শ শিক্ষানীতি রয়েছে নবীজীর জীবনাদর্শে, একজন পরিবারপ্রধানের জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারনীতি আছে নববী সীরাতের পরতে পরতে।

এককথায়, কোরআন হলো মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ গাইড বুক আর সীরাতে নববী সেই গাইড বুকের বাস্তব রূপায়ণ। তাই তো নবীজীবনের সবচে নিকট দর্শক আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেছেন, 'কোরআনই তার জীবনাদর্শ।'

সীরাতের মনোযোগী পাঠক মাত্রই জানেন, মাত্র তেইশ বছরে ইসলামের বিস্ময়কর প্রচার-প্রসার ও অগ্রযাত্রার পেছনে সবচে বড় অনুষঙ্গ ছিলো আখলাকে নববী বা নবীজীর অনুপম আদর্শ। মুসলিম-অমুসলিম বোদ্ধাগণ সকলে এ কথার স্বীকৃতি দেন, কিংবা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, তরবারির ফলাতে নয়, ইসলামের বিজয়-ইতিহাস রচিত হয়েছে আদর্শের অনুপমতায়। দীর্ঘ তেইশ বছরে মাত্র ২৬৯ জন সাহাবীর শাহাদাতের নযরানায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১২ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ডে।

সাহাবায়ে কেরাম হতে শুরু করে উম্মাহর সর্বযুগের বরণীয় ব্যক্তিবর্গ এ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সীরাতে নববীকে সীরাতে নফস বানাতে সচেষ্ট ছিলেন। অনুপম আখলাক, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার এবং আচরণসৌন্দর্যের মাধ্যমে তারা জগদ্বাসীর হৃদয়জগৎ জয় করে নিয়েছিলেন। তাই ইতিহাস বিস্ময়ের সাথে বহুবার অবলোকন করেছে অমুসলিম রাজ্যের অধিবাসীদের পক্ষ হতে মুসলিম দেশের শাসকের কাছে পাঠানো আকুতি— ‘আপনারা আমাদের দেশেও আগমন করুন। আমাদেরকেও যুলুম-অনাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করুন। আমাদের দেশেও আপনাদের সুশাসন-সুবিচার প্রতিষ্ঠা করুন।’

এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করার পর অমুসলিম বিশ্ব দু'টি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১. বিশ্বাসে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আচরণে-উচ্চারণে তারা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয় নববী আদর্শকে। তাই পরকালের বিচারে তারা চির বঞ্চিত হলেও দুনিয়ার চোখে তারা 'সভ্য ইউরোপ'। এক কালের অন্ধকার ইউরোপ আজ সভ্যতা ও ভব্যতার শিক্ষক!

২. মুসলিম জাতিকে শেকড়চ্যুত করা, মুসলিম জাতিকে তাদের সাফল্য ও বিজয়ের মূল অবলম্বন ‘আখলাকে নববী’ হতে দূরে সরিয়ে দেয়া। এজন্য একদিকে তারা নবীচরিত্রে কালিমা লেপন করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে, অপরদিকে নতুন নতুন আইডিয়াল ও আদর্শের(!) উৎপত্তি ঘটাতে থাকে। একদিকে তারা তৈরি করে ‘রঙিলা রসূল’, ‘স্যাটানিক ভার্সেস’, ‘ইনোসেন্স

অব মুসলিম'; অপরদিকে সৃষ্টি করে চে গুয়েভারা, নেলসন ম্যান্ডেলা কিংবা কার্ল মার্কসের আদর্শ। তাই আজকের ইউরোপ-আমেরিকায় গবেষণা হয় সীরাতে মুহাম্মাদী, তুরাছে ইসলামী নিয়ে আর যুগে যুগে মুসলিম বিশ্বে নির্মিত হয় প্রেমসৌধ তাজমহল কিংবা বুর্জ আল খলীফা।

এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এই যে, মুসলিম জাতি আজ দিকহারা, মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা, মুসলিম জাতি আজ লাঞ্ছিত-বঞ্চিত এবং মুসলিম জাতি আজ নির্যাতিত-নিপীড়িত। যে চরিত্রমাধুর্য ছিলো মুসলমানদের শৌর্য ও বীর্যের, প্রতাপ ও প্রভাবের মূল চালিকাশক্তি, তা হারিয়ে মুসলিম জাতি আজ রিক্ত ও নিঃস্ব।

আজ কোথায় সেই মঈনুদ্দীন চিশতী রহ. যার এক পলকের দৃষ্টিতে সত্তর লাখ পৌত্তলিক মুসলমান হবে? আজ কোথায় সেই সাহাবা-কাফেলা যাদের তেইশ বছরের কোরবানীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বারো হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ডে?

আজ কোথায় সেই নববী আখলাক? কোথায় সেই ক্ষমা ও উদারতা? কোথায় সেই দয়া ও কোমলতা? কোথায় সেই প্রীতি ও বদান্যতা? আজ কোথায় সেই মুচকি হেসে কাছে টানা? কেন আজ আমাদের দৃষ্টিতে নেই মুহাম্মাদী আকুলতা, হৃদয়ে নেই মুহাম্মাদী ব্যাকুলতা, সর্বোপরি আচরণে ও উচ্চারণে নেই মুহাম্মাদী আদর্শের প্রতিফলন?

আজ কেন এক রাতে তিন হাজার প্রাণের কোরবানীতেও আসে না সুবহে সাদিক, আসে না নতুন দিগন্ত? কেন আজ নও মুসলিমদের মুখে শুনতে

হয়—'মুসলমানদের ইসলামকে দেখে নয়, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি বইয়ের পাতার ইসলামকে দেখে'।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর প্রবাদপুরুষ, মহান সংস্কারক, মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিয়া নাদাবী রহ.। বারবার তিনি বলেছেন ও লিখেছেন, সে যুগের জাহিল আরব যে পথে পেয়েছিলো মুক্তির সন্ধান, এ যুগের দিশাহীন মুসলমানের মুক্তি সে পথেই। সর্ব যুগের সকল মুসলমানের মুক্তির সন্ধান নববী জীবনাদর্শেই।

আমরা যদি ফিরে পেতে চাই আমাদের হারানো ঐতিহ্য, আমাদের হৃত মর্যাদা, সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলমানদের সেই চারিত্রিক সুখ্যাতি, তাহলে আচরণে-উচ্চারণে এবং চরিত্র ও ব্যবহারে আমাদের হতে হবে সীরাতে নববীর একনিষ্ঠ অনুসারী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে নববী জীবনাদর্শ।

প্রশ্ন হলো সমাজের প্রতিটি স্তরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে বাস্তবায়িত হবে নববী জীবনাদর্শ? কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সীরাতে মুহাম্মাদী?

নববী আখলাক কি প্রতিষ্ঠিত হবে বছরে এক দিন জশনে জুলুস করে আর এক রাত নাতে রাসূল গেয়ে? কিংবা নববী আদর্শ কি বাস্তবায়িত হবে সহীহ হাদীসের অনুসরণের নামে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করে?

না। এভাবে নয়। বরং নববী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নবীজীকে জানতে হবে; নবীজীর আচরণ-উচ্চারণ, নবীজীর স্বভাব-দর্শন, নবীজীর চালচলন

গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এবং হৃদয় থেকে তা বরণ করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে।

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত দাঈ, খতীব, বিদগ্ধ আলিম শায়খ ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী বর্তমান সময়ের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। আজকের আরব যদিও বিলাসিতায় ডুবে থাকা আরব, আজকের তেলসমৃদ্ধ আরবের প্রতীক যদিও বুর্জ আল খলীফা; তবু আজকের আরবেও আছে সেই খালিদ বিন ওয়ালিদের রক্ত, সেই দরদ ও তড়প এবং সেই সত্যকথন। হয়তো হাতে গোণা, হয়তো নিভৃতে; তবুও আছে। শায়খ মুহাম্মাদ আরিফী তাদেরই একজন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর রক্ত ও চেতনার উত্তরাধিকারী এই মহান আলিম আপন যিন্দেগীকে ওয়াকফ করেছেন ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় ডুবে থাকা আরব যুবসমাজকে দ্বীনমুখী করতে, প্রতিনিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে, বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন দাওয়াত ইলাল্লাহর পয়গাম।

আরব যুবসমাজ যখন দৌড়াচ্ছে মার্সিডিজ, রোলস রয়েস আর আইপডের পেছনে, তিনি তাদের পেছনে দৌড়াচ্ছেন দরদভরা হৃদয় নিয়ে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আরবদের আত্মপরিচয়ের কথা, আত্মবিস্মৃতির কথা, বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে তাদের বলছেন, তোমাদের কামিয়াবী পশ্চিমে নয়, তোমাদের সফলতার চাবিকাঠি তো এই আরবেই। তোমাদের স্বপ্নভাবনা

তো হলিউড নয়, তোমাদের দিন-রাতের ভাবনা তো হওয়া উচিত সীরাতে নববী।

শায়খ আরিফীর বেদনাহত হৃদয়েরই বহিঃপ্রকাশ তার কালজয়ী রচনা ‘ইসতামতি বিহায়াতিক’। আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন—কীভাবে একজন মুসলমান তার আচরণ ও উচ্চারণ, আখলাক ও কর্মজীবনকে সীরাতের রঙে রাঙাতে পারে। কীভাবে আখলাক ও চরিত্রগুণে, আচার ও ব্যবহারমাধুর্যে মুসলমান ফিরে পেতে পারে হৃত মর্যাদা ও হারানো গৌরব।

বিষয়গুরুত্বের কারণে ইতোমধ্যেই গ্রন্থটি আরব বিশ্বে বেস্ট সেলার (সর্বাধিক বিক্রিত) বইয়ের তালিকায় শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে এবং ইংরেজি-উর্দূসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অনারবী মুসলমানদের খেদমতেও পৌঁছে গেছে। সঙ্গত কারণেই বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের কাছে এ বইটির বাংলা অনুবাদ পরিবেশিত হওয়া ছিলো সময়েরই দাবী।

আমাদের দারুল উলূম মাদানীনগরের শিক্ষা সমাপনকারী তালিবে ইলম ভাইয়েরা প্রতিবছরই বিদায়ী স্মারক হিসেবে ডাইরী, প্রবন্ধ-সংকলন ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। চলতি শিক্ষাবর্ষের তালিবে ইলম ভাইয়েরা আসাতেযায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেন ডাইরীর পরিবর্তে কোনো বই প্রকাশ করার। উদ্দেশ্যের বিচারে অবশ্যই এটি ছিলো একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

আদীব হুযুর মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ দা.বা. লিখেছেন, ‘আফসোস, আমাদের দ্বীনী মহলে উচ্চারণে না হলেও আচরণে সম্ভবত মনে করা হয়, অনুবাদই সবচে' সহজ কাজ। বিষয়টি কিন্তু তা নয়।’

জানি না, এ মানসিকতার কারণেই কি না ফারেগীন ভাইয়েরা বিদায়ী স্মারক হিসেবে অনুবাদকর্মকেই বেছে নেন এবং পরামর্শের মাধ্যমে অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেন শায়খ আরিফীর ‘ইসতামতি বিহায়াতিক’ গ্রন্থটিকে; বিষয়বস্তুর বিচারে যা অতি মূল্যবান আর কলেবরের বিচারে নাতিদীর্ঘ!

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, তাকমীল জামাত ও মেশকাত জামাতের মেধাবী ও চৌকস কয়েকজন তালিবে ইলমকে নির্বাচন করে গঠন করা হয় অনুবাদ-পরিষদ।

হাতে সময় মাত্র কয়েক মাস। চার শতাধিক পৃষ্ঠার অনুবাদ, কম্পোজ, কম্পোজবিভ্রাট সংশোধন, প্রাথমিক সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং, চূড়ান্ত সম্পাদনা, মেকআপ ও অঙ্গসজ্জা, কভার ডিজাইন—এ সব কিছু সম্পাদন করে বইটি পৌঁছাতে হবে ছাপাখানায়, এবং সবশেষে পাঠকের দস্তরখানে। আর এ সব কিছু আঞ্জাম দেবে একদল নবীন তালিবানে ইলম, দিনের অধিকাংশ সময় যাদের ব্যয় হয় দরস, মোতালাআ ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে। অধিকন্তু অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়।

শুরু হলো বন্ধুর পথ চলা, দুর্গম গিরি-কান্তার মরু পাড়ি দেয়া। কিন্তু রহমতে ইলাহী যাদের পাথেয়, একান্ত বিশ্বাস যাদের শক্তি, তাদের দৃষ্টি তো গন্তব্যে, অন্য কিছুতে নয়।

ঠিক মতই চলছিলো সব কিছু। সময়ের কাঁটা ধরে এগিয়ে চলছিলো পথ চলা। এরই মাঝে আমাদের জীবনে এলো ৫-ই মে। ঐতিহাসিক ৫-ই মে। সেই উত্তপ্ত দিন, সেই শীতল রাত। কিছুই নয়, কিন্তু অনেক কিছু। একসময় ভোর হলো। অবসন্ন দেহ, শরীরে মাখা রাঙা আলতা! থেমে গেলো ঝড়। শান্ত হলো অশান্ত রাজধানী, বিধ্বস্ত রাজপথ। ডানাভাঙা পাখিরা ফিরছে নীড়ে।

সারা রাত তাণ্ডব চালিয়ে ক্লান্ত টর্নেডো যেমন চলে যাওয়ার সময় শেষ আঘাত হেনে যায়, রাজধানী-ফেরত পরিশ্রান্ত ঝড়ও ছুঁয়ে গেলো রাজধানীর কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা দারুল উলূম মাদানীনগরকে। একটু আলতো ছোঁয়া, কিন্তু ওলট-পালট হয়ে গেলো সব কিছু।

আহ! কী হারিয়েছি? কবে মিলবে হিসাব? শেষ হবে প্রশ্নবোধক দীর্ঘশ্বাস!

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

আল্লাহর কাছেই পেশ করছি আমার সব কিছু। আল্লাহ তো দেখছেন বান্দাদের। আয় আল্লাহ! চাই শুধু তোমার দয়া ও করুণা; এ জীবনে, সে জীবনে। চাই না কিয়ামতবিভীষিকা; না এ জীবনে, না সে জীবনে।

তবুও জীবন তো থেমে থাকে না। থেমে যাওয়া কাজ একসময় আবার শুরু হলো। দেরীতে হলেও শেষ হলো অনুবাদের পালা। এবার সম্পাদনাপর্ব।

এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ও সাহিত্য-মানোত্তীর্ণ গ্রন্থের কাঁচা হাতের অনুবাদের সম্পাদনা করার জন্য প্রয়োজন ছিলো এমন কোনো ব্যক্তিত্বের; যিনি একদিকে হবেন আরবী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রাজ্ঞ, অপরদিকে অনুবাদরীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত, পাশাপাশি লেখালেখির অঙ্গনে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, দারুল উলূম মাদানীনগরের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদ, বাংলাভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও সঠিক পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শেখার জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যসূচি তৈরিতে গবেষণারত নীরব সাধক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ ছাহেব দা. বা. উল্লিখিত সকল বিষয়ে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। তাই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিলো—একটি সহকারী সম্পাদনা পরিষদ পুরো বইটির বানানভুল ও কম্পোজভুল সংশোধন এবং বিভিন্ন অনুবাদকের করা অনুবাদ-অংশকে এক শৈলীতে নিয়ে আসার কাজটি সম্পাদন করে হুজুরের খেদমতে পেশ করবে, তারপর হুজুর দক্ষ হাতে সম্পাদনা করে পাঠক-খেদমতে একটি মানসম্পন্ন অনুবাদগ্রন্থ উপহার দেবেন। কিন্তু কবি যেমন বলেছেন, ‘মানুষ যা চায়—সবই সে পায় না/ কিশতির অনুকূলে সদা বাতাস বয় না’।

আল্লাহর ইচ্ছা—বাতাস আমাদের অনুকূলে প্রবাহিত হলো না। অনুবাদে বিলম্ব ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন কারণে সময় দ্রুত ফুরিয়ে এলো এবং এর সঙ্গে অনিবার্য আরো কিছু কারণ যুক্ত হওয়ায় হুজুর সামান্য কিছু অংশ সম্পাদনা করার পরই বইটি প্রকাশ করতে হলো। আশা করি পাঠকবৃন্দ আমাদের এই সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

অবশ্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির বিষয়গুরুত্ব ও গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হওয়ার নির্দেশনা সম্বলিত চমৎকার একটি ভূমিকা হুযুর আমাদের উপহার দিয়েছেন। আশা করি, একদিন পুরো বইটি হুযুরের দক্ষ হাতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে। সে পর্যন্ত না হয় ...

বাংলা বানানরীতি নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা এত বেশি যে, এ বিষয়ে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। আমরা এক্ষেত্রে যথাসম্ভব 'আমাদের বড়দের' অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি এবং পারতপক্ষে তা হতে বিচ্যুত হইনি। আমাদের কাছে একেই নিরাপদ পন্থা বলে মনে হয়েছে।

অনুবাদের রয়েছে নানা শৈলী, বিভিন্ন রীতি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর বিচারে এক্ষেত্রে আমাদের উপযুক্ত মনে হয়েছে এমন ভাবানুবাদ পেশ করা, যাতে পাঠকের মনে হবে তিনি একটি মৌলিক বাংলা বই-ই পড়ছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে এ ধারাটিই আমরা অবলম্বন করতে চেয়েছি। তবে মূল গ্রন্থের মর্ম ও তথ্য যেন পরিবর্তন না হয়ে যায়, সেজন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে কেবল এতটুকুই বলতে পারি—

إِنْ أَصَبْنَا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأْنَا فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ.

যা কিছু সঠিক ও সুন্দর তা তো দয়াময় আল্লাহর দান। আর যদি থাকে কোনো ভুল-ভ্রান্তি, তার কারিগর স্বীয় নফস আর বিতাড়িত শয়তান।

সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাসহ আয়াত ও হাদীসের সূত্র বের করার জটিল কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন তাকমীল জামাতের মাওলানা ইলিয়াস খান। সহসম্পাদনার কাজে আরো ছিলেন তাকমীল জামাতের শিক্ষার্থী মাওলানা আবুবকর ও মাওলানা আরিফ বিল্লাহ। ভেতরের অঙ্গ-সজ্জা ও বাইরের প্রচ্ছদ—দু'টোই ছানূভী তৃতীয় বর্ষের তালিবুল ইলম মুনীরুল ইসলামের করা। আল্লাহ তাদের সকলকে আপন শান অনুযায়ী জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন!

অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির মাঝেও এ তথ্যটি হয়তো প্রিয় পাঠক আপনাকে চমৎকৃত করবে যে, আপনার হাতের এই বইটির অনুবাদ, সিংহভাগ কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ সংশোধন, অক্ষরবিন্যাস, সাজসজ্জা এবং সবশেষে প্রচ্ছদ তৈরি—এ সবগুলো কাজ এমন একদল নবীন আলিমে দ্বীনের হাতে সম্পাদিত হয়েছে, যাদের কেউই এসব ক্ষেত্রে পেশাদার নন। আমরা দোয়া চাই দ্বীনের পথে আরো অনেক কিছু করার। তাওফীক তো একমাত্র আল্লাহর।

প্রিয় পাঠক! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বইটি আপনি হাতে তুলে নিয়েছেন সীরাতে নববীর সুবাসে সুবাসিত হতে, নববী আদর্শে নিজের আচরণ ও উচ্চারণ এবং আখলাক ও চরিত্রকে সাজাতে। তাই শেষ হোক সেই প্রতীক্ষার পালা।

আসুন প্রবেশ করি সীরাতে নববীর সুরভিত উদ্যানে, অনুপম আদর্শের এক আলোকিত ভুবনে। স্বাগতম আপনাকে।

১৫-০৩-৩৫ হি.

১৬-০১-১৪ ঈ.

**বিনীত, মুহাম্মাদ ওসমান গনী**

দারুল উলূম মাদানীনগর

# আমাদের কথা

দাওরায়ে হাদীসের বছর শিক্ষা সমাপনের স্মৃতি-স্মারক হিসেবে কিছু প্রকাশ করা হয়। আমাদের মেশকাতের বছর আসাতিযায়ে কেরাম আমাদেরকে আদেশ করলেন, আগামী বছর তোমরা স্মারক হিসেবে ভালো কোনো কিতাব প্রকাশ করবে। আর আগামী বছর কোরবানির ঈদের পরপরই যে ইসলাহী জোড় হবে, তার আগেই সব কাজ শেষ করবে।

আমরা আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে অনেক ভেবে অবশেষে 'ইসতামতি বিহায়াতিক' কিতাবটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিলাম।

এবার কাজ কীভাবে সুবিন্যস্তভাবে করা যায় সে ব্যাপারে ফুআদ ছাহেব হুজুরের সাথে পরামর্শ করলাম। হুজুর আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিলেন। কারণ সুবিন্যস্তভাবে কাজ করতে পারলে অনেক দ্রুত ও সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

এরপর আমরা অনুবাদের কাজ ভাগ করে নিলাম। সব কাজের সাথে অনুবাদের কাজও চলতে থাকলো ধীর গতিতে। কখনো চলে, কখনো থামে। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পর আমাদের কাজে কিছুটা গতি এলো। কিন্তু তখন শুরু হলো অন্য এক ঝড়। ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হলো হেফাজতে ইসলামের রক্তমাখা-অধ্যায়। আর খোদায়ী ফায়সালা, এ রক্তের ছোপ এসে

লাগলো আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার গায়েও। সে এক রক্তমাখা হৃদয়বিদারক অধ্যায়। সেই পরিস্থিতিতে বছরের শেষে শান্তভাবে কাজটিকে সুবিন্যস্তভাবে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হলো না আমাদের।

এ বছরের শুরুর কথা। নব উদ্যমে পড়ালেখার মানসিকতা নিয়ে শুরু হলো দাওরাতুল হাদীসের বছর। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার সেই স্মৃতি-স্মারকের কথা। ইতোমধ্যে রমযানের বিরতিতে অনেকে নিজ নিজ অংশ অনুবাদ শেষ করে নিয়েছে, আবার অনেকের ছিলো বেশ বাকী। এ পর্যায়ে আবার আমরা সামনে বাড়লাম এবং যত দ্রুত সম্ভব কাজটি সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা চাই দ্রুত করতে, কিন্তু হয়ে যায় বিলম্ব। যারা এ অঙ্গনের মানুষ, বোধ করি তারা উপলব্ধি করবেন এ বিলম্বের কারণ।

যা হোক, এ বছর [১৪৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষ] কোরবানির বিরতির সময় কয়েক ভাই মাদরাসায় থেকে কাজ করলেন। এভাবে একটানা সময় দেয়ায় কাজটিতে বেশ গতি এলো এবং অনেকটাই শেষ হলো। উপরন্তু কাজটি যে বাস্তবেই হচ্ছে সেই আশার আলো জ্বলে উঠলো। আসলে যে কোনো বড় কাজের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কিছুদিন সময় দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। এভাবেই কখনো হতাশা, কখনো আশা, কখনো হতোদ্যম, কখনো আত্মবিশ্বাস—সব মিলিয়ে কাজ সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুলো।

বিভিন্ন সময় অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা এর ইংরেজি অনুবাদ *Enjoy Your Life* থেকে কিছুটা সহায়তা পেয়েছি। কারণ অনেক জায়গায় শব্দের অর্থ

স্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য আমাদের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট ছিলো। সেসবের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজি অনুবাদে কিছুটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে। তবে জটিল অনেক জায়গা, বিশেষভাবে কঠিন কবিতার পঙক্তিগুলো ইংরেজি অনুবাদে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি কাজ আমরা করেছি। মূল বইয়ে হাদীসগুলোর সাথে কিতাবের নাম দেয়া থাকলেও হাদীসের নম্বর দেয়া ছিলো না। তাহকীকের স্বার্থে আমরা সেগুলোতে নম্বর যুক্ত করেছি। অনেকগুলো হাদীসের তাখরীজ করা ছিলো না; সেগুলোও আমরা করেছি। আল্লাহ পাকের অসংখ্য শোকর, আমাদের মতো অযোগ্যদেরকে কাজটি সমাপ্ত করার পৌঁছে দেওয়ার তাওফীক তিনি দিয়েছেন।

**কৃতজ্ঞতা তাদের:**

আমরা সবদিক দিয়ে নবীন। বয়স ও অভিজ্ঞতা সবই আমাদের স্বল্প। তবুও হিম্মত করেছি একটু কাজ করার। আমাদের অনুবাদ তো ছিলো আমাদের কাঁচা হাতের কচি লেখায় পূর্ণ। কিন্তু আমাদের অগ্রজ মাওলানা ওসমান সাহেব আমাদের কাজকে নিজের কাজ মনে করে নিলেন। সেই যে শুরু করলেন তারপর থেকে আর থামেননি। রাত-দিন ভুলে কাজ করেছেন বিরামহীনভাবে।

আল্লাহর শোকর, আমরা তার কাছে যতটুকু আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। আল্লাহ তাঁকে আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহ তাকে দান করুন ইলমের গভীরতা ও প্রাজ্ঞতা, দ্বীন ও

শরীয়তের তাফাক্কুহ ও সঠিক বুঝ; আর ভারসাম্যপূর্ণ বিশাল ব্যাপ্ত ফিকর ও ভাবনা; সাথে সাথে দান করুন বিশেষ নেয়ামত সুস্থতা ও কর্মব্যস্ততার জীবন। আল্লাহ আমাদের সকলকেও দান করুন এ সকল নেয়ামত। আমীন!

আমাদের উস্তায হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ সাহেব হুজুর কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়েছেন পরম আন্তরিকতার সাথে। আমাদের খুব ইচ্ছা ছিলো, হুজুর বইটির সম্পাদনা করবেন। হুজুরেরও আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো। হুজুর দেখাও শুরু করলেন। কিছুদূর অগ্রসরও হলেন। কিন্তু এ কাজের জন্য যে পরিমাণ সময় দরকার, হুজুরের বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝে সে পরিমাণ সময় বের করাটা সত্যিই খুব কঠিন ছিলো।

হুজুর যদি সম্পাদনা করতে পারতেন তাহলে অনেক ভালো হতো। কিন্তু সব আশা যে পূর্ণ হবার নয়। তাই আমাদের ভাবতে হলো, এখন এভাবেই একবার ছাপা হয়ে যাক। পরবর্তীতে যখন সম্ভব হয় হুজুরের সম্পাদনাসহ পরবর্তী সংস্করণ বের করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ, সব কাজ শত ভাগ পূর্ণ করার চেষ্টা করতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে কাজই করা সম্ভব হয় না।

তবে অন্তত বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে হুজুর আমাদের ওপর ইহসান করেছেন। আল্লাহ হুজুর এবং অন্য সকল আসাতিযায়ে কেরাম থেকে আমাদের আরো বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। তাদের ছায়ায় থেকে আমাদেরও উম্মাহর জন্য ছায়া হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

**ত্রুটিগুলো দূর করে দিন, হে আল্লাহ!**

বইটির অনুবাদ করেছেন আমাদের জামাতেরই কিছু ভাই। অবশ্য কিছু অংশ অন্যরাও করেছেন। বইয়ের অধিকাংশ অনুবাদ করেছেন মাওলানা ইলিয়াস খান, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা ইউনুস, মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা শোয়াইব, মাওলানা আব্দুল মাজেদ ও মাওলানা রহমতুল্লাহ।

এছাড়াও অনুবাদে শরীক ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা রাশেদুল ইসলাম, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, যুবায়ের বিন আবু তাহের, মাসউদুর রহমান ও সিরাজুস সালেকীন।

অনুবাদের পর যথেষ্ট সময় ব্যয় করে পুরো বই সাধ্যমত প্রথমবার সম্পাদনা করেন মাওলানা আবু বকর, মাওলানা ইলিয়াস ও মাওলানা আরিফ বিল্লাহ। নিজেদের পড়ালেখার ফাঁকে তারা কষ্ট করে কাজ করেছেন। এছাড়াও আরো অনেকেই, বিশেষভাবে দাওরায়ে হাদীসের সকলেই কোনো না কোনোভাবে এ কাজে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলের সহায়তা না হলে হয়তো এত বড় কাজ শেষ করাটা সম্ভবই হতো না।

পুরো কাজের ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক মেহনত করেছেন মাওলানা আব্দুল মাজেদ, মাওলানা কামালুদ্দীন, মাওলানা আব্দুল হান্নান, মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা আশিকুর রহমান ও মাওলানা মুবাশ্বির হোসাইন।

হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও আপনার ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা দিয়ে আমাদেরকে বানান আপনার প্রিয় বান্দা। সবাইকে আপনার মকবুল বান্দা বানিয়ে নিন। আমীন!

তবে সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও এতে অনেক ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ আমরা মানুষ। তাই ‘মানুষ’ পাঠকদের কাছে আবেদন, কোনো ভুল নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। এবং ইনশাআল্লাহ সুযোগমত সংশোধন করে নেবো। আল্লাহ একে উপকারী করুন—রাত-দিনের দোয়ায় এ-ই আমাদের মিনতি।

**দাওরাতুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ**

১৪৩৫ হিজরী

وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي *** وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ *** كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

*তোমার চেয়ে সুন্দর আর দেখেনি তো কেউ কভু*
*তোমার চেয়ে উত্তম করে সৃজন করেননি প্রভু,*
*করলেন সৃজন তোমাকে তিনি সকল ত্রুটি-মুক্ত করে*
*মনে হয় যেনো সৃজিলেন তিনি চেয়েছো তুমি যেমন করে।*

# প্রথম কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার শানে। দুরুদ ও সালাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরে। হামদ ও সালাতের পর,

সুহৃদ পাঠক! আমার বয়স যখন ষোল বছর, 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ' নামক ডেল কার্নেগির একটি বই আমার হাতে আসে। চমৎকার একটি বই। বইটি আমি বহু বার পড়েছি। লেখক প্রতিমাসে একবার করে বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি সেভাবেই পড়েছি। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের সময় তার লিখিত নিয়ম-নীতিগুলো ধীরে ধীরে অনুশীলন করেছি এবং এর ফলে আশ্চর্য প্রভাবও লক্ষ করেছি।

ডেল কার্নেগি প্রথমে মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের একটি নীতি লিখেছেন। এরপর এর প্রায়োগিক অনেক উপমা-উদাহরণ পেশ করেছেন। রুজভেল্ট, লিংকন, জোসেফ এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনে ঘটে যাওয়া এ সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনাও তিনি তুলে ধরেছেন।

আমি চিন্তা করে দেখলাম, লেখক শুধু পার্থিব সুখ-শান্তি অর্জনের কথাই লিখেছেন। তিনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতেন, ইসলামী আখলাক সম্পর্কে লিখতেন তাহলে তো তিনি উভয় জগতের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি অর্জন করতে

পারতেন। মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের এই যোগ্যতাকে তিনি যদি ইবাদতে রূপান্তর করতেন, কতো ভালো হতো! কারণ ইবাদতের মাধ্যমে তো বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

কিছুদিন পর জানতে পারলাম, বেচারা ‘ডেল কার্নেগি’ আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। বুঝলাম, বইটা অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও লেখকের নিজেরই কোনো উপকারে আসেনি। আমি ফিরে তাকালাম আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের দিকে। দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত, সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনে সামাজিক আচার-ব্যবহারের এমন অনেক আদর্শ রয়ে গেছে যা আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য যথেষ্ট। তখন থেকেই আমি এ বিষয়ে লিখতে শুরু করি।

তাই বলা যায়, বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটি এক মাস কিংবা এক বছরের পরিশ্রমের ফল নয়, বরং দীর্ঘ বিশ বছরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফসল। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ পর্যন্ত বিশটিরও বেশি গ্রন্থ প্রণয়নের তাওফীক দিয়েছেন। দু'একটি বইয়ের বিশ লক্ষাধিক কপি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সবচে প্রিয়, সবচে মূল্যবান এবং মনে হয় সবচে বেশি জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উপকারী গ্রন্থ এটি।

এর বাক্যগুলো কলমের কালিতে নয়, খুনরাঙা হরফে লেখা। এর প্রতিটি শব্দে, শব্দের পরতে পরতে গেঁথে আছে আমার অন্তর, আমার অন্তর-ধ্বনি। স্মৃতির নির্যাসে তৈরি এর একেকটি বাক্য, বাক্যমালা। আমি এর প্রতিটি

শব্দ হৃদয়ের গভীর থেকে লিখেছি। এর বাক্যগুলো হৃদয় থেকে হৃদয়ে রাখতে চেয়েছি। পাঠক-হৃদয়ে যেন এর মর্ম গভীরভাবে রেখাপাত করে, সে চেষ্টাই আমি করেছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো—যদি কোনো পাঠক-পাঠিকা এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলোর অনুশীলন করেন, এর শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা বিকশিত করার সাধনা করেন। আমার বিশ্বাস, তখন সত্যিকার অর্থেই তিনি জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন। কোনো পাঠক যদি বইটি পড়ার পর তার অনুভব-অনুভূতি জানিয়ে আমাকে ই-মেইল বা এসএমএস করেন তাহলে আমি আরো আনন্দিত হবো, আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবো এবং দূরে থেকেও তার জন্য দোয়া করবো।

সবশেষে মহান আল্লাহর কাছে আরজি, তিনি যেন আমাকে-সবাইকে এই লেখাগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন এবং একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমীন।

**নিবেদক আপনার কল্যাণকামী**

ড. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আরিফী

ই-মেইল: arefe5@yahoo.com

পোস্টবক্স নং- ১৫১৫৯৭ রিয়াদ-১১৭৭৫

ফোন: ০০৯৬৬-৫০৫৮৪৫১৪০

ফ্যাক্স: ০০৯৬৬-১২৪৪০০৬২

*প্রথম কথা... বইটি পড়ে শেষ করতেই হবে—এমন নয়, বরং এর থেকে উপকৃত হওয়াই যেন লক্ষ্য হয়।*

# ১. এরা কখনো উপকৃত হতে পারবে না...

একদিন আমার মোবাইলে একটি ক্ষুদেবার্তা এলো। তাতে লেখা, ‘জনাব! আত্মহত্যার বিধান কী?!’ বার্তাটি পেয়ে আমি প্রেরকের নম্বরে ফোন করলাম। ওপাশ থেকে এক তরুণের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। তাকে বললাম, ‘দুঃখিত! আমি তোমার প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি। প্রশ্নটি আবার করো।’ সে খুব বিরক্তির সঙ্গে বললো, ‘প্রশ্ন তো একেবারে সুস্পষ্ট। আমি জানতে চাচ্ছি, আত্মহত্যার বিধান কী?’

আচানক অপ্রত্যাশিত উত্তর দিয়ে আমি তাকে চমকে দিতে চাচ্ছিলাম। তাই মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, ‘মুস্তাহাব’! ছেলেটি এমন উত্তর শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। সে উচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘কী বললেন?’

আমি বললাম, ‘ঠিকই বলেছি। তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার সঙ্গে আত্মহত্যার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো?’

যুবকটি চুপ করে রইলো। আমি জানতে চাইলাম, ‘তুমি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছো কেন?’

‘আমি বেকার, আমার চাকরি নেই, কোনো কাজও খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ আমাকে ভালোবাসে না। আসলে আমি ব্যর্থ ও অকর্মণ্য একজন মানুষ!’

যুবকটি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো। এরপর সে নিজের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার এক দীর্ঘ দাস্তান আমাকে শোনাতে লাগলো।

বর্তমানে অধিকাংশ লোকের এটা একটা বড় সমস্যা। কিছু লোক সবসময় নিজের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। নিজেকে সর্বদা তুচ্ছজ্ঞান করে। মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায় উপনীত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, সবার জন্য সম্ভব হলেও অন্তত আমার পক্ষে এমন মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়। জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা অন্তত আমার জন্য শোভা পায় না। আমার স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে কোনো ধরণের পরিবর্তন ঘটবে না। এভাবেই চলতে হবে আমাকে। আরব কবি যেন এদের সম্পর্কেই বলেছেন:

পর্বত-চূড়ায় পৌঁছুতে যার মনে ভয়-কম্পন
ভূমির অতল গহ্বরে সে রয়ে যায় আমরণ।

পাঠক! আপনি কি বলতে পারবেন, এ গ্রন্থ থেকে কে উপকৃত হতে পারবে না? এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলী থেকেও কে জীবনপথের আলো গ্রহণ করতে পারবে না? যারা আপন দুর্বলতার সামনে আত্মসমর্পণ করে, সামান্যতেই ভেঙ্গে পড়ে, ভুল আর অসম্পূর্ণতাকে নিজের নিয়তি বলে ধরে নেয়, আর বলে, ‘এটা আমার স্বভাবজাত দুর্বলতা। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। এ স্বভাব নিয়েই আমি বেড়ে উঠেছি। আমার স্বভাব পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। মানুষ আমাকে এমন পেয়েই অভ্যস্ত। খালেদের মত বক্তৃতা করা, আহমদের মত প্রফুল্ল থাকা কিংবা যিয়াদের

মত মানুষের প্রিয়ভাজন হওয়া তো আমার জন্য আকাশ-কুসুম কল্পনা!' এমন ধারণা যারা পোষণ করে তারা এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবে না এবং এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলী থেকেও জীবনের আলো গ্রহণ করতে পারবে না।

জীবনসায়াহ্নে উপনীত এক বৃদ্ধের সঙ্গে একদিন বসে ছিলাম। তার জীবনের সূর্য এখন অস্ত যাওয়ার পথে। মজলিসে আরো লোকজন ছিলো। অধিকাংশাই সাধারণ মানুষ। আমি কোনো এক প্রসঙ্গে শায়খ আবদুল আযীয বিন বাযের একটি ফতোয়ার কথা আলোচনা করলাম। আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র লোকটি গর্বের সঙ্গে বলতে লাগলো, 'আমি শায়খ বিন বাযের সহপাঠী ছিলাম। আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে আমরা দু'জন একসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমের দরসে বসতাম!'

বৃদ্ধ লোকটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, শায়খ বিন বাযের সঙ্গী হওয়ার কারণে তিনি বেশ গর্ববোধ করছেন। তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন এবং জীবনসংগ্রামে সফল একজন ব্যক্তির একসময়ের সংস্পর্শ পেয়ে তিনি আজ নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন।

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, হে জীবনসংগ্রামের প্রবীণ মুসাফির! একজন সফল ব্যক্তির সহপাঠী হতে পেরে আপনি এত গর্ববোধ করছেন, কিন্তু নিজে কেন সফল হতে পারলেন না? দু'জন একই পথে হেঁটেছিলেন, আপনি কেন বিন বাযের মত গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলেন না? শায়খ বিন বায যখন ইন্তেকাল করলেন, সমগ্র পৃথিবী তার জন্য কেঁদেছিলো। সকলের চোখ

থেকে বেদনার অশ্রু ঝরেছিলো। সবার মাঝে শোকের ছায়া পড়েছিলো। মিম্বরে-মিম্বরে, মেহরাবে-মেহরাবে, লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগারে কান্নার রোল পড়েছিলো। আপনিও তো একদিন মারা যাবেন, সেদিন কেউ হয়তো কাঁদবে না। সামাজিকতা রক্ষা করা ছাড়া কারো চোখ থেকে অশ্রু ঝরবে না।

আমরা সকলেই বলতে গর্ববোধ করি, 'অমুক মহান ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। ছাত্রজীবনে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে গর্ব করার কিছুই নেই। বরং তিনি যেমন সাফল্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন, সে স্তরে পৌঁছুতে পারাই ছিল প্রকৃত গর্বের বিষয়।

তাই আপনিও সাহসী হোন। আজকেই সফল হওয়ার সুদৃঢ় সংকল্প করুন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলুন। নেতিবাচক মানসিকতা বর্জন করুন। ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করুন। মলিনতাকে প্রফুল্লতায়, দুশ্চিন্তাকে সুচিন্তায়, কৃপণতাকে দানশীলতায়, গোস্বাকে সহনশীলতায় রূপান্তরিত করুন। দুর্যোগ ও দুর্বিপাককে আনন্দে রূপান্তরিত করুন আর বিশ্বাসের অস্ত্রকে সঙ্গী করে সব বাধাকে জয় করুন।

জীবনকে উপভোগ করুন। জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে দুশ্চিন্তা করারও সময় নেই। তাই সকল দুশ্চিন্তা বর্জন করুন। আর কীভাবে দুশ্চিন্তা বর্জন করবেন, কীভাবে টেনশনমুক্ত থাকবেন, তা জানার জন্যই রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। এ পথচলায় আমাদের সঙ্গী হোন। ইনশাআল্লাহ, একসঙ্গে আমরা পৌঁছে যাবো সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায়।

এ পথচলায় আমাদের সঙ্গী হবেন *সেই সাহসী ব্যক্তি যার আছে উচ্চ মনোবল ও সুদৃঢ় সংকল্প, পেছনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভের আগ্রহ এবং সম্ভাবনার প্রতিটি বিন্দু থেকে উপকৃত হওয়ার বিপুল প্রত্যাশা।*

# ২. এ বইতে আমরা কী শিখবো?

সামগ্রিকভাবে মানুষের সুখ-দুঃখের কারণগুলো সাধারণত অভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন সম্পদের আগমনে, কর্মক্ষেত্রের পদোন্নতিতে কিংবা রোগমুক্তির কারণে আমরা আনন্দিত হই। কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে সফল হলে আনন্দে আমাদের হৃদয়-মন ভরে ওঠে। আর যখন আমরা আর্থিক দীনতার শিকার হই, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কাজ করে ফেলি, অসুস্থ কিংবা অপমানিত হই তখন আমাদের কষ্ট লাগে। সকলেই দুঃখ পাই। হৃদয়ের মাঝে বড় ব্যথা অনুভব করি। আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা এটাই।

এ পরিস্থিতিতে এমন পথ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা দরকার, যার মাধ্যমে আমরা সবসময় খুশি থাকবো। আমাদের কষ্টগুলো আনন্দে রূপান্তর করতে পারবো। জীবনকে সুখময় করতে সক্ষম হবো।

জীবনে সুখ ও আনন্দ যেমন থাকবে, থাকবে দুঃখ ও বেদনা, কষ্ট ও কান্না। এটাই জীবনের চিরাচরিত বিধান। তবে কেন সামান্য কিংবা অতি সামান্য বিষয়ে আমরা অতিরিক্ত টেনশন করবো? কেন তুচ্ছ কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনায় রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটাবো?

অগোচরেই মনের দরজা দিয়ে দুশ্চিন্তা আপনার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, দুশ্চিন্তা দূরীকরণেরও শত শত পদ্ধতি রয়েছে। এ গ্রন্থে আমরা সেই পদ্ধতিগুলোই শিখবো। হৃদয়ের খোলা দরজা

বন্ধ করে দুশ্চিন্তাকে কীভাবে তাড়াতে হয়, সে কথাই আমরা এ গ্রন্থে জানবো।

আমরা অনেক মানুষকে দেখি, সবাই তাদেরকে ভালোবাসে। তাদের সাক্ষাতে, তাদের সংস্পর্শে, তাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দবোধ করে। আপনি কি তাদের মত হতে চান না? তাদের মত ভালোবাসা পেতে চান না? আপনি কেন সবসময় অন্যের প্রতি মুগ্ধ থাকবেন? নিজে মুগ্ধতার পাত্র হতে কেন চেষ্টা করবেন না? এ গ্রন্থে আমরা কীভাবে নিজেকে মুগ্ধকর করা যায়—সেই আলোচনা করবো।

আপনার চাচাতো ভাই যখন কথা বলে তখন সবাই চুপ থাকে, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে, কথাগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে। কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন তখন তারা তেমন মনোযোগ দেয় না। অন্য কোনো কথা বা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন? কেন এমন হয়? জ্ঞান-বুদ্ধি, শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও তত্ত্বজ্ঞান, সনদ-সার্টিফিকেট, পদ-পদবী সবক্ষেত্রেই তো আপনি এগিয়ে। তা সত্ত্বেও কেন সবাই আপনার সেই ভাইয়ের কথা শুনে মুগ্ধ হয়? তার প্রতি আকৃষ্ট হয়?

দেখুন, দু'জন বাবা; একজনকে দেখলে তার সন্তানেরা আনন্দিত হয়। সবসময় তার কাছে কাছে থাকে। তাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে। অথচ আরেক বাবার সন্তানেরা দূরে দূরে সরে থাকে। সবসময় চোখের আড়ালে থাকতে চায়। এমনটা কেন হয়? দু'জনই তো সন্তানদের পিতা। তারপরও

কেন এত ব্যবধান? হ্যাঁ, এসব ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষের মন জয় করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, আমরা এ গ্রন্থে সে পদ্ধতি শিখবো।

শিখবো—কীভাবে মানুষকে আপন করতে হয়, কীভাবে সব ধরণের মানুষের সঙ্গে চলতে হয়, তাদের মাঝে প্রভাব ফেলতে হয়, তাদের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করতে হয়। শিখবো—দুশ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়। এছাড়া শিখতে পারবো আরো অনেক কিছু। এ পথচলায় আপনাকে স্বাগতম।

*একটি কথা... মানুষ কী ভালোবাসে, নিছক তা জানাশোনায় কোনো সফলতা নেই। সফলতা সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায়, যার মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা লাভ করা যায়।*

# ৩. কেন বহুমুখী আচরণদক্ষতা অর্জন করবো?

একবার আমি বয়ান করার জন্য দারিদ্র্য-পীড়িত একটি অঞ্চলে গিয়েছিলাম। দূর এলাকা থেকে একজন শিক্ষকও সেখানে এসেছিলেন। আমার কাছে এসে তিনি বললেন, 'আমাদের কিছু ছাত্রের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'স্কুল তো সরকারি! সেখানে ফ্রি শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। এরপরও আপনার এ ধরণের আবেদনের পেছনে যৌক্তিকতা কী?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ফ্রি। তবে এখান থেকে যারা ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে যায়, মূলত তাদের জন্যই ধনবান লোকদের কাছে আমরা এ ধরণের আবেদন করে থাকি।' আমি বললাম, 'ভার্সিটিগুলোও তো সরকারি। সেখানেও ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বরং ভার্সিটিতে তো ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তিও প্রদান করা হয়।'

তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে ব্যাপারটি খুলে বলছি। আমাদের এখানে ৯৯% ছাত্রই স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। তাদের যথেষ্ট মেধা ও প্রতিভা থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক স্টাডিজ, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তারা যখন গ্রামের বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটিতে যেতে চায় তখন তাদের বাবা বাধা দিয়ে বলেন, "যতটুকু শিখেছো, যথেষ্ট! আর পড়াশোনার

প্রয়োজন নেই। এখন বাড়িতে থেকে আমাকে সাহায্য করো। আমার সঙ্গে বকরি চরাও"।'

এ কথা শুনে নিজের অজান্তেই আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'কী! বকরি চরানো?!'

শিক্ষক মহোদয় বললেন, 'হ্যাঁ, বকরি চরানো। তখন হতভাগা ছাত্রটি বাবার কথা মত বকরি চরানো শুরু করে দেয় এবং নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে গলা টিপে হত্যা করে। বছরের পর বছর এভাবে বকরি চরিয়েই কাটায় ছেলেটি। একসময় বিয়ে করে, সন্তানের বাবা হয়। ছেলেরা বড় হয়, তখন সে নিজেও ছেলেদের সঙ্গে একই আচরণ করে। তার ছেলেরাও বকরি চরাতে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।'

'এর সমাধান?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা ছাত্রের বাবাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ছেলের পরিবর্তে একজন শ্রমিককে বকরি চরানোর জন্য নিয়োগ করি। ছেলের পরিবর্তে শ্রমিকটি বকরি চরায় এবং সেই শ্রমিকের বেতন-ভাতা আমরা বহন করি। এতে ছেলেটি পড়াশোনার সুযোগ পায়। নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। শিক্ষাজীবনের শেষ পর্যন্ত ছাত্রটির সার্বিক খরচও আমরা বহন করে থাকি।'

এরপর শিক্ষক মহোদয় মাথা নিচু করে বললেন, ‘এভাবে আমরা একটি প্রতিভাকে বকরি চরিয়ে নষ্ট হতে দিতে পারি না। এটা আমাদের জন্য উচিত হবে না।’

পরবর্তীতে আমি তার কথা নিয়ে চিন্তা করলাম। তিনি ঠিকই বলেছেন। কখনো কারো প্রতিভা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করতে দেয়া উচিত নয়। প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েই আমরা সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হই। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দাওয়াত ও বক্তৃতা এবং জ্ঞান ও গুণের যে কোনো শাখায় যারা সফল; আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, তারা সকলেই নির্দিষ্ট একটি যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে, নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি চর্চা করেই সফলতা লাভ করেছেন। একই কথা প্রযোজ্য তাদের ক্ষেত্রেও, যারা পারিবারিক ক্ষেত্রে একজন সফল স্বামী, সফল পিতা কিংবা সামাজিক আচরণে একজন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী, ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।

সফলতা লাভের পদ্ধতিগুলো অনেকের প্রকৃতিগতভাবে আয়ত্তে থাকে। আবার অনেককে শিখতে হয়, আলাদাভাবে চর্চা করে সফলতা অর্জন করতে হয়। আমরা এ গ্রন্থে সফল মানুষদের নিয়ে আলোচনা করবো। তাদের অনুসৃত পথ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবো। গভীরভাবে দেখবো, তারা কীভাবে সফল হয়েছেন। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে সফলতা অর্জন করেছেন। আমরা ভেবে দেখবো, সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরাও সফল হতে পারি কিনা।

কিছুদিন পূর্বে আমি পৃথিবীর শীর্ষ ধনীদের একজন শায়খ সোলায়মান আর-রাজেহীর একটি সাক্ষাৎকার শুনেছি। আপন নীতি ও চরিত্রে, চিন্তা ও চেতনায় তিনি পাহাড়ের ন্যায় অটল। তিনি বর্তমানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক। হাজার হাজার জমি ক্রয় করেছেন। শত শত মসজিদ নির্মাণ করেছেন। অগণিত এতিমের ভরণ-পোষণ করছেন। এককথায় সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণকারী একজন ব্যক্তি তিনি।

কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তার অবস্থান কোথায় ছিলো? কীভাবে তিনি পথচলা শুরু করেছেন? সেসব কথাই তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন। তিনি বললেন, ‘আমি ছিলাম অতি সাধারণ একজন মানুষ। দৈনন্দিনের খাবার জোটানো আমার জন্য কঠিন হয়ে যেতো। কখনো কখনো না খেয়েই দিন কাটাতাম। আমার মনে আছে, খাবারের জন্য আমি মানুষের ঘর ঝাড়ু দিয়েছি। দোকানে দোকানে রাতভর জেগে কাজ করেছি।’ এরপর তিনি দারিদ্র্যের সেই অতল গহ্বর থেকে কীভাবে সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত হলেন, কীভাবে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করলেন, সে কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

রাজেহী যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সফল হয়েছেন, যে যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে জীবনে বড় হয়েছেন সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তার মত যোগ্যতা আমাদের অনেকেরই আছে এবং তার পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের অনেকের পক্ষেই সফল

হওয়া সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, সীমাহীন চেষ্টা ও অবিরাম সাধনা।

আমাদের অনেকের মাঝেই চমৎকার কিছু করার, জাতিকে কিছু উপহার দেয়ার যোগ্যতা আছে। কিন্তু নেই সুপ্ত সেই যোগ্যতা ও প্রতিভা উপলব্ধি করার মত অনুভব-অনুভূতি। নেই তা বিকশিত করার প্রাণপণ চেষ্টা। ফলে সে যোগ্যতার, সে প্রতিভার করুণ অপমৃত্যু ঘটে। একজন সফল নেতা, অনলবর্ষী বক্তা, বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিম আমরা হতে পারি না। আমরা কেবল স্বপ্নই দেখে যাই। একসময় আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

অবশ্য কেউ কেউ নিজের মধ্যে লুকায়িত প্রতিভা ও যোগ্যতা আবিষ্কার করতে পারে। বাবা-মা, ভাই-বোন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পদস্থ কর্মকর্তা, কল্যাণকামী বন্ধু—সবাই তার প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য, অতি অল্প। আমরা এ গ্রন্থে আপনার সুপ্ত প্রতিভাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করবো। সেগুলো কীভাবে জাগিয়ে তুলতে হয়, কীভাবে বিকশিত করতে হয়—সে পদ্ধতি জানিয়ে দেবো। তাহলে আসুন, এবার শুরু করি।

*একটি চিন্তা... পর্বত জয় করতে হলে বিক্ষিপ্ত পাথরখণ্ডের পরিবর্তে দৃষ্টি রাখুন পর্বতচূড়ায়। পর্বতারোহণে সফল হতে হলে লম্ফ-ঝম্পের পরিবর্তে এগিয়ে চলুন দৃঢ় পদে, তাহলে পদস্খলন হবে না।*

# ৪. নিজেকে এগিয়ে নিন .. প্রতিনিয়ত...

বিশ বছরের সাধারণ কোনো যুবককে আপনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। দেখবেন, তার একটি নির্দিষ্ট বাচনভঙ্গি ও নির্দিষ্ট চিন্তাধারা রয়েছে। বছর দশেক পর পুনরায় তাকে পর্যবেক্ষণ করুন। লক্ষ করবেন, তার যোগ্যতা পূর্বের মতোই রয়ে গেছে। তার কোনো উন্নতিই হয়নি।

পক্ষান্তরে আরেকজন যুবককে দেখবেন, প্রতিদিনই তার উন্নতি হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সে নিজের যোগ্যতার বিকাশ ঘটাচ্ছে। এমন কেন হয়? আসুন, আমরা বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি অনুধাবন করি।

মনে করুন, দু'জন ব্যক্তি নিয়মিত রেডিও শোনে। একজন এমন প্রোগ্রামগুলোই শোনে যেগুলো তার চিন্তাশক্তির উন্নতি ঘটায়, মেধা বিকাশে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে ভাষার দক্ষতা, উপস্থাপনার শৈলী এবং আলোচনার পদ্ধতি ও বিতর্কের কলা-কৌশল সে আয়ত্ত করে নেয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন শুধু নাটক ও গান-বাদ্য শুনে সময় নষ্ট করে। এবার বলুন, পাঁচ-দশ বছর পর দু'জনের চিন্তাধারা কেমন হবে? দু'জনের মধ্যে কার যোগ্যতা বেশি হবে? নিশ্চয়ই প্রথমজনের।

কেবল যোগ্যতাই নয়, দু'জনের আচরণ ও উচ্চারণেও আপনি লক্ষণীয় ভিন্নতা অনুভব করবেন। প্রথমজন কোনো বিষয়ে দলিল-প্রমাণ দেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের শরণাপন্ন হবে। আর দ্বিতীয় জন গায়ক-গায়িকা ও নায়ক-নায়িকাদের ডায়ালগ দিয়ে দলিল পেশ করবে।

এমনই একজন একদিন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ বললো, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে বান্দা! তুমি চেষ্টা করো। আমিও তোমার সঙ্গে চেষ্টা করছি!"' আমি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'ভাই! এটা তো কোরআনের আয়াত নয়।' আমার কথা শুনে লোকটার চেহারার রঙ বদলে গেলো। সে একেবারে চুপ হয়ে গেলো। পরবর্তীতে তার কথাটি নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম। এটা মূলত মিশরীয় একটি প্রবাদ বাক্য। আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো, কোনো ধারাবাহিক নাটক শুনতে শুনতে এই প্রবাদ বাক্যটি তার মনে গেঁথে গেছে।

আরেকটি বিষয় ভেবে দেখুন, আমরা যারা পেপার-পত্রিকা পড়ি, আমাদের ক'জনের নজর থাকে অর্থবহ সংবাদ বা ব্যক্তিউন্নয়নে সহায়ক তথ্যসমূহের দিকে, আর কতজনের চোখ থাকে খেলার খবর ও বিনোদনের পাতার দিকে? অবশ্যই দ্বিতীয়টার দিকে বেশিরভাগ পাঠকের আকর্ষণ থাকে। এ কারণেই পত্র-পত্রিকাগুলোতেও বর্তমানে খেলার খবর ও বিনোদনের পাতা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে।

আমাদের চিন্তা-চেতনায় এবং আমাদের গল্প ও আলোচনার মজলিসগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সর্বত্র আমরা বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আপনি যদি জীবনে বড় হতে চান তাহলে প্রতি মুহূর্তে আপনাকে নিজের উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশে সহায়ক কাজ করতে হবে। বহুমুখী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

আবদুল্লাহ নামে কর্মঠ ও উদ্যমী এক ব্যক্তি ছিলো। তবে তার মাঝে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কিছুটা অভাব ছিল। একদিন সে যোহরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হলো। পথে সে একজন লোককে দেখলো, খেজুর গাছের ওপর বসে কাজ করছে। নামাযের আর অল্প কিছু সময় বাকি ছিলো। কিন্তু লোকটির সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিলো না। অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ প্রচণ্ড রেগে গেলো। কঠোর স্বরে বললো, ‘এই বেটা! নেমে আয় গাছ থেকে। নামায পড়বি না?’

লোকটি শান্তভাবে উত্তর দিলো, ‘ঠিক আছে, নামছি।’ আবদুল্লাহ বললো, ‘তাড়াতাড়ি কর। বেটা! নামাযের গুরুত্ব নেই? গাধা কোথাকার!’

গাধা বলায় লোকটির মাথায় রক্ত উঠে গেলো। রাগে ও গোস্বায় সে বলতে লাগলো, ‘কী! আমি গাধা? দাঁড়া বেটা, তোকে দেখাচ্ছি মজা।’ এরপর একটি লাঠি নিয়ে সে নিচে নামতে লাগলো। অবস্থা বেগতিক দেখে আবদুল্লাহ চেহারা ঢেকে মসজিদের দিকে দৌড়ে পালালো, লোকটি যেন তাকে চিনতে না পারে! আবদুল্লাহ মসজিদে চলে গেলো।

এদিকে লোকটি গাছ থেকে নেমে রাগে-ক্রোধে ছটফট করতে লাগলো। আবদুল্লাহকে না পেয়ে কাজ ছেড়ে সে বাড়ি চলে গেলো এবং নামায পড়ে কিছুটা শান্ত হলো। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার জন্য আবার ফিরে এলো।

আসরের সময় আবদুল্লাহ নামায পড়তে বের হলে লোকটিকে আগের মতই গাছের ওপর দেখলো। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে এবার সে দাওয়াতের পদ্ধতি পাল্টে ফেললো। সে লোকটিকে সালাম দিয়ে বললো, 'ভাই! কেমন আছেন?'

লোকটি বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।' আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলো, 'এবার ফল কেমন হয়েছে?' লোকটি বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো ফলন হয়েছে।'

'আল্লাহ আপনার ফল ও ফসলে বরকত দান করুন। আপনার রিযিক বাড়িয়ে দিন। আপনার পরিশ্রমের উত্তম প্রতিদান দান করুন।' আবদুল্লাহ লোকটির জন্য দোয়া করলো। আবদুল্লাহর দোয়া শুনে লোকটি খুশি হয়ে গেলো এবং আমীন আমীন বলতে লাগলো। এরপর আবদুল্লাহ বললো, 'ভাই! মনে হয় কাজের ব্যস্ততায় আসরের আযান শুনতে পাননি। আসরের আযান তো হয়ে গেছে। নামাযের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। এখন একটু নেমে নামায পড়ে নিন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করবেন।' এরপর আবদুল্লাহ তার সুস্থতার দোয়া করে বললো, 'আল্লাহ আপনাকে সবসময় সুস্থ রাখুন।'

লোকটি খুশি হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি এখনই নামছি।' এরপর সে ধীরে-সুস্থে গাছ থেকে নেমে এলো। নিচে নেমে সে আবদুল্লাহর সঙ্গে মোসাফাহা করলো। এরপর বললো, 'সুন্দর ব্যবহারের জন্য আপনাকে

ধন্যবাদ। তবে যোহরের সময় যে লোকটা আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলো তাকে ধরতে পারলে বুঝিয়ে দিতাম, গাধা কে!’

*ফলাফল... মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। মানুষও আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।*

# ৫. পড়ে যাওয়া দুধের জন্য আফসোস করবেন না

অনেকে মনে করে, মানসিকতার পরিবর্তন তেমনই অসম্ভব, যেমন অসম্ভব মানুষের গোত্র-বর্ণের পরিবর্তন। কিন্তু জ্ঞানীগণ বলেন, মানসিকতা পরিবর্তন করা কাপড় পরিবর্তনের চেয়েও সহজ।

আমাদের মানসিকতা ও অভ্যাস পড়ে যাওয়া দুধের মত নয় যে, তাকে আর একত্রিত করা বা বোতলে ভরা যায় না। নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলেই আমরা নিজেদের অভ্যাস ও মানসিকতা বদলে ফেলতে পারি। বরং এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে কখনো কখনো মানুষের চিন্তা-চেতনাও বদলে ফেলা যায়।

ইবনে হাযম রহ. ‘তাওকুল হামামাহ’ নামক গ্রন্থে স্পেনের ধনাঢ্য এক ব্যবসায়ীর ঘটনা লিখেছেন। একই শহরের আরো চারজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা ছিলো। ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তারা চারজন তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে পড়লো এবং একপর্যায়ে চার ব্যবসায়ী মিলে তাকে চরম শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

একদিন সকালে সেই ব্যবসায়ী তার দোকানে যাচ্ছিলো। পরনে ছিলো সাদা জুব্বা, মাথায় সাদা পাগড়ি। পথিমধ্যে সেই চারজনের একজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। সে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করলো। এরপর পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আপনার হলুদ পাগড়িটা তো বেশ সুন্দর!’

ব্যবসায়ী বললো, ‘আরে! তুমি অন্ধ নাকি? সাদা পাগড়িকে হলুদ পাগড়ি বলছো কেন?’

লোকটি বললো, ‘আপনি সম্ভবত ভুল করছেন। পাগড়িটি হলুদ। তবে হলুদ হলেও বেশ চমৎকার।’

ব্যবসায়ী তার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে সামনে চলতে লাগলো। কিছু দূর অগ্রসর হতেই চারজনের আরেকজন এসে সালাম দিলো। পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, ‘বাহ! আপনি আজ চমৎকার পোশাক পরেছেন। বিশেষ করে এ সবুজ পাগড়িতে আপনাকে বেশ মানিয়েছে।’

ব্যবসায়ী তখন বললো, ‘আপনি সম্ভবত ভুল দেখছেন। আমার পাগড়িটি সাদা রঙের।’

সে বললো, ‘কী বলছেন আপনি? এটা তো দেখছি সবুজ রঙের।’

‘বেটা অন্ধ; স্পষ্ট রঙটাও দেখিস না?’ ব্যবসায়ী মনে মনে বললো।

এরপর সে সামনে চলতে লাগলো, আর কিছুক্ষণ পর পর পাগড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগলো, ‘পাগড়ি তো সাদাই দেখছি! কিন্তু ওরা এসব কী বলছে?’ অবশেষে সে গিয়ে দোকানে বসলো। কিছুক্ষণ পর তাদের তৃতীয়জন এসে বললো, ‘আজকের পোশাকে তো আপনাকে বেশ মানিয়েছে। বিশেষ করে নীল পাগড়িটা অতুলনীয়।’

ব্যবসায়ী তখন নিজের পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, ‘ভাই! আমার পাগড়ির রঙ তো সাদা।’

লোকটি বললো, 'আপনি হয়তো ভুল করছেন। পাগড়ির রঙ নীল। তবে এটা সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে। এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।'

কিন্তু ব্যবসায়ী তাকে চিৎকার করে বললো, 'ভাইজান! আমার পাগড়ির রঙ সাদা।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই লোক জোর গলায় বললো, 'না, বরং আপনার পাগড়ি তো নীল। তবে চিন্তা করবেন না, এটাতেই আপনাকে সুন্দর মানিয়েছে।' এ কথা বলে লোকটা চলে গেলো। এদিকে সে একা একা বলে চললো, 'আমার পাগড়ি সাদা। আমার পাগড়ি সাদা।' বারবার সে পাগড়িটি নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো।

কিছুক্ষণ না যেতেই চতুর্থজন এসে বললো, 'মাশাআল্লাহ! এই লাল পাগড়িটি আপনি কোত্থেকে কিনেছেন?'

'আরে ভাই! কী বলছেন? আমার পাগড়ি তো সাদা।'

'না, এ তো দেখছি লাল।'

ব্যবসায়ী তখন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো আর বলতে লাগলো, 'আমার পাগড়ি সাদা। না, আমার পাগড়ি বরং লাল।' একটু পরে সে আবার বললো, 'আমার পাগড়ি সবুজ। না, বরং এটা নীল। হ্যাঁ, এটা নীল।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে হাসতে শুরু করলো আর বলতে লাগলো, 'আমার পাগড়ি কালো। না, এটা তো হলুদ। না, বরং এটা সাদা পাগড়ি। এটা সাদা পাগড়ি।' এরপর সে হঠাৎ লাফ-ঝাঁপ দিতে শুরু করলো আর পাগলের মত উচ্চ স্বরে হাসতে লাগলো।

লেখক ইবনে হাযম বলেন, ‘আমি এই ব্যবসায়ীকে স্পেনের অলি-গলিতে পাগল হয়ে ঘুরতে দেখেছি। ছোট ছোট বাচ্চারা তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারছিলো।’

পাঠক! এই চারজন যদি তাদের অসৎ দক্ষতা দিয়ে একজন মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারে, তার বিবেক-বুদ্ধি বিকৃত করে দিতে পারে তাহলে আপনি কেন পারবেন না ওহীর আলোয় আলোকিত, শাশ্বত ও স্বীকৃত যোগ্যতা আর আচরণদক্ষতাকে কাজে লাগাতে? কেন পারবেন না? আচরণের উৎকর্ষ সাধন, সৃষ্টির মনোরঞ্জন—আপনার এ সবকিছুর উদ্দেশ্য তো একমাত্র মাওলায়ে পাকের সন্তুষ্টি অর্জন।

তাই বলি, জীবনে সুখী হতে হলে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার সর্বোত্তম ব্যবহার করুন। যদি বলেন, ‘না, আমি পারবো না।’

আমি বলবো, ‘অন্তত চেষ্টা করুন।’

যদি বলেন, ‘আমি তো জানি না, কীভাবে চেষ্টা করবো?’

আমি বলবো, ‘শিখতে শুরু করুন। পথে নামুন।’ পথই আপনাকে পথের সন্ধান দেবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন: إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ
অর্থ: জ্ঞান অর্জিত হয় কেবল শেখার মাধ্যমে আর সহনশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ অর্জিত হয় দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে। [আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী: ১৬২৯৬, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী: ১০৩৩৩]

*দৃষ্টিভঙ্গি... সাহসী ব্যক্তি নিজের দক্ষতার উন্নতি সাধনে তুষ্ট না হয়ে অন্যের দক্ষতা বাড়াতেও সচেষ্ট হয়। বরং কখনো কখনো অন্যের যোগ্যতাকেই পাল্টে দেয়।*

# ৬. আপনি হোন ভিন্ন ... হোন অনন্য ..

কখনো দেখা যায়, দু'জন লোকের মাঝে কথা চলছে। প্রচণ্ড তর্কের মধ্য দিয়ে তাদের কথা শেষ হলো। আবার এমন দু'জনও দেখা যায়, যাদের কথা সমাপ্ত হয় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে, হাসিমুখে। মূলত কথা বলার দক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

দু'জন বক্তা একই বিষয়ে বয়ান করেন। কিন্তু লক্ষ করলে আপনি দেখবেন, একজনের বয়ান চলার সময় লোকজন হয়তো ঘুমায়, নয়তো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকিয়ে উঠে চলে যায়। অথচ অপরজনের বয়ানের সময় দেখা যায়, শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে তার আলোচনা শোনে। গভীর দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলকও পড়ে না। কেউ কথা বললে তাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমন কেন হয়? কেন একজনের আলোচনার সময় থাকে পিনপতন নীরবতা, পলকহীন দৃষ্টি, অখণ্ড মনোযোগ আর অপরজনের আলোচনার সময় বিক্ষিপ্ত নড়াচড়া, পরস্পর কথাবার্তা কিংবা মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠে মগ্নতা? বক্তৃতা করার যোগ্যতায় সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণেই কিন্তু এমনটা হয়ে থাকে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন। কোনো কোনো শিক্ষকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন তিনি মাদরাসার বারান্দায় হাঁটেন ছাত্ররা জটলা করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কেউ মোসাফাহা করে, কেউ পরামর্শ চায়। আবার কেউ কোনো প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করে। তিনি নিজ দফতরে বসে ছাত্রদের আসার অনুমতি দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো কামরা ছাত্রে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

অথচ অন্য অনেক শিক্ষক আছেন, পথে হাঁটলে কেউ তার সাক্ষাতে এগিয়ে আসে না। হাঁটেন একা, মসজিদ থেকে বের হন একা। কেউ হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাকে সালাম করে না। পরামর্শ চাইতেও কেউ আসে না। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা দফতরে বসে থাকলেও কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। এমন কেন হয়? মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশার যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেই কিন্তু এমনটি হয়ে থাকে।

একজন মানুষ এমন, যিনি কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে সবাই তাকে দেখে আনন্দিত হয়। হাসিমুখে সালাম জানায়। সবাই কামনা করে, তিনি যেন তার পাশেই আসন গ্রহণ করেন। অথচ একই সময় অন্য একজন সে মজলিসেই এলে কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। কেউ কেউ হয়তো সৌজন্য রক্ষার খাতিরে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে তার সঙ্গে মোসাফাহা করে। কিন্তু কেউ তার জন্য জায়গা করে দেয় না। নিজের পাশে বসার জন্য ডাকে না। কেন এমন হয়? প্রকৃতপক্ষে মানুষকে আপন করে নেয়া এবং মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করার যোগ্যতার তারতম্যের কারণেই এমন হয়ে থাকে।

একজন পিতা বাড়িতে প্রবেশ করতেই তার সন্তানেরা হাসিমুখে এগিয়ে আসে। আরেকজন পিতা ঘরে এলে সন্তানেরা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সন্তানের সঙ্গে আচরণদক্ষতার পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়। মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশার ও সকলকে আপন করে নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতায় ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ হয়তো মুহূর্তের মধ্যে অন্যকে আপন করে নিতে পারে, আবার কেউ পারে না। তবে মানুষকে আপন করে তাদের

মনে জায়গা করে নেয়া এবং নিজের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করা খুব কঠিন কিছু নয়।

আমি কথাটি বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলছি না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি। আমি দেখেছি, নির্দিষ্ট ও সহজ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে বেশিরভাগ মানুষেরই মন জয় করা সম্ভব। তবে শর্ত হলো, সে পদ্ধতিগুলো প্রথমে আন্তরিকভাবে আত্মস্থ করতে হবে। এরপর সুন্দরভাবে সেগুলোর প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহারের মাধুর্যের কারণে আমাদের অজান্তেই অনেক সময় অন্যরা আমাদের প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আমার জীবনের একটি ঘটনা শুনুন।

আজ তের বছর যাবৎ একটি সামরিক ভার্সিটির মসজিদে আমি ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করছি। মসজিদে যাওয়ার পথে একটি গেট আছে। একজন দারোয়ান সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। যাওয়ার পথে সবসময় তাকে দেখে আমি মুচকি হাসতাম এবং সালাম করতাম। বেশিরভাগ সময় নামায চলাকালে আমার মুঠোফোন অসংখ্য এসএমএস ও মিসডকলে জমা হয়ে থাকতো। তাই ফেরার পথে গাড়িতে বসে আমি সেগুলো পড়তাম। এ কারণে ফেরার সময় তার দিকে আর তাকানো হতো না।

দারোয়ান গেট খুলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু আমি তার দিকে তাকাতাম না এবং একটু মুচকি হাসিও দিতাম না। একদিন হঠাৎ বের হওয়ার সময় আমাকে থামিয়ে তিনি বললেন, ‘শায়খ! আপনি কি আমার প্রতি কোনো কারণে রাগ করেছেন?’

আমি বললাম, ‘না তো! কেন?’

তিনি বললেন, ‘আপনি যখন প্রবেশ করেন, আমাকে দেখে হাসিমুখে সালাম দেন। অথচ বের হওয়ার সময় হাসিও দেন না, আপনাকে আনন্দিতও মনে হয় না।’

দারোয়ান ছিলেন খুবই সাদাসিধে এবং স্বচ্ছ মনের অধিকারী। আমার আচরণে অলক্ষেই আমাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন। আমি তাকে আমার ব্যস্ততার কারণ খুলে বললাম। সেদিন আমার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মানুষকে আপন করে নেয়ার দক্ষতাগুলো যখন আমাদের স্বভাবগুণে পরিণত হয়, তখন আমরা উদাসীন থাকলেও মানুষ সেগুলো গভীরভাবে লক্ষ করে।

*আলোর ঝলক... সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না, সম্পর্কই সম্পদ উপার্জনের পথ খুলে দেবে।*

# ৭. কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়?

আপনি যদি আপনার ব্যবহার ও আচরণে, কথাবার্তা ও উচ্চারণে প্রত্যেককে এ কথা অনুভব করাতে সক্ষম হন যে, সে আপনার কাছে সবচে প্রিয় মানুষ তাহলে বলা যাবে, আপনি সর্বোত্তম আচরণদক্ষতার অধিকারী।

আপনি আপনার মায়ের সঙ্গে সুন্দর-মধুময় আচরণ করুন। গভীর ভালোবাসায় তাকে সিক্ত করুন। সুকোমল ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলুন। তিনি যেন মনে করেন, এরকম ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ আর কারো সঙ্গে আপনি করেন না। এমন ভালো আর কাউকে বাসেন না। একই আচরণ করুন বাবার সঙ্গে, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবসহ সবার সঙ্গে; এমনকি যাদের সঙ্গে জীবনে মাত্র একবার দেখা হচ্ছে (যেমন কোনো দোকানদার কিংবা পেট্রোলপাম্পের কর্মচারী) তাদের সঙ্গেও।

আপনি যদি প্রত্যেককে এ কথা অনুভব করাতে সক্ষম হন যে, সে আপনার সবচে প্রিয় মানুষ তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে ভাববে, আপনি তাদের সবচে প্রিয় মানুষ। আমাদের নবীজীর ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু এমনই ছিলো। সীরাতে নববীর দিকে তাকালে আমরা এর উত্তম নমুনা খুঁজে পাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতেন। হাসিমুখে কথা বলতেন। এমন আচরণ করতেন যে, সবাই মনে করতো আমিই নবীজীর সবচে প্রিয় মানুষ। ফলে প্রত্যেকেই নবীজীকে সর্বাধিক ভালোবাসতো।

আমর বিন আস রাযি. ছিলেন আরবের গুণীজনদের একজন। জ্ঞানে-গুণে, মেধা ও প্রতিভায় তার সমকক্ষ ব্যক্তি আরবে কমই ছিল। গোটা আরবে চারজন ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আমর রাযি. ছিলেন তাদের অন্যতম।

তিনি নিজ গোত্রের সরদার ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি লক্ষ করলেন, পথে সাক্ষাৎ হলে আল্লাহর রাসূল তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। মজলিসে উপস্থিত হলে নবীজী তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন। সবসময় হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তার সবচে পছন্দনীয় নামে তাকে ডাকেন। এমন আচরণ দেখে আমর রাযি.-এর মনে হলো, আমিই হয়তো নবীজীর সবচে প্রিয় মানুষ। এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে একদিন তিনি নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সবচে প্রিয় মানুষ কে?' নবীজী বললেন, 'আয়েশা'।

আমর রাযি. বললেন, 'না, আসলে আমি জানতে চাচ্ছি—পুরুষদের মাঝে আপনার সবচে প্রিয় ব্যক্তি কে? আমি আপনার পরিবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি না।' নবীজী বললেন, 'আয়েশার পিতা (আবু বকর)।' আমর জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?' নবীজী বললেন, 'ওমর ইবনুল খাত্তাব।' আমর আরয করলেন, 'তারপর?' নবীজী এবার ইসলাম গ্রহণ ও দ্বীনের জন্য কষ্ট বরণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা হিসেবে এক একজন করে নাম বলতে লাগলেন। 'অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক...।' আমর রাযি. বলেন, 'আমার নাম সবার শেষে বলেন কিনা, এই ভয়ে আমি আর প্রশ্ন না করে চুপ হয়ে গেলাম।'

লক্ষ করে দেখুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন চারিত্রিক মাধুর্যের মাধ্যমে আমর রাযি.-এর মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাকে নিজের আপন বানিয়ে নিয়েছিলেন। নবীজী এভাবেই প্রত্যেককে তার স্তর অনুযায়ী মর্যাদা দিতেন। বরং তার প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনে আপন কাজ ছেড়ে দিয়ে তার কথা শুনতেন।

যখন ইসলামের বিজয় শুরু হলো, চারিদিকে মুসলমানদের বিজয়াকেতন উড়তে লাগলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন গোত্রে পাঠাতে লাগলেন। কখনো কখনো প্রয়োজনে সেনাদলও পাঠাতে হতো। এরই ধারাবাহিকতায় নবীজী 'তাঈ' গোত্রের উদ্দেশে সাহাবীদের একটি জামাত প্রেরণ করলেন। আদি বিন হাতেম ছিলেন 'তাঈ' গোত্রের সরদার। যুদ্ধের ভয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। দেশ ছেড়ে পালিয়ে শামে আশ্রয় নিলেন।

মুসলিম সেনাদল খুব সহজেই 'তাঈ'-জনপদ জয় করে নিলো। কারণ তাদের নেতৃত্ব দেয়ার মত সরদারও নেই, আর সরদার না থাকায় সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীও নেই। মুসলমানগণ যুদ্ধের ময়দানে বিজিতদের সঙ্গে সদাচরণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্য তো ছিলো কেবল তাঈ গোত্রের অমুসলিমদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করা এবং তাদের সামনে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করা।

বনী তাঈ এর সঙ্গেও এর বিপরীত হলো না। তাদেরকে বন্দী করা হলেও সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করা হলো। সকল বন্দীদের মদীনায় নিয়ে আসা

হলো। এদের মাঝে আদি বিন হাতেমের বোনও ছিলো। নবীজীকে আদির পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ দেয়া হলে তিনি আশ্চর্য হলেন। কীভাবে সে নিজ সম্প্রদায়কে ছেড়ে পালিয়ে গেলো? কোন ধরণের বুদ্ধির পরিচয় দিলো সে?!

শামে পালিয়ে গেলেও আদি সেখানে সুখের সঙ্গে বসবাস করতে পারলেন না। কারণ সেখানে তার পরিচিত কেউ ছিলো না। অবশেষে আদি নিজ দেশে ফিরে এলেন। মদীনায় এসে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ ঘটনা আদি নিজেই বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একসময় আমার সবচে অপছন্দনীয় মানুষ ছিলেন। কারণ আমি ছিলাম একজন খৃস্টান। স্বভাবতই নবীজী কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত শুনে আমার মনে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হলো। তবে কিছুদিন পর আমার সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেলো। স্বপ্নের রাজপ্রাসাদগুলো চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়লো। পালিয়ে শামে গিয়ে কোনোমতে প্রাণে বাঁচলাম। কিন্তু শামের দিনগুলো আমার সুখে কাটলো না। তাই মনে মনে ভাবলাম, এখানে না থেকে আরবে ফিরে যাওয়াই আমার জন্য ভালো। আমি মুহাম্মাদের কাছে ফিরে যাবো। মিথ্যাবাদী হলে তো সে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর বাস্তবেই সে সত্যবাদী হলে তাকে অনুসরণ করতে আমার সমস্যা কোথায়?'

মদীনায় পৌঁছালে লোকেরা আমাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলো, 'ঐ দেখো আদি বিন হাতেম! ঐ দেখো আদি! শেষমেষ কোনো উপায় না পেয়ে ফিরে এসেছে।' তবে আমি কারো কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা নবীজীর

দরবারে উপস্থিত হলাম। নবীজী আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আদি বিন হাতেম নাকি?' আমি উত্তরে বললাম, 'জ্বী, আমি আদি বিন হাতেম।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদির আগমনে আনন্দিত হলেন। তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন। যদিও তিনি মুসলমানদের শত্রু, ইসলামবিদ্বেষী, রণাঙ্গন থেকে পলায়নকারী এবং খৃস্টান দেশে আশ্রয়গ্রহণকারী; তবুও তার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করলেন। নবীজী আদির হাত ধরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। আদি নবীজীর পাশে চলতে লাগলেন। তার কাছে মনে হচ্ছিলো, উভয় মাথাই তো সমান!

নবীজী হলেন মদীনা ও তার আশপাশের অঞ্চলের বাদশা। আর তিনি তাঈ-উপত্যকা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সরদার। নবীজী প্রতিষ্ঠিত আছেন খোদাপ্রদত্ত ধর্ম ইসলামের ওপর। আর তিনিও আসমানী ধর্ম খৃস্টধর্মের অনুসারী। মুহাম্মাদের আছে আসমানী গ্রন্থ 'আল কোরআন', তার কাছেও আছে আসমানী কিতাব 'ইনজীল'। তাই আদি মনে মনে ভাবলেন, শক্তি ও সৈন্য-সামন্ত ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আমার মাঝে ও নবীজীর মাঝে তেমন কোনো তফাৎ নেই। পথিমধ্যে তিনটি ঘটনা ঘটলো:

১. তারা উভয়ে পথ ধরে হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে একজন মহিলার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। মহিলা নবীজীকে দেখেই চিৎকার করে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন।' নবীজী আদি বিন হাতেমের হাত ছেড়ে মহিলার কাছে গেলেন। কী হয়েছে জানতে চাইলেন। নীরবে তার কথা শুনতে লাগলেন। আদি বিন হাতেম জীবনে বহু রাজা-বাদশাহর আচরণ

দেখেছেন। কিন্তু এমন কখনো দেখেননি। তাই তিনি অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন এবং দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের আচরণের সঙ্গে নবীজীর আচরণ তুলনা করতে লাগলেন। মুগ্ধ হয়ে আদি বিন হাতেম দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করলেন। এরপর বললেন, 'খোদার কসম! এমন আখলাক রাজা-বাদশাদের হতে পারে না। এ আখলাক তো নবী-রাসূলের! এ আখলাক তো আম্বিয়ায়ে কেরামের!' মহিলার কথা শেষ হলে নবীজী আদি বিন হাতেমের কাছে ফিরে এলেন এবং উভয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

২. কিছু দূর না যেতেই তাদের দেখা হলো আরেক ব্যক্তির সঙ্গে। লোকটি বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অভিযোগ করছি।' লোকটি ছিলো সীমাহীন দরিদ্র। খাওয়া-পরার কিছুই নেই। ছেলে-মেয়েদের ক্ষুধা নিবারণের মত কোনো খাবার নেই। আশপাশে যে মুসলমানগণ আছেন তাদেরও সামর্থ্য নেই তাকে সাহায্য করার। নবীজী অবস্থা শুনে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, কিছু কথা বললেন। আদি বিন হাতেম সবকিছু দেখলেন, শুনলেন এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। এরপর আবার তারা হাঁটতে শুরু করলেন।

৩. কিছুদূর যাওয়ার পর আরেকজন লোক এলো। সে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমাদের অনেক শত্রু থাকার কারণে আমরা পথঘাটে নিরাপদে বের হতে পারি না। মদীনা থেকে বের হলেই চোর-ডাকাত আমাদের ওপর হামলা করে।' নবীজী তার কথা শুনলেন। তাকে এর সমাধান দিলেন এবং আরো কিছু কথা বলে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

আদি বিন হাতেম এ বিষয়গুলো নিয়ে এবার গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তিনি নিজে তো সীমাহীন মান-মর্যাদার অধিকারী। তার কোনো শত্রু নেই। ক্ষতিসাধনের জন্য কোথাও কেউ ওঁত পেতে বসে নেই। তাহলে কেন তিনি এমন ধর্ম গ্রহণ করবেন, যার অনুসারীরা সবাই দরিদ্র ও নিঃস্ব, অসহায়, দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন?

অবশেষে উভয়ে নবী-গৃহে প্রবেশ করলেন। নবীজীর গৃহে প্রবেশ করে আদি বিন হাতেম দেখলেন, সেখানে একটাই বালিশ আছে। তিনি সেটা নবীজীর দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু নবীজী মেহমানের সম্মানার্থে বালিশটি আদিকে দিলেন এবং বললেন, 'নাও, তুমি বসো।' আদি বিন হাতেম আবার সেটা রাসূলকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'না, না, আপনিই বসুন।' নবীজী বললেন, 'না, বরং তুমিই বসো।' আদি বিন হাতেম তা নিয়ে বসলেন।

নবীজী ইসলাম ও আদি বিন হাতেমের মধ্যকার দূরত্ব দূর করতে মনোযোগী হলেন। কুফর ও শিরকের আপাত মজবুত প্রাচীরগুলো ভাঙতে শুরু করলেন। নবীজী বললেন, 'আদি! তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তাহলে (উভয় জগতের) নিরাপত্তা লাভ করবে।'

আদি বললেন, 'আমি তো একটা ধর্ম অনুসরণ করে চলছি।'

নবীজী বললেন, 'শোনো আদি! তোমার ধর্মের ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি।'

আদি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন?!'

নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত। আদি! তুমি কি রুকুসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত নও?'

রুকুসিয়াত হলো খৃস্টধর্মের একটি শাখা। অগ্নিপূজারীদের ধর্মের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। লক্ষ করুন, নবীজী তাদের ধর্মের গভীরের সেই বিশেষ শাখা সম্পর্কেও অবগত আছেন। এটা ছিলো নবীজীর স্বতন্ত্র এক যোগ্যতা। তিনি এ কথা বলেননি যে, 'তুমি তো খৃস্টান।' বরং তার ধর্মের আরো গভীরে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো রুকুসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।'

মনে করুন, ইউরোপের কেউ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। সে আপনাকে বললো, 'তুমি খৃস্টান হয়ে যাও।' আপনি বললেন, 'আমি তো একটি দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি।' প্রত্যুত্তরে সে আপনাকে এ কথা বললো না যে, 'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি মুসলমান।' বললো না, 'হ্যাঁ, আমার জানা আছে তুমি সুন্নী।' বরং সে বললো, 'হ্যাঁ, তুমি তো শাফেয়ী বা তুমি তো হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।' তার কথা শুনে আপনি অবশ্যই বুঝবেন, আপনার দ্বীন সম্পর্কে সে অনেক কিছুই জানে।

এ দক্ষতাটিই আদির সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আদিকে বললেন, 'তুমি কি রুকুসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত নও?'

আদি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।'

নবীজী বললেন, 'তুমি যখন কওমকে সঙ্গে নিয়ে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ নিজেই রেখে দাও। তাই না?'

আদি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এমনটিই করি।'

নবীজী বললেন, 'এটা তো তোমাদের ধর্মে অবৈধ।'

এ কথা শুনে আদি নবীজীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি যথাযথ বলেছেন।'

নবীজী এবার আদিকে লক্ষ করে বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ করতে তোমার বাধা কোথায়, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি তো বলবে, দুর্বল, অসহায় ও দরিদ্র লোকেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আরবের সম্পদশালীরা তো এই ধর্মকে মেনে নেয়নি।' নবীজী আদির প্রতি আরো আন্তরিক হয়ে বললেন, 'আদি! তুমি কখনো হেরাত গিয়েছো?'

আদি বললেন, 'আমি হেরাতের নাম শুনেছি। তবে কখনো যাওয়া হয়নি।'

নবীজী বললেন, 'কসম সেই খোদার যার হাতে আমার প্রাণ! এই দ্বীন, এই ধর্ম একদিন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র ধর্ম ইসলামের শান্তির বার্তা একদিন সর্বত্র পৌঁছে যাবে। একজন নারী সেদিন সুদূর হেরাত থেকে একা একা সফর করে বাইতুল্লাহর যিয়ারত করবে। তার কোনো সফরসঙ্গী থাকবে না।' অর্থাৎ কোনো দেহরক্ষীর সহায়তা ছাড়াই কেবল মাহরাম নিয়ে সে সুদূর হেরাত থেকে এসে হজ করে যাবে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বহু শহর-বন্দর অতিক্রম করে সে একাই মক্কায় পৌঁছে যাবে। কারো সাহস হবে না তার প্রতি সীমালঙ্ঘন করার, তার ওপর জুলুম করার অথবা তার সম্পদ কেড়ে নেয়ার। মুসলমানগণ সেদিন মহাক্ষমতাধর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। একজন মুসলমানের পক্ষে সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে

এগিয়ে আসবে বলে তার প্রতি কেউ চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পাবে না।

আদি নবীজীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কল্পনার চোখে যেন দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য—একজন নারী সুদূর হেরাত থেকে মক্কা নগরী পৌঁছাবে। তার সফরসঙ্গী কেউ হবে না। তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবার কেউ সাহস করবে না। তার মানে সেই নারী এই উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত অর্থাৎ তার (আদি) কওমের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবে? আদি আশ্চর্য হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, মরু কাঁপিয়ে বেড়ানো তাঈ গোত্রের যুদ্ধবাজ যুবকরা তখন কী করবে! তারা সে নারীকে ছেড়ে দেবে?!

এরপর নবীজী বললেন, 'আদি! শোনো, এই মুসলমানগণ একদিন কিসরা বিন হুরমুযের রাজভাণ্ডার করায়ত্ত করবে।'

আদি বিন হাতেম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিন হুরমুযের রাজভাণ্ডার?!'

নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ, কিসরা বিন হুরমুযের রাজভাণ্ডার। মুসলমানগণ তার ধনভাণ্ডার করায়ত্ত করবে এবং সমূহ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।'

নবীজী বললেন, 'জীবন তোমাকে সঙ্গ দিলে একদিন তুমি দেখবে, একজন ব্যক্তি মুঠো ভরে স্বর্ণ-রূপা নিয়ে পথে পথে ঘুরবে। কিন্তু সদকা প্রদানের জন্য একজন গরিব মুসলমানও সে খুঁজে পাবে না।' অর্থাৎ মানুষের ধন-সম্পদ তখন এত অধিক হবে যে, দরিদ্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে।

নবীজী এরপর আদিকে কিছু উপদেশ দিলেন। আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, 'সেদিন কিছু লোক মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু মাওলার সঙ্গে তারা কথা বলতে পারবে না। তাদের মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকাবে; কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখবে না। বাম দিকে ফিরে তাকাবে। সেখানেও দেখবে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুন।' নবীর উপদেশ শুনে আদি বিন হাতেম নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন।

নবীজী তাকে বললেন, 'আদি! একত্ববাদের পবিত্র কালিমা পাঠ করে মুসলমান হতে কখন তোমার দ্বিধা? কোথায় তোমার বাধা? নাকি তোমার কাছে আল্লাহর চেয়ে মহান ইলাহ আছে?' আদি এবার বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম। আমি একনিষ্ঠ মুসলমান হয়ে গেলাম। আমি সন্তুষ্ট মনে পাঠ করলাম, "আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...।"' আদি বিন হাতেমের ইসলাম গ্রহণে নবীজী সীমাহীন আনন্দিত হলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একদিন আদি বিন হাতেম রাযি. বলেন, 'আমি সেই নারীকে দেখেছি, যে সুদূর হেরাত থেকে একটি উটের পিঠে চড়ে একা একাই পবিত্র মক্কা নগরী সফর করেছে। হজব্রত পালন করে একা একাই সে আবার হেরাত ফিরে গেছে। এই দীর্ঘ সফরে এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর ভয় তার ছিলো না। আর কিসরা বিন হুরমুযের ধনভাণ্ডার যারা করায়ত্ত করেছে আমিও তাদের সঙ্গী ছিলাম। আল্লাহর শপথ! তৃতীয়

ভবিষ্যদ্বাণীটিও সত্য প্রমাণিত হবে। কেননা, তা তো বলেছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

পাঠক! গভীরভাবে চিন্তা করুন, রাসূলের পক্ষ থেকে আদির প্রতি আচরণ কত ঘনিষ্ঠ ছিলো। কী চমৎকার অভ্যর্থনা দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদিকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। হযরত আদিও সেটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চিন্তা করুন, নবীজীর এই সুমধুর আচরণ হযরত আদিকে ইসলাম গ্রহণ করতে কী পরিমাণ আকৃষ্ট করেছিলো। অতএব এই ভালোবাসা, এই প্রেম এবং এই মমতাবোধ আমরাও যদি মানুষের হৃদয়ে ঢেলে দিতে পারি, মানুষের সঙ্গে যদি এর চর্চা করতে পারি তাহলে আমরাও পারবো তাদের মন জয় করতে। আমরাও পারবো মানুষ ও মানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে, চিরসত্যের সন্ধান দিতে।

*একটি চিন্তা... কোমলতা ও উদারতা দিয়ে আমরা মানুষের হৃদয় জয় করতে পারি, আচরণ-দক্ষতার প্রয়োগ ঘটিয়ে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।*

# ৮. উপভোগ করুন আচরণদক্ষতা

আচরণদক্ষতা একটি সম্পদ। এর ফলাফল অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। শুধু পরকালীন সুখ নয়, দুনিয়ার জীবনেও তা সীমাহীন শান্তি এনে দেয়। এর মাধ্যমেই আপনি অনুভব করবেন জীবনের প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি। তাই যোগ্যতা ও দক্ষতাকে উপভোগ করুন। সকল মানুষের সঙ্গে এর অনুশীলন করুন। বড়দের সঙ্গে, ছোটদের সঙ্গে, ধনী-গরিব, দূরের-কাছের সকলের সঙ্গে সব ধরনের দক্ষতার চর্চা করুন। অন্যের ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে কিংবা তাদের হৃদয়ে স্থান পেতে অথবা তাদের সংশোধন করতে এর প্রয়োগ করুন। হ্যাঁ, অন্যের সংশোধনেও প্রয়োজন আচরণদক্ষতার সঠিক ব্যবহার।

আলী বিন জাহম ছিলেন একজন কবি, সুসাহিত্যিক। কিন্তু তিনি ছিলেন রূঢ় স্বভাবের বেদুঈন। সভ্য জীবনের কিছুই তার জানা ছিলো না। জানা ছিলো না সভ্য সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং রুচি-পছন্দ। মরুপ্রান্তরে যাযাবর জীবনের যতটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন, জেনেছেন ও আত্মস্থ করেছেন ততটুকুই। তৎকালীন খলীফা মুতাওয়াক্কিল ছিলেন একজন শক্তিধর শাসক। সকাল-সন্ধ্যা প্রজাগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে তার দরবারে হাজির হতো।

বেদুঈন কবি আলী বিন জাহম একদিন বাগদাদে এলেন। কেউ একজন তাকে জানালো, ‘সুসমৃদ্ধ-ছন্দবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে খলীফার যথোপযুক্ত প্রশংসা করতে পারলে তার দরবারে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান লাভ করা যায় এবং

প্রচুর হাদিয়া-তোহফাও লাভ করা যায়।' এ কথা শুনে আলী খুবই আনন্দিত হলেন এবং খলীফার রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা করলেন। মুতাওয়াক্কিলের দরবারে তিনি প্রবেশ করলেন। দেখলেন, বহু কবি-সাহিত্যিক সেখানে উপস্থিত। তারা স্বরচিত কবিতায় বাদশাহর গুণকীর্তন করছে এবং তার করুণা লাভে ধন্য হচ্ছে। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের প্রতাপ, গাম্ভীর্য আর শক্তির দম্ভ ছিলো স্বীকৃত। আলী তার দরবারে আসন গ্রহণ করলেন এবং কাব্যে কাব্যে খলীফার প্রশংসা শুরু করলেন। তার কবিতার প্রথম চরণগুলো ছিলো:

ভালোবাসার লাজ রক্ষায় আপনি যেন প্রহরী কুকুর!
রামছাগলের মতই আপনি শত ঝঞ্ঝায় অটল প্রাচীর!
আপনি যেন বিশাল এক কূপ! সব বালতির চাহিদা মেটে,
যতই বড় মোদের চাওয়া, 'আচ্ছা' বলা তবই খাটে।

পূর্বের কবিগণ যেখানে বাদশাহকে তুলনা করেছেন চন্দ্র, সূর্য, পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে, সেখানে আলী বিন জাহম যাযাবর জীবনের প্রথানুযায়ী তার কবিতায় বাদশাহকে তুলনা করতে লাগলেন কুকুর, ছাগল, কুয়া ও মাটির সঙ্গে!

খলীফা তার কবিতা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। রাজপ্রাসাদে মুহূর্তে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। ভয় আর আতঙ্কের ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। প্রহরীগণ নড়েচড়ে উঠলো। জল্লাদ তরবারি খাপমুক্ত করে ফেললো। হত্যা করার বিশেষ মাদুর বিছিয়ে সে আলী বিন জাহমকে তাতে বসালো এবং তাকে হত্যার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হলো।

কিন্তু খলীফা শান্তভাবে ভাবলেন। বুঝতে পারলেন, আসলে আলী বিন জাহম তাকে তুচ্ছ করতে চাননি। যাযাবর জীবনের স্বভাব প্রকৃতির কারণেই তিনি এভাবে তুলনা করেছেন। তার যাযাবর জীবনধারায় এগুলোই উমদা তাশবীহ ও শ্রেষ্ঠ তুলনা! খলীফা তার এই স্বভাবদুর্বলতাকে পরিবর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ জারি করলেন। বাদশাহর নির্দেশে ভৃত্যগণ তাকে এক মনোরম প্রাসাদে পৌঁছিয়ে দিলো। রাজ্যের রূপসী সব ক্রীতদাসীরা সেখানে তার সেবা করতো এবং ভোগ ও উপভোগের যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করতো।

আলী বিন জাহম সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করে ভোগের জীবন কাটাতে লাগলেন। বর্ণাঢ্য সোফায় হেলান দিয়ে, কোমল গালিচায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে খোশগল্প করে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। এভাবে কেটে গেলো দীর্ঘ সাত মাস।

তারপর একদিন খলীফা নৈশ আসরের আয়োজন করলেন। আলী বিন জাহমকে ডাকা হলো। ভৃত্যগণ কবিকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করলো। খলীফা বললেন, 'আলী! আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও।' খলীফার নির্দেশে তিনি কাব্যে কাব্যে খলীফার প্রশংসা শুরু করলেন। তার এবারের কবিতার প্রথম চরণগুলো ছিলো:

ডাগর চোখের বাঁকা চাহনি হৃদয়ে জ্বেলেছে দহনজ্বালা
জানা-অজানা কত না পথে হৃদয়ে গেঁথেছে প্রেমের মালা।

হৃদয়ে আমার জেগেছে আবার পুরনো সেই প্রেমের স্মৃতি
কে নেভাবে আগুন বলো, জ্বলছে আমার হৃদয় অতি।

এভাবেই তিনি শব্দের ফুলঝুরি দিয়ে সকলের অনুভূতিতে নাড়া দিলেন। অভিনব, সুললিত পংক্তিমালা দিয়ে সকলের হৃদয়কে বিগলিত করলেন। এরপর তিনি খলীফাকে একে একে চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি, তরবারির সঙ্গে তুলনা করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

পাঠক লক্ষ করুন, কীভাবে খলীফা আলী বিন জাহমের স্বভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম হলেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততির স্বভাব ও আচরণ আমাদেরকে মাঝে মাঝেই পীড়া দেয়। আমরা কি কখনো চেষ্টা করেছি তাদের সেই স্বভাব পরিবর্তন করতে? আমরা কি পেরেছি তাদের স্বভাবজাত দুর্বলতাকে পরিবর্তন করে তাদেরকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে?

তার চেয়ে বড় কথা হলো, সবার আগে আপনি নিজেকে বদলান। নিজের স্বভাবজাত দুর্বলতাগুলো ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠুন। মলিনতাকে মুচকি হাসিতে রূপান্তর করুন। গোস্বাকে সহনশীলতায়, কার্পণ্যকে দানশীলতায় এবং সংকীর্ণতাকে উদারতায় পরিবর্তন করুন। এটা খুব কঠিন কিছু নয়। এর জন্য প্রয়োজন কেবল দৃঢ় সংকল্পের, প্রয়োজন ধারাবাহিক অনুশীলনের। তাই আজই উদ্যোগী হোন। সাহসের সঙ্গে শুরু করুন।

নবীজীর সীরাত অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারবো, মানুষের সঙ্গে তিনি কত সুন্দর আচরণ করেছেন। চরিত্র মাধুরী দিয়ে তিনি মানুষের অন্তরকে কীভাবে জয় করে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি লৌকিকতার আশ্রয় নেননি।

এমন কখনো হয়নি যে, বাইরে সবার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করেছেন, সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন আর ঘরে ফিরে প্রচণ্ড রাগ করেছেন, কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহার করেছেন। এমনও হয়নি যে, সবার সঙ্গে ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল অথচ গৃহে এসেই হয়েছেন মলিনমুখ; কিংবা সবার প্রতি দয়াশীল, কিন্তু স্ত্রী-পরিবারের প্রতি ক্ষুব্ধ ও দয়াহীন।

বরং তিনি সবসময় সর্বক্ষেত্রে সবার সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করেছেন। তার আচরণে ছিলো না কোনো কপটতা বা কৃত্রিমতা। তার চরিত্র ছিলো অকৃত্রিম, সরল ও সর্বোৎকৃষ্ট। চাশত বা তাহাজ্জুদের নামাযের মত মানুষের সঙ্গে উত্তম আখলাক প্রদর্শনকেও তিনি ইবাদত মনে করতেন। মুচকি হাসিকে তিনি আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করতেন। নম্র ব্যবহারকে তিনি মনে করতেন ইবাদত, ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণকে তিনি গণ্য করতেন নেক আমল বলে।

বস্তুত সদাচরণ ও চারিত্রিক কোমলতাকে কেউ ইবাদত মনে করলে সর্বাবস্থায় সে তা বজায় রেখে আত্মতৃপ্তি পাবে। যুদ্ধাবস্থায় বা শান্তিকালীন অবস্থায়, ক্ষুধার্ত বা পরিতৃপ্ত অবস্থায়, সুস্থ কিংবা অসুস্থাবস্থায়, আনন্দ বা নিরানন্দ—সর্বাবস্থায় সে হৃদয়ে তৃপ্তি অনুভব করবে। অনেক স্ত্রীগণ গৃহাভ্যন্তরে বসে স্বামীদের উদারতা, দানশীলতা ও সদাচরণের মত মহৎ গুণের কথা শোনেন। কিন্তু বাড়িতে এর কিছুই তারা দেখেন না। বরং গৃহাভ্যন্তরে সেই উদার স্বামীর ব্যবহার থাকে রুক্ষ, মেজাজ থাকে খিটখিটে, হৃদয় সংকীর্ণ, চেহারা মলিন। কোমলমতি স্ত্রীদের প্রতি তারা

হয়ে যায় দয়াহীন, মায়াহীন। অথচ গৃহাভ্যন্তরে রাসূলের আচরণ কেমন ছিলো? তিনি নিজেই তো বলেছেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর শোনো, পরিবারের সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। [সুনানে তিরমিযী: ৩৮৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯৬৭]

এবার দেখুন, কেমন ছিলো পরিবারের সঙ্গে নবীজীর আচরণ? আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ রহ. বলেন, 'আমি আয়েশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে কী করতেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'পরিবারের বিভিন্ন কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। এরপর নামাযের সময় হলে অযু করে নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।'

বাবা-মায়ের সঙ্গেও সর্বদা সুন্দর আচরণ করতে হবে। অনেকেই দূরের ব্যক্তিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথা বলে এবং বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করে। কিন্তু বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানের মত যারা নিকটাত্মীয়, যারা উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার, তাদের সঙ্গে তারা মন্দ ও রুক্ষ আচরণ করে। উত্তম তো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের সঙ্গে, বাবা-মায়ের সঙ্গে, অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে এবং সন্তান-সন্ততি মোটকথা ঘরে বাইরে সকলের সঙ্গে সদাচরণ করে।

একদিন হযরত আবু লায়লা রাযি. নবীজীর দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে নবী-দৌহিত্র হাসান বা হুসাইন নবীজীর কাছে চলে এলো।

নবীজী তাকে আদর করে কোলে বসালেন। একটু পরেই সে নবীজীর কোলে পেশাব করে দিলো! হযরত আবু লায়লা বলেন, আমি লক্ষ করলাম, নবীজীর কোল থেকে পেশাব গড়িয়ে পড়ছে। তাই আমি দ্রুত নবীজীর কোল থেকে তাকে নিতে চাইলাম। নবীজী বললেন, ‘আমার প্রিয় সন্তানকে আমার কোলেই রেখে দাও। তাকে তোমরা ভীত-চকিত করো না।’ বাচ্চার পেশাব করা শেষ হলে নবীজী পানি আনতে বললেন এবং নিজ হাতেই পেশাব পরিষ্কার করলেন।

সুবহানাল্লাহ! কী অনুপম নববী আখলাক! উত্তম আখলাককে নবীজী নিজের স্বভাবগুণে পরিণত করে নিয়েছিলেন। তাই নবীজীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, এতে আশ্চর্য কী!

*সিদ্ধান্ত... অন্ধকারকে গালি দেয়ার পরিবর্তে প্রদীপটি মেরামতের চেষ্টা করুন।*

# ৯. গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে আপনি যেমন হবেন

বর্তমানে অনেক মানুষের চরিত্র হয়ে গেছে বাণিজ্যিক চেতনানির্ভর। তাদের সদাচরণ কেবল ধনীদের জন্যই। ধনীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের মুখে হাসি থাকে। ধনীদের শত অপরাধও যেন লঘু অপরাধ। দেখেও সে না দেখার ভান করে। অপরদিকে দরিদ্রদের সঙ্গে তাদের আচরণ বড় কঠোর। দরিদ্রদের কথা শুনলে তারা হাসি দেয় অবজ্ঞার। গরিবরা ছোট-খাটো কোনো অপরাধ করলেও নেই নিস্তার। শোনামাত্রই শুরু হয়ে যায় তিরস্কার। ঝড় ওঠে আলোচনা-সমালোচনার। তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো অনেক বড় করে দেখা হয়। দুর্বল কেউ কোনো ভুল করে ফেললে ঘটে যায় তুলকালাম কাণ্ড।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ও মায়া-মমতা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ছিলো সমান।

হযরত আনাস রাযি. বলেন, যাহির বিন হারাম নামক জনৈক বেদুঈন সাহাবী কখনো কখনো প্রয়োজনবশত মরু এলাকা থেকে মদীনায় এলে নবীজীর জন্য পনির বা ঘি হাদিয়া নিয়ে আসতেন। ফিরে যাবার সময় নবীজীও তাকে খেজুর বা অন্য কিছু হাদিয়া দিয়ে দিতেন। নবীজী তাকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তার সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন:

إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ

অর্থ: যাহির আমাদের গ্রামাঞ্চল, আর আমরা তার শহরাঞ্চল।

হযরত যাহির রাযি.-এর মুখাবয়ব তেমন সুশ্রী ছিলো না। একদিন তিনি গ্রাম থেকে রাসূলের কাছে এলেন। কিন্তু নবীজীকে বাড়িতে পেলেন না। তার সঙ্গে কিছু পণ্য ছিলো। বিক্রির জন্য সেগুলো নিয়ে তিনি বাজারে চলে গেলেন। এদিকে নবীজী বাড়ি ফিরে যাহিরের আগমন সংবাদ জানতে পেরে তাকে তালাশের জন্য নিজেই বের হয়ে পড়লেন। বাজারে গিয়ে দেখলেন, যাহির রাযি. পণ্য বিক্রি করছেন। তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। শরীরের কাপড়-চোপড় ঘামে ভিজে আছে। গ্রাম্য লোকদের কাপড়-চোপড়ের মতোই তার কাপড় থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। নবীজী তাকে পেছন দিক থেকে দেখলেন। এরপর একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

যাহির নবীজীকে দেখতে পাননি। তিনি বুঝতে পারলেন না, কে তাকে এভাবে ধরেছে। যাহির ঘাবড়ে গেলেন এবং বলে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দিন। কে আপনি?'

নবীজী নিশ্চুপ রইলেন।

যাহির ছুটবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ পেছনের দিকে ফিরলেন। নবীজীকে একপলক দেখেই তার হৃদয়-মন প্রশান্ত হয়ে গেলো। অন্তরের অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো। আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

নবীজীকে চিনতে পেরে তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশকে নবীজীর পবিত্র সীনার সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেন। নবীজী যাহিরের সঙ্গে একটু রসিকতা করতে চাইলেন। তিনি উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, 'এ গোলামটিকে কে কিনবে?

কে কিনবে গোলামটিকে?’

নবীজীর কথা শুনে যাহির নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র এক গ্রাম্য বেদুঈন। সহায় নেই, সম্বল নেই, অবয়বে সৌন্দর্য বলতে কিছু নেই। নিজেকে বড় নিঃস্ব-অসহায় মনে হলো তার। তাই তিনি নবীজীকে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনাকে তো গোলামটা অনেক সস্তায় বিক্রি করতে হবে।’

নবীজী বললেন, ‘কিন্তু আল্লাহর কাছে তুমি সস্তা নও। মহান আল্লাহর কাছে তুমি অনেক দামী।’

পাঠক! এমন মহৎ গুণের অধিকারী, দয়ার আধার, করুণার নবী, রাসূলে আরাবীর জন্য অসহায়-দুঃখীদের মন পাগলপারা থাকবে, নবীজীর জন্য তারা নিবেদিতপ্রাণ হবে—এতে আশ্চর্যের কী? নবীজী তো সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে। সর্বোৎকৃষ্ট আখলাক দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর কেড়ে নিয়েছিলেন।

বহু দরিদ্র মানুষ আছেন, যারা ধনীদের কাছে সম্পদ চান না। একবেলা খাবারের জন্য হাত বাড়ান না। তারা ধনীদের কাছে পেতে চান একটু সুন্দর আচরণ, একটু কোমল ব্যবহার। কতজন অসহায়-দরিদ্রকে দেখে আপনি মিষ্টি করে হেসেছেন? কতজনের প্রতি মূল্যায়ন ও সম্মানবোধ প্রকাশ করেছেন? আপনি কি জানেন, নির্জন রাতের নীরব প্রহরে সে আপনার জন্য দোয়া করে? আল্লাহর কাছে আপনার নিরাপদ ভবিষ্যৎ ও শান্তিময় জীবন কামনা করে? তার দোয়ায় আপনার প্রতি বর্ষিত হয় আসমানী রহমত?

আপনার জীবনে নেমে আসে করুণার বারিধারা? মনে রাখবেন; বিক্ষিপ্ত কেশধারী, ছিন্নবসন পরিহিত, মানুষের দুয়ার থেকে বিতাড়িত এমন অনেক ধুলোমলিন অবয়বের ব্যক্তি আছেন, যারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বলে ফেললে আল্লাহ অবশ্যই তা পূর্ণ করে দেন। তাই এসব দুর্বল-দরিদ্রদের সঙ্গে সর্বদা হাসিমুখে থাকুন।

*ইঙ্গিতে... কোনো দরিদ্র-অসহায় ব্যক্তির সঙ্গে একটু হাসিমুখের আচরণ হতে পারে আল্লাহর কাছে আপনার সমূহ মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।*

# ১০. নারীদের সঙ্গে আপনি যেমন হবেন

আমার দাদা প্রায়ই একটি প্রবাদ বাক্য বলতেন, 'ছাগল যদি ছাগীকে অবমূল্যায়ন করে, ছাগী তখন অন্য ছাগলের সন্ধানে নামে।' (উপেক্ষিত হইলে নারী স্বামীর কাছে, ঘর ছেড়ে যেতে পারে অন্যেরও আশে।) অর্থাৎ স্বামী যখন স্ত্রীর ভালোবাসা ও আবেগের মূল্যায়ন করে না, তার হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটায় না, স্বভাবতই তখন সে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সুভাষী কাউকে কাছে পাওয়ার কামনা অন্তরে লালন করে।

এ প্রবাদ বাক্যের উদ্দেশ্য নারী-পুরুষকে ছাগল-বকরীর সঙ্গে তুলনা করা নয়। আল্লাহ হেফাযত করুন। নারী তো বরং পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী, জীবনসঙ্গিনী। সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণে পুরুষ যেমন ভূমিকা রাখে তেমনই একজন নারীর ভূমিকাও কম নয়। পুরুষকে যদি আল্লাহ পাক দিয়ে থাকেন সুগঠিত দেহসৌষ্ঠব, তাহলে নারীকে দান করেছেন সুগভীর আবেগ-অনুভব। ইতিহাসের কত রাজা-বাদশাহ, বীর-বাহাদুরকে আমরা দেখেছি, নারীমনের আবেগ-উচ্ছ্বাস আর ভালোবাসার কাছে অবনত হয়েছে তাদের শৌর্য-বীর্য।

নারীর সঙ্গে আচার-ব্যবহারের দক্ষতাকেও আয়ত্ত করতে হবে। গভীর ভালোবাসা দিয়ে তার অন্তর জয় করার এবং হৃদয়ের বদ্ধ দরজা খোলার চাবিকাঠি হাতে নিতে হবে। আর নারী-মন জয়ের সে চাবিটি হলো আবেগ-অনুভূতি! হ্যাঁ, তার চাবি দিয়েই তার হৃদয়ের বদ্ধ দরজা খুলতে হবে!

নবীজী আমাদেরকে নারীর প্রতি সদাচরণের আদেশ করেছেন। নারীর আবেগ ও ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করতে বলেছেন। কেননা, ঘরের রমণীর সঙ্গে আচরণ সুন্দর হলে তার সঙ্গে আপনার জীবনযাপনও হবে সুখ ও শান্তিময়। নবীজী পিতাকে তার কন্যাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছেন। নবীজী বলেছেন:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ

অর্থ: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যাসন্তান যে লালন-পালন করবে, হাশরের মাঠে আমি ও সে এভাবে থাকবো। এ কথা বলে নবীজী হাতের দু'টি আঙুল একত্র করে দেখালেন। [সহীহ মুসলিম: ৪৭৬৫, সুনানে তিরমিযী: ১৮৩৭]

মায়ের ব্যাপারে সন্তানগণকেও নবীজী এমন নির্দেশ দিয়েছেন। জনৈক ব্যক্তি নবীজীকে একদিন জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে আমার উত্তম সহচর্য কে বেশি হকদার?' নবীজী বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি বললো, 'এরপর?'

'তোমার মা।'

'তারপর?'

'তোমার মা।'

চতুর্থবার নবীজী বললেন, 'তোমার বাবা।'

স্বামীকেও তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যে স্ত্রীর সঙ্গে রেগে যায় এবং দুর্ব্যবহার করে, নবীজী তার কঠোর নিন্দা করেছেন। নবীজীর জীবন দেখুন। বিদায় হজের খুতবা চলছে। নবীজীর সামনে

উপস্থিত সোয়া লক্ষ সাহাবী। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, কিশোর-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র সবাই আজ উপস্থিত। উচ্চ স্বরে নবীজী সকলের উদ্দেশে বললেন: أَلَا اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
অর্থ: শোনো, হে লোকসকল! তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। [সহীহ মুসলিম: ২৬৭১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৪১]

একদিন নবীপত্নীগণের কাছে কিছু মহিলা এলো। তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করলো। নবীজী এ কথা শুনে সাহাবীদের ডেকে বললেন, 'মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের কাছে অনেক মহিলা আগমন করে এবং তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। শুনে রাখো, এ সকল স্বামীরা তোমাদের ভালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' তিনি আরো বলেছেন: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর শোনো, পরিবারের সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। [সুনানে তিরমিযী: ৩৮৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯৬৭]

ইসলাম নারীকে এত মর্যাদা দিয়েছে যে, একজন নারীর সম্মান রক্ষার্থে দেশে দেশে যুদ্ধ বেধে যেতো। একজন অবলা নারীর আব্রুর হেফাযত করতে গিয়ে রক্তের বন্যা বয়ে যেতো। একজন নির্যাতিত নারীর কান্না থামাতে প্রয়োজনে বহু শির উচ্ছেদ করা হতো। মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মদীনায় কিছু ইহুদিও বসবাস করতো। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলে তারা ক্ষুব্ধ হলো। মুসলিম রমণীদের পর্দাবৃত অবস্থা তাদের পছন্দ হলো

না। তাই প্রথমে তারা চেষ্টা করলো মুসলিম নারীদের মাঝে দ্বিধা ও বিশৃঙ্খলার বীজ বুনতে। কিন্তু চির অভিশপ্ত ইহুদি জাতি তাতে সফল হলো না।

একদিন জনৈকা মুসলিম নারী বনু কায়নুকার বাজারে গেলেন। তিনি ছিলেন পর্দাবৃত, সতীসাধ্বী একজন নারী। বাজারে গিয়ে তিনি এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে বসলেন। ধূর্ত ইহুদিরা তার মুখে হিজাব দেখে এবং তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা দেখে মনে মনে ভীষণ রাগান্বিত হলো। তারা তার মুখমণ্ডল এক পলক দেখার জন্য লালায়িত হলো। তাকে স্পর্শ করার এবং তাকে নিয়ে খেলা করার অপবিত্র কামনা তাদের পাপী মনে জেগে উঠলো। ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের নিয়ে তারা যে ধরনের তামাশা করতো, এই মুসলিম রমণীর সঙ্গেও তারা তাই করতে চাইলো।

তারা তার চেহারা উন্মোচন করতে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলো এবং হিজাব খুলে ফেলার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগলো। কিন্তু এই মহীয়সী নারী তাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অবলা নারী আনমনে বসে ছিলেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী অভিশপ্ত স্বর্ণকার ইহুদি শয়তানি ফন্দি আঁটলো। সে মহিলার অগোচরে পেছন থেকে তার কাপড়ের নিম্নাংশ ওপরের ওড়নার সঙ্গে বেঁধে দিলো। কাজ শেষে মহিলা যখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তার কাপড়ের পেছন দিকটা ওপরে উঠে গেলো এবং শরীরের কিছু অঙ্গ উন্মোচিত হয়ে গেলো।

অবস্থা দেখে ইহুদিরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি মনে মনে কামনা করছিলেন, ‘হায়! এরা যদি আমার ইজ্জতে হাত দেয়ার পরিবর্তে আমাকে হত্যা করে ফেলতো!’ জনৈক মুসলমান বিষয়টি লক্ষ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরবারি খাপমুক্ত করে অভিশপ্ত স্বর্ণকারকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ইহুদিরাও ভীষণ ক্ষেপে গেলো। তারা দল বেঁধে এই মুসলমানকে শহীদ করে দিলো।

নবীজী যখন জানলেন যে, ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মুসলিম রমণীকে লাঞ্ছিত করেছে তখন তিনি ইহুদিদের এলাকা অবরোধ করলেন। দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং উপায়ান্তর না দেখে নবীজীর ফায়সালা মেনে নিতে রাজী হলো। এরপর নবীজী যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং একজন সতীসাধ্বী নারীর সম্ভ্রমহানির প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। মুসলিম নামধারী শয়তানের এক দোসর তখন দাঁড়িয়ে গেলো। এদের কাছে একজন মুসলিম নারীর ইজ্জত-আব্রুর কোনো মূল্য নেই। মহীয়সী নারীর সম্ভ্রম হেফাযতের সামান্য পরোয়া এদের নেই। অবলা নারীকে ভোগ ও উপভোগের পণ্য বানানোই এদের বাসনা।

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই নবীজীর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সে বললো, ‘মুহাম্মাদ! আপনি আমার মিত্র ইহুদিদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।’ জাহেলী যুগে এ সকল ইহুদিরা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সহযোগী ছিলো। নবীজী তাকে এড়িয়ে গেলেন এবং তার আবেদন প্রত্যাখ্যান

করলেন। যারা সদা সর্বদা মুসলমানদের মাঝে ফিতনা ছড়ানোর চিন্তায় বিভোর থাকে, তাদের ক্ষমার সুপারিশ কেমন করে করলো এই মুনাফিক?!

হঠকারী এই মুনাফিক নির্লজ্জের মত আবার আবেদন করলো। নবীজীকে আবারও সে বললো, 'মুহাম্মাদ! আপনি এদের প্রতি সদাচরণ করুন।' নবীজী এবারও মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রু ও আত্মমর্যাদাবোধের কথা চিন্তা করে ইবনে সালুলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। মুনাফিক সরদার তখন ক্রোধে ফেটে পড়লো। সে নবীজীর লৌহবর্মের বিভিন্ন খাঁজে হাত ঢুকিয়ে টানাটানি শুরু করলো এবং বারবার বলতে লাগলো, 'আমার মিত্রদের প্রতি আপনি সদাচরণ করুন। আমার মিত্রদের প্রতি সদাচরণ করুন।'

নবীজী রাগান্বিত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালেন। উচ্চ স্বরে বললেন, 'ছেড়ে দাও আমাকে।' কিন্তু এরপরও ইহুদিদেরকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচাতে এই মুনাফিক বরাবর পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। অবশেষে দয়ার নবী তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকলো।' নবীজী প্রাণদণ্ড থেকে তাদের মুক্তি দিলেন। তবে পবিত্র ভূমি মদীনা থেকে তাদের উচ্ছেদ করলেন এবং নিজেদের এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। একজন মহীয়সী নারীর ইজ্জত-আব্রুর হেফাযতের জন্য প্রয়োজনে এর চেয়েও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই বাঞ্ছনীয়।

খাওলা বিনতে সা'লাবাহ ছিলেন পুণ্যবতী এক মহিলা সাহাবী। তার স্বামী আওস বিন সামেত ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। অল্পতেই তিনি রেগে যেতেন। একদিন তিনি গোত্রীয় মজলিস থেকে ফিরে খাওলার কাছে এলেন এবং

খাওলাকে একটা কাজ করতে বললেন। কিন্তু খাওলা কাজটি করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অমনি দু'জনের বেঁধে গেলো। একপর্যায়ে আওস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো!’ এই বলে তিনি রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জাহেলী যুগে কেউ এমন বাক্য উচ্চারণ করলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যেতো। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী—খাওলার তা জানা ছিলো না। আওস ঘরে ফিরে লক্ষ করলেন, খাওলা তার থেকে দূরে দূরে থাকছেন। একপর্যায়ে খাওলা তাকে বললেন, ‘কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি যা বলার তা তো বলেই ফেলেছো। অতএব এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ফয়সালা ছাড়া তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না।’

এরপর খাওলা নবীজীর কাছে রওয়ানা হলেন। নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। স্বামীর পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত যেসব দুর্ব্যবহারের ও অসদাচরণের শিকার হতেন, নবীজীকে তা জানালেন। নবীজী সবকিছু শুনে তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, ‘খাওলা! তোমার চাচাতো ভাই (স্বামী) একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।’

নবীজীর কথা শুনে খাওলা কোনোমতে অশ্রুসংবরণ করে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমার যৌবন তার হাতে তুলে দিয়েছি। আমার উদরকে তার সন্তান ধারণের জন্য তার কাছে সঁপে দিয়েছি। এখন আমি আমার জীবন সায়াহ্নে উপনীত। সন্তান ধারণের ক্ষমতা আমার নেই। আজ এই পরিস্থিতিতে সে

আমার সঙ্গে যিহার করলো?! হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই অভিযোগ করছি।'

নবীজী ওহীর প্রতীক্ষা করছিলেন। খাওলা তখনো রাসূলের দরবারে উপস্থিত। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাঈল আ. উপস্থিত হলেন। উদ্ভূত সমস্যার ঐশী বিধান নিয়ে তিনি এসেছেন। নবীজী এবার খাওলার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, 'খাওলা! তোমার স্বামী ও তোমার ঘটনার সমাধানে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।' এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

আয়ে (১) [সূরা মুজাদালাহ]

এভাবে সূরায়ে মুজাদালার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করে নবীজী খাওলাকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে বলে দাও একটি গোলাম আযাদ করতে।' হযরত খাওলা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আযাদ করার মত তার কাছে কিছুই নেই।'

'তাহলে তাকে দুই মাস লাগাতার রোযা রাখতে বলো।'

'সে তো অতিশয় বৃদ্ধ। এভাবে রোযা রাখার শক্তিও তার নেই।'

'তাহলে তাকে বলো, সে যেন সত্তরজন মিসকিনকে এক ওয়াসক করে খেজুর দিয়ে দেয়।'

'আল্লাহর রাসূল! তার কাছে খেজুরও নেই।'

নবীজী এবার বললেন, 'ঠিক আছে। আমি কিছু খেজুর দিয়ে তাকে সহায়তা করবো।'

খাওলা বললেন, ‘তাহলে আমিও তাকে কিছু খেজুর প্রদান করবো।’ নবীজী বললেন, ‘তাহলে তো অনেক ভালো হয়। যাও, তার পক্ষ থেকে এগুলো দান করে দাও। আর তার সঙ্গে সদাচরণ করো।’

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নবীজীকে সকলের সঙ্গে কোমলতা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের মত মহা নেয়ামত দান করেছিলেন। এমনকি সকলের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানেও তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও সহনশীল। আমি নিজে আপন স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে কোমল ও আবেগীয় আচরণদক্ষতার অনুশীলন করেছি। এরও পূর্বে করেছি মা ও বোনের সঙ্গে। আমি এর গভীর ও কার্যকর প্রভাব উপলব্ধি করেছি। এসব আচরণদক্ষতার অনুশীলন ব্যতীত কেউ এ প্রভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন না।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই নারীকে সম্মান করে। আর ইতর ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই কেবল নারীকে অসম্মান করে।

*বিরতিতে... স্ত্রী মেনে নিতে পারে স্বামীর দরিদ্রতা, চেহারার কদর্যতা, বাইরের ব্যস্ততা কিন্তু কিছুতেই সে মেনে নিতে পারে না স্বামীর আচরণ ও ব্যবহারের অসভ্যতা।*

# ১১. ছোটদের সঙ্গে আপনি যেমন হবেন

সুখ ও দুঃখের, হাসি ও কান্নার কত ঘটনা ছোটবেলায় ঘটেছে, অথচ তার স্মৃতি এখনো আমাদের মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। ইচ্ছা করেও যেন আমরা সেসব ভুলতে পারি না! এবার তাহলে একটু ফিরে যান আপনার শৈশবের দিনগুলোতে। উল্টাতে থাকুন শৈশবের বর্ণিল অধ্যায়ের সোনালী স্মৃতির পাতাগুলো। স্মৃতিরা মিছিল করে আসতে থাকবে আপনার মনের আয়নায়।

আপনার মনে পড়ে যাবে কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির স্মৃতি। কোনো সাফল্যের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মাননাস্বরূপ আপনাকে তা দেয়া হয়েছিলো। মনে পড়বে অনেক জনসাধারণের উপস্থিতিতে বড় কোনো অনুষ্ঠানে কেউ আপনার প্রশংসা করেছিলো। এগুলো এমন স্মৃতি, যা সবসময় প্রোথিত থাকে মনের গভীরে। কখনো মোছে না, স্মৃতির পাতায় জমা হয়ে থাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এর পাশাপাশি আমরা জীবনের এমন কিছু দুঃখ-বেদনার স্মৃতিও স্মরণ করতে পারি যা শৈশবে ঘটেছিলো। শিক্ষকের প্রহার, সহপাঠীর সঙ্গে ঝগড়া, কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতির কারণে পরিবারের কারো পক্ষ থেকে অপমান-লাঞ্ছনা, সৎ মায়ের পক্ষ থেকে প্রতিহিংসামূলক আচরণ—এ জাতীয় আরো কত স্মৃতি! এসব ঘটনাও আমরা সাধারণত ভুলি না। আমাদের অন্তরে ও স্মৃতির পাতায় এগুলো থেকে যায় সবসময় স্মৃতি হয়ে, স্মরণীয় হয়ে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছোটদের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার, একটু কোমল আচরণের ফলে কেবল ছোটরাই নয়, তাদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও প্রভাবিত হন এবং সবার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের অনেকেরই এ অভিজ্ঞতা আছে যে, ছোট ছোট ছাত্রদের বাবা-মায়েরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার প্রশংসা করেন এবং জানান যে, তাদের সন্তান তাকে খুব ভালোবাসে, সবসময় তার প্রশংসা করে। তাই তারাও তাকে ভালোবাসেন। কখনো কখনো তারা তাদের হৃদয়ের এ অনুভূতি উষ্ণতাপূর্ণ ও আন্তরিক সাক্ষাৎ, হাদিয়া বা পত্র পাঠানোর মাধ্যমেও ব্যক্ত করে থাকেন।

আর তাই ছোটদের হাসিমুখ, তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা অর্জন, তাদের সঙ্গে কোমল ও উপযোগী আচরণের অনুশীলন—এসব বিষয়কে মোটেই তুচ্ছ মনে করবেন না। একদিন আমি এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছোট ছোট ছাত্রদের উদ্দেশে নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। একপর্যায়ে আমি তাদেরকে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি হাদীস বলতে বললাম। একজন বললো, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ অর্থ: নামায বর্জন করা হলো ঈমান ও কুফুরের মধ্যবর্তী কাজ।’ [সহীহ মুসলিম: ১১৬]

তার উত্তরে আমি মুগ্ধ হলাম। আমি এত বেশি খুশি হলাম যে, আমার হাতের ঘড়িটি খুলে তাকে দিয়ে দিলাম। ঘড়িটি ছিলো খুবই সাধারণ, শ্রমিকেরা সাধারণত যে ধরণের ঘড়ি ব্যবহার করে অনেকটা তেমনই।

আমার সেদিনের সেই আচরণে ছেলেটি খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। এরপর সে পড়াশোনায় গভীরভাবে মনোযোগী হলো এবং কোরআনে কারীম হিফযের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাতে মনোনিবেশ করলো। কয়েক বছর পর একদিন এক মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে আমি জানতে পারলাম, সেদিনের ছোট্ট সেই ছেলেটিই এখন এই মসজিদের ইমাম! এখন সে পূর্ণ যুবক। ইতোমধ্যে সে শরীয়া অনুষদ থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছে এবং বর্তমানে সে বিচার বিভাগে চাকুরি করে। তার শৈশবের সেই ঘটনা আমার স্মরণ ছিলো না। সে-ই আমাকে অনেক আগের সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

প্রিয় পাঠক! দেখুন, অনেক বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই সামান্য ঘটনা তার অন্তরে কী গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং আমার প্রতি কেমন ভালোবাসা ও মূল্যায়নবোধ তৈরি করেছে। আরেকবার আমি একটি ওলীমা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। হাস্যোজ্জ্বল চেহারার জনৈক যুবক আমাকে খুবই আন্তরিকভাবে সালাম দিলো এবং অনেক আগে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া চমৎকার একটি ঘটনা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো। তার শৈশবে আমি একবার তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলাম। তখনকার সে ঘটনাটি আজও তার ভালোভাবে মনে আছে।

অনেক সময় দেখবেন, মসজিদ থেকে বের হয়ে ছোট ছোট ছেলেরা তার বাবার হাত ধরে টেনে একজন লোকের কাছে নিয়ে যায়। বাবা সেই লোককে সালাম করে এবং এ কথা জানায় যে, তার ছেলে তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, লোকটি ছোটদের সঙ্গে ভালো

ও সুন্দর ব্যবহার করে। বড় বড় দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে—যেখানে অনেক মানুষ উপস্থিত হয়—সেখানেও এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

আমি সবসময়ই ছোটদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিই। তাদের কচি মুখের মিষ্টি কথাগুলো মন দিয়ে শুনি। অথচ তাদের অধিকাংশ কথাবার্তাই সাধারণত অপ্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। কখনো কখনো তাদের মা-বাবাবার প্রতি সম্মানার্থে এবং তাদের মন জয় করতে তাদের প্রতি একটু বাড়তি মনোযোগ দিয়ে থাকি।

আমার এক বন্ধু তার ছোট ছেলেকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। আমি ছোটদের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতাম এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতাম। একদিন আমার বন্ধুটি তার ছেলেকে নিয়ে একটি বড় মাহফিলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। বন্ধুটি আমাকে সালাম দিয়ে বললো, ‘বন্ধু! বলো তো, তুমি আমার ছেলেতে কী যাদু করেছো! কয়েকদিন আগে ওর শিক্ষক ক্লাসের প্রত্যেককে ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। একজন বললো, আমি ডাক্তার হবো। আরেকজন বললো, আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো। আর আমার ছেলে বললো, আমি হবো মুহাম্মাদ আরিফী!’

লক্ষ করলে আপনি দেখতে পাবেন, ছোটদের সঙ্গে মানুষের আচরণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আপনি দেখবেন, বড় কোনো মজলিসে যখন কেউ সকলের সঙ্গে মোসাফাহা করে, পেছনে পেছনে তার সন্তানও তার দেখাদেখি সকলের সঙ্গে মোসাফাহা করতে থাকে। তখন কেউ কেউ কেবল বাবার সঙ্গেই মোসাফাহা করে। ছোট সন্তানের প্রতি গুরুত্বই দেয় না। কেউ

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতের সামান্য একটু অংশ বাড়িয়ে দিয়ে কোনোমতে হাত মেলায়। কিন্তু কেউ কেউ তার সঙ্গেও হাসিমুখে মোসাফাহা করেন। হৃদ্যতার সঙ্গে হাত নাড়ান। তারপর বলেন, 'এই যে বুদ্ধিমান ছেলে! আহলান! সাহলান! কেমন আছো?' ফলে ছোট ছেলেটির অন্তরে এই লোকটির প্রতি একটি ভিন্ন ধরণের ভালোবাসা তৈরি হয়। কেবল তার অন্তরেই নয়, তার বাবা-মার অন্তরেও লোকটির প্রতি ভালোবাসা জন্মে। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণও ছোটদের সঙ্গে ছিলো কোমল ও অনুকরণীয়।

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.-এর ছোট একটি ভাই ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে রসিকতা করতেন। তাকে ডাকতেন 'আবু ওমায়র' বলে। ছোট আবু ওমায়রের ছোট্ট একটি পাখি ছিলো। পাখিটি নিয়ে আবু ওমায়র সারাদিন খেলা করতো। একদিন হঠাৎ করে পাখিটি মরে গেলো। তার সঙ্গে দেখা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুষ্টুমি করে তাকে বলতেন, 'আবু ওমায়র! কোথায় তোমার নুগায়র?!' আল্লাহর রাসূল 'নুগায়র' বলে সে পাখিটিকে বোঝাতেন। এভাবেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোটদের সঙ্গে সহানুভূতির আচরণ করতেন। তাদের সঙ্গে আনন্দ করতেন। তিনি উম্মে সালামার মেয়ে যায়নাবের সঙ্গেও হাসি-ঠাট্টা করতেন। দুষ্টুমিও করতেন। তাকে বলতেন, 'ও যুওয়াইনিব! যুওয়াইনিব! কী খবর তোমার?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলায় মগ্ন শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করতেন। আনসারদের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে সালাম দিতেন, তাদের মাথায় হাত বোলাতেন। নবীজী যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন, ছোট ছোট বাচ্চারা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। নবীজী তাদেরকে উটের ওপর তুলে নিতেন। তার পাশে তাদেরকে বসিয়ে রাখতেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মুতার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী মদীনার একেবারে কাছে চলে এসেছিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের নিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। ছোট ছোট বাচ্চারাও তাদের ইস্তেকবালের জন্য দৌড়ে এলো। আল্লাহর রাসূল ছোট বাচ্চাদের দেখতেই মুজাহিদদের বললেন, ‘তোমরা এদেরকে তোমাদের উটে উঠিয়ে নাও। আর জাফরের ছেলেকে আমার কাছে দাও।’ জাফরের ছেলে আবদুল্লাহকে রাসূলের কাছে নিয়ে আসা হলো। আল্লাহর রাসূল তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে উঠিয়ে নিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন অযু করছিলেন। পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু মাহমুদ বিন রাবী' আল্লাহর রাসূলের কাছে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে পানি নিতেন। তারপর সেই পানি মাহমুদের চেহারায় ছিটিয়ে দিতেন। এভাবেই রাসূল মাহমুদকে আনন্দ দিচ্ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত মানুষের সঙ্গে হাসি-খুশি থাকতেন। আপন আচরণের মাধ্যমে মানুষের মনে আনন্দ দিতেন। তাঁর উপস্থিতি ও সংস্পর্শ কারো কাছে বিরক্তিকর মনে হতো না।

একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিহাদ কিংবা দূরে কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে একটি উট চাইলো। তিনি তার সঙ্গে একটু রসিকতা করে বললেন, 'আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেবো।'

লোকটি অবাক হয়ে গেলো। সে ছোট একটি উটের ওপর চড়বে কী করে? উটনীর বাচ্চা তো মানুষকে বহন করতেই পারে না। সে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো!'

রাসূল বললেন, 'আরে! উট তো উটনীর গর্ভেই জন্ম নেয়!' অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রাপ্তবয়স্ক উটই দেবো। কিন্তু সেটি তো অবশ্যই কোনো উটনীর বাচ্চাই হবে।

একদিন আল্লাহর রাসূল রসিকতা করে হযরত আনাসকে বললেন, 'এই যে দু'কানওয়ালা!'

আরেকদিন জনৈক মহিলা আল্লাহর রাসূলের কাছে নিজ স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমার স্বামী কি সেই লোকটি, যার চোখ সাদা?!'

আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মহিলা ভয় পেয়ে গেলো। সে ভাবলো, তার স্বামী হয়তো অন্ধ হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেছেন, 'দুঃখ-বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে তার দুচোখ সাদা হয়ে গেছে।' অর্থাৎ তার দুচোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাই সে ভয়ে অস্থির হয়ে দ্রুত তার স্বামীর কাছে ফিরে এলো এবং ভালো করে তার চোখ দেখতে লাগলো! স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার?'

স্ত্রী বললো, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমার চোখ নাকি সাদা হয়ে গেছে!' তখন স্বামী বললো, 'আরে! আল্লাহর রাসূল কি বলেননি যে, চোখের সাদা অংশ কালো অংশের চেয়ে বেশি?!' অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের চোখের কিছু অংশ কালো, কিছু অংশ সাদা। তবে সাদা অংশই বেশি থাকবে। এটাই স্বাভাবিক।

রাসূলের সঙ্গে কেউ রসিকতা করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, মুচকি হেসে আনন্দে শরীক হতেন। প্রদত্ত খোরপোশষের চেয়ে অধিক দাবি করায় একদিন রাসূল আপন স্ত্রীগণের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। এমন সময় হযরত ওমর রাযি. উপস্থিত হলেন।

ওমর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কোরাইশ বংশের লোক। আমাদের স্ত্রীরা সবসময় আমাদের বশে থাকতো। আমাদের কথামত চলতো। কেউ অতিরিক্ত খোরপোশষ চাইলে আমরা তার ঘাড়ে ভালো মত এক চড় বসিয়ে দিতাম!'

‘মদীনায় এসে দেখতে পেলাম, এখানে পুরুষরাই বরং মহিলাদের কথামত চলে। তাদের মহিলাদের দেখাদেখি আমাদের মহিলারাও এমন হয়ে গেলো। তারাও এখন আমাদের উপর সরদারী করতে শুরু করেছে।’

ওমরের কথা শুনে আল্লাহর রাসূল হেসে ফেললেন। ওমর আরো অনেক কথা বললেন। রাসূলও তার কথার সঙ্গে হাসতে লাগলেন। এভাবে রাসূলের রাগও কমে এলো।

আপনি অনেক হাদীসে পড়েছেন, আল্লাহর রাসূল এত বেশি হেসেছেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেছে। বোঝা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের সঙ্গে হাসি-খুশি থাকতেন। আচরণ ও উচ্চারণে মজলিসের সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে যেতেন।

আমরাও যদি সবার সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারি তাহলে আমরাও বাস্তবেই জীবনের স্বাদ অনুভব করতে পারবো।

*একটি চিন্তা... শিশুদের হৃদয় যেন নরম কাদামাটি। আমাদের আচরণ ও উচ্চারণের ধরণেই গড়ে উঠবে তাদের আচরণ ও উচ্চারণ, মন ও মনন।*

# ১২. অধীনস্থদের সঙ্গে আপনি যেমন হবেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসদের সঙ্গেও সুন্দর ব্যবহার করতেন। তাদের হৃদয় জয় করার জন্য উপযুক্ত আচরণ করতেন। চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর কোরাইশরা রাসূলকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগলো। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে গেলেন। রাসূলের আশা ছিলো, সাকীফ গোত্র থেকে তিনি কিছু সাহায্য পাবেন। আল্লাহ তাকে যে দ্বীন দান করেছেন তারা তা গ্রহণ করবে। তাই তিনি তায়েফ রওয়ানা করলেন।

তায়েফে পৌঁছে তিনি সেখানকার বড় বড় তিনজন নেতার কাছে গেলেন। তারা তিন ভাই এবং তায়েফের সবচে গণ্যমান্য ব্যক্তি। এক ভাইয়ের নাম আবদে ইয়ালীল, অন্যজনের নাম মাসুদ, আর তৃতীয়জনের নাম হাবীব। তারা তিনজনই আমর বিন ওমায়রের ছেলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানালেন। আর কওমের যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা বড় নিকৃষ্ট ভাষায় রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করলো।

একজন বললো, 'আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কাবার গিলাফ ছিঁড়ে দেখাও!'

অন্যজন বললো, ‘আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া নবী বানানোর মত আর কাউকে পাননি?’

তৃতীয়জন দার্শনিককের ভঙ্গিতে বললো, ‘আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না। কারণ দাবি মত তুমি যদি সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকো তাহলে তোমার কথার জবাব দেয়াটা আমার জন্য বিপদজনক! আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার কোনো প্রয়োজনই নেই।’ ^১[এ প্রবাদটি সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেসব ক্ষেত্রে বক্তা শ্রোতার বক্তব্যের সত্য হওয়াকে অসম্ভব মনে করছে। তাই কৌশলে তার উত্তর দিতে চাচ্ছে। তাই বললো, তুমি যদি সত্য বলে থাকো তাহলে কাবার গিলাফ ছিঁড়ে দেখাও। আর এটা এমন কাজ যেটা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ যখনই যে কাবার ওপর আক্রমণ করতে চেয়েছে সেই ধ্বংস হয়েছে। তাই সে বলছে, তুমি যদি সত্য নবী হও তাহলে কাবার গিলাফ ফেঁড়ে দেখাও। কারণ তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাকলে কাবার গিলাফ ছিঁড়ে ফেললেও আল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না।]

তাদের এই অশোভনীয় উত্তর শুনে রাসূল তাদের কাছ থেকে উঠে চলে এলেন। তিনি সাকীফ গোত্রের কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু পাওয়ার আশাও ছেড়ে দিলেন। তবে তিনি আশঙ্কা করছিলেন, তায়েফবাসীদের প্রত্যাখানের সংবাদ জানতে পারলে কোরাইশরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে, আরো

বেশি নির্দয় আচরণ করবে। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছো তা কাউকে জানিও না।’

কিন্তু তারা তাও মানলো না। উল্টো নিজেদের কিছু ক্রীতদাস ও নির্বোধ লোককে রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা তাঁকে অবিরাম গালি দিয়ে চললো, চিৎকার করে করে তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগলো। তাদের এই উপহাস এবং চেঁচামেচিতে রাসূলের আশপাশে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে গেলো।

এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে করতে তারা তাঁকে রাবীয়া-পুত্র ওতবা ও শায়বার প্রাচীরঘেরা একটি বাগান পর্যন্ত নিয়ে গেলো। এরপর পিছু নেয়া সাকীফ গোত্রের নির্বোধ লোকগুলো চলে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আঙুর গাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। ওতবা ও শায়বা তখন বাগানেই ছিলো।

ওতবা ও শায়বা অনেকক্ষণ ধরে রাসূলকে দেখছিলো। তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি যে নির্দয় ও নির্মম আচরণের শিকার হয়েছিলেন তাও তারা লক্ষ করেছিলো। তাই তাদের অন্তরে রাসূলের প্রতি দয়ার উদ্রেক হলো।

তারা তাদের এক খৃস্টান গোলাম আদাসকে ডেকে বললো, ‘গাছ থেকে এক থোকা আঙুর পেড়ে প্লেটে করে নিয়ে যাও এবং গাছের নীচে হেলান দিয়ে বসে থাকা ঐ লোকটিকে দিয়ে এসো।’

আদাস তাই করলো। আঙুর নিয়ে সে আল্লাহর রাসূলের সামনে রাখলো এবং বললো, ‘নিন, এখান থেকে খান।’

আল্লাহর রাসূল হাত বাড়ালেন। এরপর 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে শুরু করলেন। আদাস বললো, 'আল্লাহর শপথ! আপনি যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন তা তো এ এলাকার কেউ বলে না!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আদাস! তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার ধর্ম কী?' সে বললো, 'আমি খৃস্টধর্মের অনুসারী। আমার বাড়ি নীনওয়ায়।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর প্রিয় বান্দা ইউনুস বিন মাতা-এর এলাকার লোক তুমি?' আদাস বললো, 'ইউনুস ইবনে মাতা কে, আপনি তা জানেন?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন। আমিও নবী।'

এ কথা শুনে আদাস রাসূলের কপালে ও হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগলো। ওতবা এবং শায়বা এ দৃশ্য দেখে একে অপরকে বলতে লাগলো, 'মুহাম্মাদ তোমার গোলামকেও বিগড়িয়ে ফেললো!'

আদাস যখন তার মালিকের কাছে ফিরে এলো, তার চেহারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন ও কথোপকথনের বরকতময় নূর উদ্ভাসিত হচ্ছিলো। তার মালিক তাকে বললো, 'কী ব্যাপার, আদাস! তুমি লোকটির কপালে ও হাতে-পায়ে চুমু খাচ্ছিলে কেন?'

আদাস বললো, 'মনিব আমার! পৃথিবীতে এই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন বিষয়ে অবগত করেছেন, যা নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না।' এ কথা শুনে তার মনিব বললো, 'ধ্বংস হও

আদাস! এ কেমন কথা বললে তুমি! সাবধান, সে যেন তোমাকে তোমার ধর্ম হতে বিচ্যুত করতে না পারে। তোমার ধর্ম তো তার ধর্ম থেকে অনেক ভালো।'

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে আমরা কি একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না? শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আমাদের আচরণ হবে সুন্দর থেকে সুন্দরতম, এই সিদ্ধান্ত কি আমরা নিতে পারি না?

*এক ঝলক... অর্থ-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র, পেশা-পদবীর ভিন্নতার প্রতি লক্ষ না করে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একজন মানুষ হিসেবেই আচরণ করুন।*

# ১৩. বিরোধীদের সঙ্গে আপনি যেমন হবেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের সঙ্গেও ইনসাফের আচরণ করতেন। দাওয়াত ও ইসলাহের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও কটু কথা, নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করতেন। তাদের সব ধরণের মন্দ আচরণকে তিনি উপেক্ষা করে চলতেন। আর এমন হবেই না বা কেন? স্বয়ং আল্লাহ যে বলেছেন, 'আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'

শুধু মুমিনদের জন্য? না, বরং তিনি 'রাহমাতুল লিল আলামীন', পুরো জগতের জন্য রহমত। ইহুদিদের অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। তারা আল্লাহর রাসূলের নিন্দা করছে, তাঁর সঙ্গে শত্রুতার আচরণ করছে। কিন্তু তবু রাসূল তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন, তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করেন।

আয়েশা রাযি. বলেন, ইহুদিরা একদিন আল্লাহর রাসূলের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন তারা বললো 'আসসা-মু আলাইকুম'। (অর্থাৎ 'আপনার মৃত্যু হোক!) আল্লাহর রাসূল তখন কী করলেন! একটুও ক্রোধান্বিত না হয়ে শান্ত ভাষায় বললেন, 'ওয়া আলাইকুম'। কিন্তু আয়েশা রাযি. তাদের কথা শুনে ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আসসা-মু আলাইকুম (তোমাদের বরং মৃত্যু হোক), আল্লাহ তোমাদের অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের প্রতি ক্রোধের আচরণ করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আয়েশা! শান্ত হও। একটু ধৈর্য ধরো। সবার সঙ্গে নরম ও কোমল আচরণ করতে হবে। কঠোরতা ও নিন্দনীয় আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।’ হযরত আয়েশা বললেন, ‘আপনি শোনেননি, তারা কী বলেছে?’ রাসূল বললেন, ‘তাদের কথার উত্তরে আমি কী বলেছি—তা কি তুমি শোনোনি? আমি তাদের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি। (অর্থাৎ তোমাদের জন্য সে দোয়াই কবুল হোক, যা তোমরা আমার জন্য করেছো।) আমার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন, আর তাদের দোয়া কবুল হবে না। কটু কথার জবাবে কটু কথা বলার কী প্রয়োজন আছে? আল্লাহ কি বলেননি, “আপনি মানুষকে সুন্দর ও মার্জিত কথা বলুন?”’

একদিনের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ জিহাদ থেকে ফিরছিলেন। ফেরার পথে তারা গাছ-গাছালিতে পূর্ণ একটি উপত্যকায় অবতরণ করলেন। সাহাবীগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একটি গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজের তরবারি গাছটির ডালের সঙ্গে বেঁধে গাছের নীচে চাদর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

জনৈক মুশরিক এতক্ষণ মুসলিম বাহিনীকে অনুসরণ করছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একাকী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঘুমাতে দেখে সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো এবং তরবারিটি গাছের ডাল থেকে নিয়ে

নিলো। এরপর সে চিৎকার করে বললো, ‘মুহাম্মাদ! আজ তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?’

আল্লাহর রাসূল জাগ্রত হলেন। শিয়রে শত্রু দণ্ডায়মান। হাতে উদ্যত তরবারি। তরবারির ফলায় যেন মৃত্যু চমকাচ্ছে। আল্লাহর রাসূল একাকী, নিরস্ত্র। শরীরে কোনো বর্ম নেই, পরনে কেবল একটি কাপড়। সঙ্গী-সাথীরা সকলে দূরে, বিক্ষিপ্ত, ঘুমে নিমগ্ন। মুশরিক ব্যক্তিটি জয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে শক্তির উন্মাদনায় বারবার বলছিলো, ‘বলো, আজ তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?’

কিন্তু এমন সঙ্গীন ও নাযুক পরিস্থিতিতেও আল্লাহর রাসূল শান্ত-প্রশান্ত, অটল-অবিচল। দৃঢ় আস্থার সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহ! আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।’ আল্লাহর রাসূলের স্পষ্ট উচ্চারণে তার দেহ-মনে কম্পন সৃষ্টি হলো। হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং তরবারিটি হাতে তুলে নিলেন। এরপর বললেন, ‘এখন বলো, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?’ এ কথা শুনতেই লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো আর আল্লাহর রাসূলের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। মিনতির স্বরে সে বললো, ‘আপনার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর মত কেউ নেই। আপনি তো সদাচরণকারী, তরবারি হাতেও সদাচরণকারী। আমার প্রতি দয়া করুন।’

নবীজী বললেন, ‘তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে?’ সে বললো, ‘না। অবশ্য যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সহায়তা করবো না।’ আল্লাহর রাসূল তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সর্বোত্তম আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। লোকটি ছিলো গোত্রের প্রধান। নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে সে গোত্রের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালো এবং তার আহ্বানে পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে গেলো (সুবহানাল্লাহ)।

হ্যাঁ, এভাবে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আপনিও পারেন মানুষের হৃদয় জয় করতে, চরম শত্রুকেও বশে আনতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রগুণের অধিকারী। চরিত্রগুণেই তিনি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন, হেদায়াতের দিশা দিয়েছেন আর তাদের হৃদয় থেকে কুফরীর আবিলতা দূর করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, কুরাইশের লোকেরা তাঁর মোকাবেলা করতে শুরু করলো। এজন্য তারা সব ধরণের পন্থা অবলম্বন করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে কীভাবে প্রতিরোধ করা হবে এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের সঙ্গে কী ধরণের আচরণ করা হবে তা নিয়ে তারা বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করলো।

তাদের একজন বললো, ‘তোমরা যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজনকে খুঁজে বের করো। তারপর তাকে ঐ লোকের কাছে পাঠাও যে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি

করেছে, আর আমাদের ধর্মের নিন্দা করে চলেছে। সে তার সঙ্গে কথা বলুক এবং দেখুক, লোকটি কী বলে।' সকলে বললো, 'আমরা তো এক্ষেত্রে ওতবা বিন রাবিয়ার চেয়ে অধিক যোগ্য আর কাউকে দেখছি না।' তখন সকলে মিলে ওতবাকে বললো, 'ওতবা! তুমিই তাহলে যাও। দেখো, সে কী বলে।'

ওতবা ছিলো ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ একজন নেতা। সে বললো, 'তোমরা আসলে তার ব্যাপারে কী ভাবছো? তোমরা কি চাচ্ছো যে, আমি তার সঙ্গে কথা বলবো এবং বিভিন্ন ধরণের লোভ দেখিয়ে তাকে বাগে আনতে চেষ্টা করবো?' তারা বললো, 'হ্যাঁ, আমরা তাই চাচ্ছি।'

ওতবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তভাবে বসে ছিলেন। ওতবা রাসূলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমেই বললো, 'মুহাম্মাদ! বলো তো দেখি, তুমি উত্তম না তোমার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম?' আল্লাহর রাসূল চুপ রইলেন। পিতার সম্মান রক্ষার্থে তিনি কোনো কথা বললেন না। ওতবা আবার বললো, 'মুহাম্মাদ! বলো, তুমি উত্তম না আবদুল মুত্তালিব উত্তম?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের সম্মান রক্ষার্থে তিনি কোনো কথা বললেন না।

এরপর ওতবা বললো, 'তুমি যদি মনে করো এরা সবাই তোমার চেয়ে উত্তম তাহলে তো তোমারও তাদের অনুসরণ করা দরকার। তারাও তো মূর্তিরই উপাসনা করতো। অথচ তুমি মূর্তির নিন্দা করতে শুরু করেছো। আর যদি

মনে করো তুমি তাদের চেয়ে উত্তম—তাহলে এ কথাটাই তুমি মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলো। আমরা তোমার মুখ থেকেই এ কথাটা শুনতে চাই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো জবাব দেওয়ার আগেই ওতবা খুব উত্তেজিত হয়ে গেলো। সে বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি কোনো জাতির জন্য তোমার চেয়ে দুর্ভাগা এবং কুলক্ষুণে কাউকে দেখিনি। তুমি আমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করেছো। আমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করেছো। আমাদের ধর্মের নিন্দা করেছো। পুরো আরবে আমাদেরকে অপমানিত করেছো। পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়েছে যে কোরাইশদের মাঝে একজন যাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। কোরাইশদের মাঝে একজন গণকের আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের এ অবস্থার চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ হলো, একদিন আমরা সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো এবং লড়াই করতে করতে একে একে সবাই নিঃশেষ হয়ে যাবো।'

কথাগুলো বলতে বলতে ওতবা বেশ ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিলো। তার চেহারার রূপ বদলে গিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল শান্ত-সমাহিত, নীরবে সব কথা শুনলেন। এরপর ওতবা একে একে রাসূলের সামনে বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করতে লাগলো। উদ্দেশ্য, এসব লোভনীয় প্রস্তাব শুনে আল্লাহর রাসূল দ্বীনের দাওয়াত ছেড়ে দেবেন। সে বললো, 'মুহাম্মাদ! তুমি যা কিছু করেছো, এসব যদি সম্পদ অর্জনের জন্য হয় তাহলে শোনো, আমরা তোমাকে এত সম্পদ সংগ্রহ করে দেবো যে, তুমি হবে কুরাইশের মাঝে সবচে বড় ধনী।'

'তোমার যদি নেতৃত্বের বাসনা থাকে, তাও বলো। আমরা তোমাকে পুরো আরবের কর্তৃত্ব দিয়ে দেবো। তুমিই হবে পুরো আরবের একচ্ছত্র অধিপতি।' 'আর এ সবকিছুই যদি হয় অপরূপা সুন্দরী কোনো নারীকে পাওয়ার জন্য তাহলে তাও বলো। কোরাইশদের যে মহিলাকেই তুমি চাও তাকেই পাবে, আমরা তোমাকে প্রয়োজনে দশটি বিয়ে করিয়ে দেবো!'

'তুমি যে আচরণ করছো তা যদি জ্বীন বা ক্ষতিকর কোনো কিছুর প্রভাবে হয়ে থাকে, যা তুমি নিজ থেকে দূর করতে পারছো না তাহলে তাও বলো। আমরা তোমার জন্য ডাক্তার খুঁজে আনি এবং তোমার চিকিৎসা করি। এজন্য যত অর্থের প্রয়োজন, আমরা সব ব্যবস্থা করবো। অনেক সময় দুষ্ট জ্বীন মানুষের পেছনে লাগে। তবে চিকিৎসা করলে এর সমাধান সম্ভব।'

ওতবা এভাবেই অশালীন ভাষায় তার কথা বলেই চললো এবং একের পর এক রাসূলকে বিভিন্ন ধরণের লোভ দেখাতে লাগলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তভাবে তার কথা শুনছিলেন। সে আল্লাহর রাসূলকে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব পেশ করে প্ররোচিত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তভাবে সব কিছু শুনলেন। রাজত্ব-নেতৃত্ব, অর্থ-সম্পদ, সুন্দরী নারী, পাগলামির চিকিৎসা—সব ধরণের লোভনীয় প্রস্তাব একসময় শেষ হলো। দীর্ঘসময় কথা বলে একসময় ওতবা থামলো। এবার সে উত্তরের অপেক্ষায় আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে মাথা উঁচু করে তাকালেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'ওতবা! তোমার কথা শেষ হয়েছে?' ওতবা সত্যবাদী-

বিশ্বস্ত মহানবীর এই শান্ত-সমাহিত ভাব দেখে মোটেও অবাক হলো না। শুধু বললো, 'হ্যাঁ'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এবার তাহলে আমার কথা শোনো।' সে বললো, 'ঠিক আছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুরু করলেন। পাঠ করতে লাগলেন কোরআনে কারীম হতে:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন। ওতবা নিবিষ্ট মনে শুনছে। একসময় ওতবা যমীনে বসে পড়লো। তার শরীর নড়ে উঠলো। সে পেছনে হাত নিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে শুনতে লাগলো রাসূলের তেলাওয়াত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেই চলেছেন। এভাবে তেলাওয়াত করতে করতে তিনি পৌঁছুলেন এ আয়াতে:
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
আয়ে ﴿١٣﴾ [সূরা ফুসসিলাত]
অর্থ: তারা যদি আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদেরকে বজ্রপাতের ভীতি প্রদর্শন করছি, যেমনটি আপতিত হয়েছিলো আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ওপর।

কঠিন আযাবের এ সতর্কবাণী শুনে ওতবা নড়ে-চড়ে বসলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের ওপর হাত রাখলো, যেন তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি তেলাওয়াত করেই চললেন। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি সেজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং সেজদা করলেন। সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে তিনি ওতবার দিকে

তাকালেন। বললেন, 'ওতবা! তুমি কি এতক্ষণ আমার তেলাওয়াত শুনেছো?' সে বললো, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'এই তোমার প্রশ্নের উত্তর।'

ওতবা উঠে তার সঙ্গীদের কাছে চলে গেলো। তারাও বড় আগ্রহের সঙ্গে তার আগমনের অপেক্ষা করছিলো। ওতবা তাদের কাছে পৌঁছতেই একজন বলে উঠলো, 'আল্লাহর কসম! ওতবা তো আগের মত নেই। তার তো কিছু একটা হয়েছে। তার মাঝে অবশ্যই এক ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে।' ওতবা কাছে এসে বসলো। তারা বললো, 'কী ব্যাপার! কী সংবাদ নিয়ে এলে?'

ওতবা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদের কাছে এমন কিছু শুনেছি, যা জীবনে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এগুলো কবিতা বা যাদু কিছুই নয়। এগুলো গণকবিদ্যাও নয়। হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা আমার কথা মানো। এই লোক যা করছে, তাকে তা করতে দাও। সে যা বলছে, তা অবশ্যই বড় কোনো সংবাদ হবে। হে আমার কওম! এটাই হল বাস্তবতা।'

'সে আমার সামনে বেশ কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলো। সে পড়লো: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حم ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٤﴾
[সূরা ফুসসিলাত]

একপর্যায়ে পড়লো:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
আয়ে ১৩

তখন আমি তার মুখ চেপে ধরলাম এবং আত্মীয়তার শপথ দিয়ে তাকে সামনে তেলাওয়াত বন্ধ করতে বললাম। আর তোমরা তো জানো, মুহাম্মাদ যখন কিছু বলে ফেলে, তার ব্যতিক্রম কখনো হয় না। তাই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, সে যদি এ কথা বলে তাহলে তো তোমাদের ওপর আযাব নেমে আসবে।'

এরপর ওতবা একটু সময় চুপ থাকলো। সে ভাবতে লাগলো। পাশের লোকেরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওতবার কথা শুনে তারা হতবাক। ওতবা এ কী বলছে! একটু পরে সে বললো, 'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কথায় এক ধরণের মিষ্টতা আছে। তার কথায় এক ধরণের সৌন্দর্যও আছে। তার কথার উপমা হতে পারে এমন একটি গাছ, যার শেকড়ে সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকে। শাখাগুলো ফলে-ফুলে পূর্ণ থাকে। মুহাম্মাদের কথাও তেমনই। সেটা মেনে নিলে জীবন কল্যাণ ও মঙ্গলের ফলেফুলে পূর্ণ থাকে। আর তার সঙ্গে রয়েছে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির পর্যাপ্ত পানি। কোনোভাবেই তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সে-ই সব বিষয়ে বিজয়ী হয়। সে তার বিপক্ষে থাকা সব কিছুকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। আর সে যা বলছে, কোনো মানুষ তা বলতে পারে না।'

তারা বললো, 'ওতবা! তুমি যা শুনেছো, তা তো কবিতা।' ওতবা বললো, 'আল্লাহর কসম! তোমরা এখানে যারা আছো, তাদের কেউ আমার চেয়ে

কবিতা সম্বন্ধে ভালো জানো না। কবিতার ছন্দমিল এবং পংক্তির ব্যাপারে তোমাদের মাঝে আমার চেয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কেউ নেই। এমনকি জ্বীনদের কবিতা ও কবিতার পংক্তিমালার ব্যাপারেও আমার চেয়ে অধিক অবগত তোমাদের মাঝে কেউ নেই। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ যা বলেছে সেগুলো এর কোনোটির সঙ্গেই মেলে না।’

ওতবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এই মনোভাব নিয়ে তাদের সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডা করেই চললো। ওতবা ইসলাম গ্রহণ করেনি ঠিক, তবে ইসলামের প্রতি তার অন্তরে এক ধরণের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিলো। ইসলামের প্রতি সে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছিলো।

প্রিয় পাঠক! আবারও একটু ভাবুন। এই ছিলো উত্তম ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণের এবং সঠিক কথনদক্ষতার প্রভাব। অথচ ওতবা ছিলো ইসলাম ও ইসলামের নবীর চরম দুশমন।

আরেক দিনের ঘটনা। কুরাইশের লোকেরা একত্র হয়ে হুসাইন বিন মুনযির খোযায়ীকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠালো। সে ছিলো প্রসিদ্ধ ও মহান সাহাবী ইমরান বিন হুসাইনের পিতা। আবু ইমরান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। চারপাশে সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন। আবু ইমরান আল্লাহর রাসূলকে সে কথাই বললো, যা কোরাইশরা সবসময় বলে থাকে, ‘তুমি আমাদের পারস্পরিক ঐক্য নষ্ট করেছো। আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ পর সে তার কথা শেষ করলো।

রাসূল নরম ভাষায় বললেন, ‘আবু ইমরান! আপনার কথা শেষ হয়েছে?’ সে বললো, ‘হ্যাঁ’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এবার তাহলে আমি যা জিজ্ঞেস করি, তার উত্তর দিন।’ আবু ইমরান বললো, ‘ঠিক আছে, বলুন।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আপনি প্রতিদিন কতজন মাবূদের ইবাদত করেন?’ ‘সাতজনের; ছয়জন যমীনে আছেন, আর একজন আসমানে’! ‘আচ্ছা, এদের মধ্যে কাকে ভয় করেন এবং কার কাছে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন? সবার কাছে, না একজনের কাছে?’ ‘না, যিনি আসমানে আছেন কেবল তাঁর কাছে!’

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হুসাইন! আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে আমি আপনাকে এমন দু'টি বাক্য শিক্ষা দিতাম, যা সবসময় আপনার জন্য কল্যাণকর হতো।’ আল্লাহর রাসূলের এই শান্ত, কোমল ও সুন্দর ভাষার কথা শুনে হুসাইন সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সেই বাক্য দু'টি শিক্ষা দিন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি সবসময় বলবেন: اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৎ পথে চলার বুঝ দান করুন। আপনি আমাকে আমার মাঝের সব ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।

আহ! কী চমৎকার ছিলো আল্লাহর রাসূলের আচরণ! মানুষের অন্তরে কত গভীর প্রভাব ছিলো এর! কাফিরদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই সবচে কার্যকর।

জনৈক যুবক পড়াশোনা করতে জার্মানীতে গিয়েছিলো। সেখানে সে একটি ফ্লাটে ভাড়ায় থাকতো। তার সামনের ফ্লাটেই থাকতো একজন জার্মান যুবক। দু'জনের মাঝে তেমন সম্পর্ক ছিলো না। প্রতিবেশী, ব্যাস, এতটুকুই। জার্মান যুবকটি একদিন কোথাও সফরে গেলো। হকার এসে প্রতিদিন তার দরজার সামনে পত্রিকা দিয়ে যেতো। প্রতিবেশী যুবক একদিন দেখলো, তার সামনের ফ্লাটের দরজার সামনে অনেক পত্রিকা জমা হয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারলো, তার প্রতিবেশী কোথাও সফরে গিয়েছে। তখন সে পত্রিকাগুলো একত্র করলো এবং সেগুলো নির্দিষ্ট একটি ড্রয়ারে সংরক্ষণ করে রাখলো। প্রতিদিন সে পত্রিকা সংগ্রহ করে সেগুলো বিন্যস্ত করে রেখে দিতো।

দু' তিন মাস পর তার প্রতিবেশী জার্মান যুবকটি ফিরে এলো। সে গিয়ে তাকে সালাম দিলো এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করায় তাকে স্বাগত জানালো। এরপর তাকে পত্রিকাগুলো দিয়ে বললো, 'আমার মনে হলো— আপনি হয়তো কোনো প্রবন্ধ নিয়মিত পড়ার জন্য অথবা পত্রিকার কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পত্রিকা সংগ্রহ করে থাকেন। আপনার প্রবন্ধপাঠ বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ যেন না ছুটে যায় তাই আমি এগুলো সংরক্ষণ করে সুবিন্যস্ত করে রেখেছি।'

তার এ কাজ দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি এর জন্য কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাচ্ছেন?'

'না, না। কোনো বিনিময়ের জন্য আমি এ কাজ করিনি। আমাদের ধর্মই আমাদেরকে প্রতিবেশীর সঙ্গে এমন আচরণ করার শিক্ষা দেয়। আপনি তো আমার প্রতিবেশী। তাই আপনার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।'

এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে তার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে যেতে লাগলো। ফলে একসময় সেই জার্মান যুবক ইসলাম গ্রহণ করলো।

প্রিয় পাঠক! এটাই জীবনের উপভোগ্য বিষয়। আপনার আচরণ সুন্দর করুন। আপনার জীবন হবে উপভোগের জীবন। ডানদিকের শূন্যের যেমন মূল্য আছে, তেমনি আপনার জীবনেরও মূল্য আছে। আপনার প্রতিটি কাজের আছে বিশেষ মূল্যায়ন। আপনি তো সব কাজই আল্লাহর ইবাদত হিসেবে করবেন। এমনকি মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণও হবে আপনার ইবাদতেরই অংশ।

প্রিয় বন্ধু! অমুসলিমদের একটি বড় অংশ কেবল কোনো কোনো মুসলমানদের অনৈতিক আচরণের কারণে ইসলাম হতে দূরে সরে আছে। মুসলমানরা কখনো তাদের অমুসলিম কর্মচারীর ওপর অত্যাচার করে, কখনো বাজারে গিয়ে তাদেরকে ধোকা দেয়, আবার কখনো তাদের কাফির প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। মুসলমানরা যদি তাদের সঙ্গে ইসলামের শিক্ষা দেয়া মাধুর্যপূর্ণ আচরণ করে তাহলে অবশ্যই তারা ঈমানের সুশীতল ছায়াতলে

আশ্রয় নেবে। তাই আসুন, আজ হতে নতুন করে শুরু করি। অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণে-উচ্চারণে ইসলামের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলি।

*আলোর পরশ... উচ্চারণের পূর্বে যার আচরণ ইসলামের পথে আকর্ষণ করে, কথার পূর্বে যার কাজ ইসলামের পথে আহ্বান করে সে-ই সর্বোত্তম দায়ী।*

# ১৪. পশুপাখির প্রতিও সদয় হোন!

সুন্দর ব্যবহার কারো স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হলে তা সাধারণত দূর হয় না। তা তার হৃদয় থেকে মুছে যায় না। তাই আপনি দেখবেন, সর্বদা সবার সঙ্গে সে নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও সহনশীল একজন মানুষ। জীবজন্তু এমনকি জড় বস্তুর সঙ্গেও তার আচরণ হয় শালীন ও কোমল।

আল্লাহর রাসূল একবার সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীর হাতে একটি পাখির বাসা দেখলেন। বাসায় দু'টি ছানা। পাখির ছানাদু'টি তারা ধরে আটকে রেখেছে। এদিকে মা পাখিটা তাদের চারপাশে ওড়াউড়ি করছে আর ডানা ঝাপটাচ্ছে। আল্লাহর রাসূল এ অবস্থা দেখে সাহাবীদেরকে বললেন, 'ছানা দু'টি আটকে রেখে মা পাখিটাকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? এক্ষুণি ছানা দু'টিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও।'

আরেকবার আল্লাহর রাসূল দেখলেন, পিপীলিকার একটি বাসা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 'কে এটি পুড়িয়েছে?' একজন সাহাবী বললেন, 'আমি, আল্লাহর রাসূল!' নবীজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়ার অধিকার কেবল তাঁর, যিনি আগুনের প্রতিপালক। এক আল্লাহ ছাড়া আগুন দিয়ে পোড়ানোর অধিকার কারো নেই।'

আল্লাহর রাসূল ছিলেন উদারতার প্রতীক। নিরীহ প্রাণীকুলের প্রতিও তিনি সীমাহীন উদার ছিলেন। একবার তিনি অযু করছিলেন। এ অবস্থায় একটি বিড়াল এলো। রাসূলের মনে হলো, বিড়ালটির পিপাসা লেগেছে। তিনি

পানির পাত্রটি বিড়ালের সামনে ঝুঁকিয়ে দিলেন। বিড়ালটি পানি পান করলো। অবশিষ্ট পানি দিয়ে নবীজী অযু শেষ করলেন।

আরেকদিনের ঘটনা। নবীজী কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, মাটিতে একটি বকরি শুইয়ে রেখেছে। একদিকে সে বকরিটার ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে, অন্যদিকে যবাই করার জন্য ছুরি ধার দিচ্ছে, আর বকরিটি করুণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এ অবস্থা দেখে নবীজী খুব রাগ করলেন। বললেন, 'তুমি কি বকরিটাকে দু'বার মারতে চাও? শোয়ানোর আগে ছুরিটা ধার করে নিলে না কেন?'

একদিন নবীজী দু'জন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, তারা উভয়ে নিজেদের উটনীর ওপর বসে পরস্পর কথা বলছে। এ অবস্থা দেখে উটনী দু'টির প্রতি নবীজীর খুব মায়া হলো। তাই তিনি পশুকে চেয়ার বানিয়ে বসতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় উটনীর ওপর অবশ্যই আরোহণ করবে। তবে প্রয়োজন শেষ হলে নেমে যাবে। পশুটিকে আরামে ছেড়ে দিবে। আল্লাহর রাসূল পশুর কপালে দাগ দিতেও নিষেধ করেছেন।

নবীজীর একটি উটনী ছিলো। উটনীটির নাম ছিলো 'আযবা'। মুশরিকদের একটি দল একবার মুসলমানদের উটের ওপর হামলা করে বসলো। উটগুলো মদীনার উপকণ্ঠে বিচরণ করছিলো। মুশরিক দল সেগুলো নিয়ে গেলো। নবীজীর উটনীও এর মধ্যে ছিলো। একজন মুসলিম নারীকেও তারা বন্দী করে নিয়ে গেলো।

বন্দিনী মুসলিম নারী এবং উটগুলো নিয়ে তারা পালিয়ে গেলো। পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে থেমে উটগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে তারা একটি ঘরে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে গভীর রাতে বন্দিনী মহিলা পলায়নের প্রস্তুতি নিলেন এবং আরোহণের জন্য একটি উটের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কাছে আসা মাত্রই উটটি জোরে হাঁক দিলো। মহিলা সেখান থেকে সরে গেলেন। এভাবে একে একে তিনি প্রতিটি উটের কাছে গেলেন। কিন্তু সবগুলোই অশান্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আযবা নামক উটনীটির কাছে এসে দেখলেন, সেটি একেবারে নম্র ও শান্ত।

বন্দিনী মহিলা তাতে সওয়ার হয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উটনীও খুব দ্রুত গতিতে ছুটে চললো। বিপদ কেটে মুক্ত হাওয়া গায়ে লাগতেই মহিলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য এই উটনীটি কোরবানি করবো!’

মহিলা মদীনায় পৌঁছালে লোকজন রাসূলের উটনীটি চিনে ফেললো। তাই সকলে উটনী নিয়ে আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো। অপরদিকে মহিলাও উটনী খুঁজতে লাগলেন। সংবাদ পেয়ে তিনিও রাসূলের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলকে জানালেন, তিনি এটাকে কোরবানি করার মান্নত করেছেন।

আল্লাহর রাসূল বললেন, ‘এ কেমন কথা! এ কেমন প্রতিদান! এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিলেন। আর বিনিময়ে এটাকেই তুমি যবাই করতে চাচ্ছো?! কী নিকৃষ্ট প্রতিদান!’ এরপর নবীজী বললেন, ‘আল্লাহর অবাধ্যতা

হয়—এমন মান্নত পুরো করতে নেই। অন্যের সম্পদ সংশ্লিষ্ট মান্নত পূর্ণ করতে নেই।’

প্রিয় পাঠক! তাহলে আপনি কেন আপনার সহজাত দক্ষতাগুলোকে সার্বক্ষণিক গুণে পরিণত করবেন না? নম্রতা ও কোমলতা, ভদ্রতা ও উদারতা, দয়া ও মানবিকতা—এসব সুমহান গুণাবলীকে কেন সব ক্ষেত্রে সবার সঙ্গে প্রয়োগ করবেন না? এগুলোর সৌরভ ছড়িয়ে দিন মানুষের মাঝে, প্রাণীকুল ও জীবজন্তুর মাঝে। এমনকি গাছপালা, তরু-লতা ও জড়বস্তুরও মাঝে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন মসজিদে রাখা একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। একদিন জনৈক আনসারী মহিলা বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমার এক ক্রীতদাস কাঠমিস্ত্রি। অনুমতি হলে তাকে দিয়ে আপনার জন্য একটি মিম্বর বানিয়ে দিতাম।’ নবীজী বললেন, ‘ঠিক আছে, বানিয়ে দাও।’

মহিলা সাহাবী নবীজীর জন্য একটি মিম্বর তৈরি করালেন। পরবর্তী জুমার দিন আল্লাহর রাসূল সেই মিম্বরে আরোহণ করলেন। মিম্বরে বসতেই পুরনো খেজুর কাণ্ডটি ষাঁড়ের ন্যায় আওয়াজ করে উচ্চ স্বরে কেঁদে উঠলো। মনে হচ্ছিলো এখনই তা ফেটে পড়বে। পুরো মসজিদ যেন কেঁপে উঠলো। আল্লাহর রাসূল মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং গাছটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তখন বাচ্চার ন্যায় ক্রন্দনরত খেজুর কাণ্ডটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ধীরে ধীরে শান্ত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যার

হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! যদি আমি গাছটিকে বুকে জড়িয়ে না নিতাম তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত সেটি এভাবে ক্রন্দন করতে থাকতো।'

*ইঙ্গিতে... আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ সৃষ্টিজীবের প্রতি তাঁর অন্যায় আচরণের দ্বার উন্মোচন করে দেয়া নয়।*

# ১৫. মন জয়ের শত পদ্ধতি

প্রত্যেক মানুষই তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত ব্যক্তি অর্থোপার্জন ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন কলা-কৌশলও সে রপ্ত করতে চেষ্টা করে। রেডিও ও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো মানুষের মন কাড়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। নানা ধরণের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে এবং নিত্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা দক্ষতার সঙ্গে এমন এমন নতুন অনুষ্ঠান আবিষ্কার করে, যেগুলোর কারণে মানুষ তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। একই কথা প্রযোজ্য প্রিন্ট মিডিয়া ও বেতারের ক্ষেত্রেও। ঠিক তেমনই পণ্য হালাল হোক বা হারাম, সবাই পণ্যকে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

প্রত্যেকেই চায়, যে সকল দক্ষতা অর্জন করলে তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মক্ষেত্রে তারা উন্নতি করতে পারবে সে সকল দক্ষতা অর্জন করতে এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে। মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা অর্জন করা একটি শাস্ত্র। এর আছে নানা শৈলী, বিভিন্ন পদ্ধতি।

মনে করুন, আপনি একটি মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রায় চল্লিশজন মানুষ আগে থেকেই আছেন। আপনি ঘুরে ঘুরে তাদের সঙ্গে মোসাফাহা করতে লাগলেন।

১. প্রথমে একজনকে সালাম করে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সে নিরাসক্ত ভাব নিয়ে কোনো মতে হাতের একাংশ এগিয়ে দিলো এবং নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো, 'স্বাগতম! স্বাগতম!'

২. আপনি দ্বিতীয়জনের কাছে গেলেন। সে তার পাশের একজনের সঙ্গে কথা বলছিলো। আপনি গিয়ে হঠাৎ তাকে সালাম দিলেন। সেও নিরুত্তাপ কণ্ঠে সালামের জবাব দিলো এবং আপনার দিকে না তাকিয়েই মোসাফাহা করলো।

৩. তৃতীয়জন তার মোবাইলে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলো। আপনি সালাম দেয়ায় সে হাত বাড়িয়ে দিলো। তবে অভ্যর্থনামূলক কিছু বললো না, আপনার প্রতি আগ্রহও দেখালো না।

৪. আর চতুর্থজন আপনাকে আসতে দেখেই সালাম দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। চোখে চোখ পড়তেই হাসিমুখে আপনার সঙ্গে কথা বললো এবং আনন্দ প্রকাশ করলো। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে সে বেশ আনন্দিত, তাও বোঝালো। উষ্ণতার সঙ্গে আপনার সঙ্গে মোসাফাহা করলো এবং আপনার আগমনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অথচ না আপনি তাকে চেনেন, না সে আপনাকে চেনে।

এভাবে আপনি সকলের সঙ্গে সালাম ও সাক্ষাৎ পর্ব শেষ করলেন। আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো, এই চতুর্থ লোকটির প্রতি কি আপনি ভিন্ন রকম আকর্ষণ বোধ করবেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই আপনার মন তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। হয়তো আপনি তা টেরও পাবেন না। বাস্তবতা হলো, আপনি তার নামও জানেন না, সে কোথায় কাজ করে, কী তার

পেশা—কিছুই জানেন না। তা সত্ত্বেও সে কিন্তু আপনার হৃদয়রাজ্য জয় করে নিয়েছে। আর এটা কোনো সম্পদ কিংবা পদের মাধ্যমে হয়নি; হয়নি বংশমর্যাদার কারণে। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে কেবল মানুষের সঙ্গে আচরণদক্ষতায় অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে।

বোঝা গেলো, শক্তি-সম্পদ কিংবা সৌন্দর্য ও পেশার গুণে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। মানুষের হৃদয় তো বরং এর চেয়েও অনেক সহজে জয় করা যায়। কিন্তু এরপরও খুব কম মানুষই অন্যের হৃদয়রাজ্য জয় করে তার হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে পারে।

আমার মনে পড়ে, কলেজে আমার এক ছাত্র মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলো। এতে সে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলো। তার পিতা একজন উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় কলেজে আসতেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আমিও তার সন্তানের চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করতাম। আমি কখনো কখনো তাদের বাড়িতে যেতাম। বাড়িটি দেখতে একটি চমৎকার প্রাসাদের মতো। দেখতাম, তার পিতার কামরায় সবসময় মেহমানদের এত ভিড় যে, সামান্য ফাঁকা জায়গাও নেই। মানুষ যে তাকে এত ভালোবাসে, তা দেখে আমি অবাক হতাম।

তারপর অনেক বছর কেটে গেলো। তিনি তার চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। একদিন তার বাড়িতে গেলাম। সেই ঘরে প্রবেশ করলাম। কামরাটির দিকে তাকালাম। সেখানে পঞ্চাশটির অধিক চেয়ার পড়ে আছে। কিন্তু কামরায় কেউ নেই। বৃদ্ধ একা বসে বসে রিমোট টিপছেন, আর বিভিন্ন

অনুষ্ঠান শুনছেন। আর একজন সেবক মাঝে মাঝে তাকে চা-কফি দিয়ে যাচ্ছে। আমি সেখানে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম।

বের হওয়ার পর আমি ভাবতে লাগলাম, তিনি যখন চাকুরিতে ছিলেন তখন তার কেমন অবস্থা ছিলো আর তার বর্তমান অবস্থা কী? পূর্বে কেন মানুষ তার কাছে আসতো? কেন সবাই তার বাড়িতে ভিড় জমাতো? কেনই বা তারা তাকে ভালোবাসতো? আমি বুঝতে পারলাম, তিনি তার আচরণ-উচ্চারণ এবং সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়রাজ্যকে জয় করতে পারেননি। মানুষ আসতো তার পদ ও পদমর্যাদার কারণে, ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে; ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগুণের কারণে নয়। আজ পদ নেই, তাই ভালোবাসাও নেই। ক্ষমতা নেই, তাই ভিড়ও নেই।

তাই প্রিয় পাঠক! আপনি শিক্ষা নিন তার ঘটনা হতে। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগুণে জয় করুন মানুষের হৃদয়। আপনি মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করুন, যেন তারা আপনার ব্যক্তিত্বকে পছন্দ করে। তারা যেন আপনাকে ভালোবাসে আপনার নম্র আচরণ ও বিনয়ী উচ্চারণ, আপনার মায়াবী চাহনি ও মিষ্টি হাসির কারণে; অন্যের দোষ দেখলেও উপেক্ষা করে চলার দুর্লভ গুণের কারণে এবং অন্যের বিপদে-আপদে স্বতঃস্ফূর্ত পাশে দাঁড়ানোর মত গুণের কারণে। তাদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা যেন আপনার পদমর্যাদা ও ক্ষমতার কারণে না হয়। বরং তা যেন হয় আপনার প্রতি তাদের হৃদয়ের ভালোবাসার কারণে।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানের অর্থ-সম্পদ, খাবার-দাবার সব চাহিদা পূরণ করে, সে হয়তো তাদের উদরতুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে, কিন্তু তাদের মনোতুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। যে তার স্ত্রী-সন্তানকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে, আবার তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে, সে তাদেরকে আর্থিকভাবে সন্তুষ্ট করতে পারলেও তাদের হৃদয়কে বশ করতে পারেনি।

কাজেই মোটেও আশ্চর্য হবেন না যদি আপনি দেখেন, বিপদে পড়ে কোনো যুবক তার বন্ধু, মসজিদের ইমাম কিংবা শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছে কিন্তু নিজের বাবাকে জানায়নি, জানাতে পারেনি। কারণ তার বাবা তার হৃদয়কে জয় করতে পারেনি, ভাঙতে পারেনি তার ও সন্তানের মাঝের অদৃশ্য বাঁধকে। পক্ষান্তরে তার বন্ধু কিংবা শিক্ষক তার হৃদয়কে জয় করতে পেরেছে। তারা হতে পেরেছে তার 'হৃদয়ের' মানুষ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভেবে দেখুন। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন, তারা যখন কোনো মজলিসে উপস্থিত হয় এবং বসার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকে, উপস্থিত সকলের মাঝে অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সবাই তাকে ডাকতে থাকে, সবাই তাকে নিজের পাশে বসতে অনুরোধ করে।

এবার বলুন, এমনটি কেন হয়েছে? কেন তার প্রতি সকলের এত ঝোঁক! আপনাকে হয়তো নৈশভোজের জন্য কোনো বুফেতে দাওয়াত দেয়া হলো। বুফের নিয়ম হলো, প্রত্যেকে নিজ চাহিদা মত ডিশ থেকে নিজ নিজ প্লেটে খাবার নিয়ে নেবে। তারপর ওভাল আকৃতির কোনো একটি টেবিলে বসে

খেতে থাকবে। সেখানে আপনি হয়তো অবশ্যই দেখেছেন যে, কেউ কেউ নিজ প্লেট পূর্ণ করা মাত্রই অনেকে তাকে ইশারা করে বলতে থাকে, ‘এই যে ফাঁকা জায়গা আছে, এখানে বসুন। এই যে ফাঁকা জায়গা আছে বসুন।’ প্রত্যেকেই চায়, সে তার সঙ্গে বসুক। কিন্তু অন্য একজন তার খাবার পূর্ণ করে নিচ্ছে, এদিক সেদিক তাকাচ্ছে, কেউ তাকে ডাকেও না; কেউ তার প্রতি সামান্য পরিমাণ মনোযোগও দেয় না। সে একাকী একটি টেবিলে গিয়ে বসে। কেন প্রথমজনের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ, আর দ্বিতীয়জনের প্রতি কোনো আগ্রহই নেই?

এবার আপনি বলুন, কিছু মানুষ দূরে-কাছে যেখানেই থাকুক, তাদের প্রতি কি আপনি ভিন্ন রকম মনের টান অনুভব করেন না? যেন তাদের হাতে কোনো যাদুর কাঠি আছে, যেটি দিয়ে দূর থেকেও তারা আপনার অন্তরকে আকর্ষণ করে চলেছে। কীভাবে তারা সকলে মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পারলেন? বস্তুত এটা হলো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করার কিছু পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন মানুষ সকলের হৃদয়কে জয় করতে পারে। মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

*সিদ্ধান্ত... অন্যের হৃদয় জয় করার এবং তাদের আন্তরিক ভালোবাসা অর্জনের শক্তি ও দক্ষতা আমাদের জীবনে এনে দিতে পারে শান্তি, প্রশান্তি, আনন্দ ও উপভোগের নবমাত্রা।*

# ১৬. নিয়ত বিশুদ্ধ করুন, কাজ করুন আল্লাহর জন্য

আমি কিছু কিছু মানুষের আচরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করতাম। তাদের সঙ্গে আমি অনেক বছর সময় কাটিয়েছি। কিন্তু কখনো তাদেরকে একটু মুচকি হাসতে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। এমনকি কখনো আমি তাদের ঠোঁটের কোণে সৌজন্যবশত এক চিলতে হাসিও ফুটতে দেখিনি। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় কথাপ্রসঙ্গে একটু হেসেছে, এমনটাও হয়নি। আমার মনে হয়, তারা এভাবেই বড় হয়েছে। এর ব্যতিক্রম কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর আমি লক্ষ করলাম, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে—বরং বলা উচিত নির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে—তাদের আচরণ ভিন্ন। দেখলাম, ধনী ও বড় বড় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে তারা হাসিমুখে কোমল ভাষায় কথা বলে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তারা এসব কিছু করছে কেবল তুচ্ছ স্বার্থের কারণে। আর তাই সুন্দর আচরণের পরকালীন বিরাট প্রতিদান তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

মুমিন ব্যক্তির সদাচরণ ও আচরণদক্ষতার প্রয়োগ তো হবে আল্লাহর জন্য। তাই তা হবে ইবাদত। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে লাভ করবে আজরে আযীম, মহা পুরস্কার। মুমিনের সুন্দর আচরণ ও আচরণদক্ষতার প্রয়োগ হবে না কোনো পদ বা সম্পদের আশায়। হবে না মানুষের প্রশংসা-

প্রত্যাশায়, কিংবা সুন্দরী পাত্রীর পাণি-প্রার্থনায়। মোটকথা, একজন মুমিনের সুন্দর ব্যবহার হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ যেন তাকে ভালোবাসেন, তাকে মানুষের মাঝে প্রিয় করে দেন। আর সদাচরণকে যে ইবাদত মনে করে, ধনী-গরিব, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, সাধারণ পিয়ন—সবার সঙ্গেই সে সুন্দর আচরণ করে।

পথচলার সময় একদিন রাস্তার ঝাড়ুদার আপনার সঙ্গে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো; আর অন্য একদিন আপনি বড় কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেও মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো; উভয়ের প্রতি আপনার মনোভাব, আপনার মনোযোগ, আপনার মুখের হাসি ও চেহারার প্রফুল্লতা কি সমান হয়? আমি জানি না, দু'ক্ষেত্রে আপনার আচরণে কোনো ভিন্নতা থাকে কিনা।

তবে এক্ষেত্রে নববী আখলাক কী ছিলো, তা আমি আপনাদের জানাতে পারি। অন্যের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোযোগ ও কল্যাণকামনা, দয়া ও দোয়া সমান ছিলো। আজ আপনি যাকে তুচ্ছজ্ঞান করছেন, হতে পারে সে আল্লাহর কাছে বড় দামী। হতে পারে—পদ ও পদবীর কারণে যাদের সঙ্গে আপনি মিষ্টি আচরণ করছেন, তাদের হাজারজনের চেয়েও এই সাধারণ মানুষটি আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দের। আপনি জানেন না, আপনার কাছে যিনি অতি তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে হয়তো তাঁর মর্যাদা অত্যুচ্চ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে আমার সবচে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সবচে নিকটভাজন ব্যক্তি হবে সে, যার আখলাক সবচে সুন্দর।’ ^১[সুনানে তিরমিযী: ১৯৪১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসাজ বিন আবদুল কায়স রাযি.কে বলেছিলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন, এমন দু'টি গুণ তোমার মাঝে আছে।’ কী সে গুণ দু'টি? রাতভর নামায ও দিনভর রোযা? আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে আসাজ বিন আবদুল কায়স আনন্দে আপ্লুত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহর রাসূল! কী সে গুণ দু'টি?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘কর্মে ধীরস্থিরতা ও আচরণে সহিষ্ণুতা।’ ^১[সহীহ মুসলিম: ২৪, সুনানে তিরমিযী: ১৯৩৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন সর্বোত্তম পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সর্বোত্তম পুণ্য ও নেক কাজ হলো মানুষের সঙ্গে সদাচরণ ও সুন্দর ব্যবহার করা।’ ^১[সুনানে তিরমিযী: ২৩১১, সহীহ মুসলিম: ৪৬৩২] অন্য একদিন জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কোন আমলের বিনিময়ে মানুষ অধিক জান্নাতে যাবে?’ তিনি বললেন, ‘তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় এবং সদাচরণ ও সুন্দর ব্যবহার দ্বারা।’ ^১[সুনানে তিরমিযী: ১৯২৭, মুসনাদে আহমদ: ৯৩১৯]

তিনি আরো বলেছেন, ‘পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যার আখলাক সুন্দর, আচরণ নম্র ও বিনম্র; যে অন্যের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আচরণ করে, অন্যরাও তার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আচরণ করে। আর তার মাঝে কোনো

কল্যাণ নেই, যার সঙ্গে মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে দ্বিধাবোধ করে এবং সেও অন্যের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।' ^১[সুনানে তিরমিযী: ১০৮২, আল মুজামুস সগীর: ৬০৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় অন্য কোনো আমল সদাচরণের মত ওযনদার হবে না।' ^১[সুনানে তিরমিযী: ১৯২৫] তিনি আরো বলেছেন, 'একজন আবিদ রাত জেগে ইবাদত করে এবং দিনভর রোযা রেখে যে মর্যাদা অর্জন করতে পারে, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একজন মানুষ সে মর্যাদা অর্জন করতে পারে।' ^১[সুনানে তিরমিযী: ১৯২৬, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৫]

সদাচরণ ব্যক্তিকে উভয় জগতে লাভবান করে। উম্মে সালামার সেই ঘটনাটি স্মরণ করুন। একদিন তিনি রাসূলের সঙ্গে বসে ছিলেন। এ সময় পরকাল ও পরকালের নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ হলে তিনি আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়াতে কোনো মহিলার দু'জন স্বামী ছিলো (অর্থাৎ একজনের মৃত্যুর পর সে অন্যজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো)। মৃত্যুর পর তারা তিনজনই জান্নাতবাসী হলো। তাহলে মহিলা কার সঙ্গে থাকবে?'

আল্লাহর রাসূল কী উত্তর দিলেন? যে স্বামী রাত জেগে অধিক ইবাদত করতো, তার সঙ্গে? যে অধিক রোযা রাখতো, তার সঙ্গে থাকবে? ইলম ও জ্ঞানের গভীরতায় যে অগ্রসর ছিলো, তার সঙ্গে? না, আল্লাহর রাসূল এগুলোর কোনোটিই বললেন না। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যার আচরণ ও

ব্যবহার অধিক সুন্দর ছিলো, তার সঙ্গে থাকবে।' এ কথা শুনে উম্মে সালামা খুব অবাক হলেন। নবীজী তাকে অবাক হতে দেখে বললেন, 'উম্মে সালামা! উত্তম ব্যবহার তো দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণের সোপান।'

মোটকথা, সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার উভয় জগতের কল্যাণকে নিশ্চিত করে। পার্থিব জীবনে নিশ্চিত করে মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার আসন। আর পরকালে মহান আল্লাহর অবারিত দান-প্রতিদান। একজন মানুষ যতই নেক আমল করুক, তার আচরণ যদি সুন্দর না হয়, সব আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। একদিন রাসূলের কাছে জনৈক মহিলার আলোচনা করতে গিয়ে বলা হলো, 'সে রোযা রাখে। অনেক অনেক নামায পড়ে। দান-সদকাও অনেক করে। তবে আচরণে-উচ্চারণে সে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, 'সে তো জাহান্নামী।'

প্রশংসিত সকল গুণের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। দয়ায় ও বদান্যতায়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মানব। সততা ও সত্যতায়, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতায় তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। লাজ ও লাজুকতায় তিনি ছিলেন পর্দাবৃত কুমারী নারীর চেয়েও বেশি লাজুক। তাই তো মুমিনদের পূর্বে কাফিররাই, নেককারদের পূর্বে বদকারেরাই অকুণ্ঠ চিত্তে রাসূলের এসব গুণের সাক্ষ্য দিতো।

প্রথম যেদিন রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হলো ওহীয়ে ইলাহী ও খোদায়ী প্রত্যাদেশ, দায়িত্ববোধে বিচলিত নবীজীকে সেদিন হযরত খাদিজা রাযি. বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো বিব্রত ও অপদস্থ করবেন না।' কেন? এ অবিচল বিশ্বাস হযরত খাদিজা কোথায় পেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হযরত খাদিজার যবানিতেই শুনুন। এরপর তিনি বললেন, 'আপনি তো আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। এতিম-অসহায়দের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সর্বদা নিঃস্বদের খোঁজখবর নেন। অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। সত্যের পথে যারা বিপদের সম্মুখীন হয়, তাদের সহায়তা করেন। সদা সত্য বলেন। আমানত রক্ষা করেন।' আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তো রাসূলের স্তুতিতে অবতীর্ণ করেছেন এক শাশ্বত বাণী:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আয়ে ٤ [সূরা কলাম]

অর্থ: নিশ্চয়ই আপনি সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র ছিলো কোরআনের প্রতিচ্ছবি। কোরআন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিলো রাসূলের আচরণে-উচ্চারণে, কর্ম ও চরিত্রে। তিনি পাঠ করেছেন কোরআনের এই আয়াত:

وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আয়ে ١٩٥ [সূরা বাকারা]

অর্থ: তোমরা সদাচরণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের পছন্দ করেন।

আর ভালো ব্যবহার করেছেন সবার সঙ্গে। শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, তুচ্ছ-অত্যুচ্চ সকলের সঙ্গে তিনি করেছেন সর্বোত্তম ব্যবহার।

তিনি শুনেছেন কুদরতি প্রত্যাদেশ:
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
আয়ে ১০৯ [সূরা বাকারা]
অর্থ: তোমরা ক্ষমা করো এবং অন্যের অসদাচরণকে উপেক্ষা করো।
আর তিনি ক্ষমা করেছেন অন্যকে, উপেক্ষা করেছেন সকল অসদাচরণকে।

তিনি তেলাওয়াত করেছেন:
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
আয়ে ৮৩ [সূরা বাকারা]
অর্থ: তোমরা মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলো।
তখন তিনিও সর্বোত্তম ভাষায় মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন।

আল্লাহর রাসূল তো আমাদের সব সময়ের আদর্শ। তাঁর কর্মনীতি তো আমাদের জন্য শাশ্বত কর্মনীতি। সীরাতে নববীর প্রতি একটু লক্ষ করুন। দেখুন, নবীজী মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন। তিনি কীভাবে মানুষের ভুল সংশোধন করতেন। কীভাবে কটূক্তি ও অত্যাচার বরদাশত করতেন। কীভাবে মানুষের শান্তির জন্য নিজের শান্তিকে বিসর্জন দিতেন। কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বান জানাতে কীভাবে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখতেন। সীরাতের পাতা ওল্টান। আজ তিনি একজন অসহায় ব্যক্তির প্রয়োজন পুরো করার জন্য চেষ্টা করছেন। আগামীকাল দুই মুসলমানের

মাঝে সংঘটিত বিবাদের ফায়সালা করছেন। আরেকদিন কাফিরদের দাওয়াত দিচ্ছেন। এভাবেই ধীরে ধীরে জীবনের সোনালী সময় কেটে গেছে। অস্থি-মজ্জা দুর্বল হয়ে পড়েছে। উপস্থিত হয়েছে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত।

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'বার্ধক্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ নামায বসে পড়তেন।' কেন এমন হয়েছিলো? কারণ, উম্মতের কল্যাণ কামনায় অমানুষিক পরিশ্রম, আর এ পথে পাওয়া কষ্ট তাঁকে করে ফেলেছিলো দুর্বল। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—এই হোক জীবনের সাধনা। আর আসলে মানুষ যখন বড় ও মহান হয় তখন তার ইচ্ছা ও কামনাও অনেক বড় হয়। আর তার এই ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে শরীর হয়ে যায় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। মানুষের সঙ্গে সদাচরণে রাসূল এত আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি দোয়ায় বলতেন:
«اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي»
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার বাহ্যিক আকৃতিকে যেমন সুন্দর করেছেন, তেমনই সুন্দর করুন আমার আচরণ ও ব্যবহারকে। [মুসনাদে আহমদ: ৩৬৩২]

তিনি আরো দোয়া করতেন:
«اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ»
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উত্তম আচরণ শিক্ষা দিন। আপনি

ব্যতীত কেউ উত্তম আচরণের পথনির্দেশ করতে পারে না। আমাকে অসদাচরণ হতে দূরে রাখুন। আপনি ব্যতীত কেউ অসদাচরণকে দূর করতে পারে না। [মুসনাদে আহমদ: ৭৬৪]

অতএব, আমরা যদি চাই আমাদের আচরণে অমুসলিমরা অনুধাবন করবে ইসলামের প্রকৃত পরিচয়, মুসলমানরা পাবে সঠিক পথের দিশা, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে আমরা লাভ করবো ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আসন; তাহলে আচরণ ও উচ্চারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করতে হবে নববী আদর্শ।

*ইঙ্গিতে... নিয়তকে শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করুন। তাহলে মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণও ইবাদতে পরিণত হবে। আচরণের বিশুদ্ধতায় আপনি লাভ করবেন তাকাররুবে ইলাহীর নিশ্চয়তা।*

# ১৭. ব্যক্তি বুঝে আচরণ করুন!

স্বভাবগতভাবেই মানুষ কিছু বিষয়ে সকলে একমত হয়, কিছু বিষয়ে হয় না। কিছু জিনিস সবাই পছন্দ করে, দেখলে খুশি হয়, আবার এমনও কিছু জিনিস আছে, যা কেউ পছন্দ করে না। বিপরীতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে রুচি-ভিন্নতা দেখা যায়। বিষয়টি কেউ কেউ পছন্দ করলেও অন্য কারো কারো হয়তো বিষয়টাই পছন্দ হয় না।

মিষ্টি-হাস্যোজ্জ্বল চেহারা সবাই পছন্দ করে, মলিন-ভ্রুকুঞ্চিত মুখাবয়ব কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ঠাট্টা-রসিকতা? কেউ খুব পছন্দ করলেও অনেকের কাছে সেটাই বিরক্তির কারণ। অনেকে এমন আছেন, যারা সবাইকে নিয়ে চলতে ভালোবাসেন, আবার অনেকে সম্পূর্ণ একা থাকতেই পছন্দ করেন। কেউ চায় সারাদিন কথাবার্তা, গল্পগুজবে মুখরতা, আবার কেউ ভালোবাসে নীরবতা-নির্জনতা।

এই স্বভাব-ভিন্নতার কারণে প্রত্যেকেই সাধারণত এমন ব্যক্তির সঙ্গে চলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যার আচরণ তার স্বভাবের অনুকূল। প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষের পারস্পরিক মেলামেশার সময় সকলের স্বভাব অনুকূল হয় না কেন? প্রত্যেকের আচরণ অপরের রুচি বুঝে হয় না কেন? কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি একদিন একটি বাজপাখিকে একটি কাকের পাশে উড়তে দেখলো। পাখির রাজা বাজকে সামান্য একটা কাকের পাশে উড়তে দেখে লোকটি বেশ আশ্চর্য হলো। সে মনে মনে ভাবলো, এদের মাঝে কোনো

বিষয়ে মিল আছে বলেই এরা একত্র হতে পেরেছে। সে পাখি দু'টির প্রতি লক্ষ রাখতে লাগলো। একপর্যায়ে পাখি দু'টি ক্লান্ত হয়ে মাটিতে নেমে এলো। লোকটি কাছে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলো, উভয় পাখিরই এক পা ভাঙা!

আমাদের যেটা লক্ষ রাখতে হবে সেটা হলো—প্রত্যেকের সঙ্গে তার রুচি ও মেজাজের অনুকূল আচরণ করা। কারো পিতা নীরবতা ভালোবাসেন, অধিক কথাবার্তা তাঁর পছন্দ নয়। তাহলে ছেলের উচিত বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা। তাহলে বাবা সন্তুষ্ট হবেন। স্ত্রী যদি বুঝতে পারে, তার স্বামী রসিকতা পছন্দ করে তাহলে সে তার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে, অন্যথায় তা থেকে বিরত থাকবে। সহকর্মী, প্রতিবেশী, ভাই-বোন সবার ক্ষেত্রেই স্বভাব বুঝে ব্যবহার করার এই আচরণদক্ষতার প্রয়োগ জরুরি। মনে রাখতে হবে, সব মানুষের স্বভাব ও রুচি, পছন্দ ও চাহিদা এক নয়। মানুষের স্বভাব-ভিন্নতা যেন রঙ ও বর্ণের চেয়েও বৈচিত্র্যময়।

এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কথা আমার মনে পড়ে। তিনি আমার এক বন্ধুর মা। ছেলেদের মধ্যে একজনের তিনি খুব প্রশংসা করতেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। অন্য ছেলেরাও মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করতো। তবু কেন যেন বৃদ্ধার মন তার ঐ ছেলেটির দিকেই ঝুঁকে ছিলো। আমি রহস্যটা উদ্ঘাটন করতে চাইলাম। সুযোগমত একদিন তার কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম। সে আমাকে বললো, 'আসলে সমস্যা হলো আমার ভাইয়েরা আম্মার রুচি ও মেজাজ বোঝে না। তাই তাদের উপস্থিতি

আম্মার জন্য বিরক্তিকর ও ভারী মনে হয়।’ আমি একটু রসিকতা করে বললাম, ‘আচ্ছা! তাহলে জনাবই কেবল মায়ের রুচি ও মেজাজ অনুধাবন করতে পেরেছেন!’

সে হেসে বললো, ‘জ্বী, হ্যাঁ। আমি রহস্যটা তোমাকে বলছি। মূলত আমার আম্মাও অন্যান্য বৃদ্ধাদের মত মেয়েলি বিষয়ে কথা বলতে ও শুনতে পছন্দ করেন। যেমন ধরো, কার কবে কোথায় বিয়ে হলো? কার তালাক হলো? অমুকের কয় সন্তান? তাদের মধ্যে বড় কে? ওমুক ছেলে তমুক মেয়েকে কবে বিয়ে করেছে? তাদের প্রথম সন্তানের নাম কী? এ জাতীয় আরো অনেক কথা যেগুলো আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করলেও আম্মা বারবার বলে ও শুনে আনন্দ পান। তাঁর কাছে এসব বিষয় ও তথ্য মহামূল্যবান। কারণ এগুলো তো আমরা বই, অডিও টেপ, ইন্টারনেট—কোথাও পাবো না!’

‘আমিও আম্মার কাছে গেলে এসব প্রসঙ্গ তুলি। আম্মা খুশি হয়ে আমার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করেন। তিনি ভাবেন যে, এসব তথ্য তিনিই প্রথম আমাকে সরবরাহ করছেন। গল্প করতে করতে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আমিও তার কাছে বসলেই এ সব প্রসঙ্গ তুলে দিই। তিনিও দীর্ঘ সময় জুড়ে এ সব আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু আমার ভাইয়েরা এসব মেয়েলি আলোচনা শুনে অভ্যস্ত নয়। তারা আম্মার সঙ্গে অন্য সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে যায়। তখন আম্মার আর তা ভালো লাগে না। তাই আম্মা আমাকে পেলেই খুশি হন। এই হলো আমার কৃতিত্ব!’

আপনিও যদি কারো পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন এবং তার স্বভাব ও রুচিবোধ বুঝতে পারেন, আপনার জন্য তার মন জয় করা কোনো ব্যাপারই নয়। মানুষের সঙ্গে নবীজীর আচরণনীতি নিয়ে কেউ চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকের অভিরুচি বিচার করে তার সঙ্গে আচরণ করতেন। এমনকি স্ত্রীগণের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি লক্ষ রাখতেন—কার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করা উপযোগী হবে।

আম্মাজান আয়েশা রাযি. একটু উচ্ছল স্বভাবের ছিলেন বিধায় রাসূল তার সঙ্গে রসিকতা করতেন। এক সফরে আয়েশা রাযি. রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। ফেরার পথে কাফেলা যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছালো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সফরসঙ্গীদের বললেন, ‘তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।’ রাসূলের আদেশে সবাই সামনে এগিয়ে গেলো। রাসূলের পাশে শুধু আয়েশা রাযি. দাঁড়িয়ে আছেন। অল্প বয়সী হওয়ায় তার মধ্যে তারুণ্যের চঞ্চলতা ছিলো। রাসূল মৃদু স্বরে বললেন, ‘আয়েশা! চলো, তোমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে!’ আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দৌড় শুরু করলেন এবং একপর্যায়ে রাসূলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন।

বেশ কিছুকাল পর, আবার এক সফরে তিনি রাসূলের সঙ্গী হলেন। তখন আয়েশা রাযি.-এর বয়সও কিছু বেড়েছে, শরীরও কিছুটা ভারী হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সফরসঙ্গীদের বললেন,

‘তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।’ সবাই সামনে এগিয়ে গেলো। রাসূল আয়েশাকে বললেন, ‘এসো, আজ আবার তোমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা!’ সেদিনের মত আজও আয়েশা দৌড় শুরু করলেন। কিন্তু আজ রাসূল আয়েশাকে পেছনে ফেলে আগে চলে গেলেন এবং রসিকতা করে তার দুই কাঁধের মাঝে টোকা দিয়ে বললেন, ‘আয়েশা! সেদিনের প্রতিশোধ নিলাম আজকের জয়ের মাধ্যমে! আজকের জয় সেদিনের প্রতিশোধ!’

অন্যদিকে খাদিজা রাযি.-এর সঙ্গে রাসূলের আচরণ ছিলো ভিন্ন। কারণ বয়সে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে পনেরো বছরের বড় ছিলেন। সাহাবীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি তাদের স্বভাবের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তাই তো তিনি আবু হোরায়রা রাযি.-এর সঙ্গে সে আচরণ করেননি যে আচরণ খালিদ রাযি.-এর সঙ্গে করেছেন। আবার আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন, তালহা রাযি.-এর সঙ্গে তেমন করেননি। আর ওমর রাযি.-এর সঙ্গে রাসূলের আচরণ ছিলো একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁকে এমন অনেক কাজে সমর্থন করতেন, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করতেন না। এমন অনেক বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করতেন না।

বদরযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তের একটি ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। ইতোমধ্যে জানতে পারলেন, কোরাইশরাও এগিয়ে আসছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কোরাইশদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রণাঙ্গনে

উপস্থিত হবে, অথচ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছে তাদের নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, ‘আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশেম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু কিছু লোক প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে আসতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছে নেই। সুতরাং বনু হাশেমের কেউ তোমাদের সামনে পড়ে গেলে তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আবুল বুখতারী বিন হিশামকে কেউ যদি দেখে তাহলে তাকে যেন হত্যা না করে। আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিবকেও কেউ যেন কতল না করে। কেননা সে একান্ত অনিচ্ছাতেই ময়দানে আসতে বাধ্য হয়েছে।’

মূলত আব্বাস রাযি. পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি যেন কোরাইশদের সঙ্গে থেকে তাদের বিভিন্ন তৎপরতা সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করতে পারেন এ উদ্দেশ্যে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। রাসূল তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিও গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন, আবার কোনো মুসলমান যেন তাকে হত্যা না করে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন।

বদরযুদ্ধ ছিলো মুসলমান ও কোরাইশদের মাঝে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। মুসলমানরা ছিলো অপ্রস্তুত। পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। এদিকে ইসলামের খাতিরে মুসলমানরা হাতিয়ার নিয়ে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে নিজের পিতা, পুত্র কিংবা কোনো আত্মীয়ের। এ ছিলো ঈমানের

এক অগ্নিপরীক্ষা। আর এই চরম মুহূর্তে রাসূল বিশেষ কিছু লোককে হত্যা করতে নিষেধ করছেন।

ওতবা বিন রাবিয়া ছিলো কোরাইশদের অন্যতম নেতা ও বদরযুদ্ধে কাফির বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি। তার পুত্র আবু হুযায়ফা বিন ওতবা রাসূলের সাহাবী। আবু হুযায়ফা রাযি. ধৈর্য হারিয়ে বলে ফেললেন, 'আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও ভাইদেরকে হত্যা করবো আর আব্বাসকে ছেড়ে দেবো! খোদার কসম! আমি যদি তার দেখা পাই, আমার তরবারি তার ভাগ্যের ফায়সালা করবে।'

তাঁর এ কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে তাকালেন। তাঁর চারপাশে তিনশত বীরযোদ্ধা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে ওমরের ওপর পড়লো এবং তিনি আর কারো দিকে না তাকিয়ে ওমরকেই বললেন, 'আবু হাফস! আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে?'

ওমর রাযি. বলেন, 'আল্লাহর কসম! সেদিনই প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আবু হাফস উপনামে সম্বোধন করেন।' হযরত ওমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকারীর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সামান্য ভুলও আত্মঘাতী বিপদ ডেকে আনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ওমর একটি দৃঢ় সমাধানের পথ বেছে নিলেন। তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিন,

আমি তরবারি দিয়ে ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শান্ত করলেন। তিনি জানতেন, ওমরের এ হুঙ্কার পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আবু হুযায়ফা রাযি. সৎ মনের মানুষ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন, ‘সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম তার কারণে আজও নিজেকে নিরাপদ মনে করি না। আর আমি ততদিন ভীতসন্ত্রস্তই থাকবো যতদিন না শাহাদত লাভের মাধ্যমে আমার এ অপরাধের বদলা হয়ে যায়।’ পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

এই হলেন হযরত ওমর রাযি.। রাসূল ভালোভাবেই জানতেন, কোনো ধরণের কাজের দায়িত্ব ওমরের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। বিষয়টি ট্যাক্স উসূল করা, বিবাদমান দু'দলের মাঝে মীমাংসা করা কিংবা কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করার পর্যায়ের ছিলো না। বরং এটি ছিলো তপ্ত রণাঙ্গনের একটি সিদ্ধান্তের বিষয়। এক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির দরকার ছিলো, যে অন্যদের থেকে বেশি প্রভাব ও দৃঢ়তার অধিকারী। এজন্য রাসূল ওমরকেই এ কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন আর তাঁর চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে বলেছিলেন, ‘আবু হাফস! আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে?’

আমরা নবী-জীবনের আরেকটি অধ্যায় লক্ষ করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাযওয়ায়ে খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সামান্য প্রতিরোধের পর খায়বারের ইহুদিরা রাসূলের সঙ্গে সন্ধি করলো এবং রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারে প্রবেশ করলেন। রাসূল শর্তারোপ করলেন, ‘কেউ কোনো সম্পদ, সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা লুকাতে পারবে না। সব কিছু উপস্থিত করতে হবে এবং তার ওপর শরয়ী বিধান কার্যকর করা হবে।’ সঙ্গে সঙ্গে রাসূল এ হুঁশিয়ারি বাক্যও উচ্চারণ করলেন যে, ‘কেউ যদি কিছু লুকিয়ে রাখে তাহলে মুসলমানগণ তার নিরাপত্তার দায়ভার নেবে না এবং সে সন্ধিচুক্তির আওতাভুক্ত হবে না।’

হুয়াই বিন আখতাব ছিলো ইহুদিদের অন্যতম সরদার। নির্বাসিত হয়ে মদীনা থেকে খায়বারে আসার সময় সে সঙ্গে করে সেলাই করা চামড়ায় ভরে স্বর্ণ ও অলঙ্কারাদি নিয়ে এসেছিলো। এসব মাল রেখেই হুয়াই মারা যায়। কিন্তু ইহুদিরা সেগুলো লুকিয়ে রাখলো। হুয়াই এর চাচাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘বনু নযীর থেকে হুয়াই যা নিয়ে এসেছিলো, তা কোথায়?’ হুয়াই এর চাচা বললো, ‘যুদ্ধ ও অন্যান্য খাতে খরচ হয়ে গেছে।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেবে দেখলেন, হুয়াই যে সম্পদ এনেছিলো, তা তো অনেক; অথচ সে মারা গেছে খুব বেশিদিন হয়নি। তাছাড়া ইহুদিরা মদীনা থেকে আসার পর খায়বারে তেমন কোনো যুদ্ধবিগ্রহও হয়নি, যার কারণে এত বিপুল সম্পদ খরচ হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘এটা তো বেশিদিনের কথা নয় আর সম্পদ তো সে তুলনায় প্রচুর।’ হুয়াই এর চাচা জবাব দিলো, ‘মাল-সম্পদ সব শেষ। কিছুই নেই।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বুঝে ফেললেন, লোকটি মিথ্যা বলছে। নবীজী সাহাবীদের দিকে তাকালেন। বহুসংখ্যক সাহাবী সেখানে উপস্থিত। প্রত্যেকেই তাঁর ইঙ্গিতে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রে বেছে নিলেন যুবাইর বিন আওয়ামকে। বললেন, 'যুবাইর! তার মুখ খুলতে একটু শাস্তির প্রয়োজন।' যুবাইর রাযি. সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। যুবাইরকে দেখে বেটা ইহুদি ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, সত্য না বললে অতিসত্বর খুব খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বাঁচার জন্য সে তাড়াতাড়ি বললো, 'হুয়াইকে প্রায়ই দেখতাম, ঐ বিরান বাড়িটির পাশে ঘোরাফেরা করতো।' সে একটি পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো। সাহাবীয়ে কেরাম সেখানে গিয়ে চারপাশে ভালোভাবে তল্লাশি চালালেন। অবশেষে বেরিয়ে এলো হুয়াই এর গুপ্ত সম্পদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইর রাযি.কে এমন ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতেন। ধনু‍ুক তার হাতেই দেয়া দরকার যে এর সঠিক ব্যবহার করতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামও পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতিরই অনুসরণ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত। রোগ-যন্ত্রণায় নামাযে ইমামতি করারও শক্তি নেই। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা আবু বকরকে নামাযের ইমামতি করতে বলো।'

আবু বকর রাযি. একে তো ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, অধিকন্তু তিনি দুনিয়া-আখিরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ সঙ্গী, নবুওয়তপূর্ব-পরবর্তী উভয় যুগের পরম বন্ধু, নবী-পত্নী আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর পিতা। তাই নবীজীর রোগযন্ত্রণা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের অন্তরে পাহাড়সম বেদনা হয়ে চেপে বসেছিলো। তাই নবীজী যখন আবু বকর রাযি.কে ইমামতি করার নির্দেশ পাঠালেন, তখন উপস্থিত সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, 'আবু বকর তো কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে—বিশেষ করে বর্তমান ক্ষেত্রে—আবেগ ও কান্নার কারণে নামায পড়াতে সক্ষম হবেন না।'

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদেশের মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি সুপ্ত ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই আবার আদেশ করলেন, 'তোমরা আবু বকরকে নামাযের ইমামতি করতে বলো।' অবশেষে আবু বকর রাযি. নামায পড়ালেন। স্বভাবগত কোমলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সঠিকভাবেই আপন দায়িত্ব পালন করলেন।

কোমল স্বভাবের হলেও আবু বকর রাযি.-এর প্রভাব ছিলো অসাধারণ। প্রয়োজনে গর্জে ওঠার গুণ তাঁর কোমল স্বভাবে জালাল ও প্রতাপের চাদর জড়িয়ে দিয়েছিলো। তাঁর সারা জীবনের সহযাত্রী হযরত ওমর রাযি. বিষয়টি জানতেন। সেই দৃশ্যটির কথা কল্পনা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের ইন্তেকালের পর খলীফা নির্ধারণের জন্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বনু সাঈদার আঙিনায় সমবেত হয়েছেন। হযরত ওমর রাযি.ও হযরত আবু বকর রাযি.সহ সেখানে উপস্থিত হলেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিতে গিয়ে ওমর রাযি. বলেন, আমরা বনু সাঈদার অঙ্গনে একত্রে উপস্থিত হই। গিয়ে দেখলাম, এক আনসার সাহাবী বক্তব্য দিচ্ছেন। হামদ ও সানা পাঠের পর তিনি বললেন, 'আমরা আল্লাহ তাআলার (দ্বীনের) সাহায্যকারী দল ও ইসলামের অগ্রসেনা। আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা! আপনারা হলেন আমাদেরই শাখাদল। আপনাদের কেউ কেউ আমাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে চায় এবং খেলাফত দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে চায়। ...' তাঁর বক্তব্য শেষ হলে আমি কিছু বলতে মনস্থ করলাম এবং মনে মনে এমন কিছু বক্তব্য সাজিয়ে নিলাম, যা আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিবেশ-উপযোগী মনে হচ্ছিলো। প্রথমে আমি আবু বকর রাযি.কে বিষয়টি জানাতে চাইলাম। আমি তাঁকে কিছুটা উত্তেজিত করতে চাইছিলাম।

প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'ওমর! শান্ত হও।' আমি তাঁকে মনোক্ষুণ্ণ করতে চাইলাম না। এরপর তিনি বক্তব্য রাখলেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানী ও প্রভাবশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহর শপথ! আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যে কথাগুলো বলার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তিনি কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই সে কথাগুলো তো বললেনই, তাঁর চেয়েও উত্তম ও অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী অনেক কথা বললেন।

আবু বকর রাযি. তাঁর বক্তব্যে বললেন, ‘আমার আনসারী ভাইয়েরা! আপনারা যেসব অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন, নিঃসন্দেহে আপনারা তার যোগ্য। তবে আরবরা এ কথা ভালোভাবেই জানে যে, নেতৃত্বের সহজাত গুণ কোরাইশদের মাঝেই আছে। আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বংশধারা ও গোত্র বিবেচনায় কোরাইশরাই অধিক ন্যায়পরায়ণ। আমি তাদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তিকে পেশ করছি। আপনারা তাদের যে কারো হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন।’

এরপর তিনি আমার ও আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর হাত তুলে ধরলেন। আবু বকর রাযি.-এর বক্তব্যের এই অংশটি ছাড়া পুরোটাই আমার ভালো লেগেছিলো। আবু বকর রাযি.-এর বর্তমানে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ অপেক্ষা বিনা অপরাধে শিরোচ্ছেদ হওয়াও যে আমার কাছে অধিক প্রিয়!

সবার নীরবতার মাঝে জনৈক আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমি সঠিক মানদণ্ডের মাধ্যমে ইনসাফপূর্ণ একটি মত পেশ করছি। হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আমাদের মধ্য হতে একজন নেতা নির্ধারিত হোক, তোমাদের মধ্য হতে একজন নেতা নির্ধারিত হোক।’

তাঁর এই মন্তব্যের পর চারদিকে এত বেশি কোলাহল ও চেঁচামেচি শুরু হলো যে, আমি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরার আশঙ্কা করলাম। আমি দ্রুত বললাম, ‘আবু বকর! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন।’ তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। সর্বপ্রথম আমি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এরপর

মুহাজিরগণ সকলে বাইয়াত হলো। তারপর আনসারগণ তাঁর হাতে বাইয়াত হলো।

মোটকথা, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়-দরজা খোলার একটি চাবি আছে। সে চাবি ব্যবহার করে আপনি তার ভালোবাসা অর্জন করতে পারবেন, তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আমরা নিজেদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিষয়টি লক্ষ করে থাকি। আপনি নিশ্চয়ই অনেক সময় আপনার সহকর্মীকে বলতে শুনেছেন, ‘আরে! বসকে কাবু করার চাবি হলো অমুক। কোনো প্রয়োজন পড়লে তার মাধ্যমেই স্যারকে ম্যানেজ করবে। সেই বসকে রাজি করাতে পারবে।’

তাহলে আপনি কেন মানুষের হৃদয়-রাজ্য জয়ের এই গোপন চাবিটি ব্যবহার করছেন না? সমাজে লেজের ভূমিকায় থাকার পরিবর্তে মাথা হয়ে থাকুন। আর দশজনের মত না হয়ে স্বতন্ত্র একজন হোন। মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান প্রত্যেকের হৃদয়ের চাবি খুঁজে বের করুন। কর্মক্ষেত্রেও আপনার বস ও কলিগদের অন্তরে প্রবেশের পথটি বের করে নিন। হৃদয় জয়ের চাবিটি হস্তগত করা গেলে একটি লাভ এও হবে যে, প্রয়োজনে তার মেজাজ বুঝে আমরা তাকে উপযুক্ত পন্থায় সদুপদেশ দিতে পারবো। আর সেও নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করবে। কারণ নিজের ভুল অনুধাবন ও অন্যের পক্ষ থেকে ভুল সংশোধনকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের নীতি ও মেজাজ এক নয়। তাই সংশোধন ও সদুপদেশ তখনই কার্যকর হবে, যখন তা পাত্রের মেজাজ বুঝে হবে।

নবীজীর সীরাত দেখুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের উদ্দেশে কথা বলছিলেন। হঠাৎ অপরিচিত এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। একটু পর সে মজলিসে বসার পরিবর্তে সোজা মসজিদের এক কোণায় চলে গেলো এবং লুঙ্গি নাড়াচাড়া করতে লাগলো! সবাই আঁতকে উঠলো। মসজিদের মধ্যে লোকটা কী করতে যাচ্ছে? সবাই অবাক হয়ে দেখলো, লুঙ্গির অগ্রভাগ উঁচু করে লোকটি নিশ্চিন্তে মসজিদের মধ্যে পেশাব করে দিলো! তাঁকে মসজিদে পেশাব করতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ তার দিকে তেড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল সবাইকে শান্ত করলেন এবং তাদের উত্তেজনা প্রশমিত করলেন। বারবার তিনি বলছিলেন, ‘তাকে বাধা দিও না! তাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করো না! তাকে শেষ করতে দাও!’

সাহাবায়ে কেরাম লোকটির দিকে তাকিয়েছিলেন। আগন্তুক লোকটি হয়তো সাহাবীদের এসব প্রতিক্রিয়ার কিছুই লক্ষ করেনি। সে তার মত পেশাব করেই চলেছে! মসজিদের মধ্যে পেশাব করার মত অসহ্যকর দৃশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে দেখছেন, আর সাহাবীদের শান্ত করছেন! আল্লাহু আকবার! ধৈর্যের কী চরম পরাকাষ্ঠা! কতো ধৈর্যশীল ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী!

বেদুঈন লোকটি পেশাব শেষ করে যখন ধীরে-সুস্থে লুঙ্গি ঠিক করছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমল স্বরে তাকে কাছে ডাকলেন। কাছে আসার পর দয়ার নবী খুব নরম স্বরে তাকে বললেন, ‘মসজিদ এ

জাতীয় কাজের জন্য তৈরি করা হয় না। মসজিদ তো শুধু নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের জন্য।' ব্যাস, একেবারে সংক্ষিপ্ত নসিহত। কিন্তু লোকটি নবীজীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো। এরপর চলে গেলো। নামাযের সময় হলে লোকটি সবার সঙ্গে জামাতে শরিক হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ালেন। নামাযের মধ্যে রুকু থেকে ওঠার সময় রাসূল 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' পড়লেন। মুকতাদীগণ সকলে বললো, 'রব্বানা লাকাল হামদ' (অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনার জন্যই।') কিন্তু সেই বেদুঈন সাহাবী এর সঙ্গে আরো যোগ করলো, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দয়া করুন। আপনার দয়ায় আমাদের সঙ্গে আর কাউকে শরিক করবেন না!'

নবীজীর কানে তাঁর এ বাক্য পৌঁছালো। নামায শেষ করে তিনি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কথা বলেছে?' সবাই বেদুঈন সাহাবীর দিকে ইশারা করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডাকলেন। কাছে এলে রাসূল দেখলেন, এ তো সেই ব্যক্তি যে মসজিদে পেশাব করেছিলো। নবীজীর কোমল আচরণ তার হৃদয়ে নবীপ্রেমের এমন সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করেছিলো যে, সে দোয়া করছিলো, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যেন কেবল তারা দু'জনই লাভ করেন, অন্য কেউ নয়! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য বললেন, 'তুমি তো একটি ব্যাপক বিষয়কে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছো।' অর্থাৎ আল্লাহ

তাআলার রহমত তো সবাইকে পরিবেষ্টন করে আছে আর সেটাকে তুমি আমার ও তোমার মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছো।

দেখুন, আল্লাহর রাসূল কী সুন্দর পদ্ধতিতে লোকটির মন জয় করে নিলেন। কারণ তিনি জানতেন, একজন বেদুঈনের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতে হবে। গ্রাম থেকে আসা এক সাদাসিধে বেদুঈনের জ্ঞান-স্তর কিছুতেই আবু বকর, ওমর কিংবা মুআয ও আম্মারের মত নয়। তাই তার সঙ্গে রাসূলের আচরণ পদ্ধতি অন্যদের তুলনায় ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম রাযি.-এর ঘটনা থেকেও আমরা চাইলে শিক্ষা নিতে পারি। তিনি ছিলেন সাধারণ সাহাবীদের একজন। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন না বিধায় রাসূলের সার্বক্ষণিক সাহচর্যও লাভ করেননি। তার কিছু বকরি ছিলো। তাই সবুজ ঘাসের খোঁজে তিনি চষে বেড়াতেন বিস্তৃত মরুভূমি।

একদিন তিনি মদীনার মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে হাঁচি দেয়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করছেন। রাসূল সাহাবীদেরকে শিখিয়েছিলেন, ‘কোনো মুসলমান অপর মুসলিম ভাইকে হাঁচি দিয়ে “আলহামদু লিল্লাহ” বলতে শুনলে উত্তরে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলবে।’ মুয়াবিয়া রাযি. মাসআলাটি মুখস্থ করে নিলেন। এরপর চলে গেলেন নিজ কাজে।

কিছুদিন পর তিনি কোনো প্রয়োজনে পুনরায় মদীনায় এলেন। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছেন। তিনি নামাযে শরিক হলেন। নামাযের মধ্যে মুসল্লীদের মধ্য হতে কেউ একজন হাঁচি দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মুয়াবিয়ার মনে পড়লো, তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে শিখেছিলেন, মুসলমানের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হয়। হাঁচিদাতা এই বুঝি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলছে—এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে মুয়াবিয়া রাযি. উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'!

মুসল্লীগণ হকচকিয়ে গেলো। অনেকে বিরক্তিভাব নিয়ে আড়চোখে তার দিকে তাকালো। সকলের অপ্রস্তুতভাব লক্ষ করে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, 'আরে! তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেন?' মুসল্লীদের কেউ কেউ ঊরুর ওপর হাত দ্বারা শব্দ করে তাকে চুপ থাকার জন্য ইঙ্গিত করলো। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মুয়াবিয়া চুপ করলেন।

নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসল্লীদের দিকে ফিরলেন। মুসল্লীদের অস্থিরতা ও একজনের কথার আওয়াজ নবীজীর কানে পৌঁছেছিলো। কিন্তু এই নতুন কণ্ঠের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ পরিচিত ছিলেন না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নামাযের মধ্যে কে কথা বললো?' সবাই মুয়াবিয়া রাযি.-এর দিকে ইঙ্গিত করলো। রাসূল তাকে কাছে ডাকলেন। তিনি দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলেন। মনে ভয়, না জানি কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি তো সবার নামাযে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন, নামাযের একাগ্রতায় বাধা সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযি.

বলেন, 'আমার পিতা-মাতা আল্লাহর রাসূলের শানে কোরবান হোন! আল্লাহর কসম! আমি জীবনে এর পূর্বে বা পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও কোমল কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে না ভর্ৎসনা করলেন, না তিরস্কার করলেন আর না আমাকে প্রহার করলেন।'

রাসূল শুধু বললেন, 'মুয়াবিয়া! নামাযের মধ্যে কথা বলার অনুমতি নেই। নামায তো কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কোরআন তেলাওয়াতের নাম।' ব্যাস, এতটুকুই! সুসংক্ষিপ্ত অথচ অতি কার্যকর নসীহত। মুয়াবিয়া রাযি. মাসআলাটি বুঝতে পারলেন। রাসূলের এতটুকু কথায় তার হৃদয়জগত প্রশান্ত হয়ে গেলো। তাই তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার কথা রাসূলকে বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! কিছুদিন পূর্বেও আমরা মূর্খতার অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকে জ্যোতিষীর কাছে যায় (যারা নিজেদের অদৃশ্যজ্ঞানী বলে দাবি করে)। তারা তাদের কাছে গায়ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তাদের কাছে যেয়ো না।' অর্থাৎ তুমি একজন মুসলমান আর মুসলমান মাত্রই এ কথা বিশ্বাস করে যে, গায়বের জ্ঞান এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। তাই তাদের কাছে যাওয়া তোমার জন্য সমীচীন নয়।

এরপর মুয়াবিয়া বললেন, ‘আমাদের মধ্যে অনেকে শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে।’ অর্থাৎ উড়ন্ত পাখি দেখে শুভ-অশুভ নির্ণয় করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এ জাতীয় নির্ণয় কেবল অন্তরেরই ধারণা। বাস্তবে এর কোনো প্রভাব কিংবা বাধাদান-ক্ষমতা নেই।’ অর্থাৎ এগুলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো ভূমিকা নেই।

মসজিদে পেশাব করা এক বেদুঈন এবং নামাযে কথা বলা এক ব্যক্তির সঙ্গে এই হলো নবীজীর আচরণ। আর ব্যক্তিবিচারে তাদের ক্ষেত্রে এ আচরণই ছিলো সঠিক ও পূর্ণ উপযোগী। কারণ এ জাতীয় মানুষের ভুল হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু মুআয বিন জাবাল রাযি., নববী সোহবত ও ইলম অন্বেষণ—উভয় ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন উঁচু মার্গের সাহাবীদের একজন, তিনি কোনো ভুল করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও সংশোধন পদ্ধতি অন্যদের তুলনায় ভিন্ন হতো।

মুআয রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে এশার নামায পড়তেন। এরপর নিজ এলাকায় গিয়ে এলাকাবাসীদের এশার নামাযের ইমামতি করতেন। দ্বিতীয়বারের এ নামায মুআয রাযি.-এর জন্য নফল এবং অন্যদের জন্য ফরয হিসেবে গণ্য হতো। একরাতের ঘটনা। মুআয রাযি. এলাকায় এসে তাকবীর দিয়ে এশার নামাযের ইমামতি শুরু করলেন। ইতোমধ্যে সগোত্রীয় এক যুবক এসে নামাযে শরিক হলো। হযরত মুআয সূরা ফাতিহা শেষ করলেন। সকলে ‘আমীন’ বললো। এরপর মুআয সূরা

বাকারা শুরু করলেন! সে সময় লোকেরা সারাদিন ক্ষেত-খামারে কাজ করতো, পশু চরাতো; এরপর কোনো রকমে এশার নামায পড়েই শুয়ে পড়তো।

যুবকটি নামাযে দাঁড়িয়ে আছে, আর মুআয কেরাত প্রলম্বিত করেই যাচ্ছেন। একপর্যায়ে অস্থির হয়ে যুবকটি জামাত ছেড়ে দিয়ে একা একা নামায আদায় করে বাড়ি চলে গেলো। অনেকক্ষণ পর নামায শেষ হলে মুসল্লীদের একজন মুআযকে বললো, 'মুআয! অমুক তো আমাদের সঙ্গে নামাযে শরিক হয়েছিলো। কিন্তু আপনার দীর্ঘ কেরাতের কারণে নামায ছেড়ে চলে গেছে।' এ কথা শুনে মুআয রাযি. খুব নাখোশ হলেন এবং বললেন, 'তার মধ্যে নিফাক ও কপটতা আছে। আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার বিষয়টি জানাবো।'

যুবকটিকে হযরত মুআযের এ মন্তব্য শোনানো হলে সে বললো, 'আমিও যাবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। হযরত মুআযের বিষয়টি রাসূলকে জানাবো।' উভয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। মুআয রাযি. যুবকটির আচরণ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। এরপর যুবকটি বললো, 'আল্লাহর রাসূল! তিনি দীর্ঘ সময় আপনার কাছে থাকার পর আমাদের এখানে আসেন। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়ান। আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুআয নামায যে পরিমাণ লম্বা করেন, তাতে তো আমরা এশার নামায পড়তেই পারবো না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী কেরাত পড়ে থাকো?' মুআয একে একে সূরা বাকারাসহ বিভিন্ন বড় সূরার নাম বলতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, মুআযের দীর্ঘ কেরাতই মানুষকে নামায হতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আর নয়তো নামায কী করে মানুষের ওপর কঠিন হতে পারে! তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। মুআযকে বললেন, 'মুআয! তুমি কী মানুষকে ফিতনায় ফেলে দিতে চাও?' অর্থাৎ তোমার এ কাজ তো মানুষের মধ্যে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং তাদেরকে দ্বীন হতে বিমুখ করবে। 'তুমি সূরা তারিক, সূরা বুরূজ, সূরা শামস, সূরা লায়ল—এর মত সূরাগুলো পড়বে।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকটির দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে জানতে চাইলেন, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি নামায কীভাবে পড়ো?' যুবকটি বললো, 'আমি সূরা ফাতিহা পড়ি এবং নামায শেষে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি, জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।' এ সময় যুবকটির স্মরণ হলো যে, সে আল্লাহর রাসূল ও মুআযকে দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করতে দেখে। তাই সে বললো, 'আমি বুঝি না, আপনি ও মুআয এত দীর্ঘ সময় কী দোয়া করেন? আমি তো এত দীর্ঘ সময় কী দোয়া করবো বুঝি না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি যে জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত দোয়া করো, আমি ও মুআয সেই দোয়াই করি।'

মুআয নিফাকের অপবাদ দেয়ায় যুবকটি বেশ ব্যথিত হয়েছিলো। সে বললো, 'যেদিন কোনো শত্রু আক্রমণ করবে, সেদিন মুআয জানতে পারবে—আমি কী করেছি।' অর্থাৎ জিহাদের ময়দানেই মুআযের কাছে আমার ঈমানের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সেদিন সে বুঝতে পারবে, কাকে সে মুনাফিক বলেছিলো।

কিছুদিন পরই এক যুদ্ধে এ যুবক বীর বিক্রমে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর শোনার পর মুআযকে বললেন, 'তোমার ও আমার সেই বিবাদী—যাকে তুমি মুনাফিক বলেছিলে—কী করেছে শুনেছো?' মুআয রাযি. বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর আমি মিথ্যা বলেছি। তিনি তো আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছেন।'

তো মানুষের স্বভাব ও অবস্থানের ভিন্নতার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। দেখুন, ব্যক্তি বিবেচনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আচরণে কেমন বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা এনেছেন। এবার লক্ষ করুন ওসামা বিন যায়দের সঙ্গে রাসূলের আচরণ। সেই ওসামা, যিনি রাসূলের বড় আদরের, যিনি লালিত-পালিত হয়েছেন নবীগৃহে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জুহাইনা গোত্রের শাখা 'আল হুরাকা' এর উদ্দেশে সাহাবীদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। হযরত ওসামা বিন যায়দও মুজাহিদ বাহিনীতে ছিলেন। প্রত্যুষে যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানগণ বিজয় লাভ করলেন এবং শত্রুবাহিনীর যোদ্ধারা পালাতে

লাগলো। শত্রুবাহিনীর এক যোদ্ধা এতোক্ষণ বীর-বিক্রমে লড়াই করছিলো। কিন্তু সহযোদ্ধাদের পরাজিত হতে দেখে সে অস্ত্র ফেলে পলায়নে উদ্যত হলো। হযরত ওসামা ও একজন আনসারী সাহাবী তার পিছু নিলেন। লোকটি দৌড়াচ্ছে। তারাও পিছু পিছু ধাওয়া করছেন। প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে লোকটি একটি গাছের পেছনে আত্মগোপন করলো।

ওসামা ও আনসারী সাহাবী তাকে ঘিরে ফেলে তরবারি উঁচিয়ে ধরলেন। দু'দিক থেকে মাথার ওপর উদ্যত চকচকে দু'টি তরবারির মাঝে সে যেন মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেলো। মুখের শেষ আর্দ্রতাটুকু দিয়ে শুষ্ক জিহ্বাকে কোনো রকমে ভিজিয়ে প্রচণ্ড ভয়ে সে বারবার বলতে লাগলো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।'

আনসারী সাহাবী ও ওসামা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। লোকটির আসলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, নাকি এটি আত্মরক্ষার নিছক কৌশল মাত্র? যুদ্ধের ময়দান। পরিস্থিতি অস্থিতিশীল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ, কর্তিত হাত-পা। চারপাশে নিহতদের রক্তবন্যা, আহতদের আর্তচিৎকার। চোখের সামনে শত্রু। উভয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তড়িৎ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে কোনো সময় গায়ে বিঁধতে পারে শত্রুতীর কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর। তখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মত সুযোগ ছিলো না। আনসারী সাহাবী আঘাত না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তরবারি সরিয়ে

নিলেন, আর ওসামা ধারণা করলেন, এটা শত্রুর একটা কৌশল মাত্র। তাই তরবারির আঘাতে তিনি লোকটিকে হত্যা করে ফেললেন।

মুজাহিদ বাহিনী মদীনায় ফিরে এলো। সকলের হৃদয়ে বইছে বিজয়-আনন্দের ফল্গুধারা। হযরত ওসামা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধের ঘটনা শোনাতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে সেই লোকটির কথাও এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দচিত্তে মুসলমানদের যুদ্ধজয়ের কাহিনী শুনছিলেন। কিন্তু ওসামা যখন বললেন 'তারপর আমি তাকে হত্যা করলাম', সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের চেহারার রঙ বদলে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'লোকটি কালিমা পড়া সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?!'

ওসামা রাযি. বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! সে তো আন্তরিকভাবে কালিমা পড়েনি। সে তা পড়েছিলো আত্মরক্ষার্থে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?! তুমি কেন তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখলে না যে, সে আত্মরক্ষার্থে কালিমা পড়েছে কিনা?!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসামা রাযি.-এর দিকে তাকিয়ে বারবার বলছিলেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?! লোকটি কালিমা পড়া সত্ত্বেও তাকে মেরে ফেললে?! কিয়ামতের দিন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" যখন তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে মামলা দায়ের করবে তখন কী পরিস্থিতি হবে?'

রাসূল বারবার ওসামাকে এ কথা বলছিলেন। ওসামা বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এত বার কথাটি বললেন যে, আমি ভাবছিলাম, যদি আমি আগে মুসলমান না হয়ে সেদিনই মুসলমান হতাম!'

*সিদ্ধান্ত... আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সকল মানুষকে এক কাতারে ফেলবেন না। মানুষের স্বভাব-ভিন্নতা বর্ণের চেয়েও বৈচিত্র্যময়।*

# ১৮. ব্যক্তিউপযোগী কথা বলুন

পূর্বোক্ত বিষয়ের আলোচনার পরই যে প্রসঙ্গটি চলে আসে তা হলো—মানুষের সঙ্গে কথা বলার পদ্ধতি ও ব্যক্তি হিসেবে আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন ধরণ। আপনি যখন কারো সঙ্গে কথা বলবেন তখন তার উপযোগী কথাবার্তাই বলুন। এটাই মানবস্বভাবের দাবি। যুবকের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপচারিতার ধরণ থেকে ভিন্ন হবে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে নিশ্চয়ই সেভাবে কথা বলবেন না যেভাবে একজন বিজ্ঞ আলিমের সঙ্গে বলবেন। তদ্রূপ স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে আলাপচারিতার বিষয় ও ধরণ অভিন্ন হবে না।

আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি না যে, প্রসঙ্গই সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে। বোনকে যে ঘটনাটি শোনানো হয়েছে তা আর স্ত্রীকে শোনানো যাবে না! কোনো যুবকের সঙ্গে যা আলোচনা করা হয়েছে তা বৃদ্ধের সামনে বলাই যাবে না! না, বিষয়টি এমন নয়। বরং ভিন্নতা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, ঘটনাটি উপস্থাপনের ধরণ ও ভঙ্গিতে সামান্য পার্থক্য করা, ক্ষেত্রবিশেষে পুরো কাঠামোকেই পাল্টে দেয়া।

একটি উদাহরণ দিলে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, আপনার দাদুর সঙ্গে দেখা করতে কয়েকজন বয়স্ক মুরব্বী এলেন। সকলের বয়স আশির ঊর্ধ্বে। আপনি যদি তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার কাহিনী বলা শুরু করেন, অথবা ফুটবল খেলার গল্প শুরু করেন,

কীভাবে আপনার বন্ধু গোল দিলো, কে মাথায় ও হাঁটুতে বল রেখে খেলা দেখাতে পারে, তাহলে এটা ব্যক্তি ও পরিবেশের কতটা উপযোগী হবে? অথবা মনে করুন, আপনি বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করছেন। তাদের সঙ্গে যদি দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তাহলে কেমন হবে? এ বিষয়গুলো যে অনুপযোগী, তাতে আমরা সকলেই একমত।

মানুষকে আকর্ষণ করার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি হলো, যে যে প্রসঙ্গ ভালোবাসে, তার সঙ্গে সে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা। কোনো ভদ্রলোকের যদি স্বনামধন্য কোনো পুত্র থাকে তাহলে তার কাছে পুত্র সম্পর্কে জানতে চাওয়াই উচিত। কারণ ভদ্রলোক অবশ্যই তার ছেলেকে নিয়ে গর্ব করেন এবং তার ব্যাপারে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। কোনো দোকানদার দোকান খোলার পর কিছু বেচাকেনা করেছে। এ মুহূর্তে আপনি তার কাছে গেলেন। তখন আপনি বেচাকেনা কেমন হচ্ছে, খরিদ্দারদের আনাগোনা কেমন—এসব বিষয়ে জানতে চান। কারণ এ জাতীয় আলোচনা তখন তার ভালো লাগাই স্বাভাবিক। দেখবেন, পরবর্তীতে সে আপনাকে দেখলে খুশি হবে, আপনার সঙ্গে দু'চারটা কথা বলতে চাইবে।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাই দেখা যায়, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু, মোটকথা শ্রোতার বিবেচনায় তার কথা বলার ধরণ হতো ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর রাসূলের এক মহান সাহাবী জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি.। ওহুদ যুদ্ধে তার পিতা শহীদ হন। তখন জাবেরের ওপর তার সহোদরা নয় বোনের দায়িত্ব এসে পড়ে। জাবের রাযি.

ছিলেন তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এদিকে বাবার রেখে যাওয়া বিশাল ঋণের বোঝাও তাকে পরিশোধ করতে হবে। অথচ তখনও তিনি ছেলে মানুষ। সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। এত অল্প বয়সে বহুমুখী চাপে জাবের রাযি. বেশ পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। সারাদিন তিনি চিন্তিত থাকতেন। ঋণের চিন্তা, বোনদের চিন্তা। সকাল-বিকাল পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের তাগাদা।

একবারের ঘটনা। যাতুর রিকা' অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জাবের রাযি.ও বের হয়েছেন। দারিদ্র্যের কারণে তার সম্বল ছিলো জীর্ণ-শীর্ণ একটি উট, নিজেরই যার পথ চলতে কষ্ট হয়। উৎকৃষ্টমানের উট কেনার মত সম্পদ জাবেরের ছিলো না। উটের ধীর গতির কারণে তিনি কাফেলার একেবারে পেছনে পড়ে গেলেন। আল্লাহর নবীও সৈন্যবাহিনীর পেছনে পেছনে চলছিলেন। তিনি জাবেরকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে তার জীর্ণ-শীর্ণ উটটিও নজরে পড়লো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে এসে বললেন, 'জাবের! তোমার কী হয়েছে?' জাবের বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! এই উটটির কারণে আমি পেছনে পড়ে গেছি।' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উটটিকে বসাও।'

জাবের উটকে বসিয়ে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের উটকে বসিয়ে জাবেরকে বললেন, 'তোমার লাঠিটি আমাকে দাও অথবা আমার জন্য গাছ থেকে একটি ডাল কেটে আনো।' জাবের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের লাঠি দিলেন। তার উটটি মাটিতে

দুর্বল ক্লান্ত অবস্থায় বসে ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং উটটিকে লাঠি দ্বারা সামান্য আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উটটি পরিপূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলো। জাবের দৌড়ে উটের পিঠে চেপে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জাবের রাযি. একসঙ্গে চলছেন। জাবেরের মন খুব আনন্দিত। তার উটটি নতুন শক্তি ও উদ্যম ফিরে পেয়েছে। নবীজী জাবেরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চাইলেন।

লক্ষ করার বিষয়, জাবেরের সঙ্গে রাসূল কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন? জাবের তখন টগবগে যুবক। এ বয়সে সাধারণত যুবকদের মাথায় বিয়ে-শাদী ও জীবিকা অর্জনের চিন্তাই আনাগোনা করে বেশি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘জাবের! তুমি বিয়ে করেছো?’ জাবের উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ’। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কুমারী না বিধবা?’ ‘বিধবা’। জাবের বললেন।

অবিবাহিত এক যুবক ছেলে তার জীবনের প্রথম বিয়ে একজন বিধবাকে করেছে শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ অবাক হলেন। তিনি জাবেরকে স্নেহের স্বরে বললেন, ‘কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না যে? তাহলে তো তোমরা একে অপরকে পেয়ে আনন্দিত হতে।’ জাবের রাযি. জবাবে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা ওহুদের যুদ্ধে ইন্তেকাল করেছেন। আমার নয়টি বোন আছে। তাদের দেখাশোনা করার মত আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই আমি তাদের বয়সী কোনো যুবতীকে বিয়ে করা

সমীচীন মনে করিনি। কারণ তার সঙ্গে তাদের মতভেদের আশঙ্কাই বেশি। তাই আমি তাদের চেয়ে বয়স্ক এক মহিলাকে বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারে। বিধবাকে বিয়ে করার পেছনে এটাই ছিলো মূল রহস্য।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নিজের সামনে এমন এক যুবককে দেখছিলেন, যে নিজের বোনদের কল্যাণচিন্তায় আপন আনন্দ-বিনোদনকে বিসর্জন দিয়েছে। তিনি তাকে যুবকদের উপযোগী কিছু কথা বলে খুশি করতে চাইলেন। রাসূল তাকে বললেন, 'আমরা মদীনা ফেরার পথে যখন ছিরারে (মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরের একটি স্থানের নাম) থামবো, আর আমাদের আগমন সংবাদ তোমার স্ত্রী শুনবে, সে তোমার জন্য পালঙ্ক প্রস্তুত করে রাখবে।' অর্থাৎ যদিও তুমি বিধবাকে বিয়ে করেছো, কিন্তু সে তো নববধূ। তাই সে তোমার আগমনে আনন্দিত হবে এবং তোমার আরামের জন্য শয্যা প্রস্তুত করবে।

রাসূলের মুখে পালঙ্কের কথা শুনে জাবেরের নিজের ও তার বোনদের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, 'পালঙ্ক আসবে কোথা থেকে! আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঘরে কোনো পালঙ্ক নেই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ইনশাআল্লাহ! অচিরেই তোমাদের ঘরে পালঙ্ক আসবে।'

উভয়ে আবার পথ চলতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবেরকে কিছু সম্পদ দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'জাবের!' সঙ্গে সঙ্গে

জাবের রাযি. উত্তর দিলেন, ‘রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুমি কি তোমার উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে?’ জাবের রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ প্রস্তাবে একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই উটটিই তার একমাত্র মূলধন। দুর্বল হলেও সেটি এখন শক্তিশালী ও সবল হয়ে গেছে। এদিকে প্রস্তাব যে দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জাবের বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনিই বলুন, কত দেবেন?’ ‘এক দিরহাম।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। জাবের বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! না, আমার লোকসান হয়ে যাবে।’ ‘তাহলে দুই দিরহামে।’ নবীজী বললেন। ‘না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার লাভ হবে না।’

এভাবে দাম বাড়তে বাড়তে চল্লিশ দিরহামে পৌঁছলো, যা এক উকিয়া স্বর্ণের সমপরিমাণ। জাবের বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি রাজি। তবে আমার পক্ষ থেকে শর্ত হচ্ছে, এর ওপর চড়ে আমি মদীনা পর্যন্ত যাবো।’ রাসূল বললেন, ‘ঠিক আছে।’

মদীনায় ফিরে জাবের নিজের বাড়িতে গিয়ে উটের পিঠ থেকে মালপাত্র নামালেন। এরপর রাসূলের সঙ্গে নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। উটটিকে বেঁধে রাখলেন মসজিদের পাশে। নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বের হলেন, জাবের বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! এই যে আপনার উট।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে বললেন, ‘বেলাল! জাবেরকে চল্লিশ দিরহাম দিয়ে দাও। কিছু বাড়িয়ে দিও।’

হযরত বেলাল রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী চল্লিশ দিরহামের চেয়ে বেশি হযরত জাবেরকে দিয়ে দিলেন। জাবের দিরহামগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ফিরছিলেন, আর মনে মনে ভাবছিলেন, দিরহামগুলো কী কাজে লাগাবেন? আরেকটা উট কিনবেন? বাড়ির জন্য কিছু আসবাবপত্র কিনবেন? নাকি...? হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে বললেন, 'বেলাল! উটটি নিয়ে তুমি জাবেরকে দিয়ে দাও।'

বেলাল সঙ্গে সঙ্গে উট নিয়ে জাবের রাযি.-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জাবের রাযি. বেলাল রাযি.কে উট নিয়ে আসতে দেখে অবাক হলেন। মনে মনে আশঙ্কা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দিলেন না তো? বেলাল রাযি. জাবের রাযি. এর পাশে এসে বললেন, 'জাবের! তোমার উট নাও।' জাবের রাযি. বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কেন? কী হয়েছে?' বেলাল রাযি. বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমি যেন উটটা তোমার কাছে ফিরিয়ে দিই। আর দিরহামগুলোও তোমার কাছে থাকবে।'

বেলালের কথা শুনে জাবের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুজুর! আপনি কি উট নেবেন না?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি এত অল্প দামে উটটি নেয়ার জন্য তোমার সঙ্গে দরাদরি করিনি। বরং আমি অনুমান করতে চাচ্ছিলাম, এ

মুহূর্তে কী পরিমাণ অর্থ দিলে তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।' আল্লাহু আকবার! কত উত্তম চরিত্র!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদের সঙ্গে তাদের মানসিকতা বুঝে কথা বলতেন। আর যখন তাদেরকে সাহায্য করতে চাইতেন তখন দয়া ও স্নেহের চাদরে জড়িয়ে তা আড়াল করে দিতেন। নবীজীর পাশে একদিন এক সাহাবী বসা ছিলেন। তার নাম জুলাইবীব। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নওজোয়ান সাহাবীদের একজন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃস্ব, অসহায়; আর দেখতে কিছুটা অসুন্দর। তখনো পর্যন্ত তিনি বিয়ে করেননি। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন। আমরা একটু অনুমান করি, একজন অবিবাহিত যুবক সাহাবীর সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনার বিষয়বস্তু কী হতে পারে?

রাসূল তার সঙ্গে আরবের বংশপরক্রমা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? কোনটি উঁচু বংশ, আর কোনটি নিচু বংশ? না কি তার সঙ্গে বাজার ও ক্রয়-বিক্রয়ের নানা হুকুম-আহকাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? না, এ জাতীয় কোনো বিষয় নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে আলোচনা করেননি। বরং রাসূল তার জন্য এক ভিন্ন প্রসঙ্গ নির্বাচন করেছিলেন, যা তার জন্য অন্য যে কোনো প্রসঙ্গ থেকে উপযোগী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আর এমন কোনো যুবককে পাওয়া যাবে না, যার কাছে এ প্রসঙ্গটি ভালো লাগবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন। জুলাইবীব রাযি. বললেন, 'সমাজে আমি তো অচল, আমার কোনো মূল্য নেই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কিন্তু আল্লাহর কাছে তো তুমি অচল নও।'

এরপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবীবকে একটি ভালো জায়গায় বিয়ে দেয়ার চিন্তায় থাকলেন। একদিন জনৈক আনসারী সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার বিধবা মেয়ের পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে এলো। তার অভিপ্রায় ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাকে বিয়ে করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি।' সাহাবী বললেন, 'অবশ্যই, আমি প্রস্তুত।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি নিজে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি না।' সাহাবী জানতে চাইলেন, 'তবে কার জন্য এ কথা বলছেন?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জুলাইবীবের জন্য।' আনসারী সাহাবী একটু চমকে উঠে বললেন, 'জুলাইবীব! আল্লাহর রাসূল! মেয়ের মায়ের সঙ্গে আমার একটু পরামর্শ করতে হবে।'

এ কথা বলে তিনি ফিরে গেলেন। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়ের ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।' স্ত্রী বললো, 'এ তো বড় আনন্দের সংবাদ। তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও।' 'রাসূল নিজের জন্য প্রস্তাব পাঠাননি।' 'তবে কার জন্য?' 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তাকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।' তখন তার স্ত্রী বললো, 'এমন নিঃস্ব-ফকিরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো! দেখতেও তো সে সুন্দর নয়। আল্লাহর কসম! জুলাইবীবের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না। এদিকে আমরা অমুক অমুকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি।'

মেয়ের বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার জন্য উদ্যত হলেন, ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে জানতে চাইলো, 'আপনাদের কাছে কে প্রস্তাব পাঠিয়েছে?' তারা বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' মেয়েটি বললো, 'আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চাইছো! আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিন। তিনি কখনোই আমার জন্য ক্ষতিকর কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।' তার এ কথা বাবা-মায়ের কাছে খুব ভালো লাগলো। তাদের পেরেশানীও দূর হলো। তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ের দায়িত্ব আপনার ওপর। আপনি তাকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জুলাইবীবের সঙ্গে বিয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের ওপর তুমি কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করো এবং তাদের জীবনকে কষ্টমুক্ত করো।'

কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গযওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জুলাইবীবও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে

ছিলেন। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন সঙ্গীদের তালাশ করতে লাগলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছো না?' সাহাবীরা বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে পাচ্ছি না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সময় চুপ থেকে আবার বললেন, 'তোমরা কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছো?' তারা বললো, 'আমরা অমুক অমুককে হারিয়ে ফেলেছি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও চুপ থেকে বললেন, 'তোমরা কি কাউকে হারিয়েছো?' তারা একই জবাব দিলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি তো জুলাইবীবকে কোথাও দেখছি না।'

এবার সবাই তাকে খোঁজা শুরু করলো। যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের মাঝে তাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলো একটু দূরে এক জায়গায়। তার আশেপাশে পড়েছিলো সাতজন মুশরিকের লাশ; যাদের হত্যা করে তিনি শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার লাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'সে সাতজনকে হত্যা করার পর শহীদ হয়েছে। সে সাতজনকে হত্যা করার পর শহীদ হয়েছে। সে আমার অংশ, আমি তার অংশ।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে কবর খননের আদেশ দিলেন। আনাস রাযি. বলেন, 'আমরা কবর খুঁড়ছিলাম। আর জুলাইবীবের লাশ কাঁধে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূলের কাঁধই ছিলো তার খাট! কবর খোঁড়া শেষ হলে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাকে কবরে শুইয়ে দিলেন।' হযরত আনাস রাযি. বলেন, 'আল্লাহর কসম! জুলাইবীবের মৃত্যুর পর আনসারী সাহাবীদের মধ্যে তার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা লেগে যায়।'

এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকের সঙ্গে তার উপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এ কারণে নবীজীর কাছে এসে তার কথা শুনে কেউ বিরক্ত হতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আয়েশা রাযি.-এর পাশে বসলেন। তার সঙ্গে কিছু সময় গল্প করলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা সবচে উপযোগী? তার সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, নাকি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? এমন বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদৌ আলোচনা করবেন না। কারণ আয়েশা তো আবু বকর নন যে, তার সঙ্গে এসব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

রাসূল তার সঙ্গে মুসলমানদের দারিদ্র্য, তাদের কী কী প্রয়োজন—এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করবেন না। কারণ তিনি তো ওসমান নন। তিনি আয়েশার সঙ্গে দাম্পত্যসুলভ ভালোবাসার কথা বলেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'তুমি যখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো তখন আমি বুঝতে পারি। আবার আমার ওপর রাগ করলেও ধরতে পারি।' আয়েশা

রাযি. বললেন, ‘কীভাবে?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যখন সন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, “মুহাম্মাদের রবের কসম!” আর যখন আমার ওপর রেগে থাকো তখন বলো, “ইব্রাহীমের রবের কসম!”’ আয়েশা রাযি. বললেন, ‘আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন। তবে খোদার কসম! রাগের মুহূর্তে আমি শুধু আপনার নামটিই নিই না। (কিন্তু হৃদয়ে ভালোবাসা পূর্ণই থাকে)।’

আমরাও কি প্রাত্যহিক বিষয়গুলোতে এ সুন্নাতটির অনুসরণ করতে পারি না?

*দৃষ্টিভঙ্গি... আপনি যা বলে আনন্দ পান, তা নয়; মানুষ যা শুনতে পছন্দ করে, তা নিয়ে কথা বলুন।*

# ১৯. প্রথম সাক্ষাতেই কোমল হোন ..

মিশরের গ্রামাঞ্চলে এ প্রচলন ছিলো যে, বাসর রাতে বর নিজ কামরায় একটা বিড়াল লুকিয়ে রাখতো। স্ত্রীকে নিয়ে ফুলশয্যার পাশে আসতেই স্বামী পা দিয়ে কোনো চেয়ারে একটু নাড়া দিতো, যাতে বিড়ালটি বেরিয়ে আসে। আর যেই না বিড়ালটি বের হতো, স্বামী সেটাকে ধরে গলাটিপে মেরেই ফেলতো। এভাবে তারা স্ত্রীর সামনে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করতো। পাঠক! আপনি বলতে পারেন, তারা এমনটা কেন করতো? এমনটি তারা এজন্য করতো যেন প্রথম সাক্ষাতেই স্ত্রীর মস্তিষ্কে স্বামীর রুদ্রমূর্তির ছবি অঙ্কিত হয়ে যায়।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে একটি কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলাম তখন একজন প্রবীণ শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'ছাত্রদের সামনে প্রথম যখন তুমি লেকচার দিতে দাঁড়াবে, খুব কঠোর আচরণ করবে। চোখ লাল করে তাদের দিকে তাকাবে। যেন প্রথম দিন থেকেই তারা তোমাকে ভয় পেতে শুরু করে এবং তোমার ব্যক্তিত্বের শক্তিমত্তা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যায়।'

তার সে উপদেশ স্মরণ রেখেই আমি এ অধ্যায় লেখা শুরু করেছি। আমি বিশ্বাস করি—এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ছবির ৭০% গেঁথে যায় (এবং এর ভিত্তিতে সে বিবেচনা করে, আপনি কেমন)। একে মনোছবি বলা যেতে পারে।

একবার কয়েকজন অফিসার একটি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে আমেরিকা গেলো। প্রশিক্ষণটি ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক আচরণযোগ্যতার উন্নয়নের ওপর। ট্রেনিংয়ের প্রথম দিন তারা সকাল সকাল একটি হলঘরে একত্রিত হলো। প্রথমদিন হিসেবে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলো। এমন সময় হঠাৎ প্রশিক্ষক প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হলরুম নীরব। তখনও এক ছাত্র মুচকি হাসছিলো। প্রশিক্ষকের চোখ পড়লো তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চ স্বরে বললেন, 'এই তুমি হাসছো কেন?'

'মাফ করবেন, আমি হাসিনি।'

'না, তুমি হাসছিলে।'

প্রশিক্ষক তাকে শাসন করা শুরু করলেন। 'তুমি আত্মসচেতন নও। তোমার উচিত, আজকের প্রথম ফ্লাইট ধরেই বাড়ি ফিরে যাওয়া। আমি তোমার মত ছেলেকে পড়াতে পারবো না।' শিক্ষকের এসব কথায় ছাত্রটির চেহারার রঙ একেবারে পাল্টে গেলো। সে একবার শিক্ষক, একবার সহপাঠীদের দিকে তাকাচ্ছিলো। আর চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিলো। এরপর শিক্ষক তার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে দরজার দিকে ইশারা করে বললেন, 'বের হয়ে যাও।'

ছাত্রটি হতভম্ব হয়ে গেলো। সে কোনো রকমে জড়সড় হয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো। শিক্ষক এবার বাকি ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ড. । আমি তোমাদেরকে এই এই বিষয়ের ওপর পাঠদান করবো। কিন্তু তার আগে তোমাদের একটি ফরম পূরণ করতে হবে। এতে তোমরা

নিজেদের নাম লিখবে না।' তিনি ফরম বিতরণ করলেন। ফরমে পাঁচটি প্রশ্ন ছিলো:

১. তোমার শিক্ষকের আচরণ সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

২. শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি কেমন?

৩. তিনি কি অন্যের মত গ্রহণ করেন?

৪. তুমি কি তার কাছে আবারও শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও?

৫. তুমি কি ইনস্টিটিউটের বাইরে তার সঙ্গে দেখা করতে আনন্দবোধ করবে?

প্রতিটি প্রশ্নের সামনে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেয়া আছে: খুব ভালো, ভালো, কোনো মতে চলে, দুর্বল।

সব ছাত্র ফরম পূর্ণ করে শিক্ষকের কাছে জমা দিলো। শিক্ষক সেগুলোকে এক পাশে রেখে অফিসিয়াল ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে আচরণবিধির প্রভাব সম্পর্কে লেকচার দেয়া শুরু করলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আহা! তোমাদের সহপাঠী তো বঞ্চিত হচ্ছে।' এরপর তিনি ক্লাসরুম থেকে বহিষ্কৃত ছেলেটির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে হাত মেলালেন এবং মুচকি হেসে তাকে ক্লাসরুমে নিয়ে এলেন।

এরপর শিক্ষক তাকে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'একটু আগে আমি তোমার সঙ্গে যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই রাগ করেছি। ব্যক্তিগত কিছু পেরেশানীর কারণে আমার এ ভুলটা হয়ে গেছে। এজন্য আমি তোমার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি অবশ্যই মনোযোগী ও আগ্রহী ছাত্র।

পরিবার-পরিজন সবাইকে ছেড়ে তোমার এখানে আসাটাই এর সবচে বড় প্রমাণ। আমি তোমাকে এবং তোমার সকল সহপাঠীকে শিক্ষার প্রতি তোমাদের এই অনুরাগের কারণে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার কত বড় সৌভাগ্য! তোমাদের মত ছাত্রদেরকে আমি শিক্ষাদান করতে পারছি।'

এরপর শিক্ষক কোমল আচরণ ও হাস্য-রসিকতার মাধ্যমে পরিবেশকে বন্ধুত্বপূর্ণ করে তুললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নতুন কিছু ফরম হাতে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের সহপাঠী তো ফরম পূরণ করতে পারেনি। তাই তোমরা সবাই যদি রাজি থাকো তাহলে ফরমটি আমি সবাইকে আবার পূরণ করতে বলবো।'

এরপর শিক্ষক সবাইকে আবার ফরম দিলেন। সকলে তা পূরণ করে পুনরায় জমা দিলো। তখন তিনি প্রথমবারের ফরমগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয়বারেরগুলো মিলিয়ে দেখলেন যে, প্রথমবারের ফরমগুলোতে 'দুর্বল' এর ঘরগুলোর প্রত্যেকটিতে টিক চিহ্ন পড়েছে। আর দ্বিতীয়বারের প্রশ্নপত্রে 'দুর্বল' ও 'কোনো মতে চলে' এর ঘরে একটিও টিক চিহ্ন নেই। সবগুলো টিক চিহ্ন 'খুব ভালো' ও 'ভালো' এর ঘরে।

জরিপের ফলাফল দেখে শিক্ষক হাসলেন। তারপর ছাত্রদেরকে বললেন, 'দেখো, তোমাদের এই ফরম পূরণই বাস্তব প্রমাণ যে, খারাপ ব্যবহার ও মন্দ আচরণ অফিসার ও তার অধীনস্থদের মাঝের কাজের পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ বিষয়টি তোমাদের সামনে প্রমাণ করার জন্যই মূলত আমি তোমাদের সহপাঠীর সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছি। অবশ্য এটা

করতে গিয়ে বেচারা গিনিপিগে পরিণত হলো! দেখো, অল্প সময়ের ব্যবধানে আমার ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিলাম।'

মূলত মানুষের স্বভাব এমনই। এজন্য বিষয়টির প্রতি খুব লক্ষ রাখা দরকার, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে আমাদের জীবনে শুধু একবারই দেখা হয়।

মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম সাক্ষাতেই মানুষের হৃদয় জয় করে নিতেন।

মক্কাবিজয়ের পর ইসলামের শেকড় যখন মজবুত হলো, মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল আসতে শুরু করলো। এই ধারাবাহিকতায় আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আসতে দেখে সাওয়ারী হতে নামার পূর্বেই তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, 'স্বাগতম! হে আগত প্রতিনিধি দল! লাঞ্ছনা বা লজ্জা নয়, আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি সুসংবাদ।' তারাও সাওয়ারী থেকে নেমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানাতে ছুটে এলো।

এভাবে অভ্যর্থনাপর্ব শেষ হওয়ার পর তারা বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আসার পথে "মুযার" গোত্রের মুশরিকদের একটি জনপদ

পড়ে। তাই যুদ্ধনিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে আপনার কাছে আসার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। অতএব আমাদেরকে সুসংক্ষিপ্ত এমন কিছু উত্তম আমল বলে দিন, যা পালন করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো এবং সেসব আমলের প্রতি অন্যদেরকেও আহ্বান করতে পারবো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি তোমাদের চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি, আর চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি।

আদেশগুলো হলো:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন। তোমরা কি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের উদ্দেশ্য জানো?'

তারা বললো, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।'

নবীজী বললেন, 'ঈমান হলো এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই।

২. নামায কায়েম করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দেয়া।'

আর তোমাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি:

১. হানতাম, ২. দুব্বা, ৩. নাকীর, ৪. মুযাফফাত। [এগুলো মদ পান করার বিভিন্ন পাত্রের নাম। উদ্দেশ্য হলো, মদপান হতে বিরত থাকতে হবে।]

আরেকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে রাতের বেলা সফর করছিলেন। রাতের অন্ধকারে তারা অনেক পথ অতিক্রম

করলেন। শেষ প্রহরে একটু বিশ্রামের জন্য আল্লাহর রাসূল পথের ধারে যাত্রাবিরতি করলেন। সারা রাত পরিশ্রমের পর গভীর ঘুমের কারণে কখন সূর্য উঠেছে কেউ বুঝতে পারলো না। সর্বপ্রথম আবু বকর রাযি.-এর ঘুম ভাঙলো। তারপর ওমরের। আবু বকর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার পাশে বসে আস্তে আস্তে তাকবীর দিতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে আওয়াজ বাড়াতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

নামায শেষে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, কাফেলার একজন নামায পড়েনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি আমাদের সঙ্গে নামায পড়লে না কেন?’

সে জবাব দিলো, ‘আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। কিন্তু গোসল করার পানি নেই।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার আদেশ দিলেন। সে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলো।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন। কারো কাছে পানি ছিলো না। সবাই খুব পিপাসার্ত ছিলো। পথে কোনো কুয়া বা পানির সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছিলো না।

হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাযি. বলেন, আমরা পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক মহিলার সাক্ষাৎ পেলাম। তার সঙ্গে একটি উট ও পানির বড়

বড় দু'টি মটকা ছিলো। আমরা তার কাছে পানির সন্ধান জানতে চাইলাম। সে বললো, ‘পানি নেই।’

আমরা বললাম, ‘তোমার বাড়ি থেকে পানি কত দূরে?’

সে বললো, ‘পূর্ণ এক দিন, এক রাতের পথ।’

আমরা বললাম, ‘তুমি আমাদের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলো।’

সে বললো, ‘রাসূল মানে কী?!’

সে আমাদের পানির সন্ধান দিতে পারে—এই প্রত্যাশায় তাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মহিলাটির সাক্ষাৎ হলে তিনি তার কাছে পানির সন্ধান জানতে চাইলেন। সে আমাদেরকে যা বলেছিলো, রাসূলকেও তাই বললো। অতিরিক্ত সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের একটি কষ্টের কথা জানালো। সে বললো, ‘আমি কয়েকজন এতিমের মা।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পানির মটকাটি বিসমিল্লাহ বলে স্পর্শ করলেন তারপর তা থেকে আমাদের পাত্রগুলোতে পানি ঢালা শুরু করলেন। আমরা চল্লিশজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তা থেকে পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম এবং আমাদের সমস্ত পাত্র ভরে নিলাম। তারপর তার মটকাটি তাকে ফেরত দিলাম। আমরা এত পানি নেয়ার পরও তা পূর্বের চেয়ে অধিক পানিতে পূর্ণ ছিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বললেন, ‘তোমাদের কাছে যে খাবার আছে তা নিয়ে এসো।’ এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার জন্য কিছু রুটি ও খেজুরের ব্যবস্থা করলেন। এরপর তাকে বললেন, ‘এগুলো তোমার পরিবারের জন্য নিয়ে যাও এবং শোনো, আমরা কিন্তু তোমার পানি একটুও কমিয়ে দিইনি। আল্লাহ তাআলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন।’

মহিলাটি তার উটে চড়ে বসলো। সে খাবার পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলো। বাড়ি পৌঁছে সে সবাইকে বলতে লাগলো, ‘আমি সবচে বড় যাদুকরের কাছ থেকে এসেছি। অথবা তিনি নবী, যেমনটি তার সঙ্গীরা ধারণা করে থাকে।’ তার কাছে পুরো ঘটনা শুনে তার গোত্রের লোকেরা খুব আশ্চর্য হলো এবং কিছুদিন না যেতেই উক্ত মহিলাসহ গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। ^১[সহীহ বুখারী: ৩৩৬ ও সহীহ মুসলিম: ১১০০]

মূলত প্রথম দর্শনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণে-অনুগ্রহে মহিলাটি মুগ্ধ হয়েছিলো।

আরেক দিনের ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কিছু সম্পদ চাইলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুই পাহাড়ের মাঝে বিচরণরত একপাল মেষ দান করলেন। লোকটি তার কওমের কাছে ফিরে এসে বলতে লাগলো, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সকলে ইসলাম কবুল করো। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির মত দান করেন, যার মনে দারিদ্র্য ও অভাবের ভয় নেই।'

হযরত আনাস রাযি. বলেন, 'লোকটি কেবল পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসেছিলো। কিন্তু একদিন না যেতেই দ্বীন তার কাছে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে প্রিয় ও সম্মানের বস্তু হয়ে গেলো।' ^১[সহীহ মুসলিম: ৪২৭৫]

*পরামর্শ... প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ছবির ৭০% গেঁথে যায়। সুতরাং আপনি মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করুন, যেন এটিই তোমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, এটিই তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ।*

# ২০. মানবপ্রকৃতি যেন খনিজ পদার্থ !!

আপনি যদি মানুষের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, যমীন যেমন বিভিন্ন প্রকারের, মানবপ্রকৃতিও তেমনই বিভিন্ন প্রকারের। কিছু মানুষের স্বভাব অনেক নরম ও কোমল হয়, আবার কিছু মানুষ শক্ত ও কঠিন। উর্বর ফসলী জমির মত অনেকে উদার। আবার অনেকে হয় কৃপণ, ঠিক অনাবাদী-অনুর্বর ভূমির মত; যাতে না পানি জমে, না ফসল ফলে। মোটকথা, মানুষ অভিন্ন স্বভাবের নয়।

ধরণ অনুযায়ী আমরা যমীনকে ব্যবহার করি। যমীন যদি শক্ত হয়, আমরা সাবধানে চলাফেরা করি। যমীন যদি নরম হয়, নির্দ্বিধায় চলাফেরা করি। মানুষের বিষয়টিও এমন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

« إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ، وَالْأَبْيَضُ، وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ.»

অর্থ: আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.কে সারা পৃথিবী থেকে একত্রিত করা একমুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই বনী আদম পৃথিবীতে এসেছে মাটির হিস্সা অনুযায়ী। কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো আর কেউ মাঝামাঝি বর্ণের হয়ে থাকে। আবার স্বভাবের দিক দিয়ে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের হয়। কেউ মিশুক স্বভাবের, কেউ বা মনমরা, আবার কেউ খারাপ, কেউ ভালো। ^১[সুনানে তিরমিযী: ২৮৭৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৬২৬৬]

এজন্য আত্মীয় হোক; যেমন বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান অথবা অনাত্মীয় হোক; যেমন প্রতিবেশী, সহপাঠী, বিক্রেতা—সব মানুষের সঙ্গে আচরণ করার সময় এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন, মানুষের এই স্বভাব-ভিন্নতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি তাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। আপনি নিজে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ধরুন, স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ঝগড়া হলো। এখন আপনার যে বন্ধুটি সবচে শক্ত মেজাজের, তার কাছে পরামর্শ চান। তাকে বলুন, ‘ভাই! আমার স্ত্রী আমার জন্য এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে সম্মান করে না, আমার সঙ্গে যা-তা আচরণ করে।’

দেখবেন, সে হয়তো বলবে, ‘মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করার একটাই অস্ত্র। তাদেরকে ভয় ও দাপট দেখিয়ে কাবু করে রাখা। সবসময় চোখ গরম করে কথা বলা। আরে! নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অর্জন করো। পুরুষের মত পুরুষ হও!’ আপনি যদি তার পরামর্শ গ্রহণ করে বাড়ি ফিরে যান এবং তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটতে পারে!

পরীক্ষাটা পূর্ণ করতে এ পর্যায়ে আপনি আপনার সবচে কোমল স্বভাবের একজন বন্ধুকে বেছে নিন এবং আগের বন্ধুকে যা বলেছেন তাকেও তা বলুন। দেখবেন, সে হয়তো এর কাছাকাছি জবাব দেবে যে, ‘ভাই আমার! তোমার স্ত্রী শুধু স্ত্রী নয়। সে তোমার সন্তানের মা। আর দাম্পত্য জীবনে কেউ সমস্যামুক্ত নয়। তুমি সবর করো। তার ত্রুটিগুলো সহজভাবে গ্রহণ করো। আর যাই হোক সে তো তোমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার জীবনসঙ্গিনী।’

লক্ষ করুন, কীভাবে মানুষের স্বভাব তার সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিপাসার্ত, ক্ষুধার্ত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রবল চাপের সময় বিচারককে কোনো রায় প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এটা তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রাচীনকালে কোনো এক সম্প্রদায়ে দুর্ধর্ষ এক খুনি বাস করতো। এই রক্তপিপাসু এক-দু'জন বা দশ-বিশজনকে নয়, নিরানব্বইজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো। ভাবতে অবাক লাগে, সেযুগে কীভাবে সে লোকদের প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতো। হয় সে খুব ভয়ংকর প্রকৃতির ছিলো; যে কারণে কেউ তার পাশে যেতেই সাহস করতো না, আর না হয় সে দুর্গম কোনো পাহাড়-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতো। কেউ তাকে খুঁজে পেতো না। বাস্তবতা যাই হোক, সে হত্যা করেছিলো নিরানব্বইটি তাজা প্রাণ।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মন তাওবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সে তখন সেযুগের সবচে বিখ্যাত আলিমের সন্ধান করতে লাগলো। তার হাতে হাত রেখে তাওবা করে সে তার কলুষিত জীবন থেকে ফিরে আসবে। লোকেরা তাকে বললো, 'অমুক উপাসনালয়ে একজন বিখ্যাত আবিদ থাকেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও মুসল্লা ছেড়ে কোথাও যান না। তাঁর দিন-রাত কাটে রোনাজারি আর দোয়ায়। বড় কোমল স্বভাবের, আবেগপ্রবণ এক ব্যক্তি তিনি। তুমি তার কাছে একবার যেতে পারো।'

খুনি লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সেই পুণ্যবান লোকটির উপাসনালয়ে উপস্থিত হলো এবং কোনো ভূমিকা ছাড়া সরাসরি বললো, 'আমি নিরানব্বইজনকে হত্যা করেছি। আমার কি পাপ মোচনের কোনো উপায় আছে?'

এদিকে সে আবিদ এতটাই নরম স্বভাবের ছিলো যে, আমার মনে হয়— তার মাধ্যমে অনিচ্ছায়ও যদি একটি পিঁপড়া মারা যায় তাহলে তার বাকি দিন অনুশোচনা ও ক্রন্দনেই কেটে যায়। তাহলে যে ব্যক্তি নিরানব্বইজন নিরপরাধ বনী আদমকে হত্যা করেছে, তার ব্যাপারে তার মনোভাব কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

সে আবিদের মনে হলো, যেন নিরানব্বইটা যিন্দা লাশ তার সামনে এ খুনির রূপ ধারণ করে এসে দাঁড়িয়েছে। আবিদ লোকটি চিৎকার করে বলে উঠলো, 'না! না! তোর তওবার কোনো সুযোগ নেই। কোনো সুযোগ নেই।'

সীমিত জ্ঞানের অধিকারী আবিদের কাছ থেকে এ জাতীয় জবাব আসাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ তার সিদ্ধান্তদান আবেগনির্ভর; জ্ঞান ও চিন্তানির্ভর নয়।

এদিকে পাষণ্ড হৃদয়ের খুনি লোকটি এরূপ হতাশাজনক উত্তর শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো। তার দু'চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছুরি দিয়ে আবিদ লোকটিকে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে লাগলো। ধারালো ছুরির আঘাতে আঘাতে লোকটির দেহ যখন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো তখন সে উপাসনালয় থেকে বের হয়ে এলো।

কেটে গেলো আরো কিছুদিন। আবার তার মন তাওবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। সে আবার বড় কোনো আলিমের সন্ধান করতে লাগলো। লোকেরা এবার তাকে একজন বিখ্যাত আলিমের সন্ধান দিলো। সেও তৎক্ষণাৎ তার দরবারে হাজির হলো। এবার লোকটি যার কাছে এসেছে, তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। চেহারায় গভীর প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার ছাপ। খুনি লোকটি তাকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি একশতজনকে হত্যা করেছি। এখন আমি কি তাওবা করতে পারবো?'

উক্ত আলিম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! তাওবা করতে তোমায় কে বাধা দিচ্ছে?' কত সুন্দর জবাব! আসলেই তো, তাওবা করার পথে তার তো কোনো বাধা নেই। মহান পরাক্রমশালী স্রষ্টার সামনে তারই বান্দা নত হবে, তার দিকে ফিরে যাবে, কার সাধ্য আছে সে পথে বাধা দেয়ার?

লোকটি এমন একজন আলিমের সান্নিধ্যে এসেছিলো, যিনি সিদ্ধান্ত দিতেন ইলম ও শরীয়তের ওপর ভিত্তি করে। সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের স্বভাব-অভ্যাস ও আবেগ-অনুভুতি দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। তিনি লোকটিকে বললেন, 'তুমি যে এলাকায় থাকো, সে এলাকাটি ভালো নয়।'

আশ্চর্য হওয়ার বিষয় হলো, কীভাবে তিনি বুঝতে পারলেন, সে এলাকাটা ভালো নয়? মূলত তিনি লোকটির অপরাধের পরিমাণ অনুমান করে এটা বলেছিলেন। কারণ, যেখানে এত বড় অপরাধ করলেও তেমন একটা বাধা-বিপত্তি পোহাতে হয় না সেখানে নিশ্চয়ই অপরাধ বেশি হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটি যে এলাকায় থাকে সেখানে যুলুম-অত্যাচার, হত্যা-

হানাহানি এত বেশি যে, মযলুমের পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই।

তাই তিনি তাকে বললেন, 'তুমি যে এলাকায় থাকো, সেখানে পাপাচার বেশি হয়। তুমি বরং অমুক শহর বা অমুক শহরে চলে যাও। কারণ, সেখানকার লোকেরা ইবাদতগুযার ও খোদাভীরু। তুমি তাদের সোহবতে থেকে নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে পারবে।'

লোকটি তখনই সাচ্চা তাওবা করে নির্দেশিত শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে পথেই তার মৃত্যু হলো।

আসমান থেকে রহমত ও আযাবের দুই দল ফিরেশতা অবতরণ করলেন। রহমতের ফিরেশতারা বললেন, 'এ ব্যক্তি সাচ্চা তাওবা করে পবিত্র শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সুতরাং সে...।' আর আযাবের ফিরেশতারা বললেন, 'সে তো কখনো কোনো সাওয়াবের কাজই করেনি।'

ফিরেশতারা যখন এ নিয়ে মতানৈক্য করছিলো, মীমাংসার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের আকৃতিতে একজন ফিরেশতা পাঠালেন। তিনি এসে ফয়সালা দিলেন, 'পুণ্যময় নগরী এবং তার নিজের শহরের মাঝে কতটুকু দূরত্ব তা নির্ণয় করতে হবে। সে যে শহরের নিকটবর্তী হবে, তার ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

আল্লাহ তাআলা তখন পবিত্র নগরীকে কাছে চলে আসার আদেশ করলেন, আর অপরাধের শহরকে বললেন দূরে সরে যেতে। ফিরেশতারা মেপে

দেখেন, লোকটি পুণ্যময় নগরীর অধিক কাছাকাছি। তখন তাকে রহমতের ফিরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হলো।

আফসোসের বিষয়, আজ ফতোয়াপ্রদানকারী মুফতীদের মধ্যেও অনেককে দেখা যায়, তারা অনেক সময় আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

আমার এক প্রতিবেশী ছিলো। প্রায় প্রতিদিনই স্ত্রীর সঙ্গে তার ঝগড়া হতো। একদিন ঝগড়ার চরম পর্যায়ে সে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে বসলো। পরবর্তীতে সে রাজআতের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো। কিছুদিন পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং সে একইভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো।

তার সঙ্গে যখনই আমার দেখা হতো, সতর্ক করতাম, তাকে বোঝাতাম। তাকে বারবার তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। একটি কথা আমি তাকে প্রায়ই বলতাম, ‘দেখো, তোমার হাতে শুধু একটা তালাক আছে। এটা যদি কখনো দিয়ে দাও তাহলে তোমার স্ত্রীকে আর স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তার আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হতে হবে। তারপর সে স্বামী যদি তালাক দেয় তবেই তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। নিজের সংসার ভেঙ্গো না।’

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সে আমার কাছে এলো। তার চেহারার রঙ ফ্যাকাশে। সে কম্পিত স্বরে বললো, ‘হুজুর! আমার আবার তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে এবং একপর্যায়ে আমি তাকে তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে ফেলেছি!’

তার এ কথায় আমি তেমন আশ্চর্য হইনি। আশ্চর্য হলাম তার পরবর্তী কথায়। সে বললো, ‘আপনি কি কোনো নরম মনের মুফতী সাহেবকে

চেনেন, যে আমাকে ফতোয়া দেবে, আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবো?!’

তার এ কথায় আমি বেশ আশ্চর্য হলাম এবং বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করলাম। একটু আগে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছি, সেটাই তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, অনেক সময় মানুষের মতামত এমনকি তাদের ফিকহী সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন ঘটে নিজস্ব আবেগ ও স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে।

কিছু মানুষকে দেখবেন, যারা স্বভাবগতভাবেই সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী। তাই সে যদি সর্বদা সম্পদশালী মানুষের পেছনে ঘুরঘুর করতে থাকে, আর সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে নিজের সন্তানদের খোঁজ-খবর নেয়া ছেড়ে দেয় তাহলে এটা আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। কারণ, সে স্বভাবগতভাবেই সম্পদলোভী। তার জন্য এটাই স্বাভাবিক। বরং বিভিন্ন বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণেও এই স্বভাবের প্রভাব থাকবে।

সুতরাং আপনি যদি তার সঙ্গে কোনো লেনদেন করতে চান বা তার থেকে কিছু আদায় করে নিতে চান তাহলে তার সঙ্গে কথা বলার আগে সবসময় এ বিষয়টি মাথায় রাখবেন যে, লোকটি সম্পদপাগল। তার থেকে আপনার উদ্দেশ্য হাসিলের সময় লক্ষ রাখুন, তার সম্পদের ওপর যেন কোনো চাপ না পড়ে।

কোনো বিষয় সুন্দরভাবে বোঝার জন্য উদাহরণ হলো সর্বোত্তম মাধ্যম। তাই এখানে একটি উদাহরণ পেশ করছি। ধরুন, আপনি কোনো কাজে

একদিন হাসপাতালে গেলেন। হঠাৎ এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। আপনি তাকে পরদিন সকালে নাস্তার দাওয়াত দিলেন। আর সেও আপনার বাড়িতে আসতে রাজি হলো।

আপনি বাজারে গিয়ে কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরে আগামীকালের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ উপলক্ষে ফোনে আপনি আরো কিছু বন্ধুকে দাওয়াত দিলেন, যাতে সবার সঙ্গে আপনার এই বন্ধুটির দেখা হয়ে যায়।

ধরুন, আপনার আমন্ত্রিত বন্ধুদের মধ্যে এক বন্ধু কৃপণ স্বভাবের। সম্পদের প্রতি তার প্রচণ্ড আসক্তি। দেখবেন, তাকে যখন আপনি ফোন করে দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বলবেন, সে বলবে, ‘আহা! আমার কী দুর্ভাগ্য! আমি যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারতাম! কিন্তু ভাই! কী করবো বলুন, আমি খুব জরুরি একটা কাজে আটকা পড়ে গেছি। আপনি ওকে আমার সালাম জানাবেন। সম্ভব হলে আমি ওর সঙ্গে পরে দেখা করে নেবো।’

আপনি যদি তার কৃপণতার কথা আগে থেকে জেনে থাকেন তাহলে তার না আসার কারণও আপনি ধরতে পারবেন। মূলত সে ভয় পাচ্ছে, যদি সে এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তাহলে হয়তো সৌজন্যের খাতিরে তাকে নিজের বাড়িতেও খাবারের দাওয়াত দিতে হবে এবং সেজন্য তাকে বেশ টাকা খরচ করতে হবে, যেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ একটি বিষয়। তার সার্বক্ষণিক ধান্দা তো হলো সম্পদ অর্জন করা, খরচ করা নয়।

কিন্তু তখন যদি আপনি তাকে জানান যে, আপনার সেই বিশেষ অতিথির হাতে একদম সময় নেই। সে নাস্তা করেই চলে যাবে। অন্য শহরে তার বিশেষ কাজ আছে। তাহলে দেখবেন, সে হয়তো বলবে, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি এখনই আসছি। কাজটা না হয় পরেই করবো।'

আপনার চারপাশে এমন অনেককে পাবেন, যারা ঘরকুনো স্বভাবের। পরিবারই তার কাছে সবকিছু। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তার জন্য প্রায় অসম্ভব। নিজের সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর যা কিছু তাকে করতে বলবেন, সে মানতে প্রস্তুত। সুতরাং আপনার উচিত হলো যেটা তার জন্য করা অসম্ভব, সেটার জন্য তাকে জোর-জবরদস্তি না করা। এছাড়াও পৃথিবীতে বহু স্বভাবের মানুষ আছে।

সবচে আকর্ষণীয় ব্যক্তি সে, যে মানুষের মনজয়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পেরেছে। সফরসঙ্গী কৃপণ হলে সেও খরচে মিতব্যয়ী হয়ে যায়। ফলে কৃপণও তাকে পছন্দ করে। আবেগপ্রবণ ব্যক্তির কাছে গেলে তার আবেগেও ঢেউ ওঠে। ফলে আবেগী ব্যক্তিও তাকে ভালোবাসে। যারা রসিকতা পছন্দ করে তাদের সঙ্গে দেখা হলে সে হালকা রসিকতা করে। তাই তাদের কাছেও সে কাঙ্ক্ষিত সঙ্গী।

মোটকথা, প্রত্যেক অবস্থায় আপনি অবস্থা-উপযোগী পোশাক ধারণ করুন। চাই সেটা দুঃখের হোক, কিংবা আনন্দের।

আসুন, আমরা একটু স্মৃতিচারণ করি। ফিরে যাই নববী যুগে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মক্কাবিজয়ের উদ্দেশ্যে বের

হয়েছেন। মক্কায় প্রবেশের পূর্বে মক্কার সরদার আবু সুফিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ঘটনা বেশ দীর্ঘ। মূল অংশ হলো, আবু সুফিয়ান রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আব্বাস রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আবু সুফিয়ান নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করতে ভালোবাসে। সুতরাং তার বড়ত্ব প্রকাশের মত কোনো সুযোগ করে দিন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করলেন, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ।'

আবু সুফিয়ান রাযি. যখন মক্কায় ফিরে যেতে উদ্যত হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন। এই সেই আবু সুফিয়ান, যে কোরাইশ গোত্রকে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধেও সে-ই বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলো, সবাইকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিলো। এই সেই সেনাপতি, বহু যুদ্ধের সাহসী যোদ্ধা। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হাঁকিয়ে কেটেছে তার জীবন। সবেমাত্র তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের শক্তিমত্তা দেখাতে চাইলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রাযি.কে ডাকলেন। আব্বাস রাযি. সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ

করবে তখন প্রবেশপথে যে সরু গিরিপথটি আছে সেখানে আপনি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে দাঁড়াবেন।'

হযরত আব্বাস রাযি. আবু সুফিয়ানকে নিয়ে নির্দেশিত স্থানে দাঁড়ালেন। মরুভূমিতে ধূলিঝড় তুলে সেখান দিয়ে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলছিলো মক্কা অভিমুখে। প্রত্যেক দলের অগ্রে ছিলো একটি করে পতাকা। প্রথম সৈন্যদলটি যখন অতিক্রম করলো, আবু সুফিয়ান রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বাস! এরা কারা?' আব্বাস রাযি. বললেন, 'এরা সুলাইম গোত্রের লোক।'

আবু সুফিয়ান রাযি. বললেন, 'সুলাইমের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!'

এরপর দ্বিতীয় সৈন্যদলটি অতিক্রম করলো। আবু সুফিয়ান রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?' আব্বাস রাযি. বললেন, 'এরা মাযীনা গোত্রের লোক।' আবু সুফিয়ান রাযি. বললেন, 'মাযীনা গোত্রের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' এভাবে একের পর এক সবক'টি দল চলে গেলো। প্রত্যেকটি দল যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান রাযি. তাদের পরিচয় জানতে চাচ্ছিলেন আর আব্বাস রাযি. যখন পরিচয় দিচ্ছিলেন, তিনি বলছিলেন, 'আমার এ গোত্রের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই।'

সর্বশেষে যে সৈন্যদলটি অতিক্রম করলো তাদের পতাকা ছিলো সবুজ বর্ণের। তাদের শরীর ছিলো লৌহবর্মে আবৃত। বর্মের ফাঁক দিয়ে শুধু তাদের চোখ দু'টোই দেখা যাচ্ছিলো। এই সৈন্যদলটি ছিলো মুহাজির ও আনসারদের, যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম। আবু সুফিয়ান রাযি. এ দলটি দেখে বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আব্বাস এটা কোন সৈন্যদল?' আব্বাস রাযি. বললেন, 'এটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের দ্বারা গঠিত সৈন্যদল।'

আবু সুফিয়ান রাযি. স্বগত কণ্ঠে বললেন, 'এতো রক্তিম মৃত্যুর ছদ্মবেশ। খোদার কসম! এদের সঙ্গে মোকাবেলা করার সাধ্য কারো নেই। হে আবুল ফযল! [আব্বাস রাযি.-এর উপনাম] তোমার ভাতুষ্পুত্র তো বিশাল রাজত্বের অধিকারী হয়েছে।'

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, 'আবু সুফিয়ান! [এটা রাজত্ব নয়] এটা হলো নবুওয়ত।'

আবু সুফিয়ান রাযি. বললেন, 'হ্যাঁ, সেটাই বলছি।'

যখন গোটা সৈন্যবাহিনী তাদেরকে অতিক্রম করে চলে গেলো তখন আব্বাস রাযি. আবু সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আবু সুফিয়ান! তোমার কওমকে বাঁচাও।' আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় চলে গেলেন এবং উচ্চ স্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করার সাধ্য তোমাদের কারো নেই। সুতরাং যে আমার ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।'

তারা বললো, 'খোদা তোমার ধ্বংস করুক। তোমার ঘরে কী সবার জায়গা হবে?'

আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আর যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সেও নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ।’ তখন লোকেরা কেউ ঘরে আর কেউ মসজিদে আশ্রয় নিলো।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নবীর কী অপূর্ব বিচক্ষণতা! কী অভিনব কৌশলে তিনি আবু সুফিয়ান রাযি.-এর মন জয় করে নিলেন। আর তার ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পন্থাটি প্রয়োগ করেছিলেন, সেটিই ছিলো তাকে কাবু করার সবচে উপযোগী পন্থা।

মানুষ বিভিন্ন প্রকারের হওয়া তাদের স্বভাবগত একটি বৈশিষ্ট্য। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বা অন্য কোনো কাজ করতে গিয়ে আপনি এটা উপলব্ধি করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে আপনি নিজেই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যেমন, কোনো মজলিসে আপনি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা বলুন। এরপর মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করুন।

আমার মনে আছে, একদিন আমি এক মাহফিলে হযরত ওমর রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করি। অগ্নিপূজক আবু লু'লু' কর্তৃক ওমর রাযি.কে ছুরিকাঘাত করার প্রসঙ্গে যখন পৌঁছলাম তখন একটু উঁচু স্বরে বললাম, ‘হঠাৎ আবু লু'লু' মিহরাবের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে ওমর রাযি.কে খঞ্জর দ্বারা তিন তিনটা আঘাত করলো। প্রথম আঘাত তার বুকে লাগলো। দ্বিতীয়টি পেটে। তারপর আবু লু'লু' শরীরের সর্বশক্তি একত্রিত করে তৃতীয় আঘাতটি করলো তার নাভীমূলে। এরপর খঞ্জর টান দিলে তার পাকস্থলী বের হয়ে এলো।’

আমি এই ঘটনা বলার সময় মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলাম। কাউকে এ ঘটনা শুনে চোখ বন্ধ করে ফেলতে দেখলাম। যেন সে এই মর্মান্তিক দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখছে। কেউ কেউ এ ঘটনা শুনে কেঁদে ফেললো। আর কাউকে দেখলাম, নির্বিকারভাবে শুনে যাচ্ছে। তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। যেন ঘুমানোর পূর্বে কোনো গল্প শুনছে!

অনুরূপ আপনি সকল শহীদের সরদার, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ হামযা রাযি. এর ঘটনা বর্ণনা করুন; কীভাবে তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন, কীভাবে তার পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হলো, কীভাবে তার নাক-কান কাটা হলো। এরপর দেখুন মানুষের প্রতিক্রিয়া।

এককথায় জীবন থেকে আমি এ শিক্ষা পেয়েছি যে, প্রতিটি সমাজেই এমন কিছু মানুষ অবশ্যই আছে যারা স্বভাবে রুক্ষ, যেভাবে কথা বলা উচিত সেভাবে বলে না এবং শ্রোতার সামনে সৌজন্য রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। একবার দেখলাম, এ ধরণের এক ব্যক্তি কয়েকজনের সঙ্গে বসে কোনো এক বিক্রেতার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলছিলো। কথা প্রসঙ্গে সে বললো, ‘সেই বিক্রেতাটা গাধার মত মোটা! কেন এই খালিদের মত!’ সে তার পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলো। আমি বুঝলাম না, একদম গাধার মত দেখতে লোকটা কীভাবে অবিকল খালিদের মত হলো?!

আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়। সেটা হলো—মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে গিয়ে কি নিজের স্বভাব পরিবর্তন করা সম্ভব? উত্তর হলো, হ্যাঁ! অবশ্যই সম্ভব।

হযরত ওমর রাযি. শাসন ও কঠোরতার ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর খেলাফতকালে জনৈক ব্যক্তির নিজ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলো। সে ওমরের কাছে জানতে এলো, তার স্ত্রীর সঙ্গে এখন সে কী আচরণ করবে? ওমর রাযি.-এর বাড়ির সামনে এসে দরজায় টোকা দিতে যাবে, এমন সময় সে শুনতে পেলো, ওমরের স্ত্রী উচ্চ স্বরে তাঁকে বকাঝকা করছে, আর ওমর নীরবে স্ত্রীর বকাবকি শুনে যাচ্ছেন। না তার কথার উত্তর দিচ্ছেন, না তাকে প্রহার করছেন। লোকটি ওমর রাযি.-কে না ডেকে দরজা থেকেই ফিরে যাচ্ছিলো। যে ওমর এত কঠোর, স্ত্রীর সঙ্গে তার এমন ভূমিকা দেখে সে একদম তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলো। হযরত ওমর রাযি. দরজায় শব্দ অনুভব করতে পেরে বের হয়ে এলেন এবং লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার?’

লোকটি বললো, ‘আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ করতে এসেছিলাম। এসে শুনলাম, আপনার স্ত্রী আপনাকে বকাবকি করছে!’

ওমর রাযি. বললেন, ‘শোনো! সে আমার স্ত্রী! আমার শয্যাসঙ্গিনী। সে আমার রান্না করে দেয়। আমার কাপড় ধুয়ে দেয়। তবুও কি তার সামান্য দুর্ব্যবহার আমি সহ্য করবো না?’

তবে এটা সত্য যে, কিছু মানুষ কোনো কিছুতেই শোধরায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত হলো, তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলা। আমার কাছে কেউ কেউ তার বাবার অতিরিক্ত রাগের কিংবা স্ত্রীর কৃপণতার ব্যাপারে অভিযোগ

করে। আমি তাদেরকে সংশোধনের কিছু পন্থা বলে দিলেও তারা জানায়, সব ধরনের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমাধান কী? সমাধান হলো, তাদের দুর্ব্যবহারের ওপর ধৈর্য ধরতে হবে। তাদের হাজারো ভালো আচরণের কথা স্মরণ করে অল্প কিছু খারাপ আচরণের কথা ভুলে যেতে হবে। যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কারণ, কিছু সমস্যা আছে, যার কোনো সমাধান নেই।

***সারকথা... যাদের সঙ্গে আপনি মেলামেশা করেন তাদের স্বভাব জানতে পারলে আপনি তাদের ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হবেন।***

# ২১. মুয়াবিয়ার সুতা-দর্শন!!

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের ঘটনা। একদিন তিনি গণিতের ক্লাস নিতে গিয়ে লক্ষ করলেন, কিছু ছাত্র বেশ অমনোযোগী এবং তারা তাদের হোমওয়ার্ক ঠিক মত করছে না। তিনি তাদের সংশোধনের জন্য একটি কৌশল বেছে নিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি ক্লাসে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'সবাই বই বন্ধ করো এবং খাতা-কলম হাতে নাও।' ছাত্ররা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন স্যার?' শিক্ষক বললেন, 'পরীক্ষা হবে! পরীক্ষা! আকস্মিক পরীক্ষা!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাত্ররা শিক্ষকের কথা মানলো এবং মনে মনে বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগলো। তাদের মধ্যে বিশাল বপু ও লঘু বুদ্ধির এক ছাত্র ছিলো। হঠাৎ রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কোনো অঘটন ঘটানোর ক্ষেত্রে তার বেশ খ্যাতি(?) ছিলো। সে শিক্ষকের উদ্দেশে চিৎকার করে বললো, 'স্যার! আমরা পরীক্ষা দেবো না। প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতেই আমাদের জান বের হয়ে যায়। প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষা দেবো কীভাবে?'

ছাত্রটি কথাগুলো এতটা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো যে, শিক্ষক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। শিক্ষক তাকে বললেন, 'এখানে সবকিছু তোমার খেয়াল-খুশিমত হবে না। পরীক্ষা তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে, বুঝেছো? আর যদি তোমার ভালো না লাগে তাহলে আমার ক্লাস থেকে বের হয়ে যাও।'

ছাত্রটিও যেন ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেলো। সেও চিৎকার করে বললো, ‘দরকার হলে আপনি ক্লাস হতে বের হয়ে যান।’

অবাধ্য ছাত্রের মুখে এমন অপমানজনক কথা শুনে শিক্ষক আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। ‘বেয়াদব’, ‘অপদার্থ’ ইত্যাদি বলতে বলতে তিনি ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মাঝের দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে আসছে। এদিকে ছাত্রটিও রুখে দাঁড়িয়েছে। এরপর যা ঘটার, তাই ঘটলো।

অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনার খবর বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছালো। কর্তৃপক্ষ ছাত্রটির জন্য এই শাস্তি নির্ধারণ করলো যে, তার রোল নাম্বার দু' ধাপ নামিয়ে দেয়া হবে এবং শিষ্টাচার বজায় রেখে চলার অঙ্গীকার করে তাকে একটি দরখাস্ত লিখতে হবে।

এদিকে ঐ শিক্ষকের অবস্থা এমন হলো যে, পুরো স্কুলে তাকে নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো। যাদের পাশ দিয়েই তিনি যান, দেখেন যে, তারা তাকে নিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা করছে। বিভিন্ন টিকা-টিপ্পনী, কটু মন্তব্য করছে। অবশেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখে অন্য বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

অন্য আরেক বিদ্যালয়ে এক শিক্ষক একই ঘটনার মুখোমুখি হন। কিন্তু তিনি খুব কৌশলে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

তিনিও একদিন ক্লাসে এসে ছাত্রদের বললেন, ‘সবাই কাগজ-কলম হাতে নাও। তোমাদের আজ আকস্মিক পরীক্ষা হবে।’

তাদের মধ্যেও এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি চাইলেই তো আমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন না।'

এ শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ছিলো পাহাড়ের মত দৃঢ়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার ওপর যে আরোহণ করতে চায়, তার ওজন কতটুকু। তিনি ভালো করেই জানতেন, জেদির সঙ্গে জিদ করা বোকামি।

তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ওহ আচ্ছা! এর অর্থ হলো, খালিদ পরীক্ষা দিতে চায় না।'

ছাত্রটি চিৎকার করে বললো, 'অবশ্যই'।

শিক্ষক তখন খুব শান্তভাবে বললেন, 'ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। যে পরীক্ষা দিতে চায় না, তার ব্যাপারে আমরা বিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেবো। ছেলেরা! তোমরা লেখো, প্রথম প্রশ্ন:

$$a + b = c + ১৫$$

...'

এই বলে তিনি একের পর এক প্রশ্ন লেখাতে শুরু করলেন।

জেদি ছাত্রটি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলো না। সে চিৎকার করে বললো, 'আমি পরীক্ষা দেবো না।'

শিক্ষক শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আমি কি তোমাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করছি? তুমি স্বাধীন। যেমন তুমি করবে, তেমন

ফলাফল পাবে।' শিক্ষকের এ কথার পর ছাত্রটি তাঁকে রাগানোর মত আর তেমন কিছু খুঁজে পেলো না। অবশেষে সে শান্ত হয়ে কাগজ-কলম বের করলো এবং সহপাঠীদের সঙ্গে প্রশ্নপত্র লিখতে লাগলো।

পরবর্তীতে তার এ ঘটনা বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কানে গেলে তারা তার ব্যাপারে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলো।

এই কল্পনানির্ভর ঘটনাটি আমার যখনই মনে পড়ে তখনই আমার যে বিষয়টি উপলব্ধি হয় তা হলো, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা সবার এক সমান নয়। কেউ পরিস্থিতিকে উত্তেজিত করে তোলে, আর কেউ নিমিষেই তা শান্ত করে ফেলতে পারে। একগুঁয়ে ব্যক্তির সঙ্গে একগুঁয়েমি করার ফলাফল হলো পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠা এবং তুমুল ঝগড়ার সূচনা হওয়া।

জ্ঞানীদের কাছে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আগুনের মোকাবেলা আগুন দ্বারা করা হলে শুধু তার তেজ ও লেলিহান শিখাই বাড়তে থাকবে। অপরদিকে ঠাণ্ডার সঙ্গে সবসময় ঠাণ্ডা ব্যবহার করলে কোনো কাজই ঠিকমত হবে না। সুতরাং মানুষের সঙ্গে আচরণবিধি কেমন হবে, তা বুঝতে মুয়াবিয়া রাযি.-এর সুতা সংক্রান্ত দর্শনের আশ্রয় নিন!

মুয়াবিয়া রাযি.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'আপনি গভর্নর হিসেবে বিশ বছর এবং খলীফা হিসেবে বিশ বছর—এত দীর্ঘ সময় কীভাবে মানুষের মাঝে শাসনকার্য পরিচালনা করলেন?'

মুয়াবিয়া রাযি. জবাবে বলেছিলেন, 'আমি জনগণ ও আমার মাঝে একটি সুতা রেখেছি। এক প্রান্ত আমার হাতে, অপর প্রান্ত জনগণের হাতে। তারা

যখন সে সুতা ধরে টান দেয় তখন আমি ঢিল দিই, যেন সুতাটা ছিঁড়ে না যায়। আর যখন জনগণ ঢিল দেয় তখন আমি টেনে ধরি।’

মুয়াবিয়া রাযি. সত্য বলেছেন। মানুষের সঙ্গে আচরণবিধির ক্ষেত্রে এটি একটি যথার্থ উক্তি। কত চমৎকার ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন মুয়াবিয়া রাযি.!

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি জেদি হয়, কেউ কাউকে ছাড় দিতে না চায় তাহলে তাদের সংসার নরকে পরিণত হতে সময় লাগে না। অনুরূপ দুই বন্ধুর উভয়ে যদি একগুঁয়ে হয় তাহলে তাদের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না।

একবার আমি এক জেলখানায় বয়ান করেছিলাম। জেলখানার সে অংশটি ছিলো খুনের আসামিদের জন্য নির্ধারিত।

আমি যখন বয়ান শেষ করলাম, সব কয়েদি তাদের নিজ নিজ সেলে ফিরে গেলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি এই বলে নিজের পরিচয় দিলেন যে, ‘আমি জেলখানায় বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজ-কর্ম পরিচালনার দায়িত্বশীল।’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এদের অধিকাংশের হত্যার মত অপরাধ সংঘটনের পেছনে কারণ কী?’

তিনি বললেন, ‘রাগ ও ক্রোধই হলো সকল নষ্টের মূল। এদের কেউ কেউ সামান্য কিছু টাকার জন্য দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে কিংবা ফিলিং স্টেশনের তেলবিক্রেতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।’

তখন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী মনে পড়ে গেলো:

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»

অর্থ: কাউকে ধরাশায়ী করার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই। প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। [সহীহ বুখারী: ৫৬৪৯, সহীহ মুসলিম: ৪৭২৩]

হ্যাঁ, সে প্রকৃতপক্ষে বীর নয়, যে মল্লযুদ্ধে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে সবাইকে পরাজিত করতে পারে। যদি এটাই বীরত্বের মাপকাঠি হতো তাহলে হিংস্র প্রাণীরা মানুষের চেয়ে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হতো। প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে বোঝে, কোন পরিস্থিতিতে তাকে কী রকম আচরণ করতে হবে। সে দক্ষতার সঙ্গে তার স্ত্রী, সন্তান, অফিসের বস, সহপাঠী সবাইকে আপন করে রাখে। ক্রোধের শিকার হয়ে কারো সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে না। হাদীসে আছে:

«لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

অর্থ: কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত না দেয়। [সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৮৯, সুনানে তিরমিযী: ১৩২২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ধৈর্যধারণে ও সহনশীলতায় অভ্যস্ত হতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

«إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ»

অর্থ: নিশ্চয়ই জ্ঞান অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে আর ধৈর্য নিহিত আছে

আত্মসংযমের অনুশীলনের মধ্যে। [আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী: ১৬২৯৬, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী: ১০৩৩৩]

হ্যাঁ, আত্মসংযমের অনুশীলনের মাধ্যমেই রাগ নিয়ন্ত্রণ হয়। প্রথম বার রাগ নিয়ন্ত্রণ করার সময় আপনার ১০০% কষ্ট হবে, দ্বিতীয় বার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে ৯০%। এরপর তৃতীয় বার আপনি যখন রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবেন তখন ৮০% পরিশ্রম করলেই চলবে। এভাবে আপনি অনুশীলন করতে থাকলে ধৈর্য ও সহনশীলতা একসময় আপনার স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে।

রাগ সংক্রান্ত একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেলো। একবার আমি একটি কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে 'আমলাজ' শহরে গিয়েছিলাম। জেদ্দা থেকে 'আমলাজ' তিনশ কিলোমিটার দক্ষিণে। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে এক যুবক ছিলো, যে হঠাৎ রেগে গিয়ে নানা তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতো। তারই একটি ঘটনা আপনাদের শোনাবো।

সে একবার গাড়ি নিয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য বের হলো। বিশেষ কোনো তাড়া না থাকায় সে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলো। পেছনেই একটি গাড়ি খুব দ্রুত আসছিলো এবং পথ ছেড়ে দেয়ার জন্য বারবার হর্ন বাজাচ্ছিলো।

কিন্তু যুবকটি তার গাড়ির গতি আরো কমিয়ে দিলো এবং হাত নেড়ে পেছনের গাড়িটিরও গতি কমাতে বললো। পেছনের গাড়ির চালক খুব বেশি সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারলো না। সে ঝুঁকি নিয়ে জোরে এক্সিলারেটরে

চাপ দিলো এবং তীরবেগে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেলো। অবশ্য কোনো গাড়িরই কোনো ক্ষতি হলো না।

তবে এ ঘটনায় যুবকটি রেগে আগুন হয়ে গেলো। এর চেয়ে তুচ্ছ কিছু ঘটলেও সে রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সেও তাদের ধরার জন্য গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো এবং বারবার তাদেরকে চিৎকার করে থামতে বললো। সে বারবার সিগন্যাল লাইটও জ্বালাচ্ছিলো।

এ অবস্থা দেখে সামনের গাড়িটি থামলো। তখন যুবকটি তার হাত-মোজা খুলে সিটের পাশে রেখে একটি রড হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, সে প্রচণ্ড রেগে আছে। হাতে তার লোহার শক্ত রড (সেটি ছিলো প্রয়োজনের সময় গাড়ির চাকার প্যাঁচ খোলার একটি র‍্যাঞ্চ)।

এমন সময় সে দেখলো, সামনের গাড়ি থেকে তিনজন যুবক নেমে আসছে। দেখতে যেন এক একজন বডিবিল্ডার! সুগঠিত পেশি কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে! যুবক তিনজন তার দিকে তেড়ে আসছিলো। তারা তার হাতে রডটি দেখতে পেয়েছিলো।

এ দেখে যুবকটি খুব ভয় পেয়ে গেলো। সে যেই না উপলব্ধি করলো যে, তারা রডটি দেখে ফেলেছে; সঙ্গে সঙ্গে আস্তে করে সেটা উঁচু করে ধরলো এবং বললো, ‘মাফ করবেন! এটা আপনাদের গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলো। এটা আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।’

তিনজনের একজন শান্তভাবে তার হাত থেকে রডটা নিয়ে নিলো এবং নিজেদের গাড়িতে উঠে চলে গেলো। আর সে বিদায় জানাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতে লাগলো!

**সমীকরণ...**

ক্রোধ + ক্রোধ = বিস্ফোরণ!

# ২২. হৃদয় জয়ের চাবিকাঠি

প্রত্যেক বন্ধ দরজা খোলার যেমন একটি চাবি থাকে তেমনই মানুষের হৃদয় জয়েরও একটি চাবি আছে। আর সে চাবি হলো, ব্যক্তির স্বভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। মানুষের সমস্যার সমাধান, তাদের দ্বন্দ্ব নিরসন, তাদের কাছ থেকে স্বার্থ উদ্ধার এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর সকল পদ্ধতি আপনার সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন আপনি তাদের স্বভাব সম্পর্কে অবগত হবেন।

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, কোনো যুবকের সঙ্গে তার পিতার মনোমালিন্য দেখা দিলো এবং এক পর্যায়ে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে বাবা ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিলো। পরবর্তীতে ছেলে কয়েকবার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলেও বাবা তার জিদ থেকে এক চুলও হটবার নয়।

এ অবস্থায় মীমাংসার উদ্দেশ্যে আপনি ছেলের বাবার কাছে গেলেন এবং শুরুতে তাকে শরীয়তের কিছু বিধি-বিধান শোনালেন। আত্মীয়তা ছিন্ন করার পাপ সম্পর্কেও তাকে সতর্ক করলেন। কিন্তু আপনার এ প্রচেষ্টায় ভদ্রলোকের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। সে তখনও ক্রোধে অগ্নিশর্মা।

এদিকে আপনি কিছু সময় কথাবার্তা বলে বুঝতে পেরেছেন যে, যুবকটির পিতা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল এবং আবেগপ্রবণ। এ পর্যায়ে আপনি তাকে বললেন, ‘জনাব! নিজের সন্তানের প্রতি কি আপনার এতটুকু মমতাবোধ

নেই! কোথাও তার একটু মাথাগোঁজার ঠাঁই নেই। খোলা আকাশই তার গায়ের চাদর। এভাবেই মাটির বিছানায় শুয়ে কাটছে তার দিন-রাত। আপনি এদিকে নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া করছেন আর বেচারা সকাল-সন্ধ্যা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ঘুরছে। যখন আপনি রুটির টুকরো মুখে দেন, তাকে কি একবারও মনে পড়ে না? সূর্যের কঠিন তাপে অস্থির হয়ে পড়া ছেলেটার প্রতি একবারও কি আপনার দয়া হয় না? সেই স্মৃতিগুলো কি আপনার মনে পড়ে না—যখন সে ছোট্ট ছিলো, আপনি তাকে কোলে তুলে নিতেন, আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তার ঘ্রাণ নিতেন, চুমু খেতেন?'

'আপনি বেঁচে থাকতে আপনার সন্তান পথে পথে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াবে, এটা কি আপনার কাছে ভালো লাগবে?'

দেখবেন, আপনার দরদভরা এই কথাগুলো বাবার স্নেহের সাগরে ঢেউ তুলবে। বাবা তখন সন্তানকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

আর যদি তার বাবা কৃপণ স্বভাবের হয় তাহলে তাকে বলুন, 'জনাব! সময় থাকতেই সতর্ক হোন। নিজেকে জটিলতায় জড়াবেন না। ছেলেকে তাড়াতাড়ি চোখের সামনে নিয়ে আসুন। আমি তো ভয় পাচ্ছি, ক্ষুধার তাড়নায় না জানি সে আবার চুরি-ডাকাতি করে বসে। তখন দেখবেন, কোর্টে গিয়ে সমস্ত খরচ ও ক্ষতিপূরণ আপনাকেই বহন করতে হবে। যত কিছু হোক, আপনি তো তার বাবা, তার অভিভাবক।' দেখবেন, কৃপণ বাবা ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কায় সে অস্থির হয়ে উঠবে।

কথাগুলো যদি ছেলেকে বলতে চান আর সে সম্পদপ্রিয় স্বভাবের হয় তাহলে এভাবে বলুন, ‘ভাই! বাবা ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই। দু'দিন পর যখন তুমি বিয়ে করবে, মোহরের টাকা কে পরিশোধ করবে? আজ যদি তোমার গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা মেরামত করার টাকা পাবে কোথায়? হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও তো লোক পাবে না। ওদিকে তোমার ভাইয়েরা তোমার বাবার থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেবে, টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু তারাই ভোগ করবে। আর তুমি এখানে বসে কিছুই করতে পারবে না। ভেবে দেখো, বাবার কপালে একটি চুমু দিয়ে কিংবা সান্ত্বনার সামান্য দু'একটি কথা বলে তুমি সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারো।’

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য কলহ মেটানোর জন্যও আপনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। মোটকথা, প্রত্যেকের হৃদয়ের দরজা খুলতে হবে তার উপযুক্ত চাবি দ্বারা।

ধরুন, আপনি যে অফিসে চাকরি করেন সে অফিসের বস কাউকে ছুটি দিতে চায় না। তার কাছে আবেগ ও সামাজিক ফরমালিটির কোনো স্থান নেই। সে বোঝে শুধু কাজ আর কাজ। তার কাছ থেকে যদি আপনার ছুটি নিতে হয় তাহলে তাকে বলুন, ‘স্যার! আমি কর্মোদ্যম ফিরে পাওয়ার জন্য তিনদিনের ছুটি চাই। তিনদিন পর আমি নব উদ্যমে কাজে যোগ দেবো। তীব্র কাজের চাপের কারণে আমি অনুভব করছি, দিন দিন আমার সৃজনশীলতা কমে যাচ্ছে। ব্রেনটাকে ফ্রেশ করার একটু সুযোগ আমাকে

দিন। মাত্র তিনদিন। দেখবেন, তিনদিন পর আমি আরো উদ্যমী ও কর্মঠ হয়ে কাজে ফিরবো।' এভাবে বলতে পারলে দেখবেন, কাজ হয়ে গেছে।

আর যদি বসের আচরণে আপনি বুঝতে পারেন যে, তিনি বেশ সামাজিক; সামাজিক বিষয়গুলোর প্রতি তিনি বেশ গুরুত্ব দেন, পরিবার ও সন্তানদের খুব ভালোবাসেন—সেক্ষেত্রে আপনি তাকে এভাবে বলুন, 'স্যার! আমার সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি কয়েকদিন ছুটি চাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে, যেন আমি এক পৃথিবীতে আর তারা অন্য পৃথিবীতে।'

আপনি যদি মানুষের হৃদয়জয়ের এসব কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে দেখবেন, অতি সত্বর মানুষ বলাবলি করবে, 'মানুষের মন জয় করার ক্ষেত্রে অমুকের কোনো জুড়ি নেই।'

**সারকথা...**

*প্রত্যেক মানুষকে জয় করার জন্য একটি বিশেষ চাবি আছে। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অবগত হলেই আপনি সেই কাঙ্ক্ষিত চাবিটির সন্ধান পাবেন।*

# ২৩. ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বিবেচনায় রাখুন

মানুষের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে তা পরিবর্তিত হয়। সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, স্থিরতা-অস্থিরতা এরূপ বিভিন্ন পরিস্থিতি মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে কারো খুব প্রিয় জিনিসও তার কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

মন যখন প্রফুল্ল থাকে তখন হাস্যরসিকতা সবার ভালো লাগে। কিন্তু দুঃখ ও বেদনার মুহূর্তে হাস্যরসিকতা কারো সহ্য হওয়ার কথা নয়। কাউকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার সঙ্গে রসিকতা করা যতটা অনুপযোগী, বনভোজনে বের হয়ে বন্ধুদের আনন্দ দেয়ার জন্য রসিকতা করা ততটাই উপযোগী। অর্থাৎ কোন আচরণ কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পাবে, সেটা নির্ভর করে অবস্থা ও পরিস্থিতির ওপর। এটি একটি স্বীকৃত বিষয় এবং এখানে তা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমি যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি সেটা হলো, কারো সঙ্গে কথাবার্তা, আচার-আচরণের পূর্বে আমরা অবশ্যই যেন তার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করি এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখি।

মনে করুন, কোনো মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে। মহিলার মা-বাবা বেঁচে নেই। ভাই-ভাবীর বাসাই এখন তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেখানে আশ্রয় নেয়ার জন্য সে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিচ্ছে।

ঠিক সে সময় প্রতিবেশী জনৈক মহিলা তার খোঁজ-খবর নিতে এলো। সে হাসিমুখে তাকে বসতে বলে চা-নাস্তা নিয়ে এলো। চা পান করতে করতে প্রতিবেশী মহিলাটি সৌজন্যমূলক কী বলে কথা শুরু করবে—তা ভাবতে লাগলো। এরই মধ্যে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটি বললো, 'আপা! গতকাল আপনাদের একসঙ্গে কোথায় যেন যেতে দেখলাম?'

প্রতিবেশী মহিলাটি বললো, 'ও আচ্ছা! বাচ্চার বাবা (তার স্বামী উদ্দেশ্য) গতকাল আমাকে বারবার বলছিলো, "চলো! বাইরে কোথাও গিয়ে ডিনার করি।" কী আর করা! ওর সঙ্গে বের হতে হলো। মার্কেট থেকে ও একটা গাউন কিনলো আমার বোনের বিয়েতে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য। আরেকটা শপিংমল থেকে আমাকে কিছু চুড়ি কিনে দিলো বিয়ের অনুষ্ঠানে পরার জন্য। বাড়িতে ফিরে দেখলাম বাচ্চারা মন খারাপ করে বসে আছে। ওদের বাবা তখন ওদেরকে আগামী সপ্তাহে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে সান্ত্বনা দিলো।'

অসহায় তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটি তার প্রতিবেশীর এসব কথা শুনছিলো আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলো। সে ভাবছিলো, একটু পর ভাবীর বাসায় একজন অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে সে কেমন আচরণ পাবে?

প্রশ্ন হলো, মাত্রই যে মহিলার সংসার ভেঙে গেছে তার সঙ্গে এরূপ আলোচনা করাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? আপনার কী মনে হয়? এ ঘটনার পর ঐ প্রতিবেশী মহিলার প্রতি তার হৃদয়ের টান আরো বাড়বে? তার সঙ্গ পেতে সে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে? তাকে দেখলে সে খুশি হবে?

নিশ্চয়ই আমাদের সকলের সম্মিলিত উত্তর হবে, 'না'। বরং প্রতিবেশী মহিলার কথায় তার অন্তরে ঈর্ষা-হিংসা ও ক্রোধের অগ্নি জ্বলে উঠবে।

তাহলে সমাধান কী? পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সে কি মিথ্যার আশ্রয় নেবে? কক্ষনো না। কেন সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে যাবে? বরং আলোচনাকে সে দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষেপে শেষ করবে। সে এমন বলতে পারে, 'আপা! আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ ছিলো তো, তাই একটু বের হতে হয়েছিলো।' তারপর সে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে এবং তালাকপ্রাপ্তা অসহায় মহিলাটিকে কিছু কথা বলে সান্ত্বনা দেবে, ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। দুই বন্ধু একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে। একজন খুব ভালো ফলাফল করেছে, কিন্তু অপরজন কয়েক বিষয়ে ফেল করেছে কিংবা এত কম নম্বর পেয়ে পাশ করেছে যে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। যে ভালো রেজাল্ট করেছে সে নামী-দামী এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, কিন্তু অপর বন্ধুর ভাগ্যে জুটলো একরাশ হতাশা।

প্রশ্ন হলো, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছে সে যখন তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে, তখন যদি সে তার সঙ্গে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানের নানা সুযোগ-সুবিধার কথা নিয়ে আলোচনা করে, সেটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাবেও নিশ্চয়ই সবাই বলবেন, 'না'।

তাহলে করণীয় কী? করণীয় হলো, সে এমন সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, যাতে বন্ধুর মানসিক চাপ কিছুটা হলেও লাঘব

হবে। যেমন সে বলতে পারে, ‘এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে অনেক চাপ ছিলো, অনেকে পরীক্ষা দেয়ার পরও খুব অল্প সংখ্যক কৃতকার্য হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরে কৃতকার্য বহু ছাত্রও নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে।’ কারণ এ জাতীয় আলোচনায় বন্ধুর চাপ কিছুটা হলেও লাঘব হবে এবং সে এ বন্ধুর সঙ্গ পেতে আগের চেয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে। বন্ধুর প্রতি তার হৃদ্যতা ও ভালোবাসা আরো বাড়বে। সে তার সবচে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। দুই বন্ধুর পরস্পর দেখা হলো। একজনের পিতা বেশ উদার। ছেলেকে হাত খরচের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা দেন। অপরজনের বাবা ভীষণ কৃপণ। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে এত কম টাকা দেন যে, তার চলতে খুব কষ্ট হয়।

এক্ষেত্রে সচ্ছল বন্ধু যদি অপর বন্ধুর সঙ্গে নিজের বাবার উদারতা নিয়ে গল্প করে, তার কাছে এখন হাতখরচের কত টাকা আছে—তা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে শুরু করে তাহলে তা তার অসচ্ছল বন্ধুর অস্বস্তির কারণ হতে পারে। এ আলোচনার ফলে তার মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং নিজের বাবার ত্রুটির দিকটা তাকে আরো কষ্ট দেবে। পরবর্তীতে এ বন্ধুর সঙ্গে চলাফেরা করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। সে ভাববে, বন্ধুর সঙ্গে তার চিন্তা-চেতনায় বিস্তর ফারাক।

এজন্যই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরের আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ»
অর্থ: তোমরা কুষ্ঠরোগীর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকো না। [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫৩৩, মুসনাদে আহমদ: ১৯৭৮]

কুষ্ঠরোগ এমন এক ব্যাধি যা চামড়ার উপরিভাগকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেয়। তাই কুষ্ঠরোগী কারো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে যদি তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে সে লজ্জা পাবে এবং ব্যথিত হবে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কাবিজয়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলেন, আবু বকর রাযি.-এর পিতা আবু কোহাফা—যিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন—তাঁর নাতনিকে বললেন, 'আমাকে একটু আবু কুবাইস পাহাড়ের কাছে নিয়ে যেতে পারবি? লোকেরা যা বলাবলি করছে তা কতটুকু সত্য, একটু দেখে আসি। শুনছি, মুহাম্মাদ নাকি মক্কা আক্রমণ করতে আসছে।'

নাতনি দাদাকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালো। দাদা বললো, 'বেটি! তুই কী দেখতে পাচ্ছিস?'

'বিশাল এক দলকে এগিয়ে আসতে দেখছি।'

'এটাই তাহলে সেই বাহিনী।'

মেয়েটি বললো, 'দাদা! সে এ বাহিনীর সেনাপতি হবে। সৈন্যদেরকে সে

দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।'

মেয়েটি হঠাৎ শঙ্কিত স্বরে বললো, 'দাদাজি! সৈন্যবাহিনী তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।'

দাদা দ্রুত বললো, 'তাহলে তারা এবার মক্কার দিকে আসছে। অতি সত্বর তারা পৌঁছে যাবে। আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল। কারণ তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে নিজ ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ।'

মেয়েটি দাদাকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে বাড়ি পৌঁছার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে পড়ে গেলো। আবু বকর রাযি. বাবাকে দেখে এগিয়ে এলেন এবং বুকভরা আবেগ নিয়ে মোবারকবাদ জানালেন। তারপর তাঁর হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন। নবীজী তখন মসজিদে ছিলেন।

নবীজী আবু কোহাফার দিকে তাকালেন। দেখলেন, অতি বার্ধক্যে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। অস্থি-মজ্জায় আগের সেই শক্তি নেই। 'আজাল' বুঝি অতি নিকটে। নবীজী এবার আবু বকরের দিকে তাকালেন। দেখলেন, পুত্র অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পিতার দিকে। ইসলামের জন্য কত দিন তিনি পিতার সান্নিধ্যবঞ্চিত ছিলেন! আজ কত বছর পর পিতা ও পুত্রের এই সাক্ষাত-মিলন!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযি.কে খুশি করার জন্য এবং তাঁর প্রতি আপন গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তাঁকে বললেন, 'আবু বকর!

আপনি কেন উনাকে বাড়িতে রেখে আসলেন না? আমি নিজে গিয়ে উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম।'

আবু বকর রাযি. জানতেন, তারা এখন যুদ্ধের ময়দানে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেনাপতি। সময়ের তুলনায় তাঁর কাজ অনেক বেশি। এ মুহূর্তে বাড়িতে গিয়ে তাঁর পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় বের করা নবীজীর জন্য অনেক কঠিন। তাই তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁর কাছে যাওয়ার চেয়ে তিনি আপনার কাছে আসবেন, এটাই শ্রেয়।'

নবীজী আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আবু কোহাফাকে সামনে বসালেন। তাঁর বক্ষে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি ইসলাম কবুল করে নিন।' আবু কোহাফার চেহারা উদ্ভাসিত হলো। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। পিতার ইসলামগ্রহণে আবু বকর রাযি. এত খুশি হলেন যে, পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় তুলে দিলেও হয়তো তিনি এত খুশি হতেন না।

নবীজী তাকিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ আবু কোহাফা রাযি.-এর চুল-দাড়িতে শুভ্রতার ছোঁয়া লেগেছে। তাই তিনি আবু বকরকে বললেন, 'এ শুভ্রতাকে খিযাবে রাঙিয়ে দাও। তবে তা যেন কৃষ্ণপ্রায় না হয়ে যায়।' [মুসনাদে আহমদ: ২৫৭১৮, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭৩৩১] এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সঙ্গে আচরণ ও উচ্চারণে তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতেন।

মক্কায় প্রবেশের সময় তিনি সৈন্যবাহিনীকে কয়েকটি দলে ভাগ করেন। একটি দলের পতাকা দেন বিখ্যাত সাহাবী খাযরাজ গোত্রের সরদার সা'দ বিন উবাদা রাযি.-এর হাতে। যুদ্ধক্ষেত্রে 'বাহিনীপ্রধান' হিসেবে পতাকা বহন ছিলো মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। এ সম্মান শুধু ব্যক্তির নয়, বরং পতাকাবাহীর পুরো গোত্রের সম্মান।

সা'দ রাযি. মক্কার দিকে তাকালেন। তাকালেন মক্কার অধিবাসীদের দিকে। তিনি ভাবলেন, এরাই তো এতদিন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। পথহারা মানুষকে রাসূলের নূরানী সংস্পর্শে আসতে বাধা দিয়েছে। এরাই সুমাইয়া রাযি. ও ইয়াসির রাযি.কে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, বেলাল ও খাব্বাবের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। আজ এদের কোনো ক্ষমা নেই। উপযুক্ত শাস্তি এদের পেতেই হবে। সা'দ রাযি. পতাকা উত্তোলন করে বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'আজ লড়াইয়ের দিন, আজ হারাম-সীমানায় রক্তপাতের দিন।'

সা'দ রাযি.-এর এই ভয়ঙ্কর হুমকি শুনে কোরাইশরা শঙ্কিত হয়ে পড়লো। ভীতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। তারা ভাবলো, আজ কারো নিস্তার নেই। মুসলমানরা সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। জনৈকা মহিলা দ্রুত নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সা'দ রাযি.-এর হুমকিতে কোরাইশদের চরম ভীত হয়ে পড়ার বিষয়টি অবগত করলো। সে উপস্থিত-স্বরচিত কবিতার ছন্দে বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করলো:

হে হেদায়েতের নবী! কোরাইশদের সকল আশ্রয় শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনিই তাদের আশ্রয়স্থল। সুপ্রশস্ত পৃথিবী যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, তাদের আকাশ-প্রভু যখন তাদের সঙ্গে বৈরিতা প্রদর্শন করছে তখন আপনিই তাদের আশা-ভরসার স্থল। সা'দ তো হুন ও বাতহা এলাকার লোকদের মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দিতে চায়। এই খাযরাজী সেনাপতি তো শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। তীব্র ক্রোধে সে আমাদের ওপর তীর-বর্শা নিক্ষেপ করবে। এই কৃষ্ণ সিংহ ও রক্ত লেহনকারী বাঘ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। সে যদি পতাকা হাতে পতাকারক্ষীদের ডাক দেয় তাহলে কোরাইশ জনপদ ঊষর মরুতে পরিণত হবে। সে এক উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কোরাইশকে হত্যা করতে চায় ঠিক বধির সাপের ন্যায়।

মহিলার কবিতা শুনে নবীজীর হৃদয়ে দয়া ও সহানুভুতির তরঙ্গ-জোয়ার সৃষ্টি হলো। মহিলাটি যেহেতু খুব আশা নিয়ে নবীজীকে বিষয়টি জানিয়েছিলো, নবীজী তাকে নিরাশ করতে চাইলেন না। আবার সা'দের হাতে নেতৃত্বের পতাকা দেয়ার পর তা ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর মনে আঘাতও দিতে চাইলেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ রাযি.-এর হাতের পতাকা তাঁর পুত্র কায়েস বিন সা'দ রাযি.কে দিতে বললেন। কায়েস পতাকা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পিতা সা'দ তাঁর পাশে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগলেন। সা'দের হাতে পতাকা না দেখে ঐ মহিলা ও কোরাইশরা খুশি হলো। এদিকে সা'দও মনোঃক্ষুণ্ণ হলেন না। কারণ, তিনি তো তখনো

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে বহাল আছেন। তদুপরি পতাকাবাহনের কষ্টও তাঁকে করতে হচ্ছে না। এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?!

তাই আপনিও এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করুন, যেন কাউকে হারাতে না হয়; লক্ষ্যও অর্জন করুন, সবার মনও জয় করে নিন। হোক তাদের চাওয়া ও উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাতে কী?!

**সিদ্ধান্ত...**

আমাদের আচরণ হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে দেহের কোনো আদান-প্রদান নয়।

# ২৪. অন্যকে গুরুত্ব দিন

স্বভাবগতভাবে মানুষ অন্যের কাছে মূল্যায়ন ও সম্মান আশা করে। বিভিন্ন আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে থাকে। এমনকি মানুষ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক সময় নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে কাল্পনিক কাহিনীও তৈরি করে থাকে।

মনে করুন, একজন লোক দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, সন্তানেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। এগারো বছর বয়সের বড় সন্তানটি ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয়জন খাবার খাচ্ছে, তৃতীয়জন খেলনা নিয়ে খেলছে আর চতুর্থজন খাতা-কলম নিয়ে লিখছে।

ঘরে প্রবেশ করে তিনি উচ্চ স্বরে সালাম দিলেন—'আসসালামু আলাইকুম'। কিন্তু কেউ তাঁর প্রতি মনোযোগী হলো না। বড় ছেলে ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয়জন খেলনা নিয়ে ব্যস্ত, তৃতীয়জন খাবারে মগ্ন। তবে চতুর্থজন একটু ব্যতিক্রমী কাজ করলো। বাবাকে দেখে সে খাতা-কলম রেখে উঠে দাঁড়ালো, হাসিমুখে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেলো এবং বাবার হাতে চুমু খেলো। এরপর পুনরায় নিজের কাজে ফিরে এলো।

এবার বলুন, চারজনের মধ্যে পিতা কাকে বেশি ভালোবাসবেন? আমার বিশ্বাস—আমাদের সকলের উত্তর এক ও অভিন্ন হবে। সকলেই উত্তর দেবেন, 'চতুর্থজনকেই পিতা বেশি ভালোবাসবেন'। আর এই অধিক ভালোবাসা এ কারণে নয় যে, সে অন্যদের চেয়ে সুদর্শন কিংবা অধিক

মেধাবী। বরং এর কারণ এই যে, সে তার পিতাকে বোঝাতে পেরেছে, ‘তার পিতা তার কাছে একজন সম্মানিত ব্যক্তি’।

তো এটাই স্বাভাবিক যে, আপনি অন্যকে সম্মান করলে সেও আপনাকে ভালোবাসবে, মূল্যায়ন করবে। সৃষ্টিকুলের সরদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। আপন আচরণে প্রত্যেককে তিনি এ কথা বোঝাতেন যে, তার সমস্যা রাসূলের নিজেরই সমস্যা, তার দুঃখ রাসূলের নিজেরই দুঃখ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বয়ান করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায়। সে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোও জানে না।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ করে দেখলেন, সে এক আরব বেদুঈন। আরব বেদুঈনদের স্বভাবজাত বেপরোয়া ভাব ও একগুঁয়েমির কথা তো সুপ্রসিদ্ধ। হয়তো সে এতটুকু অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত নয় যে, নবীজী বয়ান শেষ করে তার সঙ্গে কথা বলবেন। হতে পারে এর আগেই সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে এবং আর কোনো দিন হয়তো ফিরে আসবে না। ফলে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি তার আর জানাও হবে না।

রাসূল বুঝলেন, বিষয়টি তার দৃষ্টিতে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে বয়ান স্থগিত রেখে দ্বীনের আহকাম জানতে চাচ্ছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বিষয়কে কেবল আপন দৃষ্টিভঙ্গিতেই ভাবতেন না, ভাবতেন অন্যদের

দৃষ্টিভঙ্গিতেও। তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং একটি চেয়ার আনতে বললেন। এরপর লোকটির সামনে বসে তাকে দ্বীনের বিভিন্ন বিধি-বিধান বোঝাতে লাগলেন। লোকটি সবকিছু ঠিকভাবে বুঝে নেয়ার পর তিনি মিম্বরে ফিরে এলেন এবং বয়ান সমাপ্ত করলেন। কত মহান, কত ধৈর্যশীল আমাদের নবী! মহত্ত্ব ও ধৈর্যের কী অনুপম নমুনা!

আর সাহাবায়ে কেরাম তো নববী শিক্ষাঙ্গনেই শিক্ষালাভ করেছেন। তারা অর্জন করেছেন নববী শিক্ষা, নববী দীক্ষা। তাই তারাও অন্যদের প্রতি মনোযোগী হতেন। অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করতেন, অভিবাদন জানাতেন, অন্যদের সুখে-দুঃখে শরিক হতেন। অন্যের সুখকে নিজের সুখ এবং অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করতেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এর অসংখ্য নমুনা রয়েছে। তারই একটি হযরত কা'ব রাযি.-এর সঙ্গে তালহা রাযি.-এর সেই বিশেষ আচরণটি, যা কা'ব রাযি. জীবনের শেষ সময়েও ভুলে যাননি।

কা'ব বিন মালিক তখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। দুর্বল হয়ে গেছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অস্থি-মজ্জা যেন শুকিয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তিও অনেকটা লোপ পেয়ে এসেছে। তিনি তার যৌবনের স্মৃতিচারণ করছিলেন। স্মরণ করছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ গাযওয়া ‘তাবুক যুদ্ধ’ হতে তাঁর পশ্চাদ্গামিতার সেই বিশেষ ঘটনাটি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে জিহাদের এলান করলেন এবং আসবাবপত্র প্রস্তুত করতে বললেন। সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির

জন্য তাদের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী জমা করলেন। জিহাদের জন্য নাম লেখালেন প্রায় ত্রিশহাজার সাহাবী। সময়টা ছিলো ফল ও ফসল ঘরে তোলার মওসুম। গাছে গাছে ঝুলছে পাকা-আধাপাকা ফল, গাছের নিবিড় ছায়ায় বসলে মন জুড়িয়ে যায়। ওদিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহের মাঝে দীর্ঘপথের সফর; শত্রুবাহিনীও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী। মুসলিম সৈন্যসংখ্যাও ছিলো অনেক। তাই তাদের সকলের নাম একত্রে কোনো কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।

কা'ব রাযি. বলেন, আমি তখন পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিক সচ্ছল ছিলাম। দু'টি উটও ক্রয় করে রেখেছিলাম জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য। বাগানের ছায়াঘেরা পরিবেশ আর ফসলের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করে করে আমি আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলাম। একদিন শুনলাম, আগামীকাল ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। মনে মনে ভাবলাম, আগামীকাল বাজারে গিয়ে জিহাদের আসবাবপত্র ক্রয় করবো এবং কাফেলার সঙ্গে মিলিত হবো।

আমি পরদিন বাজারের দিকে রওয়ানা হলাম। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে সেদিন আর কিছু কেনা হলো না। মনে মনে ভাবলাম, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল রওয়ানা হবো এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হবো। সেদিনও কিছু বিষয়ের কারণে আমি আর জিহাদের আসবাবপত্র কিনতে পারলাম না। মনে মনে সেদিনও ভাবলাম, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ রওয়ানা হবো। এভাবে যাচ্ছি-যাবো করে কয়েকদিন কেটে গেলো এবং আমি নবীজীর কাফেলা

থেকে বিচ্ছিন্নই রয়ে গেলাম। আমি বাজারে যেতাম এবং মদীনায় ঘোরাফেরা করতাম। কট্টর মুনাফিক অথবা যুদ্ধে যেতে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে আমি মদীনায় দেখিনি।

এভাবে শেষ পর্যন্ত হযরত কা'বের আর যাওয়া হলো না। তিনি মদীনাতেই রয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশহাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ইতোমধ্যে তাবুক প্রান্তরে পৌঁছে গেছেন। গন্তব্যে পৌঁছে তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সাহাবীদের দিকে তাকালেন। কিন্তু তিনি একজনকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বায়আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একনিষ্ঠ একজন সাহাবীকে তিনি খুঁজে পেলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘কা'ব বিন মালিক এ কী করলো?!’

একজন বলে উঠলো, ‘আল্লাহর রাসূল! সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেই সে জিহাদে শরিক হয়নি।’ এ কথা শুনে মুআয বিন জাবাল রাযি. বললেন, ‘ভাই! এ কী মন্তব্য করলে! কতই না মন্দ মন্তব্য করলে! আল্লাহর কসম হে আল্লাহর নবী! তার সম্পর্কে আমরা ভালো ধারণাই পোষণ করি।’ নবীজী কিছুই বললেন না।

কা'ব রাযি. বলেন, অভিযান শেষে রাসূলের মদীনায় ফেরার সময় ঘনিয়ে এলে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম—রাসূলের কাছে কী কৈফিয়ত দেবো? কোন অজুহাত পেশ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না? আমি পরিবারের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলাম। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো

যে, কোনো প্রকার লুকোছাপা নয়, বরং সত্য স্বীকারোক্তির মাঝেই আমার মুক্তি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লেন। এরপর সাহাবীদের নিয়ে বসলেন। যুদ্ধে অনুপস্থিত মুনাফিকরা এসে বিভিন্ন ওযর পেশ করতে লাগলো এবং মিথ্যা কসম খেতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিলো আশিরও বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ওযর গ্রহণ করে নিলেন এবং তাদের জন্য ইসতেগফার করলেন। আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করলেন।

কা'ব বিন মালিক এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন। রাসূল তাঁর দিকে তাকিয়ে মলিন মুখে মুচকি হাসলেন। কা'ব রাযি. রাসূলের সামনে এসে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কা'ব, তুমি জিহাদে শরিক হলে না কেন? তুমি কী বাহন ক্রয় করোনি?'

'হ্যাঁ, ক্রয় করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

'তবে তুমি মদীনায় রয়ে গেলে কেন?' নবীজী জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে কা'ব রাযি. বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আপনি ব্যতীত অন্য কারো সামনে হলে—আমার বিশ্বাস—আমি অবশ্যই অজুহাত দেখিয়ে তার অসন্তুষ্টি হতে মুক্ত হয়ে যেতে পারতাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাকে বিতর্ক করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তবে আমি নিশ্চিত জানি, আজ

মিথ্যা বলে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলেও অচিরেই আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সত্য প্রকাশ করে দেবেন এবং তখন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আর সত্য বললে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আমার কোনো ওযর ছিলো না। আর আমি ইতিপূর্বে কখনো এত সচ্ছল ও সম্পদের অধিকারীও ছিলাম না।'

এ কথা বলে কা'ব রাযি. চুপ হয়ে গেলেন। নবীজী সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে তোমাদের সঙ্গে সত্য বলেছে।' এরপর কা'ব রাযি.কে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি আপন অবস্থায় থাকো। দেখি, আল্লাহ পাক তোমার সম্পর্কে কী ফায়সালা করেন।'

কা'ব রাযি. তাঁর ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চিন্তিত ও ব্যথিত অবস্থায় মসজিদ হতে বের হলেন। তিনি জানেন না, তার সম্পর্কে আল্লাহ কী ফায়সালা করবেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আপন গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি তার পিছু পিছু বের হলো এবং তাকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো, 'আমাদের জানামতে ইতিপূর্বে কখনো তুমি অন্যায় করোনি। তুমি তো একজন কবি, তুমি কেন অন্যদের মত রাসূলের নিকট অজুহাত পেশ করলে না? তাহলে তো তোমার প্রতি আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন এবং পরবর্তীতে তোমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দিতেন।'

কা'ব রাযি. বলেন, লোকদের উপর্যুপরি ভর্ৎসনার কারণে একপর্যায়ে আমার মনেও চিন্তা জাগলো, রাসূলের নিকট গিয়ে বলি যে, 'আল্লাহর রাসূল! আমি

পূর্বে যা বলেছি তা মিথ্যা ছিলো।' কা'ব রাযি. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মত আর কেউ কি আছে?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ, দু'জন ব্যক্তি তোমার মতই সত্য বলেছে। তাদেরকেও তোমার মত জবাব দেয়া হয়েছে।' কা'ব রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা দু'জন কে?' লোকেরা জানালো, 'মুরারা বিন রাবী' ও হেলাল বিন উমাইয়া।'

কা'ব মনে মনে ভাবলেন, তারা উভয়ই নেককার, উভয়ই বদরী সাহাবী। তাদের কাজ থেকে আমার শিক্ষা নেয়া উচিত এবং তাদের মতই সত্যের ওপর অটল থাকা উচিত। তাই আমি এ বিষয়ে আর রাসূলের নিকট যাবো না এবং মিথ্যা বলবো না।

এরপর কা'ব রাযি. ব্যথাভরা মনে একাকী বাড়িতে ফিরলেন। কিছুক্ষণ পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কা'ব রাযি. এবং তার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

কা'ব রাযি. বলেন, সবাই আমাদেরকে এড়িয়ে চলতো। আমি বাজারে যেতাম, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমাদের সঙ্গে সকলের আচরণ বদলে গেলো। কেউ যেন আমাদেরকে চেনে না। মদীনার প্রাচীরগুলোও যেন বদলে গেছে। এ যেন আমাদের সেই চিরচেনা প্রাচীর নয়। আমাদের চিরচেনা মদীনার মাটিও যেন আজ বড় অচেনা। আমার সঙ্গীদ্বয় রাত-দিন ঘরে বসে কাঁদতো। তারা বাইরেও বের হতো না, সন্ন্যাসীর ন্যায় রাত-দিন ইবাদতে মগ্ন থাকতো। তিনজনের মধ্যে আমি ছিলাম বয়সে নবীন ও অধিক শক্তিশালী। আমি বাইরে বের হতাম, মুসলমানদের সঙ্গে জামাতে নামায

পড়তাম, বাজারে যেতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতো না। আমি মসজিদে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতাম। আর লক্ষ করতাম, আমার সালামের উত্তরে তাঁর ঠোঁট নড়ছে কিনা? আমি রাসূলের নিকটে নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাতাম। আমি নামাযে মনোযোগী হলে তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আর আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরালে তিনি চেহারা ফিরিয়ে নিতেন।

এ অবস্থায় হযরত কা'বের কয়েকদিন কেটে গেলো। দিন দিন তাঁর কষ্ট বেড়েই চলছিলো। তিনি নিজ বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। বংশের শ্রেষ্ঠতম কবি। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাগণ তাঁকে চেনেন এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভার যথেষ্ট মূল্যায়ন করে থাকেন। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাক্ষাতে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন। কা'ব মদীনায় তাঁর নিজ গোত্রেই আছেন। কিন্তু না কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে, না কেউ তাঁর দিকে ফিরে তাকায়। একাকিত্বের এই জীবন যখন তাঁর জন্য দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ালো, ঠিক তখনই তিনি আরেকটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন।

সেদিন তিনি বাজারে ঘুরছিলেন, হঠাৎ শাম দেশের জনৈক খৃস্টান এসে লোকদেরকে বললো, ‘দয়া করে আমাকে কা'ব বিন মালিককে চিনিয়ে দিন।’ লোকেরা ইশারায় হযরত কা'ব রাযি.কে দেখিয়ে দিলো। লোকটি কা'বের নিকট এসে তাকে গাসসানের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি চিঠি অর্পণ করলো। কা'ব রাযি. মনে মনে বললেন, ‘আশ্চর্য! আমার সংবাদ

শামদেশেও পৌঁছে গেছে! গাসসানের বাদশাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি! কী মতলব তার?'

কা'ব চিঠিটি খুললেন। তাতে লেখা আছে, 'কা'ব বিন মালিক! আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার সঙ্গী তোমার সঙ্গে নির্দয় ও অন্যায় আচরণ করছে এবং তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তুমি চাইলে আমাদের দেশে চলে আসতে পারো। আমরা তোমার সহমর্মী হবো। আমাদের কাছে তুমি সম্মান ও শান্তি পাবে।'

চিঠি পড়া শেষ করে হযরত কা'ব রাযি. বলে উঠলেন, 'ইন্না লিল্লাহ! কাফিররাও আমাকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করেছে! এ তো আমার জন্য বড় ভয়ের কথা! এ তো বড় কঠিন পরীক্ষা!' তিনি চিঠিটি দ্রুত চুলার আগুনে নিক্ষেপ করলেন।

কা'ব রাযি. কাফির বাদশাহর প্ররোচনায় প্রভাবিত হননি। বিলাসবহুল অট্টালিকার দ্বার, রাজপ্রাসাদ ও রাজদরবার তাঁর জন্য উন্মুক্ত ছিলো। পার্থিব সম্মান ও রাজ-সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তাঁকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছিলো। এদিকে মদীনা ও মদীনার জীবন তাঁর জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। হাসিমুখে কথা বলার কেউ নেই। সালামের উত্তর দেয়ার কেউ নেই। প্রশ্নের জবাব দেয়ারও কেউ নেই। এতদসত্ত্বেও তিনি কাফিরদের ফাঁদে পা দেননি, শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হননি। প্রলোভনের বার্তাকে তিনি আগুনে নিক্ষেপ করেছেন।

দীর্ঘ একমাস কেটে গেছে। কষ্ট ও অসহ্য যন্ত্রণার সময় দীর্ঘায়িত হচ্ছে। অপেক্ষার এক একটি মুহূর্ত বড় কষ্টে অতিবাহিত হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না, সিদ্ধান্তমূলক ওহীও অবতীর্ণ হচ্ছে না। চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে রাসূলের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক এসে কা'বের দরজায় কড়া নাড়লো। একবুক আশা নিয়ে কা'ব রাযি. বেরিয়ে এলেন, হয়তো ক্ষমা ও মুক্তির বার্তা এসে গেছে। কিন্তু না; বার্তাবাহক জানালেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে স্ত্রী থেকেও পৃথক থাকতে বলেছেন!’

কা'ব জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেবো?’ বার্তাবাহক বললেন, ‘না, আপনি কেবল তার থেকে পৃথক থাকুন এবং স্ত্রীসুলভ আচরণ হতে বিরত থাকুন।’ কা'ব রাযি. তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আমার বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা আসার আগ পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই থেকো।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের নিকটও একই আদেশ পাঠালেন।

হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী এসে বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! হেলাল বিন উমাইয়া অতিশয় বৃদ্ধ ও দুর্বল। আমি কি তার খেদমত করতে পারবো?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং বললেন, ‘তবে সাবধান! সে যেন তোমার সঙ্গে মেলামেশা না করে।’ হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী বললো, ‘আল্লাহর নবী! আল্লাহর কসম তার মাঝে কোনো জিনিসের কামনাই নেই। শুরু থেকে নিয়ে সে রাত-দিন কেবল কান্নাকাটি করছে।’

এভাবে দিন কাটানো হযরত কা'বের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। দিন দিন কষ্ট বেড়েই চললো। বারবার তিনি আপন ঈমানকে নবায়ন করছিলেন। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলতে চান, কিন্তু তারা তার সঙ্গে কথা বলে না। তিনি রাসূলকে সালাম করেন, কিন্তু সালামের উত্তর পান না। তিনি এখন কী করবেন? কার কাছে যাবেন? কার কাছেই বা পরামর্শ চাইবেন? কে তাঁকে শোনাবে সান্ত্বনার বাণী?

কা'ব রাযি. বলেন, কষ্ট ও যন্ত্রণার মাত্রা যখন চরমে পৌঁছুলো তখন একদিন আমি আবু কাতাদার নিকট গেলাম। সে আমার চাচাতো ভাই এবং আমার অতি প্রিয়জন। সে তার বাগানে কাজ করছিলো। বাগানের প্রাচীর ডিঙিয়ে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁকে সালাম করলাম। আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের উত্তর দেয়নি। আমি তাকে বললাম, ‘আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি হে আবু কাতাদা! তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?’ সে চুপ করে রইলো। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আবু কাতাদা! তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?’ সে পূর্বের ন্যায় চুপ রইলো। আমি আবারও বললাম, ‘আল্লাহর কসম হে আবু কাতাদা! তুমি কি জানো না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?’ উত্তরে সে বললো, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।’

আপন চাচাতো ভাই ও অতি প্রিয়জনের কাছ থেকে এমন উত্তর শুনে কা'বের চোখ থেকে অঝোর ধারায় বেদনার অশ্রু ঝরতে লাগলো। ‘আল্লাহ

ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন’—ছোট্ট এই বাক্যটি যেন তার হৃদয়জগতে ঝড় বইয়ে দিলো। তিনি যেন দ্বিধায় পড়ে গেছেন, ‘আসলেই তিনি মুমিন নাকি মুমিন নন?’

প্রাচীর টপকে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁর অস্থির দৃষ্টি কখনো এ দেয়ালে, কখনো ঐ দেয়ালে ঘুরে ফিরছিলো। সঙ্গ দেয়ার জন্য স্ত্রী কাছে নেই। বন্ধুসুলভ আচরণ করার মত ঘনিষ্ঠ কেউ নেই। লোকজনকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করার পর ইতোমধ্যে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

পঞ্চাশতম রজনী। ইতোমধ্যে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উম্মে সালামা রাযি.-এর ঘরে ছিলেন। নবীজীর ওপর তাদের তাওবা কবুল সংক্রান্ত ওহী অবতীর্ণ হলো। তিনি আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। উম্মে সালামা রাযি. বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! কা'ব বিন মালিককে কি এ সংবাদ অবহিত করবো?’ জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে তো মানুষ ভিড় জমাবে এবং সারা রাত ঘুমাতে দেবে না।’

ফজর নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার কথা শোনালেন। সাহাবাগণ তাদেরকে সুসংবাদ শোনাতে বের হয়ে গেলেন। কা'ব রাযি. বলেন, সেদিন আমি ফজরের নামায আদায় করে ঘরের ছাদে বসে ছিলাম। আল্লাহ তাআলা কোরআনে যেমনটি উল্লেখ করেছেন—আপন অস্তিত্ব তখন চরম সংকটময়

মনে হচ্ছিলো, প্রশস্ত যমীনও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। আমার কাছে সবচে দুশ্চিন্তার বিষয় এই ছিলো যে, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানাযাও পড়বেন না কিংবা এ অবস্থায় যদি রাসূল ইন্তেকাল করেন তাহলে তো আমি এ অবস্থাতেই থেকে যাবো। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলবে না, কেউ আমার জানাযাও পড়বে না।

এমন সময় সালা' পর্বতের ওপর থেকে জনৈক ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পেলাম, ‘হে... কা'ব বিন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন।’ আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা এসে গেছে। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একজন আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন, আর একজন পাহাড়ের ওপর হতে চিৎকার করে আমাকে সংবাদ জানিয়েছেন। চিৎকারের আওয়াজ ছিলো ঘোড়া থেকে দ্রুতগামী।

সুসংবাদদাতা আমার নিকট এলে খুশিতে আমি আমার কাপড়জোড়া তাকে প্রদান করলাম। আল্লাহর কসম! এ দু'টি কাপড় ব্যতীত আমার কাছে তখন অন্য কোনো কাপড় ছিলো না। এরপর অন্য একজনের কাছ থেকে দু'টি কাপড় নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলো। তাওবা কবুলের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তারা আমাকে বলছিলো, ‘আল্লাহ তাআলা তোমার তাওবা কবুল করায় তোমাকে মোবারকবাদ।’

আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উপবিষ্ট আছেন। আমাকে দেখে তাদের মধ্য হতে কেবল তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানালেন। এরপর আপন স্থানে ফিরে গেলেন। আল্লাহর কসম! তালহার এই আচরণের কথা আমি কখনো ভুলবো না।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে তাঁকে সালাম করলাম। খুশিতে তাঁর চেহারা চমকাচ্ছিলো। আনন্দিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে যেতো। আমাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'জীবনের সর্বোত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার পক্ষ থেকে, নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে।'

এরপর তিনি আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসে বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! ক্ষমার পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আমি আমার সকল সম্পদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির পথে সদকা করে দিতে চাই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নিজের জন্য কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।' উত্তরে আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা

আমাকে সততার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। তাই আমি আমার তাওবার পূর্ণতার উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞা করছি যে, জীবনে কখনো মিথ্যা বলবো না।’

আল্লাহ তাআলা বাস্তবেই কা'ব বিন মালিক ও তার সঙ্গীদ্বয়ের তাওবা কবুল করেছেন। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে:

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن
١٧بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾
وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
١٨هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾

[সূরা তাওবা]

অর্থ: বস্তুত আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিলো, যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি সদয়, পরম দয়ালু। এবং সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবি রাখা হয়েছিল। অবশেষে যখন এই পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠলো এবং তারা উপলব্ধি করলো, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়পরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে

রুজু করে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ^১[সহীহ মুসলিম: ৪৯৭৩, মুসনাদে আহমদ: ১৫২২৯]

এ দীর্ঘ ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, তালহা রাযি. কা'ব রাযি.কে দেখে স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং কোলাকুলি করেছেন। এর ফলে তাঁর প্রতি কা'ব রাযি.-এর হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তো তালহা রাযি.-এর মৃত্যুর কয়েক বছর পরও এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত কা'ব বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তালহার কথা ভুলবো না।'

তালহা রাযি. কিসের মাধ্যমে কা'ব রাযি.-এর অন্তরজগতকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন? তিনি শুধু এতটুকুই করেছেন যে, তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছেন, তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন, তাঁর আনন্দে অংশীদার হয়েছেন। ফলে তিনি কা'বের নিকট সম্মান ও ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। মানুষকে মূল্যায়ন করা এবং তাদের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে জয় করা যায়। পরীক্ষার ব্যস্ত দিনগুলোতে আপনার মোবাইল ফোনে যদি একটি মুঠোফোন বার্তা আসে আর তাতে লেখা থাকে:

তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে—জানাবে...

আমি সর্বদা তোমার কথা ভাবছি...

এবং তোমার সাফল্য কামনায় দোয়া করছি...

ইতি

তোমার বন্ধু ইবরাহীম

তাহলে কি এই বন্ধুর প্রতি আপনার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে না?

তদ্রূপ মনে করুন, অসুস্থ পিতার সঙ্গে আপনি হাসপাতালে আছেন। আপনি আপনার পিতার ব্যাপারে চিন্তিত। এমতাবস্থায় জনৈক বন্ধু আপনার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করে আপনার পিতার খোঁজ-খবর নিলো এবং কোনো সাহায্য বা সেবার প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলো। আপনি তাকে ধন্যবাদ জানালেন। সন্ধ্যায় সে আবার ফোন করে বললো, 'আপনি তো হাসপাতালে আছেন। আপনার পরিবারের কোনো জিনিস প্রয়োজন আছে কি? আমাকে বললে আমি তাদেরকে তা কিনে দিয়ে আসি।' আপনি আবারো তাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তার জন্য দোয়া করে মোবাইল রেখে দিলেন। কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে, নিজের অজান্তেই আপনার অন্তরে তার প্রতি বিশেষ হৃদ্যতা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে?

একই সময়ে অন্য একজন আপনাকে ফোন করে বললো, 'বন্ধু! আমরা সমুদ্রে প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছি। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?' আপনি তাকে জানালেন, 'আমার পিতা অসুস্থ, তাই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়'। এরপর সে আপনার পিতার জন্য দোয়াও করলো না, ইতিপূর্বে তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়নি বলে ওযরখাহীও করলো না। বরং বললো, 'আরে দোস্ত! তিনি অসুস্থ হয়েছেন, তো কী হয়েছে? তিনি তো হাসপাতালে আছেন, সেবার জন্য নার্সও আছে। তোমার থাকার তো বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের সঙ্গে চল। আমরা একত্রে আনন্দ করবো, সমুদ্রে সাঁতার কাটবো।' সে এসব কথা বলছিলো এবং হাসি-ঠাট্টা করছিলো। যেন

আপনার পিতার অসুস্থতা তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। বলুন, তার প্রতি আপনার মনোভাব কেমন হবে? নিশ্চয়ই তার প্রতি আপনার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা কমে যাবে। কেননা, সে আপনার দুঃখে দুঃখী হয়নি।

আমার জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো। আমি জেদ্দায় কয়েকদিনের সফরে ছিলাম। তখন আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। এরই মধ্যে একদিন আমার মোবাইলে আমার ভাই সাউদের একটি বার্তা এলো। সে লিখেছে: 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম সবরের তাওফীক দান করুন... আমাদের চাচাতো ভাই জার্মানিতে মৃত্যুবরণ করেছে....'

আমি তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করলাম। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, আমাদের অতিশয় বৃদ্ধ এই চাচাতো ভাই দু'দিন পূর্বে হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য জার্মানি গিয়েছিলেন এবং অপারেশন চলাকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃতদেহ দু'দিন পরেই রিয়াদ বিমানবন্দরে পৌঁছাবে।

দু'দিনের মধ্যে জেদ্দার কাজ শেষ করে বিমানবন্দরে গিয়ে রিয়াদগামী ফ্লাইটের অপেক্ষা করছিলাম। কয়েকজন যুবক পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এলো এবং সালাম-মোসাফাহা করলো। তাদের চুলের স্টাইল ছিলো আশ্চর্য রকমের। তবুও আমি তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলাম। তাদের কথার সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন কথা বলে চলছিলাম।

আমি মোবাইলে কথা বলছিলাম। কথা শেষ করে দেখতে পেলাম, প্যান্ট-শার্ট পরিহিত এক যুবক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এগিয়ে এসে আমাকে সালাম দিলো, মোসাফাহা করলো। আমি তাকে স্বাগত জানালাম এবং দুষ্টুমি করে বললাম, 'তোমার পোশাকটা তো বেশ সুন্দর! তোমাকে তো বরের মত মনে হচ্ছে!' এ জাতীয় আরো কিছু কথা তাকে বললাম। যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'আপনি সম্ভবত আমাকে চিনতে পারেননি। আমি অমুক, বাবার লাশ নিয়ে এই মাত্র জার্মানি থেকে ফিরেছি। পরবর্তী বিমানে রিয়াদ যাবো।'

আমার কাছে মনে হলো, সে যেন আমার শরীরে এক বোতল ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলো! নিজের আচরণে বেশ অবাক হলাম। তার পিতা মারা গেছে, পিতার মৃতদেহও তার সঙ্গে আছে আর আমি তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছি! কত নির্মম রসিকতা! আমি সামান্য সময় চুপ থেকে বললাম, 'আসলে আমি খুবই দুঃখিত, আমি তোমাকে চিনতে পারছিনি। আমি তো এখানে কয়েকদিন যাবৎ এজন্যই অপেক্ষা করছি। আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন এবং তোমার পিতাকে মাগফিরাত নসীব করুন।' বাস্তবিকপক্ষে তাকে চিনতে না পারার ক্ষেত্রে আমার কোনো দোষ ছিলো না। কারণ, পূর্বে তার সঙ্গে আমার খুব একটা সাক্ষাতই হয়নি। তাছাড়া তার পোশাক দেখে আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, সে তার বাবার লাশ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। প্যান্ট-শার্ট পরে জেদ্দার যুবকদের ভিড়ের মাঝে তার হঠাৎ উপস্থিতির কারণে আমার কল্পনাতেও আসেনি যে, সেই শোকাতুর সন্তানটি সে-ই।

অপরকে যথার্থ মূল্যায়ন করার দাবি হলো তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি অনুভূতিতে অংশীদার হওয়া এবং এ কথা বোঝানো যে, তার চিন্তা আপনারও চিন্তা, তার সমস্যা আপনারও সমস্যা, তার কল্যাণ আপনার সবসময়ের কাম্য। এ কারণেই আপনি দেখবেন, সফল কোম্পানিগুলোতে ক্রেতা ও ভোক্তাসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। এদের দায়িত্ব হলো বিভিন্ন উপলক্ষে ভোক্তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোনবার্তা বা উপহার পাঠানো কিংবা মূল্যহ্রাস বা ফ্রি অফার দেয়া। সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এ জাতীয় বিভিন্ন কাজ তারা করে থাকে।

মানুষকে যদি বোঝাতে পারেন যে, আপনি তাদের নিয়ে ভাবেন, তারা আপনার কাছে সম্মানের পাত্র, তারা আপনাকে ভালোবাসবে, হৃদয়রাজ্যে শ্রদ্ধার আসনে বসাবে। আমাদের বাস্তব জীবন থেকে এর কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

মনে করুন, লোকে ভরপুর একটি মজলিসে আপনি বসে আছেন। জনৈক আগন্তুক মজলিসে এসে বসার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। আপনি একটু সরে বসে তার জন্য সামান্য জায়গা করে দিলেন এবং তাকে ডেকে বললেন, ‘ভাই! আপনি ভেতরে এসে এখানে বসুন।’ আপনি দেখবেন, আপনার এই বিশেষ মনোযোগ প্রদানকে সে অনুভব করতে পারবে এবং সে আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করবে।

আবার মনে করুন, আপনি রাতের খাবারের অনুষ্ঠানে আছেন। একজন ব্যক্তি খাবার নিয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে খালি টেবিল খুঁজতে খুঁজতে

সামনে এগিয়ে আসছে। আপনি তার জন্য একটি চেয়ার প্রস্তুত করে বললেন, '[হাইয়াকাল্লাহ] ভাই! এখানে বসুন।' সে অবশ্যই আপনার এই আচরণে প্রভাবিত হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। রাসূলের সীরাত দেখুন। একবার জুমার দিন রাসূল মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সামনের দিকে এগিয়ে এলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে উচ্চ স্বরে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! এক লোক দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাকে আপনি দ্বীন সম্পর্কে অবগত করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং লোকটির প্রতি মনোযোগী হলেন। একটি চেয়ার আনিয়ে তাতে বসলেন। লোকটির সঙ্গে কথা বললেন এবং তাকে বিস্তারিতভাবে দ্বীন বোঝাতে থাকলেন। লোকটি যখন ভালোভাবে সব কিছু বুঝে নিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে ফিরে এলেন। তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ প্রদানকারী। রাসূল যদি তখন তাকে অবহেলা করতেন, হয়তো লোকটি বেরিয়ে যেতো এবং আজীবন দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী অধ্যয়ন করলে আপনি দেখতে পাবেন, কোনো ব্যক্তি রাসূলের সঙ্গে মোসাফাহা করলে তিনি ততক্ষণ আপন হাত সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না মোসাফাহাকারী প্রথমে

নিজ হাত সরিয়ে নিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর দিকে চেহারা ও শরীর ফিরিয়ে সরাসরি তাকাতেন; তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সে কথা বলার সময় চুপ থাকতেন।

**অভিজ্ঞতা...**

মানুষকে যদি বোঝাতে পারেন যে, আপনি তাদের নিয়ে ভাবেন, তারা আপনার কাছে সম্মানের পাত্র; তারাও আপনাকে ভালোবাসবে, হৃদয়রাজ্যে শ্রদ্ধার আসনে বসাবে।

# ২৫. অন্যদের বোঝান, আপনি তাদের কল্যাণকামী

আপনার প্রতি মানুষের ভালোবাসা তখনই বৃদ্ধি পাবে, যখন আপনার অন্তরে থাকবে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণকামনা। যখন আপনি মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে আন্তরিক হবেন এবং তাদেরকে আপনার হৃদ্যতার বিষয়টি অনুভব করাতে সক্ষম হবেন, তারাও আপনাকে ভালোবাসবে, হৃদয়ে স্থান দেবে।

জনৈক মহিলা ডাক্তারের ক্লিনিকে সবসময় রোগীদের ভিড় লেগেই থাকতো। রোগীরা তার কাছেই আসতে চাইতো। প্রতিটি রোগী মনে করতো, সে এই চিকিৎসিকার ঘনিষ্ঠজন। এই মহিলা চিকিৎসক আচার-ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে রোগীদের মন জয় করে ফেলতো। সে তার মহিলা সহকারীকে বলে রেখেছিলো, 'কোনো রোগী ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বা রোগের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আসলে সেক্রেটারি রোগীকে স্বাগত জানিয়ে তার নাম জেনে নেবে এবং তাকে পাঁচ মিনিট পর সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য বলবে। এই ফাঁকে সে এই রোগীর টিকেটটি নিয়ে ডাক্তারকে দেবে।' ডাক্তার টিকেট দেখে রোগীর নাম-পরিচয়, কর্মক্ষেত্র, সন্তানদের নাম ইত্যাদি জেনে নেয়। পাঁচ মিনিট পর রোগী তার কাছে এলে সে রোগীকে স্বাগত জানায়, তার রোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। পাশাপাশি তার সন্তান-সন্ততি ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়। ফলে রোগী মনে করে, এই ডাক্তার

তাকে খুব ভালোবাসেন বলেই তার সন্তানদের নাম মনে রেখেছেন, তার রোগ ও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করছেন, এমনকি তার কর্মস্থলের কথাও জিজ্ঞেস করতে ভোলেননি। ফলে রোগীরা সর্বদা তার কাছে আসতেই আগ্রহী থাকে। আপনি কি ভেবে দেখেছেন, কত সহজে তিনি মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করেছেন এবং জয় করে নিয়েছেন।

পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, সহপাঠী-সহকর্মী, প্রতিবেশী সকলের প্রতি আপনার হৃদ্যতা ও ভালোবাসার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করুন। তাদের প্রতি আপনার অনুভব-অনুভূতিকে লুকিয়ে রাখবেন না। আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে স্পষ্টভাষায় বলুন, ‘আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমার অন্তরে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বিদ্যমান আছে।’ এমনকি সে যদি গোনাহগারও হয় তবু তাকে বলুন, ‘আপনি আমার কাছে অনেকের চেয়ে প্রিয়।’ এ কথা বলার কারণে আপনি মিথ্যাবাদী হবেন না। কেননা, লোকটি আপনার কাছে অবশ্যই লক্ষ লক্ষ অভিশপ্ত ইহুদির চেয়ে অনেক প্রিয়! বিষয়টি কি এমন নয়? বিচক্ষণতার সঙ্গে ভেবে দেখুন।

আমার এখনো মনে পড়ে, একবার ওমরাহর সফরে তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় আমি মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য নিরাপত্তা, খোদায়ী নুসরত ও শক্তিবৃদ্ধির দোয়া করলাম। কখনো এভাবে দোয়া করেছি, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার বন্ধু-বান্ধব ও সকল প্রিয়জনকে ক্ষমা করে দিন।’

ওমরাহর আমল শেষ করে আমি প্রথমে সহজে ওমরাহ আদায় করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। এরপর রাতযাপনের জন্য হোটেলে কামরা ভাড়া করলাম। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইলে একটি ক্ষুদে বার্তা তৈরি করলাম। তাতে লিখলাম, 'আমি এইমাত্র ওমরাহ সমাপ্ত করেছি এবং দোয়ায় আমার প্রিয়জনদের স্মরণ করেছি। আপনিও আমার প্রিয়জন। তাই আপনার জন্যও দোয়া করতে ভুলিনি। আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন, আপনাকেও বাইতুল্লাহর যিয়ারত নসীব করুন।' ক্ষুদে বার্তাটি আমি মোবাইলে সংরক্ষিত সকল নম্বরে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মোবাইলে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত ছিলো। ক্ষুদে বার্তাটি তাদের মাঝে কল্পনাতীত প্রভাব ফেলেছে।

তাদের একজন আমাকে লিখে পাঠিয়েছে, 'আমি আপনার ক্ষুদে বার্তাটি বারবার পড়েছি ও কেঁদেছি। দোয়ায় আমাকে স্মরণ করেছেন বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' আরেকজন লিখেছে, 'কীভাবে আপনার ঋণ শোধ করবো, ভেবে পাচ্ছি না। আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।' তৃতীয় একজন লিখেছে, 'আল্লাহর কাছে দোয়া করি—তিনি যেন আপনার নেক দোয়াকে কবুল করে নেন। আমি কখনো আপনাকে ভুলবো না।'

এভাবে আমরা সময়ে সময়ে অন্যদেরকে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারি যে, ব্যস্ত কর্মজীবনও আমাদেরকে তাদের কথা ভুলিয়ে দেয়নি। বন্ধুদের

উদ্দেশে আপনি লিখতে পারেন, 'আমি আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে জুমার দিনের শেষ প্রহরে তোমাদের জন্য দোয়া করেছি।' আপনার নিয়ত সৎ হলে কিছুতেই এটা রিয়া বা আত্মপ্রদর্শন হবে না। এটা তো মুসলমানদের পারস্পরিক হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির মাধ্যম।

আমার এখনো মনে পড়ে, একবার আমি তায়েফ শহরে গ্রীষ্মকালীন এক অনুষ্ঠানে বয়ান করছিলাম। শিফা পাহাড়ের পাদদেশে এক পার্কে অনুষ্ঠিত আড়ম্বরপূর্ণ সে অনুষ্ঠানে অনেক যুবক উপস্থিত হয়েছিলো। একদল যুবক পার্কের অন্য অংশে আনন্দ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকলেও শ্রোতাদের মাঝে সৎ ও সৌভাগ্যবান অনেক যুবক ছিলো। অনুষ্ঠান শেষ হলে একদল যুবক এগিয়ে এসে সালাম করলো। তাদের মাঝে একজন যুবকের চুলের স্টাইল ছিলো আশ্চর্য ধরণের, পরনে ছিলো টাইট জিন্সের প্যান্ট। সে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করলো, আমাকে ধন্যবাদ জানালো। আমি উষ্ণতার সঙ্গে সালামের উত্তর দিলাম, তার উপস্থিতির কারণে শুকরিয়া জানালাম এবং তার হাত নাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমার চেহারা তো দায়ীদের চেহারার ন্যায়।'

সে হেসে চলে গেলো। দু'সপ্তাহ পর হঠাৎ ফোন করে সে বললো, 'শায়খ! আমাকে চিনতে পারছেন না?! আমি সেই যুবক, যাকে আপনি বলেছিলেন, তোমার চেহারা দায়ীদের চেহারার মত। আমি অবশ্যই দায়ী হবো, ইনশাআল্লাহ।' এরপর সে তার অনুভূতি আমার নিকট ব্যক্ত করলো।

দেখলেন তো, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ কথা দ্বারা মানুষ কীভাবে প্রভাবিত হয়! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে জয় করে নিতেন। হযরত আবু বকর রাযি. ও ওমর রাযি. দু'জনই মহান সাহাবী। তারা পরস্পর সর্বদা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। আর আবু বকর সাধারণত জয়ী হতেন। তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ভোরে উঠে ওমর রাযি. দেখতেন, আবু বকর রাযি. তাঁর পূর্বেই উঠে গেছেন। কোনো অসহায়কে খাবার প্রদান করতে গেলে দেখতেন, আবু বকর রাযি. সেক্ষেত্রেও এগিয়ে আছেন। যদি রাতভর নামায পড়তেন, তবে দেখতেন আবু বকর রাযি. সেখানেও অগ্রগামী।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সাময়িক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য লোকদেরকে সদকা করার আদেশ করলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় ওমর রাযি. এর সম্পদের প্রাচুর্য ছিলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কোনো দিন যদি আবু বকর রাযি. এর ওপর বিজয় লাভ করতে পারি, তবে আজই সেই দিন। ওমর রাযি. তার অর্ধেক সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অর্পণ করলেন।

ওমরকে প্রচুর সম্পদ আনতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কী জিজ্ঞেস করেছিলেন? তিনি কি সম্পদের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেছিলেন? স্বর্ণ না রূপা—তা জিজ্ঞেস করেছিলেন? না, তিনি এসব কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। অধিক পরিমাণে সম্পদ নিয়ে আসতে দেখে

তিনি ওমরকে এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা দ্বারা ওমর রাযি. বুঝে নিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালোবাসেন। ওমর রাযি.কে লক্ষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'ওমর! পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?'
ওমর রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের জন্য এর সমপরিমাণ রেখে এসেছি।'

ওমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগ্রহ নিয়ে বসে রইলেন। আবু বকর রাযি. কখন আসেন, কী নিয়ে আসেন? আবু বকর রাযি.ও অনেক সম্পদ নিয়ে এলেন এবং রাসূলের নিকট অর্পণ করলেন। ওমর রাযি. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবু বকর রাযি.-এর দান দেখছেন এবং তাঁর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন শুনছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযি.-এর সম্পদের দিকে তাকিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু বকর! তুমি পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযি.কে, তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসেন, তাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাদের কষ্ট হোক, এটা তিনি চান না। তাই তাঁর এই জিজ্ঞাসা। আবু বকর রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি!' আবু বকর রাযি.-এর এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি তাদের জন্য রেখে এসেছি। আর সমস্ত সম্পদ নিয়ে

এসেছি। আমি অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ আনিনি, বরং আমি সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছি। তখন ওমর রাযি. এই স্বগতোক্তি করলেন, 'আমি কখনো আবু বকরের ওপর জয়ী হতে পারবো না।'

সাহাবীগণ প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ভালোবাসেন। তাই তারাও রাসূলকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা দ্রুত নামায পড়ালেন। নামায শেষে সাহাবায়ে কেরামকে আশ্চর্যান্বিত দেখে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি নামায সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আশ্চর্য হয়েছো?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নামাযের মধ্যে আমি একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তার মায়ের প্রতি অনুগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি নামায সংক্ষেপ করেছি।'

ভেবে দেখুন, অন্যের প্রতি কেমন ছিলো নবীজীর ভালোবাসা! কেমন ছিলো তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ! পারস্পরিক আচার-আচরণ ও চালচলনের মাঝে তিনি তাদের সামনে প্রকাশও ঘটাতেন এই ভালোবাসার।

*তুমি একা নও... আপনিও আপন হৃদয়ের ভালোলাগা ও ভালোবাসার অনুভূতিকে প্রকাশ করুন। সঙ্কোচহীন চিত্তে বলুন—"আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনার সাক্ষাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনি আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ব্যক্তি।"*

# ২৬. নাম মনে রাখুন

কাউকে সম্মান দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার নাম স্মরণ রাখা। মনে করুন, কারো সঙ্গে আপনার ব্যাংকে, বিমানে কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠানে আকস্মিক পরিচয় হলো। পরবর্তীতে অন্য কোথাও তার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে আপনি যদি হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে যান, আর তার নাম উল্লেখপূর্বক সম্বোধন করে তাকে স্বাগত জানান, নিঃসন্দেহে আপনার এ আচরণে সে অভিভূত হবে, তার অন্তরে আপনার প্রতি হৃদ্যতা এবং শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। আপনি কারো নাম মনে রাখলে সে বুঝবে যে, আপনার নিকট তার মূল্য আছে।

ছাত্রদের নাম মুখস্থ রাখেন এবং মুখস্থ রাখেন না, এমন দুই শিক্ষকের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ছাত্রকে 'হে ছাত্র! দাঁড়াও' না বলে 'হে অমুক! [নাম বলে] দাঁড়াও' বলে সম্বোধন করা অনেক বেশি কার্যকর ও ক্রিয়াশীল।

মোবাইল কল রিসিভ করার ক্ষেত্রেও নাম উল্লেখ করা শ্রেয়। আপনি যার কাছে কল করেছেন তিনি রিসিভ করে বললেন, 'কে?' কিংবা বললেন, 'হ্যালো!' অন্য একজন রিসিভ করেই স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'হে খালিদ! তোমাকে স্বাগতম'। বলুন, কোনটি আপনার কাছে বেশি ভালো লাগবে? নিশ্চয়ই তার মুখে আপনার নাম শুনতে পেয়ে আপনার অন্তরে ভালোলাগার এক কোমল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়বে।

সাধারণত কোনো সভা-সেমিনারে আলোচনা করার পর তরুণ ভাইয়েরা আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং মোসাফাহা করতে ভিড় জমায়। আমি তাদেরকে সবসময় বলে থাকি, 'আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন! ভাই! আপনার মূল্যবান নামটি জানতে পারি?' তাদের প্রতি আমার এই গুরুত্ব প্রকাশে তারা প্রত্যেকে খুশি হয় এবং আনন্দচিত্তে উত্তর দেয়, 'আমি আপনার ভাই যিয়াদ', 'আমি আপনার বেটা ইয়াসির'।

একবার কুশল বিনিময়ের পর সকলে বিদায় নিলো। তাদের একজন কোনো বিষয়ে জানার জন্য পুনরায় এলে আমি তাকে বললাম, 'দীর্ঘজীবী হও, হে খালিদ!' সে অবাক হয়ে হাসিমুখে বললো, 'মাশাআল্লাহ! আপনি আমার নাম মনে রেখেছেন!'

সেনা কর্মকর্তাগণ তাদের ইউনিফর্মে বুকের ওপর ছোট ফলক ব্যবহার করে থাকেন। তাতে তাদের নাম লেখা থাকে। আমি একবার এক সেনানিবাসে বয়ান করেছিলাম। বয়ানের পর অনেকেই আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একজন অফিসারকে দেখে মনে হলো, আমাকে সালাম দিতে চাচ্ছে। কিন্তু অন্যদের ভিড়ের কারণে সে দ্বিধায় ভুগছিলো। আমি দ্রুত নামফলকে তার নাম দেখে নিলাম। এরপর তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'স্বাগতম হে অমুক!' মুহূর্তেই তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো। আশ্চর্য হয়ে সে মোসাফাহার জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিলো এবং হাসি মুখে বললো, 'আরে! আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?!'

আমি বললাম, 'ভাই! যাদেরকে আমরা ভালোবাসি, তাদের নাম তো অবশ্যই জানতে হবে।' আমার এ আচরণ তার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। কারণ, অনেকেই তার নাম অন্য কেউ মনে রাখলে খুশি হয় এবং মনে মনে কামনা করে, 'যদি আমিও অন্যদের নাম মনে রাখতে পারতাম!'

অন্যের নাম মনে রাখতে না পারার পেছনে অনেক কারণ থাকে। উল্লেখযোগ্য একটি হলো, কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাকে গুরুত্ব না দেয়া। আরেকটি হলো, কারো সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় অন্যমনস্ক থাকা, নাম শোনার সময় মনোযোগ না দেয়া। সাক্ষাতকারীর প্রতি আপনার মনোভাবও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। আপনি হয়তো ধারণা করেন, তার সঙ্গে আপনার ভবিষ্যতে আর কোনো দিন সাক্ষাৎ হবে না। তাই তার নাম মনে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কিংবা সাক্ষাতকারী হয়তো সাদাসিধা মানুষ। তার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আগ্রহ আপনার নেই। অথবা প্রথম সাক্ষাতে আপনি তার নাম মনোযোগ দিয়ে শোনেননি, এখন পুনরায় জিজ্ঞেস করতেও সঙ্কোচ বোধ করছেন। এসব কারণেই অন্যদের নাম স্মরণ থাকে না।

নাম মনে রাখার বিভিন্ন কৌশল আছে। তার মধ্যে একটি হলো, নাম মনে রাখার গুরুত্ব স্মরণ রাখা এবং এ কথা ভাবা যে, কয়েক মিনিট পর আমাকে নামটি জিজ্ঞেস করা হবে। আরেকটি হলো, কারো নাম শোনার সময় তার চেহারার প্রতি মনোযোগ সহকারে লক্ষ করা। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি তার অঙ্গভঙ্গি, কথনভঙ্গি, হাসার ধরণ ভালোভাবে

লক্ষ করুন, যেন তা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি কথার ফাঁকে ফাঁকে বারবার তাকে নাম ধরে সম্বোধন করুন। এভাবে বলুন, 'হে অমুক! ঠিক তো? হে অমুক! আপনি নিজে শুনেছেন? হে অমুক! আপনি আমার সঙ্গে একমত?' এভাবে বারবার পুনরাবৃত্তি করুন। কাউকে নাম উল্লেখপূর্বক সম্বোধন করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোরআনে দেখুন, আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে তাদের নাম ধরেই সম্বোধন করেছেন:

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

۝٤৬ [সূরা হূদ]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

۝২৬ [সূরা ছোয়াদ]

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا

۝৭৬ [সূরা হূদ]

অর্থ: হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। হে দাউদ! আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। হে ইবরাহীম! আপনি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিন।

**সারকথা...**

নাম মনে রেখে, নামসহ সম্বোধন করে আমার প্রতি আপনার হৃদ্যতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করুন। আমি অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসবো।

# ২৭. প্রশংসা করুন

জীবনে চলার পথে আমরা অনেক কাজ কেবল অন্যের দৃষ্টি কাড়তেই করে থাকি। বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমরা নিজেদের সবচে দামী ও সুন্দর কাপড়টি পরিধান করে থাকি। অন্যের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এ কাজটি আমরা করে থাকি। আর তাই পোশাক ও বেশভূষার সৌন্দর্যে কেউ আকৃষ্ট হলে আমরা পুলক ও আনন্দ বোধ করি। ড্রয়িংরুম বা অভ্যর্থনাকক্ষের ডেকোরেশন করার সময় আমরা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সচেতন হই। এটাও আমরা করে থাকি কেবল অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, নিজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নয়। এর প্রমাণ হলো, আমরা অভ্যর্থনাকক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যতটা সচেতন, নিজেদের কামরা কিংবা বাচ্চাদের গোসলখানার সৌন্দর্য বর্ধনে ততটা নই।

কেউ আপনাকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে, খাবারের প্রশংসা করুন। কেননা আপনি জানেন, দাওয়াত প্রদানকারীর মা অথবা স্ত্রীকে কেবল আপনার জন্য দীর্ঘক্ষণ রান্নাঘরে থাকতে হয়েছে কিংবা অন্তত হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আনতে পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাই তাকে এমন কিছু কথা শোনান, যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে যেন এ কথা মনে করে যে, আপনার জন্য তার কষ্ট-ক্লেশ বৃথা যায়নি।

কোনো বন্ধুকে খাবারের দাওয়াত করলে আপনার স্ত্রী, এমনকি কখনো কখনো আপনি নিজেও খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে থাকেন। অতিথি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, খাবারের মানের প্রতি তত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। পরিচিত কেউ আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা ঘরের সাজ-সজ্জার প্রশংসা করলে কিংবা খাবার ও রান্নার গুণকীর্তন করলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি যেন অন্যের সঙ্গে তেমন আচরণই করে যেমন আচরণ সে অন্যদের কাছ থেকে পেতে ভালোবাসে।’ অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে আপনি এমন আচরণ করুন, যেরূপ আচরণ আপনি তাদের থেকে পেতে ভালোবাসেন। অন্যথায় আপনি কিসের ভিত্তিতে অন্যের কাছে উত্তম আচরণ আশা করেন? পরিচিত কারো পরনে সুন্দর পোশাক দেখতে পেলেন, তার প্রশংসা করুন; তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য কিছু কথা বলুন। সাক্ষাতকারীর পোশাক থেকে আতরের সুঘ্রাণ পেয়েছেন, তার সুরুচির তারিফ করুন। কারো সঙ্গে মতবিনিময় করার সময় তার ভালো দিকগুলো লক্ষ করুন। দ্বিধাহীন চিত্তে তার প্রশংসা করুন। বলুন, ‘মাশাআল্লাহ! কত সুন্দর! আজ তোমাকে বরের মত লাগছে!’

বন্ধুর বাসায় গিয়ে সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র দেখতে পেলেন, অকুণ্ঠ চিত্তে আসবাবপত্রের প্রশংসা করুন এবং তার সুরুচির তারিফ করুন। (তবে সতর্ক থাকবেন যেন অতিরিক্ত না হয়ে যায়। কেননা তাহলে সে ভাববে, আপনি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন)।

কোনো সভা বা মজলিসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, একজন শ্রোতাদের সম্মুখে কথা বলছেন। কথার যাদুতে তিনি মজলিসকে জমিয়ে তুলেছেন এবং শ্রোতারাও তার কথায় মুগ্ধ। আপনি তার প্রশংসা করুন। মজলিস শেষে ওঠার সময় তার হাত ধরে বলুন, 'মাশাআল্লাহ! আপনার বাগ্মিতা অতুলনীয়! আপনার উপস্থিতিতে আজকের সভা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে!' পরীক্ষামূলকভাবে এভাবে বলে দেখুন, সে আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করবে।

আপনি পিতা-পুত্রের মাঝে কোনো সুন্দর আচরণের বহিঃপ্রকাশ দেখলেন। ছেলেকে পিতার হাতে চুমু খেতে দেখলেন কিংবা পিতার জুতা এগিয়ে দিতে দেখলেন। ছেলের এ কাজের প্রশংসা করুন। কেউ নতুন পোশাক পরিধান করেছে, তার প্রশংসা করুন। বোনের বাড়িতে গিয়ে তাকে তার সন্তানদের প্রতি যত্নশীল দেখেছেন। এ কাজের জন্য বোনের প্রশংসা করুন। এভাবে অন্যের ভালো দিকগুলোই কেবল লক্ষ করুন।

আপনি আপনার বন্ধুকে তার সন্তানদের প্রতি যত্ন নিতে দেখেছেন অথবা মেহমানদের স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে তার অভিনব কোনো কৌশল দেখেছেন। আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার প্রশংসা করুন। আপনার হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করুন। আপনি কারো সঙ্গে তার গাড়িতে উঠেছেন কিংবা ট্যাক্সি ভাড়া করেছেন, নিরাপদ-চমৎকার ড্রাইভিংয়ের কারণে ড্রাইভারের প্রশংসা করুন।

অনেকেই হয়তো বলবেন, এসব তো কেবল লৌকিকতা। তবে বাস্তব সত্য কথা হলো, এ লৌকিকতারও অসাধারণ প্রভাব রয়েছে। সমাজের ছোট-বড়, নিম্ন-উচ্চ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমি নিজে এগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রয়োগ করেছি অনেক ক্ষেত্রে। এদের অনেকেই সমাজের অতি উচ্চ স্তরের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত। আমি তাদেরকে আশাতীত প্রভাবিত হতে দেখেছি। প্রভাবিত হবেই না বা কেন? মানুষ যেসব ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা কামনা করে, স্বভাবতই সেসব ক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ করলে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। নববিবাহিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ের এক সপ্তাহ পর আপনার সাক্ষাৎ হলো, উচ্চ স্তরের সার্টিফিকেট অর্জনকারী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আপনার দেখা হলো, আপনার কোনো প্রতিবেশী নতুন বাড়ি নির্মাণ করলো, এরা সকলেই আপনার প্রশংসার অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ করুন।

আমার চাচাতো ভাই আ. মাজীদ স্নাতক স্তরে পড়ে। কলেজ-শিক্ষা সমাপনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করলো। তাই একদিন সকালে আমি তার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করলাম এবং আমার গাড়ি নিয়ে তার বাড়িতে গেলাম। শিক্ষাজীবনের নতুন এক স্তরে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে বিধায় তার অন্তরে বিভিন্ন অনুভূতি ভিড় জমাচ্ছিলো। সে তার নতুন কলেজ নিয়ে ভাবছিলো। গাড়িতে ওঠার পর আমি তার শরীর হতে সুগন্ধির ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিলো, সে আতরের পুরো শিশি কাপড়ে ঢেলে দিয়েছে!

সত্যি কথা হলো, আতরের ঝাঁজালো ও সুতীব্র ঘ্রাণে আমার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম ছিলো। বুঝতে পারছিলাম, বেচারা পোশাকের সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণের জন্য যথেষ্ট লৌকিকতা করছে। আমি শ্বাস গ্রহণের জন্য জানালা খুললাম আর তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম, 'মা-শা-আল্লাহ! বড় চমৎকার মিষ্টি ঘ্রাণ! আমার তো ভয় হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর যখন প্রথমবার এই মিষ্টি ঘ্রাণ অনুভব করবেন, হয়তো সজোরে বলে উঠবেন, "তোমার ভর্তি কমপ্লিট...!"'

আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, এ কথা শুনে সে কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলো! অন্তরে লুকিয়ে রাখা আনন্দ তার পুরো চেহারায় উদ্ভাসিত হচ্ছিলো। সে আমার দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, 'ভাই আবু আব্দুর রহমান! আপনাকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। এটি অনেক দামী আতর। সবসময়ই আমি এ আতরটি ব্যবহার করি। কিন্তু কেউ এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না।' এরপর সে বারবার নিজের কাপড়ের ঘ্রাণ শুঁকতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই আমার রুচি ও পছন্দ অতি চমৎকার!'

এ ঘটনার পর ইতোমধ্যে পনেরো বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আ. মাজীদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপন করেছে এবং কয়েক বছর যাবৎ চাকুরি করছে। কিন্তু সেদিনের ঘটনা এখনো তার স্মরণ আছে। সাক্ষাতে প্রায়ই সে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্পর্কের মাধ্যমে প্রভাবিত করা এবং ভালোবাসা অর্জন করা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় স্বভাবজাত আকর্ষণ দক্ষতা প্রয়োগ করতেও অবহেলা করি। তো আপনি বিচক্ষণ হোন। অত্যুক্তি

হবে না, যদি বলি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মহামানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ভালোবাসা অর্জনে এ সকল দক্ষতা বরং এর চেয়েও উত্তম দক্ষতা প্রয়োগ করতেন।

ইসলামের প্রভাতকালে মক্কায় নিরাপদে জীবনযাপন এবং দ্বীনের ওপর চলা কঠিন হয়ে পড়লে মুসলমানগণ আপন বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি. ছিলেন মক্কার একজন প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করে শূন্য হাতে হিজরত করে তিনি হয়ে গেলেন নিঃস্ব-হতদরিদ্র মুহাজির! মুহাজিরদের অবস্থার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আবদুর রহমান রাযি. হলেন সা'দ বিন রাবী' রাযি.-এর ভাই। সাহাবায়ে কেরামের নফস ও অন্তরজগত ছিলো স্বচ্ছ, হৃদয় ছিলো পরিচ্ছন্ন। তাই সা'দ রাযি. আবদুর রহমান রাযি.কে বললেন, 'ভাই! মদীনাবাসীদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী। তাই আমার সম্পদকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে আপনি অর্ধেক গ্রহণ করুন, আমার জন্য অর্ধেক বাকি রাখুন। পাশাপাশি আমার দু'স্ত্রীর মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুন, আমি তালাক দিয়ে দিচ্ছি।'

আবদুর রহমান রাযি. তাঁর সম্পদ মক্কায় রেখে এসেছেন এবং ইতোমধ্যে কাফিররা তা দখল করে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সা'দ রাযি.-এর উভয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে বললেন, 'আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদে

বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে মদীনার বাজার চিনিয়ে দিন!’

সা'দ রাযি. তাঁকে বাজার চিনিয়ে দিলেন। তিনি বাজারে গিয়ে বাকিতে কিছু পণ্য ক্রয় করলেন এবং তা নগদে বিক্রি করলেন। ফলে ব্যবসা করার মত মূলধন অর্জিত হলো। আপন জ্ঞান ও ব্যবসায়িক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অল্প দিনেই তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হলেন এবং বিয়ে করলেন। বিয়ের পর যখন আবদুর রহমান রাযি. রাসূলের কাছে এলেন, তাঁর শরীরে মহিলাদের দেয়া যাফরানের রঙ শোভা পাচ্ছিলো। তিনি তো এখন মদীনায় অপরিচিত কেউ নন, তিনি সদ্য বিয়ে করা মদীনার বর!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মার চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। মানুষের অন্তরকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকতেন। আবদুর রহমানের প্রতি দৃষ্টি পড়া মাত্রই তিনি তার অবস্থার পরিবর্তনের দিকে মনোযোগী হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী খবর তোমার?’

আবদুর রহমান হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমি আনসারী এক মহিলাকে বিয়ে করেছি’।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হলেন। মনে মনে ভাবলেন, এত দ্রুত সে কীভাবে বিয়ে করতে সক্ষম হলো? এই তো কিছুদিন পূর্বে সে হিজরত করেছে! তাই নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, ‘স্ত্রীর মোহর কত ছিলো?’

জবাবে আবদুর রহমান রাযি. বললেন, ‘খেজুর দানার ওজন পরিমাণ স্বর্ণ!’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান রাযি.-এর আনন্দকে আরো বৃদ্ধি করতে চাইলেন। তাই বললেন, ‘একটি বকরি দিয়ে হলেও তুমি ওলিমার আয়োজন করো।’ এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের দোয়া করলেন। ফলে তাতে প্রভূত বরকত হলো। আবদুর রহমান রাযি. তাঁর উপার্জন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলতেন, ‘আমি যদি পাথরও উঠাতাম, তাতেও স্বর্ণ-রূপা পাওয়ার আশা করতাম।’ [সুনানে আবু দাউদ: ২১০৯, মুসনাদে আহমদ: ১২৫২৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের ভালো গুণগুলো তালাশ করতেন। অসহায় ও নিঃস্বদেরকে তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতেন। তারা এ কথা অনুভব করতো যে, তিনি তাদের প্রতি মনোযোগী এবং তাদেরকে ভালোবাসেন। তিনি তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মেরও মূল্যায়ন করতেন। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তার ভালো বিষয়গুলো উল্লেখ করতেন এবং তার নেক আমলকে অন্যদের সামনে পেশ করতেন। ফলে অন্যরাও অনুরূপ কাজ করতে আগ্রহী হতো।

মদীনায় কৃষ্ণবর্ণের জনৈক মুমিনা নারী মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যেই তাকে ঝাড়ু দিতে দেখতেন এবং তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হতেন। একবার বেশ কয়েকদিন তাকে দেখতে না পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তার

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবা রাযি. জানালেন, 'আল্লাহর রাসূল! সে তো কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা আমাকে তার মৃত্যুসংবাদ জানাওনি কেন?'

সাহাবীগণ মহিলার মৃত্যুর বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন। নাম-পরিচয়হীন একজন নিঃস্ব মহিলা তো এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তার মৃত্যুসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে রাসূলকে দিতে হবে। সাহাবীগণ বললেন, 'সে রাতে মৃত্যুবরণ করেছে। আপনার কষ্ট হবে ভেবে আপনাকে আমরা জাগ্রত করিনি।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন, মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ মহিলা অত্যন্ত মর্যাদাশীল। তবে তারা ভেবে পাচ্ছিলেন না, রাসূল কীভাবে সমাধিস্থ এ মহিলার জানাযা পড়বেন!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও'। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কবরের পাশে নিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরকে সামনে রেখে জানাযা পড়লেন। তারপর বললেন, 'এ কবরগুলো তার বাসিন্দাদের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো। আমার এ জানাযা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সেগুলো আলোকিত করেছেন।' [সুনানে কুবরা, বাইহাকী: ৬৫৪৮]

নিঃস্ব একজন মহিলার প্রতি রাসূলের এই ভালোবাসা ও গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়জগতে না জানি কী আশ্চর্য অনুভূতি জেগেছিলো! রাসূলের সামান্য এই আচরণে তারা লাভ করেছিলেন ঐ মহিলার ন্যায় আমল কিংবা তার চেয়েও বড় আমলের অনুপ্রেরণা।

এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন। আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছি, যেখানে এ জাতীয় দক্ষতাকে অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করা হয় না। অতি অলস ও অথর্ব একদল ব্যক্তি আছে, যারা আপনার নম্র ব্যবহার, কোমল ও উদ্বুদ্ধকর আচরণ এবং নিখাদ প্রশংসাতেও কোনো রূপ প্রভাবিত হবে না। কোমল আচরণের বিপরীতে তাদের কাছে আপনি পাবেন রু ক্ষ-প্রাণহীন আচরণ, যাতে নেই কোনো স্বাদ, রঙ, সুঘ্রাণ! এদের আচরণে হতাশ হবেন না। আপন উদ্যম বজায় রাখুন। সামনের পথে এগিয়ে যান।

একটি মজার ঘটনা শুনুন। আমার পরিচিত জনৈক যুবককে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়েছিলো। সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও আমন্ত্রিত ছিলেন। সে যাওয়ার পথে মার্কেটের একটি সুগন্ধির দোকানে প্রবেশ করলো এবং ভাব দেখালো যে, খুব দামী কোনো আতর কিনবে। দোকানদার উপযুক্ত ক্রেতা পেয়ে দ্রুত স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান আতর দেখাতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এসব বৈচিত্র্যময় সুগন্ধির মধ্য হতে ক্রেতা তার পছন্দমতো একটিকে বেছে নেবে।

বিভিন্ন ধরনের আতরের স্পর্শে যখন তার পোশাক সুঘ্রাণে ভরে গেলো, সে বিক্রেতাকে কৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে বললো, ‘ধন্যবাদ! আমি একটু ভেবে দেখি, এগুলোর মধ্য হতে যদি কোনোটি আমার পছন্দ হয়, আমি অবশ্যই আপনার দোকানে ফিরে আসবো!’

আতরের সুঘ্রাণ সঙ্গে নিয়ে সে দ্রুত অনুষ্ঠানস্থলে চলে গেলো, যেন সুঘ্রাণ হারিয়ে না যায়! খাবার টেবিলে সে তার বন্ধু খালিদের পাশে বসলো। কিন্তু খালিদ তার সুঘ্রাণে আকৃষ্টও হলো না, তার সুরুচি সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করলো না। ফলে আমাদের এই বন্ধু বড় অবাক হয়ে খালিদকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি কি কোনো চমৎকার আতরের সুঘ্রাণ পাচ্ছো না?!’

খালিদ বললো, ‘না’।

‘মনে হচ্ছে তোমার নাক (সর্দির কারণে) বন্ধ!’

‘নাক বন্ধ থাকলে তো তোমার ঘামের দুর্গন্ধ পেতাম না!’—খালিদের তড়িৎ উত্তর।

**সরল স্বীকারোক্তি...**

মানুষ সফলতার যত উচ্চ স্তরেই উন্নীত হোক না কেন সে তো মাটিরই মানুষ। তাই সেও প্রশংসা কামনা করে, প্রশংসায় আনন্দিত হয়।

# ২৮. সাবধান! কেবল সৌন্দর্যেরই প্রশংসা করুন

অনেকে সবসময় কেবল মন্তব্য ও প্রশংসা করতেই থাকে, কখনোই নিবৃত্ত হয় না। অথচ একটি প্রসিদ্ধ আরবী প্রবাদ হলো, 'কোনো ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা হলে তাতে বিপরীত ক্রিয়া হয়। আর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো বস্তু অর্জনের চেষ্টা করা হলে তা হতে বঞ্চিত হতে হয়।'

সুতরাং আপনি কেবল সেই সুন্দরেরই প্রশংসা করুন মানুষ যা দেখে আনন্দবোধ করে, অন্যের প্রশংসা কামনা করে, মুগ্ধকর বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে চায়। পক্ষান্তরে মানুষ যেসব বিষয়ে অন্যের অবগতিতে লজ্জাবোধ করে, অন্যের মন্তব্যে অপমানবোধ করে, আপনি সে ব্যাপারে অন্ধ সাজার চেষ্টা করুন।

উদাহরণস্বরূপ কোনো বন্ধুর বাসায় গিয়ে আপনি কিছু পুরনো চেয়ার দেখতে পেলেন। আপনি তখন অথর্ব ও নির্বোধদের মত না চাইতেই পরামর্শ দিতে যাবেন না, বরং আপন বচনকে সংযত রাখবেন। আপনি বলতে যাবেন না, 'এ চেয়ারগুলো বদলাচ্ছো না কেন? ঝাড়বাতির অর্ধেকই তো জ্বলছে না! নতুন ঝাড়বাতি কিনছো না কেন? আর দেয়ালের রঙ অনেক পুরনো হয়ে গেছে! নতুন করে রঙ করছো না কেন?'

ভাই! সে তো আপনার কাছে অভিযোগ ও পরামর্শ শুনতে চায়নি। আপনি তো কোনো ডেকোরেশন বিশেষজ্ঞও নন, যার কাছে সে রুম ডেকোরেশনের

জন্য পরামর্শ চেয়েছে। আপনি এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকুন। হতে পারে তার পরিবর্তন করার সামর্থ্য নেই, হতে পারে সে আর্থিক সংকটে ভুগছে কিংবা অন্য কোনো কারণ আছে।

যে বিষয়ে কেউ লজ্জা অনুভব করে সে বিষয়ে কঠিন কথা বলা, খোঁটা দেয়া কিংবা নানা রকম মন্তব্য করা হলে এর চেয়ে বিব্রতকর ও কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না। মনে করুন আপনার বন্ধুর পোশাক পুরনো কিংবা তার গাড়ির এসি নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি সম্ভব হলে ভালো কিছু বলুন, নয়তো চুপ থাকুন।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তার এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলো। বন্ধু তার সামনে রুটি ও যাইতুন পরিবেশন করলো। অতিথি বন্ধু বললো, ‘রুটির সঙ্গে যা’তার (একপ্রকার সুগন্ধি গুল্ম) থাকলে বেশ হতো!’ ঘরে যা’তার না থাকায় মেজবান বন্ধু পাশের দোকানে গেলো। কিন্তু টাকা না থাকায় দোকানি বাকিতে বিক্রি করতে অস্বীকার করলো। বাড়ি ফিরে সে তার অযু করার পাত্রটি নিয়ে দোকানীর কাছে এই শর্তে বন্ধক রাখলো যে, যদি সে যা’তারের মূল্য আদায় করতে না পারে তাহলে দোকানি অযুর পাত্রটি বিক্রি করে নিজের পাওনা আদায় করে নিবে। এভাবে যা’তার সংগ্রহ করে সে তা মেহমানের সামনে পরিবেশন করলো। তৃপ্তিমতো আহারের পর অতিথি বন্ধু দোয়া পাঠ করলো, ‘শোকর আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে আহার দান করেছেন, পানীয় প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে যা দান করেছেন, তাতেই তুষ্ট রেখেছেন!’

মেজবান বন্ধু এ কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ‘হায়! আল্লাহ যদি আপন দানে তোমাকে তুষ্ট রাখতেন, তাহলে আমার অযুর পাত্রটি বন্ধক রাখতে হতো না!’

তদ্রূপ অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে আপনি বলবেন না, ‘হায়! হায়! আপনার চেহারা তো হলদে হয়ে গেছে! চোখ দু'টো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! শরীরের চামড়াও বিবর্ণ হয়ে গেছে!’ বড় আশ্চর্যের কথা! আপনি তো তার চিকিৎসক নন। আপনি সম্ভব হলে সান্ত্বনাস্বরূপ ভালো কিছু বলুন, নয়তো চুপ থাকুন।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি একজন রোগীকে দেখতে গিয়ে তার পাশে কিছুক্ষণ বসে রইলো। এরপর তার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রোগী তার রোগের কথা জানালো। তার রোগ ছিল কিছুটা কঠিন পর্যায়ের। রোগের বিবরণ শোনামাত্রই সাক্ষাতকারী চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘হায়! হায়! আপনার এই রোগ হয়েছে! এ রোগে তো আমার অমুক বন্ধু মারা গেছে! আমার ভাইয়ের বন্ধু অমুক তো এ রোগে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার পর শেষ পর্যন্ত মারাই গেলো! আমার ভগ্নিপতির প্রতিবেশী অমুকও তো এ রোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে!’

রোগী তো তার কথা শুনে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়! সাক্ষাতকারী কথা শেষ করে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে রোগী কিছু বলবে কিনা জানতে চাইলে রোগী বললো, ‘হ্যাঁ, ভবিষ্যতে তুমি কখনো আমার কাছে আসবে না। আর কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার সামনে মৃতদের আলোচনা করবে না।’

লোকমুখে প্রচলিত আরেকটি ঘটনা শুনিয়ে আমি এ আলোচনার ইতি টানছি। জনৈক বৃদ্ধা মহিলা জানতে পারলো তার এক বৃদ্ধা বান্ধবী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে তার সন্তানদেরকে এক এক করে অনুরোধ করলো তারা যেন তাকে ঐ অসুস্থ বান্ধবীর কাছে নিয়ে যায়। ছেলেরা প্রত্যেকেই নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলো। শেষে এক ছেলে কিছুটা রাজি হলো এবং তার গাড়িতে করে মাকে নিয়ে গেলো।

গন্তব্যে পৌঁছে তার মা গাড়ি হতে নেমে গেলো, আর সে গাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলো। মহিলা তার অসুস্থ বান্ধবীর কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলো, তার রোগ সম্পর্কে জানলো এবং দোয়া করলো। বিদায় নেয়ার সময় সে দেখতে পেলো, অসুস্থ মহিলার মেয়েরা বাড়ির হলরুমে জড়ো হয়ে কান্নাকাটি করছে। তখন সে দায়সারা সুরে বললো, 'আমি চাইলেও তোমাদের কাছে আসা সম্ভব হয় না। তোমাদের মা তো অসুস্থ। মনে হচ্ছে শীঘ্রই তিনি মারা যাবেন। আল্লাহ পাক এখন থেকেই তোমাদের উত্তম পন্থায় শোক পালনের তাওফীক দান করুন!'

তাই হে প্রাজ্ঞ পাঠক! কেবল আনন্দ ও খুশির বিষয়েই মন্তব্য করুন, দুঃখ ও শোকের বিষয়ে নয়।

**সমস্যা...**

কারো পোশাকের অপরিচ্ছন্নতা কিংবা শরীরের দুর্গন্ধ—এ জাতীয় কোনো বিব্রতকর বিষয়ে যদি মন্তব্য করতেই হয় তাহলে সুন্দরভাবে সতর্ক

শব্দচয়নের মাধ্যমে তাকে অবহিত করুন। এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয় দিন।

# ২৯. অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

[সুনানে তিরমিযী: ২২৩৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৬৬]

অর্থ: অনর্থক বিষয়কে পরিহার করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য।

কত চমৎকার মর্মসমৃদ্ধ বাণী! পবিত্র, সুরভিত নববী বচন নিঃসৃত সুসংক্ষিপ্ত, সুসমৃদ্ধ বাণী! অনেক অথর্ব ব্যক্তি আছে যারা প্রতি মুহূর্তে আপনাকে অনর্থক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিরক্ত করবে। আপনার হাতে ঘড়ি দেখলেই বিভিন্ন প্রশ্ন করে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। 'ভাই! ঘড়িটি কত দিয়ে কিনলেন?' আপনি হয়তো উত্তরে বললেন, 'এটা আমি হাদিয়া পেয়েছি'। সে তখন বলবে, 'আচ্ছো! হাদিয়া! কার কাছ থেকে?' আপনি উত্তরে বললেন, 'আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে'। সে তখন জিজ্ঞেস করবে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু, না এলাকার বন্ধু, নাকি অন্য কোথাকার?' আপনি জবাবে বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের'। সে তখন বলবে, 'ভালো! তো কী উপলক্ষে?' আপনি বললেন, 'এমনিই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে...'। সে নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করবে, 'উপলক্ষটা কী? কোনো সাফল্যের কারণে, নাকি ভ্রমণের সময়, নাকি...?'

এভাবে তুচ্ছ কোনো বিষয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করতে থাকবে। আপনার হয়তো অবশ্যই তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে

করে, 'প্লিজ! দয়া করে অনর্থক বিষয়ে নাক গলাবেন না।' বিশেষ করে ভরা মজলিসে এ ধরনের অনবরত অর্থহীন প্রশ্নবান নিশ্চয়ই আপনাকে বেশ কষ্ট দেয়।

আমি একবার মাগরিব নামাযের পর সহকর্মীদের সঙ্গে এক মজলিসে বসে ছিলাম। হঠাৎ এক সঙ্গীর মোবাইল বেজে উঠলো। সে আমার পাশেই বসে ছিলো। রিসিভ করে 'কে?' জিজ্ঞেস করতেই অপর পাশ থেকে তার স্ত্রীর চড়া কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'গাধা! আমি তোর স্ত্রী! ধ্বংস হ তুই!'

মহিলার স্বর বেশ উঁচু ছিলো বিধায় আমি তাদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম। কথাবার্তায় মনে হলো সে তার স্ত্রীকে মাগরিবের পর শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেছিলো। অথচ এখন সে আমাদের সঙ্গে খোশালাপে ব্যস্ত!

স্বামী বেচারা গালি হজম করে শান্ত স্বরে বললো, 'বেশ ভালো! আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন!' স্ত্রী ততোধিক রাগান্বিত স্বরে উত্তর দিলো, 'আল্লাহ তোকে নিরাপদ না রাখুন! আমি অপেক্ষায় বসে আছি আর তুই তোর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত! তুই ষাঁড় একটা আস্ত!'

স্বামী বললো, 'আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমি এশার পরই তোমার কাছে আসবো।' আমি লক্ষ করলাম, স্ত্রীর কথার সঙ্গে তার কথার কোনো মিল নেই। বুঝতে পারলাম, সে নিজেকে কষ্ট হতে বাঁচাতে এ কাজ করছে। তাদের খোশালাপ এ পর্যন্তই! আমি উপস্থিত লোকদের দিকে তাকাতে লাগলাম। ভাবছিলাম, তাদের মধ্য হতে কেউ হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করবে,

‘আপনার সঙ্গে কে কথা বললো? সে আপনার কাছে কী চায়? কথোপকথনের পর আপনার চেহারা এমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো কেন?’ কিন্তু আল্লাহ তার প্রতি দয়া করলেন। কেউ এ জাতীয় অন্যায় হস্তক্ষেপ করলো না।

তেমনই কোনো রোগী দেখতে গিয়ে আপনি যখন তাকে তার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন রোগী হয়তো এভাবে সাধারণ উত্তর দেয় যে, ‘আলহামদু লিল্লাহ! হালকা রোগ, ছোট ব্যাধি ইত্যাদি।’ সে হয়তো এ জাতীয় অস্পষ্ট শব্দেই উত্তর সেরে নেয়। আপনি তখন আরো সুস্পষ্ট উত্তর জানতে এ জাতীয় অনর্থক কোনো প্রশ্ন করবেন না, ‘বেয়াদবী মাফ করবেন, হালকা রোগটা কী? একটু নির্দিষ্ট করে বলবেন? আরেকটু খুলে বলুন।’ আশ্চর্য! আপনার কী প্রয়োজন পড়েছে রোগীকে এভাবে কষ্ট দেয়ার?

অনর্থক বিষয়কে পরিহার করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, রোগী হয়তো নিজেই বলবে, ‘আমি অশ্বরোগে আক্রান্ত’ কিংবা ‘আমার অমুক স্থানে ক্ষত হয়েছে’ ইত্যাদি। যখন রোগী কোনো বিষয়ে অস্পষ্ট জবাব দেন তখন তার সঙ্গে সে বিষয়ে কথা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। আমি এ কথা বলছি না যে, রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে প্রশ্নই করা যাবে না। বরং আমার কথা হলো, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না করা হয়।

তেমনই ভরা মজলিসে কোনো ছাত্রকে ডেকে উচ্চ স্বরে এরূপ জিজ্ঞেস করাও ঠিক নয়—‘আহমদ! তুমি কি পাশ করেছো?’

'হ্যাঁ, পাশ করেছি।'

'তোমার গড় নম্বর কত? ক্লাসে তোমার রোল নম্বর কত?'

আপনি যদি আন্তরিকভাবেই তার প্রতি যত্নবান হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে একান্তে ডেকে প্রশ্ন করুন। তাছাড়া 'তোমার গড় নম্বর কত?' 'কেন তুমি পরামর্শ করোনি?' 'কেন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওনি?'—এসব অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নের তো কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যদি তাকে সাহায্য করতেই চান তাহলে তাকে নিয়ে একপাশে দাঁড়ান, তার সঙ্গে কথা বলে জানতে চেষ্টা করুন, সে কী চাচ্ছে। তার দুর্বলতাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়া তো সঠিক পন্থা নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অনর্থক বিষয়কে পরিহার করা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য।' ^১[সুনানে তিরমিযী: ২২৩৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৬৬] কিন্তু সাবধান! বিষয়টিকে তার বাস্তব অবস্থা হতে বড় করে দেখবেন না।

কিছুদিন পূর্বে আমি মদীনায় সফর করি। সেখানে আমার বেশ কয়েকটি বক্তৃতা-প্রোগ্রাম ছিলো। তাই আমি জনৈক যুবকের সঙ্গে একমত হলাম যে, সে আমার ছেলে আবদুর রহমান ও ইবরাহীমকে আসরের পর কোনো গ্রীষ্মকালীন বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরিয়ে আনবে এবং এশার পর তাদের নিয়ে ফিরে আসবে। আবদুর রহমানের বয়স তখন দশ বছর। আমি আশঙ্কা করছিলাম যুবকটি হয়তো ঘোরাফেরার সময় তাকে অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন করবে। যেমন—'তোমার আম্মুর নাম কী?' 'তোমাদের বাড়ি

কোথায়?’ ‘তোমরা কয় ভাই?’ ‘তোমার আব্বু তোমাকে কত টাকা দেন?’ তাই আমি আবদুর রহমানকে বললাম, ‘বাবা! তোমাকে সে কোনো অসঙ্গত প্রশ্ন করলে তুমি তাকে বলে দেবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলমানের মহৎ গুণের মধ্যে এটিও একটি যে, সে অনর্থক কাজকর্মকে পরিত্যাগ করবে।”’ আমি বারবার তাকে হাদীসটি বললাম, যাতে তার মুখস্থ হয়ে যায়।

আবদুর রহমান ও তার ভাই যুবকটির সঙ্গে গাড়িতে উঠলো। আবদুর রহমান দৃঢ়ভাবে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বসে রইলো। যুবকটি কোমল স্বরে বললো, ‘আবদুর রহমান! আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন!’ আবদুর রহমান প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বললো, ‘আল্লাহ আপনাকেও দীর্ঘজীবী করুন!’ যুবক বেচারা পরিবেশকে অন্তরঙ্গ করে তুলতে চাচ্ছিলো। তাই সে বললো, ‘আজ কি শায়খের (অর্থাৎ তোমার পিতার) কোথাও বক্তৃতার প্রোগ্রাম আছে?’

আবদুর রহমান হাদীসটি স্মরণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু স্মৃতিশক্তি তাকে সহায়তা করলো না। তাই সে চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘আপনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না!’

যুবকটি বললো, ‘না, না, আমি তো কেবল শায়খের প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে আলোচনা শোনার ইচ্ছায় এ প্রশ্ন করেছি।’

আবদুর রহমান ভাবলো, যুবকটি হয়তো তার ওপর চালাকি ফলাচ্ছে! তাই সে পুনরায় বললো, ‘আপনি অসঙ্গত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।’

যুবকটি বললো, 'আবদুর রহমান! আমি অত্যন্ত দুঃখিত! আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম...'

আবদুর রহমান কথার মধ্যেই চিৎকার করে বলে উঠলো, 'না! আপনি কিছুতেই অনর্থক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না!'

ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের দু'জনের মাঝে এ অবস্থাই বিরাজ করছিলো! ফেরার পর আবদুর রহমান আমাকে পুরো ঘটনাটি গর্বভরে শুনাচ্ছিলো। আমি হাসলাম এবং তাকে পুনরায় বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম।

**কর্মশীলন...**

অন্যের বিষয়ে অনধিকার চর্চা হতে বিরত থাকার অনুশীলন প্রথমে খুবই কষ্টসাধ্য মনে হলেও পরবর্তীতে তা অনেক আনন্দদায়ক।

# ৩০. অনধিকার চর্চাকারীর সঙ্গে আপনার আচরণ যেমন হবে...

অনেক সময় অনুমতি ছাড়াই হয়তো কেউ আপনার মোবাইল নিয়ে সংরক্ষিত মেসেজগুলো পড়তে শুরু করে। নৈশভোজের এক অনুষ্ঠানে আমার জনৈক সহকর্মী একজন বিচারকের পাশে বসেছিলো। অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ও পদস্থ বিভিন্ন ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। আমার সহকর্মী তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলো। অস্বস্তিবোধ করায় সে নিজের মোবাইলটি পকেট থেকে বের করে পাশের টেবিলে রাখলো। তার পাশে বসা বিচারক ভদ্রলোক আলাপচারিতার ফাঁকে মানবিক অভ্যাসবশত মোবাইল ফোনটি হাতে নিয়ে স্ক্রিনে নজর বুলালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার রঙ বদলে গেলো এবং তিনি মোবাইলটি টেবিলে রেখে দিলেন।

আমার সহকর্মী এ দৃশ্য দেখে কোনো মতে হাসি চেপে রাখলো। অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হওয়ার পর আমি তার গাড়িতে চড়েই ফিরছিলাম। সে তার মোবাইলটি সিটের পাশে রাখলে আমি তা হাতে নিয়ে বিচারক ভদ্রলোকের মতই স্ক্রিনে নজর বুলালাম। স্ক্রিনে দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমি হেসে উঠলাম, বরং বলা ভালো—হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম!

পাঠক! আপনি আমার হাসির কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন? ঘটনা হলো, অনেকেই মোবাইল স্ক্রিনে বিভিন্ন কথা লিখে রাখে। কেউ নিজের নাম লিখে রাখে, কেউ লিখে রাখে 'আল্লাহকে স্মরণ করুন', কেউ অন্য কিছু। আমার

সহকর্মী তার মোবাইল-স্ক্রিনে লিখে রেখেছে, ‘এই বেটা! অনধিকার চর্চাকারী! মোবাইল ফেরত দে!’

এক শ্রেণীর লোকই আছে যারা এভাবে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। কিছু লোকের স্বভাব হলো আপনার গাড়িতে উঠলে প্রথমেই সামনের ড্রয়ারটি খুলে দেখবে, ভেতরে কী আছে। কিছু মহিলার স্বভাব হলো অন্য মহিলার ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বা আইলাইনার নেড়েচেড়ে দেখবে। কেউ আছে আপনাকে ফোন করেই জিজ্ঞেস করবে, ‘তুমি কোথায়?’ আপনি উত্তর দেয়ার পর তার পরবর্তী প্রশ্ন হবে, ‘এটা আবার কোন জায়গায়? তোমার সঙ্গে কে কে আছে?’

আমি, আমরা এমন অনেকের সঙ্গেই ওঠাবসা করি, যারা এ জাতীয় আচরণ করে থাকে। প্রশ্ন হলো, তাদের সঙ্গে আমার আচরণ কেমন হবে? এক্ষেত্রে সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার সঙ্গে যেন সংঘাত সৃষ্টি না হয়। চেষ্টা করুন, কেউ যেন আপনার সঙ্গে রাগান্বিত হতে না পারে। কোনো অবস্থান হতে সরে আসার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয় দিন, যেন আপনার সঙ্গে অন্য কারো কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। কারণ ও কার্যকারণ যতই জটিল হোক না কেন, নতুন করে শত্রু তৈরি এবং পুরনো বন্ধুকে হারানোর বিষয়টিকে হালকা করে দেখবেন না।

অনধিকার চর্চাকারীর সঙ্গে আচরণের উত্তম একটি পদ্ধতি হলো, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে দেয়া অথবা কথাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে নিয়ে যাওয়া,

যাতে সে তার প্রথম প্রশ্ন ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ কেউ আপনাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনার মাসিক বেতন কত?' আপনি মুচকি হেসে কোমল স্বরে বলুন, 'কেন ভাই! আপনি কি আমার জন্য ভালো-উচ্চ বেতনের কোনো চাকরি পেয়েছেন?!'

তখন সে অবশ্যই বলবে, 'আরে না! আমি আসলে জানতে চাচ্ছি...।' তাকে থামিয়ে আপনি বলে উঠুন, 'বর্তমানে তো বেতন-ভাতার খুবই সমস্যা! সম্ভবত পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এমনটা হচ্ছে!' তখন সে বলবে, 'পেট্রোলের ব্যাপারটা কী, বলুন তো।' আপনি বলুন, 'আরে ভাই! পেট্রোলই তো সবকিছুর উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করে। দেখছেন না, এই তেলের জন্যই দেশে দেশে কত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে!'

সে তখন বলবে, 'না ভাই! আপনার এ কথাটি সঠিক নয়। যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক নেপথ্য কারণও রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীটা তো যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর...' এভাবে একপর্যায়ে সে তার প্রথম প্রশ্নটা ভুলে যাবে।

প্রিয় পাঠক! আপনার কী মনে হয়? এভাবে সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের প্রয়োগের মাধ্যমে কি এ জাতীয় সমস্যা হতে উত্তরণ সম্ভব নয়? তদ্রূপ কেউ আপনার চাকরি সম্পর্কে প্রশ্ন করলো কিংবা জানতে চাইলো, 'সফরে কোথায় যাচ্ছেন?' আপনি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করুন, 'কেন? আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?' অবশ্যই সে তৎক্ষণাৎ বলবে, 'না! আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম...।'

আপনি বলুন, 'ভাই! একসাথে গেলে টিকেট খরচ কিন্তু আপনার ওপর!' তখন সে নিজের অলক্ষেই টিকেট সংক্রান্ত আলোচনায় জড়িয়ে পড়বে এবং তার মূল কথাই ভুলে যাবে। এভাবে পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে কোনো ক্ষতি ছাড়াই আমরা এ জাতীয় সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি।

**বিরতি...**

অনধিকার চর্চাকারীর পাল্লায় পড়লে আপনি তার তুলনায় ভালো আচরণ করুন... তাঁর মনে ব্যথা না দিয়ে সুন্দর কোনো পন্থায় প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান।

# ৩১. সমালোচনা করবেন না

জনৈক ব্যক্তি তার এক বন্ধুর গাড়িতে উঠেছিলো। গাড়িতে উঠে তার প্রথম কথা ছিলো, 'হায়! তোমার গাড়ি এত পুরনো!' তার বাড়িতে প্রবেশ করে আসবাবপত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে বললো, 'ইস! তোমার ঘরের জিনিসপত্র এত এলোমেলো!' বন্ধুর সন্তানদেরকে দেখে তার মন্তব্য, 'মাশাআল্লাহ! তবে এদেরকে আরো ভালো পোশাক পরাও না কেন?' বন্ধুর স্ত্রী বেচারী কয়েক ঘণ্টা রান্নাঘরে সময় ব্যয় করে তার সামনে বিভিন্ন ধরনের খাবার পরিবেশন করলো। খাবার দেখে সে আফসোসের সুরে বললো, 'হায় আল্লাহ! ভাত রান্না করেছেন কেন? ওহো! লবণ তো কম হয়েছে! এ জাতীয় খাবারের প্রতি আমার আগ্রহ কম!'

ফল কিনতে সে একটি দোকানে ঢুকলো। দোকানটি নানা রকম ফলফলাদিতে ভরপুর। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার দোকানে আম আছে?'

দোকানদারের উত্তর, 'না। আম তো শুধু গ্রীষ্মকালেই পাওয়া যায়।'

'তরমুজ আছে?'

'না, ভাই।'

তখন তার চেহারার রঙ বদলে গেলো। সে বললো, 'মিয়া! আপনার দোকানে কিছুই নেই। দোকান খোলেন কেন?' এরপর সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো। সে যেন খেয়ালই করেনি যে, দোকানে চল্লিশ প্রকারের চেয়েও বেশি ফল আছে।

হ্যাঁ, এমন অনেক মানুষ আছে, যারা পদে পদে সমালোচনা করে আমাকে-আপনাকে বিরক্ত করে। কোনো কিছুতেই তারা খুশি হতে পারে না। ফলে সুস্বাদু খাবারের দিকে তাকালে তাদের নজর পড়ে কেবল অনিচ্ছায় পড়ে যাওয়া একটুকরো চুলের দিকে। পরিচ্ছন্ন কাপড়ের দিকে তাকালে নজর পড়ে অনিচ্ছায় পড়ে যাওয়া কালির ফোঁটার দিকে। উৎকৃষ্ট মানের কোনো কিতাব পড়তে বসলে নজর পড়ে কেবল মুদ্রণগত ছোটখাটো অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির দিকে। এদের সমালোচনা থেকে কেউ রেহাই পায় না। প্রতি মুহূর্তে এরা ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সমালোচনার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

আমার এক বন্ধু; মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন, মোটকথা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব। এখনো আমাদের সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই দীর্ঘ জীবনে আমার মনে পড়ে না, সে কারো কোনো বিষয়ে প্রশংসা করেছে! একবার আমি আমার লেখা একটি গ্রন্থ সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাইলাম। গ্রন্থটি অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং ইতোমধ্যে কয়েক লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে। সে নিরস স্বরে বললো, ‘ভালোই! তবে তাতে অপ্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা এসে গেছে, লেখার সাইজটাও আমার পছন্দ হয়নি, ছাপার মানও তেমন উন্নত নয় আর...’

একবার আমি তাকে একজন বক্তার বক্তৃতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন সে এমন সব মন্তব্য করতে লাগলো, যেন তার বক্তৃতায় ভালো কোনো দিকই নেই। দিনে দিনে তার আচরণ আমার কাছে পাহাড়ের চেয়ে ভারী

মনে হতে লাগলো। আমি কোনো বিষয়ে তার অভিমত জানতে চাইতাম না। কারণ আমি আগে থেকেই তাকে চিনি আর জানি, সে কী বলবে।

এভাবে ঐ ব্যক্তির কথাও আপনি উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারেন, যে সমাজে নিজেকে আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করে। সে তার স্ত্রীর কাছে কামনা করে, ঘর যেন চব্বিশ ঘণ্টা একশত ভাগ পরিচ্ছন্ন থাকে। সে কামনা করে, তার সন্তানরা যেন সারাদিন পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি থাকে। কোনো মেহমান সাক্ষাৎ করতে এলে সে কামনা করে, স্ত্রী যেন উত্তম খাবার প্রস্তুত করে। পরস্পর কথা বলার সময় স্ত্রীর কাছে ভালো ভালো কথা প্রত্যাশা করে। সন্তানদের কাছেও ভালো ভালো কাজ ও কথা কামনা করে। সহকর্মী, বাজারে কিংবা পথে যার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হোক, সবার কাছেই সবকিছু একশত ভাগ পেতে চায়। এদের সামনে কেউ কোনো ত্রুটি করে ফেললে এরা যেন পারলে তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়, নানা রকম মন্তব্য করে। স্বচ্ছ সাদা কাগজে এরা শুধু কালো দাগ দেখতে পায়। এ শ্রেণীর লোকেরা মূলত নিজ আচরণে নিজেকেই কষ্ট দেয়, কাছের লোকেরাও তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং তার সঙ্গে চলাফেরা করাকে বোঝা মনে করে। কবি যেন এদের লক্ষ্য করেই বলেছেন:

সামান্য ঘোলা দেখলেই যদি পানি পানে বিরত থাকো<br>
তাহলে তো তোমাকে তৃষ্ণার্তই থাকতে হবে।<br>
এমন কে আছে যার পানপাত্র সর্বদাই পূর্ণ পরিচ্ছন্ন থাকে?<br>
প্রত্যেক বিষয়েই যদি সহকর্মীর দোষ খুঁজে বেড়াও

তাহলে তো তোমাকে নিঃসঙ্গই থাকতে হবে।

অচিরেই তুমি দোষ ধরার মত কাউকে খুঁজে পাবে না।

আল্লাহ কত মহান, পবিত্র ও নিষ্কলুষ সত্তা! তিনিই বলেছেন: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا আয়ে ۝১৫২ [সূরা আনআম]

অর্থ: তোমরা ন্যায়-ইনসাফের সঙ্গে কথা বলো।

আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। পছন্দ হলে খেতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন। তিনি কোনো বিষয়ে কঠোরতা করতেন না, সেটাকে কঠিন করে তুলতেন না।' ^১[সহীহ বুখারী: ৩২৯৯, সহীহ মুসলিম: ৩৮৪৪]

হযরত আনাস রাযি. বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি নয় বছর হুজুরের খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে কখনো এমন হয়নি যে, আমি কোনো কাজ করেছি আর তিনি বলেছেন, "এমনটি কেন করেছো?" তিনি কখনো আমার কোনো দোষ ধরেননি। আল্লাহর কসম! কখনো আমার কোনো কাজে বিরক্ত হয়ে তিনি "উফ" শব্দটিও উচ্চারণ করেননি।' ^১[সহীহ মুসলিম: ৪২৭২] তিনি এমনই ছিলেন। আমাদেরও এমন হওয়া উচিত।

আমার উদ্দেশ্য আপনাদের কাছে এ আহ্বান পৌঁছে দেয়া নয় যে, কারো কোনো ভুল হলে সদুপদেশ প্রদান না করে নিশ্চুপ দেখে যাবেন। আমি

বলতে চাচ্ছি, প্রত্যেক বিষয়েই—বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে—দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর মানসিকতা পোষণ করবেন না। প্রত্যেক বিষয়কে আপন অবস্থায় থাকতে দিন। কোনো মেহমান আপনার দরজায় করাঘাত করলো, আপনি তাকে স্বাগত জানিয়ে মেহমানখানায় নিয়ে গেলেন, তাকে চা পরিবেশন করলেন। সে চা নিয়েই বলে উঠলো, 'কাপ পূর্ণ করে দিলে না!?'

আপনি বললেন, 'আরেকটু বাড়িয়ে দেবো?'

সে বললো, 'আরে না, না। যথেষ্ট!'

এরপর সে পানি চাইলো, আপনি এক গ্লাস পানি এনে দিলেন। পানি পান করে সে বললো, 'তোমাদের পানি তো খুব গরম!' তারপর এসির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার এসি তো তেমন শীতল নয়!' এভাবে চলতে থাকলো তার সমালোচনা ও দোষ খুঁজে বেড়ানো।

বলুন, এ জাতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিকে কি আপনি বোঝা মনে করবেন না? আপনি কি চাইবেন না, সে আপনার বাড়ি থেকে চলে যাক এবং আর কখনো না আসুক? মানুষ অধিক সমালোচনা ও দোষ খুঁজে বেড়ানোকে অপছন্দ করে। তাই যদি কারো দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা একান্ত অপরিহার্যই হয় তাহলে প্রশংসা ও সুন্দর কথাবার্তার আড়ালে তা উপস্থাপন করুন। দোষ ধরার ভঙ্গিতে কথা না বলে পরামর্শ-প্রদানের আঙ্গিকে কিংবা পরোক্ষভাবে তা পেশ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কারো কোনো ভুল সম্পর্কে অবগত হলে সরাসরি তাকে কিছু বলতেন না।

তিনি তাকে শুনিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, ‘লোকদের কী হলো! তারা এমন এমন কাজ করে!’

একবার তিনজন যুবক স্ব-আগ্রহে মদীনায় এলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো রাসূলের ইবাদত ও নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা। তারা গোপনে নবীপত্নীগণের কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা তাদেরকে তা জানালেন। তারা বললেন, ‘তিনি কোনো দিন রোযা রাখেন, কোনো দিন রাখেন না। রাতের কিছু অংশ বিশ্রাম নেন, বাকি অংশে সালাত আদায় করেন।’

তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, ‘তিনি আল্লাহর রাসূল হয়েও এত ইবাদত করেন! অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সম্ভাব্য সকল ত্রুটি অগ্রিম ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ তখন তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা করতে লাগলো। একজন প্রতিজ্ঞা করলো, ‘আমি কখনো বিয়ে করবো না। ইবাদতের জন্য ফারিগ হতে চিরকুমার হয়ে থাকবো!’ আরেকজন প্রতিজ্ঞা করলো, ‘আমি সারা জীবন প্রতিদিন রোযা রাখবো!’ তৃতীয়জন প্রতিজ্ঞা করলো, ‘আমি রাতে ঘুমাবো না। সারারাত জেগে থেকে ইবাদত করবো!’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানার পর মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর হামদ ও সানা আদায়ের পর বললেন, ‘মানুষের কী হলো! তারা এমন এমন কথা বলে! মানুষের কী হলো! তারা এমন এমন কথা বলে! আমি তো নামায পড়ি, আবার ঘুমাই। কখনো রোযা রাখি, কখনো রাখি না। আমি বিয়ে করেছি। সুতরাং যে আমার

সুন্নাত হতে বিমুখ হবে, সে আমার অনুসারী নয়।' ^১[সহীহ বুখারী: ৫৬৩৬, সহীহ মুসলিম: ২৪৮৭] রাসূল কিন্তু নাম উল্লেখ করে বলেননি যে, 'অমুকের অমুকের কী হলো!'

আরেকদিন হুজুর লক্ষ করলেন, তাঁর সঙ্গে নামায আদায়কারী কিছু ব্যক্তি নামাযের মধ্যেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলো। অথচ এটা সঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো দৃষ্টি সেজদার স্থানে রাখা। নামায শেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকদের কী হলো! তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে!' ^১[সহীহ বুখারী: ৭০৮] কিন্তু এরপরও তারা তা থেকে বিরত হলো না, বরং পূর্বের ন্যায় করতে লাগলো। তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কটাক্ষ করলেন না কিংবা নাম উল্লেখ করলেন না বরং বললেন, 'তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীয় দৃষ্টির হেফাযত করে।'

হযরত বারীরা রাযি. ছিলেন মদীনার একজন ক্রীতদাসী। তিনি দাসত্বমুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় আপন মুনিবের কাছে দরখাস্ত করলেন। মুনিব কিছু সম্পদ প্রদানের শর্তারোপ করলো। হযরত বারীরা আয়েশা রাযি.-এর কাছে এলেন এবং অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, 'তুমি চাইলে আমি তোমার মুনিবকে চাহিদামত অর্থ পরিশোধ করে দেবো। তবে তোমার মৃত্যুপরবর্তী পরিত্যাজ্য সম্পদ-কর্তৃত্ব আমার থাকবে।' হযরত বারীরা তাঁর মুনিবকে বিষয়টি জানালেন। কিন্তু সে পরিত্যাজ্য সম্পদ-কর্তৃত্ব ত্যাগে অস্বীকৃতি জানালো। সে চাইলো একজন ক্রীতদাসীর মালিকানা

ত্যাগের বিনিময়ে দু'ভাবে লাভ করবে; বিনিময় মূল্যও অর্জন করবে, মুক্তি পরবর্তী পরিত্যাজ্য সম্পদ-কর্তৃত্বও হাতে রাখবে।

হযরত আয়েশা রাযি. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পদ-প্রীতি এবং এ কারণে একজন অসহায় দরিদ্র মহিলার মুক্তি আটকে থাকায় আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি আয়েশা রাযি.কে বললেন, 'তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। এরপর মুক্ত করে দাও। মুক্তি পরবর্তী পরিত্যাজ্য সম্পদ-কর্তৃত্ব তোমারই থাকবে। কেননা, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর মুক্তি পরবর্তী পরিত্যাজ্য সম্পদ-কর্তৃত্ব মুক্তিদাতারই থাকে।' সুতরাং, তাদের অবৈধ-অন্যায় শর্তারোপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লোকদের কী হলো? তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কোরআনে নেই। কোরআন বহির্ভূত শত শত শর্ত আরোপ করলেও তাতে শর্তকারীর কোনো অধিকার নেই।' ^১[সহীহ বুখারী: ২৫৩০, সহীহ মুসলিম: ২৭৬২] এক্ষেত্রেও কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো নাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করে বলেননি যে, 'অমুকের কী হলো!'

তো যদি কারো দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা একান্ত অপরিহার্যই হয় তাহলে এভাবেই দূর থেকে লাঠি নেড়ে ইঙ্গিত করুন। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটিয়ে সংশোধনের(!) (অর্থাৎ সরাসরি কিছু বলার) প্রয়োজন নেই। ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীন আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি বলেন, 'গত রাতে

অমুক সহকর্মীর বাড়িতে ছিলাম। সবাই তার বাড়ির পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করছিলো।' কিংবা মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ে উদাসীন আপনার ছেলেকে যদি আপনি বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী অমুকের ছেলেটাকে বড় ভালো লাগে। কখনোই তাকে মসজিদে অনুপস্থিত দেখি না।' তাহলে তা কি অতি উত্তম সংশোধন বলে বিবেচিত হবে না? কেননা এর অর্থ হলো, শ্রোতাকে যেন বলা হচ্ছে, 'হে শ্রোতা! তোমাকেই বলছি। তুমি মন দিয়ে শোনো।'

আপনার এ প্রশ্ন করার অধিকার আছে যে, 'মানুষ সমালোচনাকে পছন্দ করে না কেন?' এর উত্তর হচ্ছে, মানুষ সমালোচনাকে নিজের জন্য মানহানিকর মনে করে। মানুষ ভালোবাসে আপন পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। কথিত আছে, সরল ধরণের একজন ব্যক্তি একবার নিজেকে প্রভাবশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করলো। এ উদ্দেশ্যে সে পানির দু'টি ফ্লাস্ক নিয়ে তাতে ঠাণ্ডা পানি ভরলো এবং মানুষের চলাচলের পথে বসে চিৎকার করতে লাগলো, 'ঠাণ্ডা পানি! ফ্রি ঠাণ্ডা পানি!' একটি ফ্লাস্ক ছিলো সবুজ, অপরটি লাল।

পিপাসার্ত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে নিজ হাতে গ্লাসে পানি ঢেলে পান করতে উদ্যত হলো এবং সবুজ ফ্লাস্কের দিকে হাত বাড়ালো। পানি প্রদানকারী ব্যক্তি বললো, 'না, না, লালটা থেকে নাও!' সে লাল ফ্লাস্ক থেকে পান করলো। আরেকজন ব্যক্তি এগিয়ে এসে লাল ফ্লাস্ক থেকে পান করতে উদ্যত হলো। তাকে বলা হলো, 'এটা থেকে নয়, সবুজটা থেকে পান করো।' কেউ একজন আপত্তি করে বললো, 'দুই ফ্লাস্কের পানির মধ্যে পার্থক্য কী?' সে উত্তর দিলো, 'পানির দায়িত্ব আমার। আমার কথামতো ভালো লাগলে

পান করো, নয়তো পান করো না!’ তো মানুষের সার্বক্ষণিক কামনা হলো, অন্যরা যেন তার প্রতি ঝোঁকে এবং তাকে মূল্যায়ন করে।

**মাছি ও মৌমাছি...!!**

আপনি মৌমাছির গুণ অর্জন করুন। মৌমাছি কেবল পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত বস্তুতেই বসে, নোংরা বস্তুকে এড়িয়ে চলে। মাছির মতো হবেন না। মাছি কেবল ক্ষতস্থান খুঁজে বেড়ায়।

# ৩২. শাসনের মেজায পোষণ করবেন না!!

তিনজন পিতার কথা ভাবুন। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানকে পরীক্ষার দিন ইন্টারনেট নিয়ে বসা দেখলো। প্রথমজন তার সন্তানকে বললো, 'মুহাম্মাদ! তোমার পরীক্ষার পাঠ মুখস্থ করো।' দ্বিতীয়জন বললো, 'মাজেদ! এখন পরীক্ষার পড়া পড়ো, নয়তো তোমাকে প্রহার করা হবে এবং তোমার হাত-খরচ বন্ধ করে দেয়া হবে।' তৃতীয়জন তার সন্তানকে বললো, 'সালেহ! এখন তোমার জন্য পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করা ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেয়ে অধিক কল্যাণকর হবে।'

তো প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন, কার পদ্ধতি সবচে সুন্দর? আপনি অবশ্যই বলবেন, 'তৃতীয়জনের পদ্ধতি। কেননা, সে বিষয়টাকে পরামর্শের শৈলীতে উপস্থাপন করেছে।'

স্ত্রীর সঙ্গেও এমন আচরণ করা উচিত। স্ত্রীকে বলতে পারেন, 'সারা! যদি তুমি চা তৈরি করতে!' 'হিন্দা! আশা করি, আজ আমরা খুব সকালে নাস্তা করবো।' তদ্রূপ কাউকে কোনো ভুল করতে দেখলে এমন পদ্ধতিতে সংশোধন করুন, যেন সে নিজেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়। আপনার সন্তান নামাযের সময় মসজিদে অনুপস্থিত থাকে। আপনি বলতে পারেন, 'সাদ! তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও?' 'অবশ্যই, আব্বু।' 'তাহলে তোমাকে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে।'

একটি ঘটনা শুনুন। মরুভূমিতে জনৈক বেদুঈনের তাঁবুতে তার স্ত্রী প্রসববেদনায় ছটফট করছিলো। স্বামী তার শিয়রে বসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষা করছে। স্ত্রীর প্রসববেদনা তীব্র হতে তীব্রতর হলো এবং একপর্যায়ে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছালো। অবশেষে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু দেখা গেলো, ভূমিষ্ঠ সন্তানের গায়ের বর্ণ কালো! লোকটি নিজের দিকে তাকালো, স্ত্রীর দিকে তাকালো। তারা উভয়ে ফর্সা বর্ণের। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলো, 'সন্তানের গায়ের রঙ কালো হলো কেন?!'

অভিশপ্ত শয়তান তার অন্তরে সন্দেহের জাল বুনতে শুরু করলো। এ সন্তান হয়তো তোমার নয়! কৃষ্ণবর্ণের কোনো দুশ্চরিত্র হয়তো তোমার স্ত্রীর সঙ্গে অপকর্ম করেছে এবং এতে সে গর্ভবতী হয়েছে! হয়তো... দুশ্চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে লোকটি মদীনায় ছুটে এসে আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো। সাহাবায়ে কেরাম অনেকেই তখন রাসূলের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। লোকটি বলতে শুরু করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। অথচ আমার পরিবারে কৃষ্ণবর্ণের কেউ নেই।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির দিকে তাকালেন। তিনি চাইলে লোকটিকে অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ না করার নসীহত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাইলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, সে নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করুক। তিনি তার সামনে

এমন একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলেন যাতে তার প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে ছিলো। প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই দৃষ্টান্তটি কিসের ছিলো? তিনি কি বৃক্ষের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন? কিংবা খেজুর বৃক্ষের? বা রোম-পারস্যের?

না, এসব কিছুই নয়! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমার কোনো উটনী আছে?'

'জ্বী হ্যাঁ, আছে'।

'কী রঙের'?

'লাল রঙের'।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'উটের পালে কালো বর্ণের কোনো উট আছে?'

'না'।

'ছাই রঙের আছে?'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, আছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ছাই বর্ণের উট কোত্থেকে এলো?!'

রাসূল তাকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, 'পালের নর-মাদী সব উট যখন লাল, অন্য কোনো রঙের নেই, তখন লাল উটনী ছাই বর্ণের বাচ্চা কীভাবে প্রসব করলো?' উষ্ট্রশাবকের রঙ তার মাতাপিতার রঙ থেকে ভিন্ন কীভাবে হলো? লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। এরপর বললো, 'সম্ভবত তার শিরা তা আকর্ষণ করেছে!' অর্থাৎ উটনীটির বংশে পূর্ববর্তী কারো রঙ এমন ছিলো।

তার সেই সামঞ্জস্যতা বংশানুক্রমে বাকি ছিলো। এখন এই সন্তানের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেয়েছে।

এতক্ষণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সম্ভবত তোমার এই সন্তানের শিরাও পূর্ববর্তী কারো সামঞ্জস্যতা আকর্ষণ করেছে।' লোকটি এ উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তার মনে হলো, 'এ উত্তর যেন তারই উত্তর, এ চিন্তা যেন তারই চিন্তা।' সন্দেহমুক্ত ও সন্তুষ্ট মনে সে স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলো। ^১[সহীহ মুসলিম: ২৭৫৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯৯৩]

আরেকদিনের ঘটনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাদের সামনে ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের স্ত্রী-গমনও একধরণের সাদকা।' অর্থাৎ এর বিনিময়েও সাওয়াব রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! কেউ আপন স্ত্রীর সঙ্গে যৌনবাসনা পূর্ণ করলেও সাওয়াব লাভ করবে?!' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি উত্তর না দিয়ে এমন কথা বললেন, যেন তারা নিজেরাই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পুনরায় কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। হুজুর বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, কেউ যদি অবৈধ স্থানে বীর্যস্খলন করে, তার কি গোনাহ হবে না?' তারা বললো, 'অবশ্যই, আল্লাহর রাসূল!' এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে হালাল ও বৈধ পদ্ধতিতে মিলিত হলে সাওয়াবও হবে।’

বরং অন্যের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তাকালেও প্রথমে এমন বিষয়কে উপস্থাপন করুন, যে ব্যাপারে আপনারা উভয়ে একমত।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে চৌদ্দশত সাহাবীর এক কাফেলা। কোরাইশরা তাদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিলো। হুদাইবিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী সংঘটিত হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কোরাইশদের মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হলো। অবশেষে সবাই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সম্মত হলো। শর্ত নির্ধারণের জন্য কোরাইশদের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো সুহাইল বিন আমর। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে শর্তের বিভিন্ন ধারায় একমত হলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

**চুক্তির শর্তাবলী:**

১. মুসলমানগণ এবার ওমরাহ না করেই মদীনায় ফিরে যেতে বাধ্য থাকবে।

২. মক্কাবাসীদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করতে চাইলে মদীনার মুসলমানগণ তাকে মদীনায় আশ্রয় দিতে পারবে না।

৩. বিপরীতে মদীনার কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় মুশরিকদের আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দেয়া হবে এবং ফেরত দেয়া হবে না!

চুক্তিতে এ জাতীয় আরো কিছু শর্ত ছিলো, যা বাহ্যত মুসলমানদের জন্য অবমাননাকর ও পরাজয়ের শামিল। প্রকৃতপক্ষে কোরাইশগণ মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলো। তারা জানতো, মুসলমানরা ইচ্ছা করলে আপন শক্তিবলে মক্কা জয় করতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই কোরাইশরা সহজতা ও সমঝোতার পথ অবলম্বন করলো। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ ধরণের শর্তাবলীকে লাঞ্ছনাকর মনে করলেন। কিন্তু তারা কোনো আপত্তি তোলেননি। কেননা, তারা জানতেন, এ চুক্তি যিনি সম্পাদন করেছেন তিনি স্বইচ্ছায় কিছুই করেন না, বলেনও না।

হযরত ওমর রাযি. অস্থিরতায় ছটফট করছিলেন আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলেন না। তাই হযরত আবু বকর রাযি.-এর নিকট ছুটে এলেন এবং এ বিষয়ে মতবিনিময় করতে চাইলেন। ওমর রাযি. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রথমেই আপত্তি ও অভিযোগ পেশ করলেন না। বরং প্রথমে এমন বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন, যাতে উভয়ে একমত। তিনি আবু বকর রাযি.কে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যার উত্তরে কেবল 'হ্যাঁ', 'অবশ্যই', 'ঠিক'—এসব শব্দই বলতে হয়!

ওমর রাযি. প্রশ্ন করলেন, 'আবু বকর! তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?'

আবু বকর উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই'।

'আমরা কি মুসলমান নই?'

'অবশ্যই।'

‘তারা কি মুশরিক নয়?’

‘অবশ্যই।’

‘আমরা কি সত্যের অনুসারী নই?’

‘অবশ্যই।’

‘তারা কি অসত্যের অনুসারী নয়?’

‘অবশ্যই।’

‘তাহলে আমরা কেন দ্বীনের ক্ষেত্রে লাঞ্ছনাকে মেনে নেবো?’

উত্তরে আবু বকর পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘ওমর! তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’

‘তাহলে তাঁর আদেশ-নিষেধকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। বলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল।’ অর্থাৎ সেলাইয়ের ফোঁড় যেভাবে ধারাবাহিকভাবে একটি আরেকটির অনুসরণ করে, কখনো বিপরীতমুখী হয় না; তুমিও তেমনই তাঁর নিঃশর্ত অনুসরণ করো, কখনো তাঁর বিরোধিতা করো না। ওমর রাযি. বললেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল’।

ওমর রাযি. আবু বকর রাযি.-এর কাছ থেকে চলে এলেন এবং ধৈর্য ধারণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল নন?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই!’

'আমরা কি মুসলমান নই?'

'হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে!'

'তারা কি মুশরিক নয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

'তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে হীনতা ও লাঞ্ছনাকে বরণ করে নেবো?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল। অতএব আমি কখনো তাঁর নির্দেশ অমান্য করবো না। আর তিনি আমাকে কখনো অপদস্থ বা ধ্বংস করবেন না।' ওমর রাযি. নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। চুক্তি অব্যাহত রইলো। মুসলমানগণ মদীনায় ফিরে এলেন। দিন গড়াতে লাগলো। একসময় কোরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় ও বাইতুল্লাহকে মূর্তি হতে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ওমর রাযি. বুঝতে পারলেন, তার সেদিনের আপত্তি যথার্থ ছিলো না।

পরবর্তীতে ওমর রাযি. বলতেন, 'সেদিন ভুল করে বলা সেই কথাগুলোর কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, এই ভয়ে আমি বহুদিন রোযা রেখেছি, সদকা করেছি, নফল নামায পড়েছি এবং গোলাম আযাদ করেছি। এখন আমি আল্লাহর কাছে কল্যাণের আশা করি।' কত চমৎকার প্রজ্ঞা হযরত ওমর রাযি.-এর! এবং তার চেয়েও অধিকতর প্রজ্ঞা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর!

কথা বলার এই দক্ষতাকে আমরা কীভাবে আরো বেশি কাজে লাগাতে পারি? আপনার সন্তান হয়তো কোরআন হিফযে পূর্ণ মনোযোগী নয়, আপনি তার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে চাচ্ছেন। প্রথমে এমন বিষয়ে আলোচনা শুরু করুন, যাতে আপনারা উভয়ে একমত। যেমন আপনি বলতে পারেন, 'তুমি কি চাও না আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুন?' 'তুমি কি চাও না জান্নাতে তুমি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হও?' উত্তরে সে অবশ্যই বলবে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' এখন আপনি পরামর্শের আঙ্গিকে তাকে উপদেশ দিন, 'তাহলে তো তোমাকে কোরআন হিফযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।'

তদ্রূপ স্ত্রীকে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করতে দেখলে প্রথমে এমন বিষয়ে কথা বলতে শুরু করুন, যে ব্যাপারে সে আপনার সঙ্গে একমত। আপনি বলুন, 'আমি জানি, তুমি একজন মুসলিম নারী। সদা ভালো ও কল্যাণের প্রতি অগ্রগামী।' তখন সে বলবে, 'অবশ্যই! আলহামদু লিল্লাহ!' 'আমি জানি তুমি একজন পবিত্র ও সংযমী নারী। তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো।' সে তখন বলবে, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আলহামদু লিল্লাহ!' এবার আপনি পরামর্শের আঙ্গিকে তাকে উপদেশ দিন, 'তাহলে তুমি পর্দার প্রতি যদি আরেকটু বেশি গুরুত্ব দিতে! যদি পর্দায় থাকার প্রতি আরো অধিক যত্নবান হতে!!' হ্যাঁ, এভাবেই কারো মনে সামান্য আঘাতও না দিয়ে আমরা মানুষ থেকে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি অর্জন করে নিতে পারি।

**একঝলক...**

মৌচাক না ভেঙেও আপনি মধু খেতে পারেন।

# ৩৩. লাঠির মাঝখানে ধরুন!!

‘শিক্ষকতার পেশা বেছে নেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ! আল্লাহ আপনাকে বলার ও বোঝানোর চমৎকার শৈলী দান করেছেন। তালিবুল ইলমগণ আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তবে আমি আশা করি, আপনি সকালে আরো দ্রুত আসবেন।’

‘আপনি খুব সুন্দরী। মাশাআল্লাহ! ঘরও বেশ পরিপাটি, গোছানো এবং আমি অস্বীকার করি না যে, সন্তানদের প্রতি লক্ষ রাখতে গিয়ে আপনাকে বেশ কষ্ট করতে হয়। তারপরও আমি আশা করি যে, আপনি তাদের পোশাকের প্রতি আরো যত্নবান হবেন।’

মানুষের সঙ্গে একজন সৎ ও সদাচারী ব্যক্তির কথন-শৈলী এমনই হয়ে থাকে। ভুল করা ব্যক্তির সামনে প্রথমে সে তার ভালো ও সুন্দর দিকগুলো উল্লেখ করে। এরপর তার ভুল সম্পর্কে অবহিত করে। আর এটিই ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের দাবি। যখনই আপনি কোনো অপরাধী ব্যক্তির কোনো দোষ-ত্রুটি দেখবেন, প্রথমে তার ভালো দিকগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করবেন। সর্বদা ভাবার চেষ্টা করবেন, আপনার সামনের ব্যক্তিটির প্রতি আপনার ধারণা ভালো। যখন তার কোনো ভুল সম্পর্কে তাকে সতর্ক করবেন, সে যেন না ভাবে যে, আপনার কাছে সে অনেক ছোট ও তুচ্ছ হয়ে গেছে কিংবা আপনি তার ভালো কাজগুলোর কথা ভুলে গেছেন এবং মন্দ কাজগুলোর কথাই কেবল মনে রাখছেন। বরং তার প্রতি আপনার

দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ যেন এমন হয় যে, সে ভাবতে থাকে, 'আপনার ভাবনা জুড়ে কেবল তার ভালো গুণগুলোই আছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিকট সবচে প্রিয় ছিলেন। কারণ, তিনি তাদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে উন্নত ও উৎকৃষ্ট শৈলী অবলম্বন করতেন।

একবার তিনি সাহাবীদের মাঝে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিলো, তিনি গভীরভাবে কোনো কিছু ভাবছেন কিংবা কোনো কিছুর প্রতীক্ষায় আছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'বর্তমানের এই কাল হলো মানুষের কাছ থেকে ইলম ও জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়ার কাল। আর মানুষ এক্ষেত্রে কিছুই করতে সক্ষম হবে না।' অর্থাৎ মানুষ কোরআন ও তার শিক্ষা হতে বিমুখ হবে এবং শরীয়তের ইলম হতেও বিমুখ হবে। তার প্রতি আগ্রহী হবে না এবং তা বুঝতেও সক্ষম হবে না। ফলে তা মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাবে।

এ কথা শুনে মহান সাহাবী যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারী রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন। পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কীভাবে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে? আমরা তো কোরআন তেলাওয়াত করি এবং ভবিষ্যতেও—আল্লাহর কসম—অবশ্যই নিজেরা কোরআন পড়বো, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের শিক্ষা দেবো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন। দেখলেন টগবগে এক যুবক, দ্বীনী জযবা ও উদ্দীপনা এবং গায়রাত ও সম্ভ্রমবোধ যেন উপচে পড়ছে। তিনি তার বোধ ও চিন্তাশক্তিকে আরো জাগিয়ে তুলতে

চাইলেন। তিনি বললেন, 'যিয়াদ! আমি তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে অন্যতম ফকীহ ও প্রাজ্ঞ হিসেবে জানি।' এ কথা বলে রাসূল সকলের সামনে যিয়াদের প্রশংসা করলেন যে, সে মদীনার অন্যতম ফকীহ ব্যক্তিত্ব। এটি হলো যিয়াদের ভালো এবং উত্তম গুণের আলোচনা। এরপর বললেন, 'তাওরাত ও ইনজীল ইহুদি-খৃস্টানদের কাছে বিদ্যমান আছে। কিন্তু তা তাদের কী কাজে আসে?' ^১[সুনানে তিরমিযী: ২৫৭৭, মুসতাদরাকে হাকীম: ৩১০] অর্থাৎ রাসূল তাকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, 'হে যিয়াদ! কোরআন বিদ্যমান থাকা আসল উদ্দেশ্য নয় বরং আসল উদ্দেশ্য হলো কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তার অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।'

সাহাবীদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের আচরণ এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল। আরেকদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের কয়েকটি গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক কথার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে একটি গোত্রের নাম ছিল 'বনু আবদুল্লাহ'। তিনি তাদেরকেও আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন এবং তাদের সামনে আপন রিসালাতের পয়গাম পেশ করলেন। তিনি বললেন, 'হে বনু আবদুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের পিতৃপুরুষের খুবই সুন্দর নাম দান করেছেন। অর্থাৎ তোমরা "বনু আবদুল উযযা" নও, "বনু আবদুল লাত"ও নও। বরং তোমরা হলে "বনু আবদুল্লাহ"। তোমাদের নামের মধ্যে কোনো শিরক নেই। অতএব তোমরা ইসলামে দাখিল হয়ে যাও।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, তিনি মানুষের নিকট অন্যের মাধ্যমে বার্তা পাঠাতেন এবং তাতে তাদের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা, কল্যাণকামিতা ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতেন। চিঠি ও বার্তা যখন প্রাপকের নিকট পৌঁছাতো তখন অনেক সময় তা সরাসরি দাওয়াতের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলতো।

খালিদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন একজন সাহসী বীর সৈনিক। তিনি সাধারণ কোনো বীর ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসী বীর। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তরিকভাবে তার ইসলাম গ্রহণের কামনা করতেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নের উপায় কী? খালিদ তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে অগ্রগামী সৈনিক। বরং ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো খালিদ বিন ওয়ালীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন, ‘যদি সে আমাদের দলভুক্ত হতো, আমরা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন করতাম এবং অন্যদের চেয়ে তাকে অগ্রগণ্য মনে করতাম।’

এ কথার প্রভাব কেমন ছিলো? আসুন, ঘটনার শুরু হতেই শুনি। খালিদ তখন ইসলামের ঘোরতর শত্রু, কট্টর কাফির এবং কাফির দলের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার। সুযোগ পেলেই রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো এবং রাসূলকে হত্যার উদ্দেশ্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকতো। এরই মধ্যে একসময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিয়ে ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে হুদাইবিয়ায় গমন করলেন।

খালিদ মুশরিকদের একদল অশ্বারোহীকে নিয়ে বের হলো এবং আল্লাহর রাসূল ও সাহাবীদের সঙ্গে আসফান নামক স্থানে মুখোমুখি হলো। খালিদ নিকটেই দাঁড়িয়ে রাসূলের ওপর তীর নিক্ষেপ করার কিংবা তরবারি দিয়ে আঘাত করার সুযোগ খুঁজছিলো। সে ওঁৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছিলো। ইত্যবসরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে জামাতের সঙ্গে যোহরের নামায আদায় করলেন। কাফিররা এ সুযোগে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের ইচ্ছা করলেও সফল হলো না। আল্লাহর রাসূল যেন শত্রুদের অপতৎপরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই আসরের নামায যুদ্ধকালীন পদ্ধতিতে আদায় করলেন। অর্থাৎ সাহাবীদের দু'দলে ভাগ করে একদলকে পাহারায় রেখে অপর দলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। বিষয়টি খালিদ ও তার সঙ্গীদের মনে খুব প্রভাব ফেললো। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, 'এই লোক আমাদের থেকে নিরাপদ। আমরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবো না। এখানে নিশ্চয়ই এমন কোনো সত্তা আছেন, যিনি তাকে হেফাযত করেন এবং সব ধরণের ক্ষতি হতে তাকে নিরাপদ রাখেন।'

তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং অযাচিত ঝামেলা এড়াতে ডান দিকের পথ ধরে চলতে লাগলেন, যেন খালিদ এবং তার সঙ্গীদের মুখোমুখি হতে না হয়। আল্লাহর রাসূল হুদাইবিয়ায় পৌঁছে কোরাইশদের সঙ্গে পরবর্তী বছর ওমরাহ আদায়ের জন্য সন্ধিচুক্তি করলেন। তারপর মদীনায় ফিরে গেলেন।

খালিদ লক্ষ করে দেখলো, দিনে দিনে আরবে কোরাইশদের মান-মর্যাদা ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো, 'অবশিষ্ট আর কী আছে? আমি কোথায় যাবো? কার কাছে যাবো?' 'আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে? না! সে তো মুহাম্মাদের অনুসারী। মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাঁর আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে।' 'তবে কি বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের কাছে যাবো? নাহ!' 'আচ্ছা, নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবো? কিংবা ইহুদি ধর্মে? নাকি আরবের বাইরে কোথাও বসবাস করবো?'

এভাবে খালিদ চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলো। এ অবস্থায় সময় অতিবাহিত হতে হতে একসময় বছর পূর্ণ হলো। মুসলমানদের ওমরাহর সময় সমাগত হলো। তারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। মুসলমানদের ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মক্কাপ্রবেশের দৃশ্য খালিদ সহ্য করতে পারলো না। সে মক্কা থেকে বের হয়ে গেলো। যে চারদিন হুজুর ওমরাহ আদায়ের জন্য মক্কায় অবস্থান করলেন, সে চারদিন সে বাইরে রইলো। ওমরাহ সম্পাদন করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন এবং অতীত স্মৃতি স্মরণ করছিলেন। তিনি বীর সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালীদের কথাও স্মরণ করলেন এবং খালিদের ভাই ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদের দিকে তাকালেন। ওয়ালীদ ছিলেন মুসলমান। তিনি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে ওমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একটি চিঠি খালিদের কাছে পাঠাতে মনস্থ করলেন। তিনি ওয়ালীদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খালিদ কোথায়?' ওয়ালীদ তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসবেন।' রাসূল বললেন, 'তার মত মানুষ কী করে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে! সে যদি তার শক্তিকে মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করতো, তার জন্য কল্যাণকর হতো।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি সে আমাদের দলভুক্ত হতো, আমরা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন করতাম এবং অন্যদের চেয়ে তাকে অগ্রগণ্য করতাম।'

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওয়ালীদ মক্কার বিভিন্ন স্থানে খালিদকে তালাশ করতে লাগলো কিন্তু কোথাও তাকে পেলো না। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সময় ওয়ালীদ তার ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি লিখলো:

অতি দয়াময় সদা দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। পরকথা এই যে, ইসলাম থেকে তোমার বিমুখতা অপেক্ষা আমার কাছে অধিক আশ্চর্যের অন্য কিছু নেই। তুমি বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেকের অধিকারী। বলো তো, ইসলামের মত মহান সম্পদ সম্পর্কে কেউ অজ্ঞ থাকতে পারে? আল্লাহর রাসূল আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন যে, 'খালিদ কোথায়?' আমি বললাম, 'আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে আসবেন।' তিনি বলেছেন, 'তার মত মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। সে যদি তার শক্তিকে মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করতো, তার জন্য কল্যাণকর হতো। যদি সে

আমাদের দলভুক্ত হতো, আমরা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন করতাম এবং অন্যদের চেয়ে তাকে অগ্রগণ্য করতাম।' কাজেই ভাই আমার! যে সকল কল্যাণকর বিষয় হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেগুলো অর্জনে ও ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট হও।

খালিদ রাযি. বলেন, রাসূলের চিঠি হাতে পেয়ে আমার ভেতর কুফরি হতে বের হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার এক আশ্চর্য উদ্যম সৃষ্টি হলো, ইসলামের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেলো। বিশেষত রাসূল আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন—এ বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করলো। এরই মধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন এক সংকীর্ণ-অনুর্বর শহরে রয়েছি। এরপর এক প্রশস্ত সবুজ শহরে বেরিয়ে এলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই বাস্তব স্বপ্ন।

আল্লাহর রাসূলের কাছে যাওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়ার পর আমি ভাবতে লাগলাম, এমন কেউ কি আছে, যে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে আমার এই মোবারক সফরে সঙ্গী হবে? এরই মধ্যে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাকে বললাম, 'আবু ওয়াহাব! তুমি কি চিন্তা করেছো আমরা কিসের মধ্যে আছি? আমাদের অবস্থা তো একপাটি দাঁতের ন্যায়, যা পরস্পর একটি অপরটিকে পেষণ করে। আরবে-অনারবে সর্বত্র মুহাম্মাদ বিজয়ীবেশে আবির্ভূত হচ্ছে। যদি আমরা তার কাছে গিয়ে তার অনুসারী হয়ে যাই তাহলে মুহাম্মাদের মর্যাদায় আমরাও অংশীদার হবো।'

সাফওয়ান জোরালোভাবে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো এবং বললো, 'জগতের সবাই তার অনুসারী হয়ে গেলেও আমি তার অনুসারী হবো না।' আমি তার কাছ থেকে সরে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, সে তো মুসলমানদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি। তার পিতা ও ভাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সে ইসলামের নবীর অনুসারী হবে না।

এরপর ইকরিমা বিন আবু জাহলের সঙ্গে দেখা হলো। তাকেও অনুরূপ প্রস্তাব করলাম। সেও আমাকে সাফওয়ানের মত জবাব দিলো। আমি তাকে বললাম, 'তাহলে মুহাম্মাদের নিকট আমার এই গমনের কথা গোপন রেখো।' সে বললো, 'আমি কারো সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করবো না।'

এরপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং বাহনজন্তু নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে ওসমান বিন তালহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। মনে মনে ভাবলাম, 'ইনি আমার প্রকৃত বন্ধু। আমি যা আশা করছি, তা যদি তার নিকট পেশ করতাম!' কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন যুদ্ধে তার যেসব পিতৃপুরুষ নিহত হয়েছে, তাদের কথা স্মরণ হলে আমি তার সঙ্গে আলোচনা হতে নিবৃত্ত হলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'এ ব্যাপারে কথা বলার দায়িত্ব আমার নেই। আমি এখন সফরে আছি।' তারপরও কেন যেন আমি তাকে কোরাইশদের বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমাদের অবস্থা এখন গর্তের ফাঁদে আটকা পড়া সেই শিয়ালের ন্যায়, গর্তে পানি ঢালা হলে যে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হবে।' আমি তাকে সে কথাগুলোও বললাম, যা

ইতিপূর্বে সাফওয়ান ও ইকরিমাকে বলেছি। সে দ্রুত আমার আহ্বানে সাড়া দিলো এবং আমার সঙ্গে মদীনায় গমনের দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। আমি বললাম, 'আমি তো আজই বের হবো আর আমি মদীনাতেই থাকার ইচ্ছা করেছি। পথের সম্বল বাহন এই যে আমার সঙ্গেই আছে।'

খালিদ রাযি. বলেন, আমরা পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, 'ইয়াজাজ' নামক স্থানে আমরা একত্র হবো। সে আগে পৌঁছালে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আগে পৌঁছালেও সেখানে অবস্থান করে তার জন্য অপেক্ষা করবো। কোরাইশরা জেনে ফেলবে—এই আশঙ্কায় আমি রাতের শেষ প্রহরে বাড়ি থেকে বের হলাম। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই আমরা উভয়ে ইয়াজাজে মিলিত হলাম। এরপর দ্রুত পথ চলে 'হাদ্দাহ' নামক স্থানে পৌঁছাতেই আমর ইবনুল আসের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। সেও উটে চড়ে কোথাও যাচ্ছে। আমাদের দেখে সে বললো, 'স্বাগতম হে কাফেলা! কোথায় চলেছো?' আমরা বললাম, 'তুমি কিসের টানে বেরিয়েছো?' সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কিসের টানে বেরিয়েছো?' আমরা বললাম, 'ইসলামে দীক্ষিত হতে এবং মুহাম্মাদের অনুসারী হতে।' সে বললো, 'এ উদ্দেশ্যই তো আমাকেও টেনে এনেছে!'

আমরা তিনজন একত্রে মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং 'যাহরুল হুররাহ' নামক স্থানে আমাদের সাওয়ারী রাখলাম। আল্লাহর রাসূলকে আমাদের আগমন সংবাদ দেয়া হলো। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। আমি আমার সবচে ভালো পোশাকটি পরিধান করে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

আমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, 'জলদি এসো! আল্লাহর রাসূলকে তোমাদের আগমন সংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের আগমনে খুশি হয়েছেন এবং তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আমরা দ্রুত চলে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে আমাকে দেখেই তিনি মুচকি হাসছিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তাঁর মুখে হাসির আভা লেগেই ছিলো। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আর নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ! সকল প্রশংসা ঐ মহান সত্তার জন্য, যিনি তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন। আমি তোমাকে একজন প্রাজ্ঞ ও সুবিবেচক ব্যক্তি হিসেবে জানি। তাই আশা করতাম, তোমার বিবেক তোমাকে কেবল কল্যাণের দিকেই ধাবিত করবে।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! আপনার বিরুদ্ধে যে সকল স্থানে উপস্থিত হয়েছি সেগুলো তো ছিলো সত্যের বিরুদ্ধাচারণ। অতএব আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় অপরাধ মুছে দেয়।' আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! তবুও আমার জন্য ইসতেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كُلَّ مَا أَوْضَعَ فِيهِ مِنْ صَدٍّ عَنْ سَبِيلِكَ
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পথে বাধাদানসহ খালিদ বিন ওয়ালীদের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিন। [মুসনাদে আহমদ: ১৭১০৯]

এরপর খালিদ রাযি. পরিণত হলেন দ্বীনে ইসলামের অন্যতম মহান সিপাহসালারে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত একটি চিঠির মাধ্যমে। কত চমৎকার সহনশীলতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা ছিলো আল্লাহর রাসূলের! মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আমাদেরও এই নববী দক্ষতার অনুসরণ ও অনুশীলন করা উচিত।

আপনি কোনো জেনারেল স্টোরে সিগারেট বিক্রি হতে দেখলেন। মালিককে সতর্ক করতে চাইলে প্রথমে তার দোকানের সাজসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করুন। তার ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করুন। এরপর হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করুন। এর ফলে সে অনুভব করবে যে, আপনি চশমার কালো আয়না দিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করেননি! বরং (সমালোচনার) লাঠিটিকে (ভারসাম্য বজায় রাখতে) মাঝখানেই ধরেছেন! আপনি বিচক্ষণ হোন। সামনের মানুষটির কোনো ভালো গুণ খুঁজে বের করে মন্দ আচরণগুলোকে তা দিয়ে ঢেকে দিন! অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। অন্যরা যেন আপনার ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ অনুভব করে আর আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করে।

**একপলক...**

কোনো মানুষ যখন অনুভব করে আমরা তার মন্দ গুণগুলোর পাশাপাশি উত্তম গুণগুলোর প্রতিও লক্ষ করছি, সে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

# ৩৪. ভুলের সমাধান করুন সহজভাবে

ছোট-বড় অনেক ভুলই মানুষ করে থাকে। ভুলের মাত্রা যতই তীব্র হোক, তার সমাধান তো সম্ভব। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সমাধান-ব্যবস্থা কখনো কখনো শতভাগ কার্যকরী হয় না। তবে সৃষ্ট সমস্যার বড় অংশের অবশ্যই সমাধান হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও 'ভুলের সমাধান সম্ভব হবে কিনা'—এই চিন্তায় অধিকাংশ মানুষ নিজের ভুল শোধরানোর কোনো চেষ্টাই করে না।

আবার কখনো কখনো অপরাধীর সঙ্গে আমাদের আচরণ এমন হয় যে, তাও একটি ভিন্ন অপরাধে রূপ নেয়। আমার ছেলে একটা অপরাধ করে ফেলেছে; তাকে এমনভাবে তিরস্কার করি, তুচ্ছজ্ঞান করি এবং তার সামান্য ভুলটাকে এত বড় করে তুলে ধরি যে, তার কাছে মনে হয়, সে অতল কূপে পতিত হয়েছে! ফলে সে সমাধানের আশা ছেড়ে দিয়ে আপন অবস্থায় পড়ে থাকে।

কখনো আমার স্ত্রী কোনো ভুল করে ফেলে কিংবা আমার বন্ধু কোনো অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে। আমি যদি তাকে বোঝাতে পারি যে, ভুল করলেও তার সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি, তাহলে ভুলের প্রতিবিধান একেবারেই সহজ। আর ভুলের মধ্যে পড়ে থাকার চেয়ে সঠিক পথে ফিরে আসাই তো উত্তম। ফিরে আসাই তো সবচেয়ে বড় সমাধান।

জনৈক ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে বাইআত হতে নবীজীর দরবারে এসে বলতে লাগলো, 'আমি হিজরতের জন্য বাইআত হতে এসেছি। কিন্তু আমি

চলে আসাতে আমার পিতামাতা কান্নাকাটি করছেন।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না তাকে তিরস্কার করলেন, না তার কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন এবং না তার বোধ ও বিবেককে হেয়জ্ঞান করলেন। কারণ লোকটি তো সৎ উদ্দেশ্যেই এসেছে এবং তার কাজকে বিশুদ্ধতম মনে করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বোঝালেন যে, এর সমাধান তো খুবই সহজ। তাই তাকে স্বাভাবিকভাবে বললেন, « ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا» অর্থ: ‘ঠিক আছে, তাদের কাছে ফিরে যাও। তাদের চোখের পানি মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে এসো।’ [সুনানে আবু দাউদ: ২৫২৮, সুনানে নাসায়ী: ৪১০৩]। ঘটনা এখানেই শেষ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সঙ্গে আপন বৈচিত্রময় আঙ্গিকের আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মাঝে কল্যাণের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। তিনি তাদেরকে কল্যাণে অগ্রগামী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। এমনকি তারা যদি মারাত্মক কোনো অন্যায়ও করে বসতো, তাদেরকে বোঝাতেন যে, তারা কল্যাণের অতি নিকটেই আছে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনার শেষ অংশটুকু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলেও পুরো ঘটনাটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় হওয়ায় এখানে তা শুরু থেকেই উল্লেখ করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের নামের লটারি করতেন। লটারিতে যাঁর নাম উঠতো সফরে তাকেই সঙ্গে নিতেন। ‘বনুল মুসতালিক’ এর যুদ্ধে রওয়ানার সময় লটারি করলে

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর নাম ওঠে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করলেন। সময়টা ছিলো পর্দা-বিধান নাযিল হওয়ার পরের। তিনি উটের পিঠের হাওদাতে আরোহণ করতেন। কাফেলার লোকজন কোথাও যাত্রা বিরতি করলে তিনি তার হাওদা থেকে নেমে প্রয়োজনাদি সেরে নিতেন। লোকজন পুনরায় যাত্রা শুরু করলে তিনিও তাতে চড়ে বসতেন।

যুদ্ধ শেষ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে কাফেলা নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কাফেলা চলতে চলতে মদীনার উপকণ্ঠে এসে যাত্রাবিরতি করে এবং রাতের কিছু সময় সেখানে অবস্থান নেয়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে পুনরায় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ আসবাবপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন। ইত্যবসরে আয়েশা রাযি. কোনো প্রয়োজনে হাওদা হতে নেমে এলেন। তার কণ্ঠে আকীক পাথরযুক্ত একটি 'হার' ছিলো। প্রয়োজন সেরে অবসর হতেই তার অজান্তে গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে যায়।

কাফেলা যখন পথ চলতে শুরু করলো, আর তিনি উটের হাওদাতে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন তখনই গলায় হাত দিয়ে অনুভব করলেন যে, হারটি কোথাও পড়ে গেছে। ওদিকে লোকজনও যাত্রা শুরু করে দিয়েছে! তিনি দ্রুত সে স্থানে ফিরে এলেন, যেখানে তিনি প্রয়োজন সেরেছিলেন। এদিকে লোকেরা তার হাওদা উটের পিঠে রেখে উটের রশি ধরে চলতে লাগলো। তারা ভেবেছিলো, তিনি হাওদাতেই আছেন। কাফেলাও চলতে লাগলো।

ওদিকে আয়েশা রাযি. অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার হারটি পেয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে এলেন।

ঘটনার পরবর্তী অংশ স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর জবানিতেই শুনুন। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, আমি দ্রুত কাফেলার অবস্থানস্থলে ফিরে এসে দেখলাম, সেখানে না কোনো আহ্বানকারী আছে! না কোনো সাড়াদানকারী! কারণ, সবাই তো চলেই গেছে! আমি সেখানেই অবস্থান করার মনস্থ করলাম। ভাবলাম, লোকেরা আমাকে না পেয়ে শীঘ্রই এখানে ফিরে আসবে। বড় চাদর দিয়ে আমি আমার শরীর ভালোভাবে ঢেকে নিলাম। একসময় ঘুমের প্রবল চাপে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আল্লাহর শপথ! ঠিক সে সময় সাফওয়ান বিন মুআত্তাল রাযি. আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে জরুরি কিছু রয়ে গেলো কিনা সেই খোঁজ নেয়ার কাজে নিযুক্ত থাকায় কাফেলার সঙ্গে রাতযাপন করেননি। তিনি দূর থেকে ঘুমন্ত মানুষের কাঠামো দেখে এগিয়ে এলেন। কাছে আসতেই আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দা-বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» 'আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী!?'

আমি তার কণ্ঠ শুনে জেগে উঠলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারায় চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলাম। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। আমিও তার 'ইন্না লিল্লাহ' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিনি। এরপর

তিনি তার বাহনজন্তুকে সামনের পায়ে ভর করিয়ে বসিয়ে দিলেন। আমি তাতে আরোহণ করলে তিনি উটের রশি ধরে লোকদের খোঁজে দ্রুতপদে চলতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! ভোর হওয়া পর্যন্ত আমরা না কারো দেখা পেলাম, না কাফেলার কেউ আমার অনুপস্থিতি আঁচ করতে পারলেন! আমরা কাফেলাকে এক স্থানে বিশ্রামরত পেলাম। হঠাৎ একজন ব্যক্তি এসে উটের রশি ধরে টানতে লাগলো। এরপর অপবাদ আরোপকারীরা বিভিন্ন কথা রটালো। বাহিনীর লোকেরা অস্থির হয়ে উঠলো। অথচ আল্লাহর শপথ! আমি এর কিছুই জানি না।

আমরা মদীনায় পৌঁছুলাম। রোগ-যন্ত্রণায় আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। লোকদের এসব অবান্তর কথার কিছুই আমার কানে পৌঁছেনি। অবশ্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমার বাবা-মায়ের কানে সেসব কথা পৌঁছেছিলো। তারা যদিও কম-বেশি কিছুই আমাকে জানাননি কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহর রাসূলের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় কিছুটা ঘাটতি অনুভব করতে লাগলাম। ইতিপূর্বে যখনই আমি কোনো কষ্ট বা যাতনায় ভুগতাম, তিনি স্নেহ-ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিতেন। কিন্তু ঐ কঠিন যন্ত্রণার মুহূর্তে তিনি এমন কিছুই করলেন না। বরং যখনই আমার কাছে আসতেন এবং আমার আম্মা আমার শুশ্রূষা করতে থাকতেন; তিনি কেবল এতটুকু জিজ্ঞেস করতেন যে, ‘এখন অবস্থা কেমন?’ এর বেশি আর কিছুই বলতেন না। আমি রাসূলের আচরণের রুক্ষতা কিছুটা হলেও অনুভব করলাম। তাই আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমি

মায়ের বাড়িতে চলে যেতাম, তিনি আমার শুশ্রূষা করতেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই।'

আমি মায়ের কাছে চলে গেলাম। তখনও আমি সেসব প্রোপাগাণ্ডার কিছুই জানি না। অথচ ইতোমধ্যে প্রায় বিশদিনেরও বেশি আমি বিছানায় পড়ে আছি। এক রাতে আমি প্রয়োজন সারতে বাইরে বের হলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার পিতা আবু বকর রাযি.-এর খালাতো বোন 'উম্মে মিসতাহ'। তিনি আমার সঙ্গে পথ চলছিলেন। দ্রুত চলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ হোঁচট খেলেন এবং পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'মিসতাহর সর্বনাশ হোক!' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আপনি এ কী বলেছেন? আপনি একজন বদরী সাহাবীকে গালি দিচ্ছেন?!' তিনি বললেন, 'হায় আফসোস! বেটি! সে কী বলেছে, তুমি কিছুই শোনোনি?! আবু বকর তনয়া! তোমার কাছে কোনো খবরই পৌঁছেনি!?' আমি বললাম, 'কিসের খবর?' তখন তিনি আমাকে অপবাদ আরোপকারীদের রটানো মিথ্যাচার সম্বন্ধে অবহিত করলেন। আমি বললাম, 'এমন রটনা রটানো হয়েছে?!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বেটি! আল্লাহর কসম! এমনই!'

আল্লাহর কসম! এ কথা শোনার পর আমি আর প্রয়োজন সারতে পারলাম না। অস্থির হয়ে ফিরে এলাম। আমার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেলো। কান্না আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো, এ কান্না আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দেবে। মাকে বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! লোকদের অপপ্রচার সম্পর্কে জেনেও আপনি আমাকে কিছুই জানালেন না!' তিনি

বললেন, 'বেটি আমার! এটা তো মামুলি একটা বিষয়! কোনো ব্যক্তি তার সুন্দরী স্ত্রীকে ভালোবাসে, আবার তার অনেক সতীনও রয়েছে। তার বিরুদ্ধে তো অনেকে রটনা রটাবেই!' আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! আশ্চর্য! মানুষ এসব কথা বলাবলি করছে!' সে রাতে কান্নাকে সঙ্গী করেই আমার প্রভাত হলো। রাতভর অশ্রুধারা থামেনি, এক মুহূর্তের জন্যও দু'চোখের পাতা এক হয়নি।

এই হলো হযরত আয়েশা রাযি.-এর অবস্থা। তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে। অথচ তার বয়স তখনও পনেরো পেরোয়নি। এ বয়সেই তাকে ব্যভিচারের অপবাদ সইতে হয়েছে। অথচ তিনি একজন পবিত্র, সচ্চরিত্র ও সংযমশীল নারী। সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে পবিত্র সত্তার সহধর্মিণী। যিনি কোনো দিন দেহের সামান্য অংশের কাপড়ও উন্মুক্ত করেননি, আপন চরিত্রে সামান্য আঁচড় লাগার সুযোগ দেননি, আজ তার অবস্থা হলো তিনি পিত্রালয়ে ধুঁকে ধুঁকে কাঁদছেন। আর আল্লাহর রাসূলের সে সময়ের অবস্থা হলো, তিনি আয়েশা রাযি.-এর চিন্তা-কষ্টকে লাঘব করার চেষ্টা করেননি। জিবরাঈল আ. কোনো ওহী নিয়ে অবতরণ করেননি, কোরআনের কোনো বাণীও অবতীর্ণ হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। নিজ সম্ভ্রম ও স্বীয় স্ত্রীর সম্পর্কে মানুষের বলাবলি, অপবাদ ও বিষোদগার তার ওপর ভারী বোঝার মত চেপে বসেছিলো।

বিষয়টি যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো তখন একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন। প্রথমে

আল্লাহ পাকের স্তুতি-প্রশংসা করলেন। এরপর ইরশাদ করলেন, ‘হে লোকসকল! এসব লোকদের কী হলো যে, তারা আমার পরিবারকে জড়িয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অসত্য-অন্যায় রটনা রটাচ্ছে? অথচ আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে সৎ ও নিষ্কলুষ বলেই জানি। তারা এমন পুরুষকে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর কসম! যার সম্পর্কে আমি ভালো ধারণাই করে থাকি। সে কোনো দিন আমার উপস্থিতি ছাড়া আমার কোনো ঘরেই প্রবেশ করেনি।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ কথাগুলো বললেন তখন আওস গোত্রপ্রধান সা'দ বিন মুআয রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যদি আওস সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে তাদের ব্যাপারে আমরাই যথেষ্ট। আর যদি আমাদের ভ্রাতাগোষ্ঠী খাযরাজ সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে তাহলে বলুন, আপনার কী আদেশ? তারা তো শিরচ্ছেদের উপযুক্ত।’ খাযরাজ গোত্রপ্রধান সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. এ কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি একজন সৎ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু বংশীয় সম্ভ্রমবোধ তাকে উত্তেজিত করে তুললো। তিনি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন, ‘আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলছো, তাদের শিরচ্ছেদ করা যাবে না। তারা খাযরাজ গোত্রের লোক—এ কথা কি তুমি নিশ্চিত জেনেই বলেছো? তারা যদি তোমার গোত্রের হয়ে থাকে তাহলেও কি তুমি একই কথা বলতে?’

এবার উসায়দ বিন হুযাইর দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিথ্যা তুমি বলেছো! আল্লাহর কসম! তাকে আমরা হত্যা করবো। তুমি তো দেখি মুনাফিক হয়ে মুনাফিকদের পক্ষে ওকালতি করছো!' তারপর লোকজন একে একে উত্তেজিত হতে লাগলো, এমনকি হাতাহাতির উপক্রম হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে নিবৃত্ত হতে বললেন। এতে সকলে নিশ্চুপ হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবে মিম্বর থেকে নেমে ঘরে চলে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, সাধারণ লোকদের দিয়ে বিষয়টির সমাধান অসম্ভব তখন পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ লোকদের নিয়ে বিষয়টি সমাধা করতে চাইলেন। সে হিসেবে তিনি হযরত আলী রাযি. ও ওসামা বিন যায়দ রাযি.কে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। ওসামা রাযি. আয়েশা রাযি.-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার পরিবারকে সৎ ও ভালো জানি। এসব নির্জলা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা।' আলী রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনেক মহিলাই তো আছে। আপনি যে কাউকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। বারীরাকে জিজ্ঞেস করুন। সে তো অবশ্যই আপনার সঙ্গে সত্য বলবে।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বারীরা! আয়েশার মাঝে তুমি কখনো সন্দেহজনক কিছু পেয়েছো?' বারীরা বললো, 'জ্বী না। যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তাকে ভালোই জানি। কিছুতেই

আমি আয়েশাকে দোষারোপ করতে পারি না। সে তো অল্প বয়সী একটি মেয়ে। অনেক সময় এমন হতো যে, আমি আটার খামির তৈরি করে তাকে বলতাম, "একটু দেখে রেখো।" কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়তো আর বকরি এসে তা খেয়ে ফেলতো!'

উৎস বারীরা রাযি. আয়েশা রাযি.-এর প্রতি কীভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন? আয়েশা তো সেই সতী-সাধ্বী যুবতী, শিশুকাল থেকে যাকে সযত্নে লালন ও প্রতিপালন করেছেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম মুমিন সিদ্দীকে আকবার আবু বকর রাযি., যাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছেন বনী আদমের শ্রেষ্ঠতম সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সংশয় ও সন্দেহ কীভাবে আসতে পারে? তিনি যে আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হৃদয় দিয়েই ভালোবাসেন। তিনি নিষ্কলুষ, পূত-পবিত্র। অবশ্য আল্লাহ পাক তার শান ও মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য এবং তার স্মৃতি ও স্মরণকে সমৃদ্ধতর করার জন্য তাকে পরীক্ষা করছেন।

এভাবে দুঃখ-বেদনায় আয়েশার দিন কাটছে। দিনে দিনে দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর তিনি রোগশয্যায় পড়ে ছটফট করছেন। পানাহার ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীদের উদ্দেশে খুতবা প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু তাতে উল্টো মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হলো। ঘরোয়াভাবে আলী ও ওসামাকে ডেকে সমাধানের আরেকটি ব্যবস্থা নিলেন। তাতেও কোনো ফল

হলো না। পরিস্থিতি যখন এই তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টিকে আয়েশার মাধ্যমেই নিষ্পত্তির ইচ্ছা করলেন।

আয়েশা রাযি. বলেন, ‘আমি সে দিন এত কেঁদেছি; আমার কান্না থামেনি, চোখের পাতা বন্ধ হয়নি। পরবর্তী রাতও অব্যাহত অশ্রুধারা আর নিদ্রাহীনতাকে সঙ্গী করে কাটালাম। আমার বাবা-মা আশঙ্কা করছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায় কিনা।’ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য আবু বকরের বাড়িতে তাশরীফ আনালেন। অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আয়েশার বাবা-মা তার শিয়রের পাশেই ছিলেন। জনৈকা আনসারী মহিলাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অপবাদ আরোপকারীদের রটানো মিথ্যাচারের পর এই প্রথম হুজুর আবু বকরের বাড়িতে এসেছেন। দীর্ঘ প্রায় একমাস যাবৎ তিনি আয়েশাকে দেখেননি এবং এ দীর্ঘ সময়ে আয়েশার শানে কোনো ওহীও অবতীর্ণ হয়নি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার কাছে গেলেন। তিনি তখন শয্যাশায়ী; সার্বক্ষণিক কান্না, মানসিক যন্ত্রণায় তিনি যেন কাটা মুরগীর ন্যায় ছটফট করছেন। যখনই তিনি কাঁদেন, উপস্থিত মহিলাটিও তার সঙ্গে কাঁদেন। আয়েশার বাবা-মা বিষয়টা নিয়ে কিছুই করতে পারছেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বসলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করলেন। এরপর বললেন, ‘হামদ ও সালাতের পর হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এমন এমন কথা পৌঁছেছে।’ এ কথা বলে তিনি ইফকের ঘটনা উল্লেখ করলেন এবং আয়েশার

মহাঅন্যায়ে লিপ্ত হওয়ায় যে অপপ্রচার চলছে তাও বললেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বলতে চাইলেন যে, মানুষের কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় আর ভুলের সমাধান কঠিন কিছু নয়। তাই তাকে বললেন, 'শোনো! তুমি যদি দোষমুক্ত হয়ে থাকো, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে "অপবাদমুক্ত" করবেন। আর যদি তুমি কোনো গোনাহে জড়িত হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তাওবা করো। বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।' এভাবেই নবীজী তার ভুলের—যদি বাস্তবে ভুল হয়ে থাকে—সহজ ও জটিলতামুক্ত সমাধান দিলেন।

আয়েশা বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা শেষ করলেন, আমার কান্না থেমে এলো। আমি কোনো অশ্রুফোঁটা অনুভব করলাম না। আমি আমার পক্ষ থেকে আব্বা-আম্মার জবাবের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু তারা কিছুই বলছেন না। আব্বাকে বললাম, "আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে তার উত্তর দিন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি না, রাসূলকে কী বলবো।" আম্মাকে বললাম, "আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে তার উত্তর দিন।" তিনিও বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, কী উত্তর দেবো তাঁকে।" আল্লাহর শপথ! আবু বকর পরিবারের ওপর তখন যে দুর্যোগ ও অসহায় অবস্থা আপতিত হয়েছিলো—আমি জানি না—অন্য কোনো পরিবারের ওপর কখনো তা আপতিত হয়েছে কিনা! আব্বা-আম্মা উভয়ে যখন নিরুত্তর রইলেন, আমি কেবল ধুকে ধুকে কাঁদতে লাগলাম। এরপর আমি বললাম,

“না! আল্লাহর শপথ! এ বিষয়ে আমি কখনো আল্লাহর কাছে তাওবা করবো না।’”

আমি জানি, বিষয়টা শুনতে শুনতে আপনাদের অন্তরে গেঁথে গেছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন, আমি কলঙ্কমুক্ত, আপনারা বিশ্বাস করবেন না! আর যদি আমি বিষয়টা স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ অবশ্যই জানেন, আমি তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। এ মুহূর্তে আমি আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু তাই বলতে পারি, যা ইউসুফ আ.-এর পিতা বলেছিলেন:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ
۝১৮ [সূরা ইউসুফ]

অর্থ: আমার জন্য ধৈর্যই শ্রেয়। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো, সে ব্যাপারে আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আয়েশা বলেন, এরপর আমি পাশ ফিরে বিছানায় শুয়ে রইলাম। আমি জানি, আমি নিষ্কলঙ্ক, আর আল্লাহ অবশ্যই আমাকে কলঙ্কমুক্ত প্রমাণ করবেন। তবে এ ধারণা আমি কখনো করিনি যে, আল্লাহ পাক আমার শানে ওহী অবতীর্ণ করবেন। আমার অবস্থান তো আমার কাছে এত তুচ্ছ যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ওহী অবতীর্ণ করবেন তা কল্পনারও ঊর্ধ্বে! আমি আশা করছিলাম যে, আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে আমার দোষমুক্তি সম্পর্কে অবহিত করবেন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূল তখনো মজলিস ত্যাগ করেননি, উপস্থিত

কেউ তখনো বের হননি, এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ভাব-তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হলেন যা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় হয়ে থাকে। আল্লাহ স্বীয় নবীর ওপর ওহী নাযিল করলেন। দেখতে পেলাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী অবতীর্ণ হতে দেখে—আল্লাহর কসম!—আমি না শঙ্কিত হলাম, না দ্বিধান্বিত। আমি জানি, আমি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত। আমার আল্লাহ আমার ওপর যুলুম করবেন না। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আয়েশার প্রাণ! যখনই আল্লাহর রাসূলের ওপর থেকে ওহীর বিশেষ আচ্ছন্নময় অবস্থা কেটে গেলো, আমার পিতা-মাতার প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হলো। তাদের আশঙ্কা, না জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের এসব কথারই সত্যতা প্রমাণিত হয়।

একটু পরে যখন আল্লাহর রাসূলের বিশেষ আচ্ছন্নময় অবস্থা একেবারে কেটে গেলো, তিনি হেসে উঠলেন এবং মোবারক চেহারা থেকে ঘাম মুছতে লাগলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

[সূরা নূর]

অর্থ: ভালোভাবে জেনে রেখো, যারা এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল। তোমরা একে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর

মনে করো না। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে নিজ কৃতকর্মের গুনাহ। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ এ অপবাদের) ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। যখন তোমরা এ কথা শুনেছিলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করলো না এবং বলে দিলো না, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা? কেন তারা অর্থাৎ অপবাদদাতাগণ এ বিষয়ে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না? সুতরাং তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করলো না তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক।

আর তাদের সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
আয়ে ۝১৯ [সূরা নূর]
অর্থ: মনে রেখো, যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপক হোক এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

সর্বপ্রথম তিনি যে কথাটি বললেন তা হলো, 'আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাকে দোষমুক্ত ঘোষণা করে আল্লাহ পাক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।' আমি বললাম, 'আলহামদু লিল্লাহ্!' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে উপস্থিত হয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং উক্ত ঘটনায় সদ্য অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতগুলো তাদের তেলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর অপবাদ আরোপকারীদের ওপর 'মিথ্যা অপবাদ প্রদানের

শরয়ী শাস্তি' প্রয়োগ করলেন। [সহীহ বুখারী: ৪৩৮১, সহীহ মুসলিম: ৪৯৭৪] ইফকের ঘটনা এ পর্যন্তই।

তো এসব ক্ষেত্রে অপরাধীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করা উচিত যে, 'সে একজন রোগী, অবিলম্বে তার চিকিৎসা প্রয়োজন।' নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা এবং এ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেননা, কখনো অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে মনে করে, তার ভুল বা অপরাধ নিয়ে বুঝি সবাই উপহাসে মেতে উঠেছে। আর হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসক তো তিনিই, যিনি স্বয়ং রোগীর চেয়েও রোগীর প্রতি অধিক সচেতন থাকেন। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
« إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا»
অর্থ: আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত হলো—জনৈক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন। যখন তার চারপাশ আলোকিত হয়ে গেলো, প্রজাপতি ও আগুনে আত্মাহুতি দানকারী বিভিন্ন কীটপতঙ্গ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। লোকটি প্রাণপণে সেগুলোকে বিরত রাখতে চাচ্ছেন, কিন্তু তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেগুলো সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! আমিও তেমনি তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখতে চেষ্টা করছি। অথচ তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছো। [সহীহ বুখারী: ৬০০২, সহীহ মুসলিম: ৪২৩৪]

**মতামত...**

কখনো অপরাধীর সঙ্গে আমাদের আচরণ এমন হয় যে, তা উক্ত অপরাধের চেয়ে বড় অপরাধে পরিণত হয়।

# ৩৫. আরেকটি মত

মানুষ যেমন মন ও মেজাজ এবং আকার ও অবয়বে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, তেমনই দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা এবং তুষ্টি-অল্পে তুষ্টিতেও বিচিত্র হয়ে থাকে। তো আপনি কাউকে কোনো অন্যায় করতে দেখলেন এবং তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করলেন, অথচ সে কোনো মূল্যায়নই করলো না। তাই বলে তাকে শত্রুর কাতারে ফেলে দেবেন না। যথাসম্ভব সর্বক্ষেত্রে বদান্যতা ও উদারতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করবেন। আপনি কোনো সঙ্গীর ভুল সংশোধন করতে চাইলেন, কিন্তু সে পাত্তা দিলো না। তাই বলে আপনি বন্ধুত্বকে শত্রুতায় বদলে দেবেন না, বরং আপন উদারনীতিতে অবিচল থাকুন। তাহলে সে তার পূর্বের ভুলের ওপর অটল থাকলেও অন্তত নতুন কোনো ভুল করবে না। কথায় বলে, 'পরের ভুলে জীবন গেলো, আগের ভুলই ভালো ছিলো।' তাই ছোট-বড় সব কিছুতেই ক্রোধান্বিত না হয়ে মানুষের সঙ্গে উদার মনে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করুন। এরপর দেখুন, জীবনটা কত আনন্দের!

রাসূলের আখলাক সম্পর্কে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, 'ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি এবং (আল্লাহর রাস্তার জিহাদে ব্যতীত) কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি; না নিজ স্ত্রীগণকে, না কোনো দাস-দাসীকে। কারো কাছ থেকে ব্যথা বা কষ্ট পেলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। অবশ্য কেউ শরীয়তনিষিদ্ধ কোনো

কাজ করলে আল্লাহর বিধান হিসেবে তাকে শাস্তি দিতেন।' [সহীহ বুখারী: ৬২৮৮, সহীহ মুসলিম: ৪২৯৬]

আল্লাহর রাসূল কখনো রাগ করলে আল্লাহর জন্যই করতেন। কখনোই তা ব্যক্তিস্বার্থে হতো না। এ উভয় প্রকারের রাগের পার্থক্য বোঝার জন্য একটি উদাহরণ নিন। ধরুন, আপনার ছোট ছেলেটি সকালবেলা আপনার কাছে এসে বললো, 'আব্বু! আমি মাদরাসায় যাচ্ছি, আমাকে টাকা দাও। মাদরাসায় গিয়ে কিছু খাবো।' আপনি মানিব্যাগ খুঁজে ভাঙতি টাকা পেলেন না। পাঁচশত টাকার নোট ছাড়া কোনো টাকাই নেই। নোটটা তাকে দিয়ে বললেন, 'দেখো, এটা কিন্তু পাঁচশত টাকার নোট। তুমি বিশ টাকা খরচ করে বাকিটা ফেরত নিয়ে আসবে।' এভাবে খুব গুরুত্বের সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু বিকেলে সে সব টাকা শেষ করে বাসায় ফিরলো। ঠিক সে মুহূর্তে আপনি কী করবেন? আপনার রাগের পরিমাণটা কেমন হবে? হয়তো তিরস্কারের সব ক'টা পন্থা শেষ করবেন কিংবা ইচ্ছেমতো মারধর করবেন এবং আগামী কয়েক দিনের খরচ বন্ধ করে দিবেন।

অপরদিকে আপনি একদিন আসরের নামায পড়ে বাসায় ফিরলেন। দেখলেন, ছেলেটা কম্পিউটারে গেমস খেলছে অথবা মোবাইল নিয়ে পড়ে আছে। মসজিদেও যায়নি, নামাযও পড়েনি। তখন কি আপনার ক্রোধটা আগের বারের ন্যায় হবে? মনে হয়, দ্বিতীয় রাগের চেয়ে প্রথম রাগটাই হবে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করলে তা হতো একমাত্র আল্লাহর জন্য। কখনো তিনি উপদেশ দিতেন, কিন্তু তা

গ্রহণ করা হতো না। তাই বলে তিনি রেগে যেতেন না। বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতেন। কারণ, হিদায়াত তো একমাত্র আল্লাহর হাতে।

একবারের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন শামসীমান্তবর্তী এলাকা তাবুকে পৌঁছুলেন। তাবুক রোম সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী এলাকা। তাই তিনি হযরত দিহইয়া কালবী রাযি.কে দূত হিসেবে রোম-বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করলেন। দিহইয়া রাযি. সেখানে পৌঁছে হিরাক্লিয়াসের বাসভবনে প্রবেশ করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা হস্তান্তর করলেন।

হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি দেখেই খৃস্টান পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের তলব করলো এবং তাদের নিয়ে একান্তে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হলো। সে বললো, 'আপনারা যে ব্যক্তির ব্যাপারে ভাবছেন, তিনি তো আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনটি পয়গামসহ আমার কাছে দূতও প্রেরণ করেছেন। তিনি আহ্বান করেছেন:

১. আমি যেন তার প্রচারিত ধর্মের অনুসারী হয়ে যাই।

২. অথবা ভূমি-কর প্রদান করে আপন রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখি।

৩. এছাড়া বিকল্প তৃতীয় পথ হলো যুদ্ধ।'

তারপর হিরাক্লিয়াস বললো, 'আমাদের রাজ্য ও রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আসমানী কিতাবে আপনারা যা পড়েছেন, তা তো

আপনাদের জানাই আছে। সুতরাং চলুন, আমরা সবাই মুহাম্মাদের ধর্ম মেনে নিই অথবা ভূমি-কর প্রদান করি।’

পাদ্রীগণ বাদশাহর প্রস্তাব শুনে বুঝতে পারলো যে, তিনি তাদেরকে তাদের বর্তমান ধর্ম ত্যাগ করার আহ্বান করছেন। তাই তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং সবাই একযোগে বাদশাহর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। এমনকি প্রতিবাদ ও ক্রোধের তীব্রতার কারণে তাদের শরীর থেকে চাদর খুলে পড়ে গেলো। তারা বললো, ‘আপনি আমাদেরকে খৃস্টধর্ম ত্যাগ করতে বলছেন?! হিজাযে আবির্ভূত এক বেদুঈনের বশ্যতা স্বীকার করতে বলছেন?!’

এহেন পরিস্থিতিতে হিরাক্লিয়াসের সত্য-ধর্ম গ্রহণের সদিচ্ছায় ভাটা পড়লো। সে বুঝতে পারলো যে, তাদের সামনে বিষয়টা পেশ করে সে বেশ জটিলতায় পড়ে গেছে। কারণ সমাজে সেসব ধর্মযাজকদের প্রভাব ও দাপট ছিলো তুঙ্গে। গণশক্তি ও জনসমর্থনও ছিলো তাদের হাতে। হিরাক্লিয়াস ভাবলো, এই মনোভাব নিয়ে পাদ্রীরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে দেশে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই সে তাদের শান্ত করতে বললো, ‘দেখুন, আমি খৃস্টধর্মের ওপর আপনাদের অটলতা আছে কিনা, তা যাচাই করার জন্যই মূলত এ প্রশ্ন করেছি!’

হিরাক্লিয়াস নিশ্চিতভাবেই জানতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই রাসূল, যার সম্পর্কে নবী ঈসা আলাইহিস সালাম আগাম সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। এরপরও বিষয়টাকে আরেকটু যাচাই করতে সে আরবের ‘তাজীব’ গোত্রের খৃস্টধর্মাবলম্বী জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে

পাঠালেন। সে তাকে বললো, 'আরবী ভাষায় পারদর্শী ধীশক্তিসম্পন্ন একজন লোককে ডেকে আনো এবং তাকে নবুওয়তের দাবিদার ঐ আরবী ব্যক্তিটির নিকট তার চিঠির জবাবসহ পাঠাও।'

তাজীবী লোকটি গিয়ে তানূখ সম্প্রদায়ের এক লোককে নিয়ে এলো। সেও ছিলো খৃস্টান। বাদশাহ তাকে প্রত্যুত্তর সম্বলিত চিঠিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দিতে বললো। সঙ্গে বলে দিলো, 'মুহাম্মাদের যত কথাই শুনবে, তার মধ্যে তিনটি বিষয় খুব ভালোভাবে লক্ষ করবে:

১. তিনি আমার নামে লিখিত চিঠির ব্যাপারে কোনো আলোচনা করেন কিনা?
২. আমার চিঠি পড়ার সময় তিনি রাতের কোনো উপমা টানেন কিনা?
৩. দেখে কৌতূহল জাগে এমন কিছু তাঁর পিঠে আছে কিনা?'

তানূখ গোত্রের লোকটি শাম ত্যাগ করে তাবূকে পৌঁছালো। সে দেখলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বসে আছেন। লোকটি প্রশ্ন করলো, 'তোমাদের নেতা কোথায়?' বলা হলো, 'এই তো তিনি।' লোকটি এগিয়ে এসে নবীজীর সামনে বসলো এবং হিরাক্লিয়াসের চিঠি পেশ করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি গ্রহণ করে নিজের কাছে রাখলেন। এরপর তাকে বললেন, 'তোমার পরিচয়?' সে বললো, 'আমি তানূখ গোত্রের লোক।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া একনিষ্ঠ ও অকাট্য সত্য ধর্ম ইসলামের

প্রতি কি তোমার আকর্ষণ আছে?’ এ প্রশ্নের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আপন গোত্রীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ ব্যতীত লোকটির ইসলাম গ্রহণের পথে অন্য কোনো বাধা ছিলো না। সে রাসূলের কথায় কর্ণপাত করলো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বললো, ‘দেখুন, আমি একটি জাতির প্রতিনিধি এবং আমি আপন জাতীয় ধর্মের অনুসারী। সুতরাং আমি তাদের কাছে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ধর্মের ব্যাপারে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না!’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তরে উত্তেজিত হলেন না, রাগও করলেন না, বিষয়টিকে জটিলও মনে করলেন না। তিনি মুচকি হেসে কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ [সূরা কাসাস]

অর্থ: আল্লাহ না চাইলে আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। আর আল্লাহ জানেন, কারা হিদায়াত লাভ করবে।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কোমলভাবে বললেন, ‘হে তানূখী! দেখো, আমি পারস্যের কিসরার নিকট একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে বড় অভদ্রতার পরিচয় দিয়েছে এবং আমার পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আল্লাহও তাকে এবং তার রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে দেবেন। তোমাদের বাদশাহর কাছেও একটি পত্র পাঠিয়েছি, সে সম্মানের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছে। ফলে যতদিন সে সুস্থতার সঙ্গে জীবিত থাকবে, ততদিন মানুষ তার প্রতাপশালী রাজত্ব প্রত্যক্ষ করবে।’

এ সময় তানূখীর হিরাক্লিয়াসের উপদেশ মনে পড়লো। সে মনে মনে ভাবলো, 'বাদশাহ আমাকে যে তিনটি বিষয় লক্ষ করতে বলেছেন, এ তো আমার সেই কাঙ্ক্ষিত তিন বিষয়ের একটি।' বিষয়টি ভুলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় সে তূণীর থেকে একটি তীর বের করে তার তরবারির পাতের মধ্যে কথাটি লিখে রাখলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রটি তার বামে বসা এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন। তানূখী ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদেরকে চিঠিটা কে পড়ে শোনাবে?' তারা বললো, 'এই যে, মুয়াবিয়া রাযি.।' মুয়াবিয়া রাযি. চিঠি পড়তে শুরু করলেন। হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'আপনি আমাকে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন, যার বিস্তৃতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীজুড়ে। তাহলে জাহান্নামের স্থান কোথায়!?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! দিন যখন আগমন করে, রাত কোথায় থাকে?'

রাতের কথা শুনেই তানূখী নড়েচড়ে বসলো। এ তো তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দ্বিতীয়টি। এবারও সে তূণীর থেকে তীর নিয়ে তরবারির খাপের মধ্যে কথাটি লিখে নিলো। মুয়াবিয়া রাযি. চিঠি পড়া শেষ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তানূখীর দিকে ঘুরে বসলেন, যদিও সে তার উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং ইসলাম ধর্ম কবুল করেনি। এরপর তাকে কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি একজন রাজকীয় দূত! আমাদের কাছে তোমার তো কিছু

প্রাপ্য আছে। তোমাকে পুরস্কৃত করার মত কিছু আমার কাছে থাকলে অবশ্যই তোমাকে দিতাম। কিন্তু আমরা যে এখন বালুকাময় প্রান্তরের মুসাফির।' অর্থাৎ তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি তো দেখতে পাচ্ছো, আমরা এখন সফরে আছি, মরুভূমিতে বালুর ওপর বসে আছি।

হযরত ওসমান রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে একটি উপহার দেবো।' এরপর ওসমান রাযি. তার পাথেয়-পাত্র (ব্যাগ) থেকে এক জোড়া দামী কাপড় নিয়ে এলেন এবং তানূখী ব্যক্তিটিকে প্রদান করলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছো, এখন তার মেহমানদারী ও আপ্যায়নের জন্য কে প্রস্তুত আছো?' জনৈক আনসারী যুবক দাঁড়িয়ে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত আছি।'

আনসারী যুবকটি দাঁড়িয়ে মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু তানূখী মেহমানের মন তখন তার কাঙ্ক্ষিত সেই তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে ফিরছিলো, যা জানতে হিরাক্লিয়াস তাকে জোর তাকিদ দিয়েছিলো। আর তা হলো রাসূলের পিঠে উভয় বাহুর মধ্যে বিদ্যমান মোহরে নবুওয়ত দর্শন। তানূখী আনসারী যুবকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলছিলো। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, 'হে তানূখী ভ্রাতা! এদিকে এসো।' তানূখী দ্রুত এগিয়ে রাসূলের সামনে এসে দাঁড়ালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠ থেকে চাদরটি সামান্য নামিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণ করে দিলেন। আর তাকে বললেন, 'এই তো এখানে,

ভালো করে দেখে নাও এবং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা কার্যকর করো।' তানূখী ব্যক্তিটি পরবর্তীতে বলেছিলো, 'আমি তার পিঠের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম এবং তার কাঁধের মাঝামাঝি স্থানে বড় আকারের কবুতরের ডিমের মত একটি মোহর দেখতে পেলাম।' [মুসনাদে আহমদ: ১৫১০০]

**একটি চিন্তা...**

মানুষ নিজের ভুলকে ভুল হিসেবে মেনে নিক, এটাই যথেষ্ট। আপনার সামনেই সব ভুল ঠিক হয়ে যেতে হবে, এমনটা প্রত্যাশা করা উচিত নয়। তাই আপনি উত্তেজিত হবেন না। মনে রাখবেন, সাপ মারতে গিয়ে লাঠিই যেন ভেঙে না যায়!

# ৩৬. মন্দের বিপরীতে উত্তম ব্যবহার করুন

আপনি যখন মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করবেন, স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের মনমতো আচরণ করবে। আপনি যেমনটি চান তেমন আচরণ তারা আপনার সঙ্গে করবে না। আপনি যাদের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করবেন, তারা সবাই কিন্তু আপনার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে না। কেউ উল্টো রেগে যাবে। ধারণা খারাপ করে বলবে, 'ব্যাপার কী? এত হাসছেন কেন?!"

আপনি যাদেরকে হাদিয়া-উপহার দেবেন, সবাই আপনার সঙ্গে একই আচরণ করবে না। বরং কেউ কেউ তো প্রতিটি সুযোগে আপনার সমালোচনা করে বেড়াবে। বলবে, 'লোকটা নির্বোধ, যেখানে সেখানে অর্থ নষ্ট করে'! কথা বলার সময় আপনি যাদের সঙ্গে কথনদক্ষতা প্রয়োগ করবেন; মনোযোগী শ্রোতা হবেন, উপযুক্ত স্থানে মন্তব্য-প্রশংসা করবেন, কোমল ও নম্র স্বরে কথা বলবেন, তাদের সবাই কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার মত আচরণ করবে না।

এর কারণ হলো মানুষের স্বভাব-বৈচিত্র্য ও রুচি-পার্থক্য। মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের রিযিক বণ্টনের ক্ষেত্রে যেমন বৈচিত্র্য রেখেছেন; তদ্রূপ ফিতরাত ও আখলাক, স্বভাব ও চরিত্রের বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য রেখেছেন। এক্ষেত্রে মানহাজে ইলাহী ও আল্লাহনির্ধারিত নীতি হলো:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

৩৪ [সূরা ফুসসিলাত]

অর্থ: আর সমান হতেই পারে না উত্তম (আচরণ) ও মন্দ (আচরণ)। রোধ করুন আপনি (লোকদের মন্দ আচরণকে) উত্তম (আচরণ) দ্বারা। তখন দেখবেন কী! আপনার মাঝে এবং যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, যেন সে সুহৃদ বন্ধু।

কিছু কিছু মানুষের এই যে আচরণগত সমস্যা; এর না আছে কোনো সমাধান, না আছে সংশোধনের সম্ভাবনা। করণীয় মাত্র দু'টি, হয় তার থেকে দূরে থাকুন কিংবা তার আচার-ব্যবহার সহ্য করেই তার সঙ্গে ওঠাবসা করুন। তৃতীয় কোনো বিকল্প এক্ষেত্রে নেই।

কথিত আছে, আরবী রূপক গল্পের আকর্ষণীয় চরিত্র 'আশআব' জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে সফরে বের হলো। সফরে বাহনের পিঠ থেকে মাল-সামানা ওঠানো-নামানো, বাহনকে পানি পান করানোসহ সব কাজ ব্যবসায়ী লোকটি আঞ্জাম দিলো। পুরো সফরে কাজ করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

ফেরার পথে দুপুরের খানা খাওয়ার জন্য তারা এক স্থানে থামলো। সাওয়ারী থেকে নেমেই আশআব সটান হয়ে শুয়ে পড়লো। এদিকে ব্যবসায়ী বেচারা একা একা বিছানাপত্র, মাল-সামানা সব নামিয়ে রান্নার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিলো। এরপর আশআবের দিকে ফিরে তাকে বললো, 'ভাই! আমাদের তো খাবার তৈরি করতে হবে। আমি এদিকে গোশত কেটে প্রস্তুত করছি। তুমি কিছু লাকড়ি কুড়িয়ে আনো।' আশআব উত্তর দিলো, 'দোহাই আল্লাহর!

আমাকে মাফ করুন, আমি দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' আশআবের কথা শুনে লোকটি নিজেই লাকড়ির ব্যবস্থা করলো।

এরপর সে আশআবকে বললো, 'যাও, লাকড়িতে আগুন জ্বালাও।' আশআবের উত্তর, 'আমি আগুনের কাছে যেতে পারি না। ধোঁয়ার কাছে গেলে আমার বুক ব্যথা করে।' কী আর করা! ভদ্রলোক নিজেই আগুন জ্বালালো। এরপর সে আশআবকে বললো, 'আশআব! এবার একটু গোশত কাটায় আমাকে সাহায্য করো।' আশআব বললো, 'আমার ভয় হচ্ছে গোশত কাটতে গিয়ে ছুরিতে যদি হাত কেটে যায়'! অগত্যা বেচারা ব্যবসায়ী নিজেই গোশত কেটে প্রস্তুত করলো।

কিছুক্ষণ পর সে বললো, 'আশআব! গোশতটা চুলায় বসিয়ে একটু রান্নাটা সেরে ফেলো।' আশআব এবার জবাব দিলো, 'রান্নার পূর্বে খাবারের দিকে বারবার তাকালে আমার কেমন যেন লাগে'! আশআবের জবাব শুনে লোকটি নিজেই আগুন ফুঁকে ফুঁকে রান্নার কাজ শেষ করলো। সব কাজ একা করায় প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে বেচারা একপর্যায়ে শুয়ে পড়লো। সে আশআবকে ডেকে বললো, 'ভাই! এবার খাবারটা একটু পরিবেশন করো।' আশআব বললো, 'শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে, একদম কাজ করতে মন চাচ্ছে না!' উপায়ান্তর না দেখে লোকটি কষ্ট করে উঠে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করলো এবং আশআবকে ডেকে বললো, 'এসো, খাবার খেতে এসো।' আশআব এবার সাড়া দিলো। সে বললো, 'বারবার ওযরখাহী করতে আমার বড় লজ্জা

লাগছে; কতবার আর ওযরখাহী করবো! না, এবার অবশ্যই আপনার অনুরোধ আমি রাখবো।' এরপর সে বিছানা ছেড়ে খাবারে শরিক হলো।

পাঠক! জীবনে চলার পথে যদি কখনো এ ধরনের আশআবদের মুখোমুখি হন তাহলে ব্যথিত-বিচলিত হবেন না। বরং আপনাকে হতে হবে ধৈর্যশীল, পাহাড়ের মত অটল-অবিচল। সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আবেগের পরিবর্তে বিবেককে প্রাধান্য দিতেন, আচরণে-উচ্চারণে সর্বোত্তম চরিত্রগুণের পরিচয় দিতেন। অন্যের অসৌজন্যমূলক আচরণ সহ্য করে তাদের সঙ্গে কোমল ও সুন্দর ব্যবহার করতেন।

একবার রাসূল সাহাবীদের নিয়ে একটি মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। ইতোমধ্যে জনৈক বেদুঈন সেখানে উপস্থিত হলো। সে নিজে অথবা অন্য কেউ এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছে সেই হত্যার রক্তপণ আদায়ে কিছু সাহায্য ও সহায়তা লাভের জন্য সে নবীজীর কাছে এসেছে। নবীজী তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করলেন। এরপর কোমলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি?' বেদুঈনের তড়িৎ উত্তর, 'না, আপনি আমার প্রতি সদাচরণ করেননি। সৌজন্যমূলক আচরণও করেননি।'

এ কথা শুনে সাহাবীদের কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে তার প্রতি অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু নবীজী ইঙ্গিতে সবাইকে নিবৃত্ত করলেন। এরপর নবীজী ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বেদুঈন আগন্তুককেও ভেতরে ডেকে নিলেন।

নবীজী তাকে বললেন, ‘তুমি আমাদের কাছে এসে কিছু সাহায্য চেয়েছো, আমরা তোমাকে কিছু সাহায্য করেছি। তদুপরি তুমি যা বলার বলেছো।’ এরপর নবীজী ঘরে যা কিছু পেলেন, তা থেকে তাকে আরো কিছু সাহায্য বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, ‘এবার বলো, আমি কি এখন তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি?’ বেদুঈন উত্তর দিলো, ‘হ্যাঁ। আল্লাহ আপনাকে আমার পরিজন ও গোত্রের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।’

তার সন্তুষ্টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আনন্দিত হলেন। কিন্তু নবীজীর আশঙ্কা ছিলো প্রিয় সাহাবীদের নিয়ে। লোকটির প্রতি তাদের অন্তরে এখনো হয়তো ক্ষোভ রয়ে গেছে। তাদের কারো সঙ্গে যদি পথে হাটে লোকটির দেখা হয়ে যায়, অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। তাই তিনি সাহাবীদের অন্তরের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে মনস্থ করলেন। নবীজী বেদুঈনকে বললেন, ‘তুমি আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাওয়ার পর আমরা সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করেছি। এরপর তুমি যা বলার বলেছো। সেজন্য তোমার প্রতি আমার সাহাবীদের অন্তরে ক্ষোভ রয়েছে। তাই এক কাজ করো। তাদের সামনে গিয়ে এখন আমার সামনে যে কথা বললে, তা বলো। এতে তাদের মনঃকষ্ট দূর হবে।’

বেদুঈন সামনে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন, ‘তোমাদের এই ভাই আমাদের কাছে এসে সাহায্য চেয়েছে। আমরা তাকে সাহায্য করেছি। সে তখন অসৌজন্যমূলক কিছু কথা বলে ফেলেছে। পরে আমরা তাকে ডেকে আরো কিছু দিয়েছি। এখন সে খুশি হয়েছে।’

তারপর নবীজী বেদুঈনের দিকে ফিরে বললেন, ‘বিষয়টা কী এমন নয়?’ সে বললো, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। আল্লাহ আপনাকে আমার পরিজন ও গোত্রের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।’

বেদুঈন যখন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, নবীজী আপন সাহাবীদেরকে হৃদয় জয় করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, ‘দেখো, আমার ও এই বেদুঈন লোকটির দৃষ্টান্ত হলো ঐ উটের মালিকের মত যার উট পালিয়ে যেতে লাগলো। লোকজন উটটাকে ধরার জন্য ধাওয়া করলো। দূর থেকে উটটি ভয়ে আরো দ্রুত পালাতে লাগলো। উটের মালিক অবস্থা দেখে বললো, “এই তোমরা থামো। আমি দেখছি কী করা যায়। তার পিছু ছেড়ে দাও। তাকে কীভাবে পোষ মানাতে হয়, সেটা আমার ভালো জানা আছে।” উটের মালিক উটের দিকে এগিয়ে গেলো এবং হাতে কিছু মাটি-বালু নিয়ে তাকে ডাকলো। উটটা সুবোধ বালকের মত ডাকে সাড়া দিয়ে মালিকের কাছে চলে এলো। মালিক তার গলায় রশি বেঁধে পিঠে চড়ে বসলো। বেচারা বেদুঈনের কথা শোনার পর তোমরা যে আচরণ করতে যাচ্ছিলে, আমি যদি তাতে সায় দিতাম তাহলে সে জাহান্নামের দিকে পা বাড়াতো।’ অর্থাৎ তোমরা যদি তাকে তাড়িয়ে দিতে, হয়তো সে মুরতাদ হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যেতো। [মুসনাদুল বাযযার]

কোমলতা বস্তুর সৌন্দর্যকেই বৃদ্ধি করে আর কোমলতার অভাব তার সৌন্দর্যকেই কেড়ে নেয়।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

৩৪ [সূরা ফুসসিলাত]

বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। ফোযালাহ বিন উমায়র নামক জনৈক ব্যক্তি যে শুধু বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো নবীজীকে দেখে এগিয়ে এলো এবং নবীজীর পিছু পিছু তাওয়াফ করতে লাগলো। তার ইচ্ছা ছিলো নবীজীকে একটু অসতর্ক পেলেই হত্যা করে ফেলবে। সে যখন নবীজীর একদম কাছে এসে গেলো তখন নবীজী তার ব্যাপারে সচেতন হলেন। নবীজী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আরে! ফোযালাহ নাকি?’ সে বললো, ‘জ্বী! ফোযালাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।’ নবীজী বললেন, ‘তুমি মনে মনে কী বলছিলে, ফোযালাহ?’ সে অপ্রস্তুত অবস্থায় উত্তর দিলো, ‘না, কিছু না। আমি তো আল্লাহর যিকির করছি’! নবীজী মৃদু হেসে বললেন, ‘ফোযালাহ! আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করো।’

ফোযালাহ বর্ণনা করেন, ‘এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মোবারক আমার বুকে রাখলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়ে গেলো। কসম আল্লাহর! তিনি আমার বক্ষ থেকে হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টির মাঝে তাঁর থেকে প্রিয় আমার কাছে কিছু নেই।’

বাড়ি ফেরার পথে ফোযালাহর জাহেলী যুগের এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ইতোপূর্বে সে তার সঙ্গে মেলামেশা করতো, খোশগল্পে মত্ত থাকতো। ফোযালাহকে দেখে মহিলাটি বললো, ‘এই, এসো না গল্প করি।’

ফোযালাহ স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো, 'না'। এরপর সে স্বরচিত কবিতার তিনটি চরণ আবৃত্তি করলো:

মেয়েটি বলে, এসো না গল্প করি, আমি বললাম, না
আল্লাহর ধর্ম ইসলাম তাতে সমর্থন করে না।
যদি না দেখে থাকো দ্বীনের নবীকে মক্কা বিজয়ের দিন
দেব-দেবীদের অসার মূর্তি গুঁড়িয়ে দেয়ার দিন।
দেখেছো, দেখবে নিশ্চয় তবে আল্লাহর দ্বীন চির আলোকিত
আর বহুত্ববাদের কালোমুখ আজ অমানিশায় নিমজ্জিত।

এ ঘটনার পর ফোযালাহ রাযি. একজন খাঁটি ও একনিষ্ঠ মুসলমানে পরিণত হন। এভাবে ক্ষমাসুলভ আচরণের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করে নিতেন।

মানুষকে কাছে টেনে সত্য ও কল্যাণের পথ দেখাতে নবীজী কত না কষ্ট সহ্য করেছেন! চাচা আবু তালিব যতদিন বেঁচে ছিলেন, দয়ার নবীর প্রতি কোরাইশদের সকল অত্যাচার ও নিপীড়ন তিনি একাই প্রতিহত করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলের জন্য পবিত্র মক্কাভূমি আরো সংকীর্ণ হয়ে গেলো। কোরাইশদের পক্ষ থেকে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার এমন প্রচণ্ড প্লাবন ধেয়ে এলো, যার মুখোমুখি নবীজী চাচার জীবদ্দশায় হননি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোথাও যাওয়ার চিন্তা করতে লাগলেন, যেখানে তিনি পাবেন একটু সাহায্য, একটু সমর্থন এবং একটু আশ্রয়। রাসূলের আশা ছিলো, বনু সাকীফ গোত্র থেকে তিনি কিছু সাহায্য

পাবেন। আল্লাহ তাকে যে দ্বীন দান করেছেন, তারা তা গ্রহণ করবে। তাই তিনি তায়েফ রওয়ানা করলেন।

তায়েফে পৌঁছে তিনি সেখানকার বড় বড় তিনজন নেতার কাছে গেলেন। তারা তিন ভাই এবং তায়েফের সবচে মান্যগণ্য ব্যক্তি। এক ভাইয়ের নাম আবদে ইয়ালীল, অন্যজনের নাম মাসউদ, আর তৃতীয়জনের নাম হাবীব। তারা তিনজনই আমরের ছেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন, ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। আর কওমের যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা বড় নিকৃষ্ট ভাষায় রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করলো।

একজন বললো, 'আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কাবার গিলাফ ছিঁড়ে দেখাও!' অন্যজন বললো, 'আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া নবী বানানোর মত আর কাউকে পাননি?' তৃতীয়জন এমন অভিনব উত্তর দিতে চাইলো যেন তার কথাটা প্রথম দু'ভাইয়ের চেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়। সে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললো, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না। কারণ দাবি মত তুমি যদি সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল হয়ে থাকো তাহলে তোমার কথার জবাব দেয়াটা আমার জন্য বড় ভয়ের বিষয়। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।'

তাদের এই অশোভনীয় উত্তর শুনে নবীজী মজলিস ত্যাগ করে তাদের কাছ থেকে উঠে চলে এলেন। তিনি সাকীফ গোত্রের কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু পাওয়ার আশাও ছেড়ে দিলেন। তবে নবীজী আশঙ্কা করছিলেন যে, তায়েফবাসীদের প্রত্যাখানের সংবাদ জানতে পারলে কোরাইশরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে, আরো বেশি নির্দয় আচরণ করবে এবং নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছো, তা কাউকে জানিও না।' কিন্তু তারা তাও মানলো না। রাসূলের এ অনুরোধের সামান্যতম মূল্যায়ন না করে উল্টো তারা নিজেদের কিছু ক্রীতদাস ও নির্বোধ লোককে রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা তাঁকে অবিরাম গালি দিয়ে চললো, চিৎকার করে করে বিদ্রূপ করতে লাগলো। নবীজী দ্রুতপদে ফিরে আসছিলেন আর এই পাষণ্ডরা রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে নবীজীর পবিত্র শরীরে পাথর নিক্ষেপ করছিলো। দয়ার নবী তাদের পাথরের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য আরো দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর পবিত্র পদযুগল রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের একজন মানুষকে এভাবে নির্মমভাবে আঘাত করতে তায়েফের সেসব পাষণ্ডদের বিবেক একটুও বাধা দেয়নি।

পাথরের আঘাতে জর্জরিত শরীর, জখমী কদম। কোনো মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে নবীজী দূরে সরে এলেন এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছে একটি খেজুর বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসলেন। পুরো শরীর জুড়ে অসহ্য বেদনা, আর মনে ভাবনা—কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করবেন, কোরাইশদের পরবর্তী আচরণ কেমন হবে। নবীজী অশ্রুভেজা নয়নে আকাশপানে তাকিয়ে দোয়া

করলেন:

« اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার কাছেই অভিযোগ ও অনুযোগ করছি আমার দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের, কৌশলস্বল্পতার এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার। হে দয়ালু দাতা! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক, আপনি আমারও প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছেন! এমন অচেনা কারো হাতে, যে আমার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করবে, নাকি কোনো শত্রুর হাতে, যাকে আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছেন। আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আমার কোনো আফসোস নেই, নেই কোনো অভিযোগ। আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তার শামিয়ানা আমার জন্য সুপ্রশস্ত ও প্রসারিত করুন। আমি আপনার সত্তার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়, দুনিয়া-আখেরাতের সব কিছু যে নূরে পরিচালিত হয়। আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির অবতরণ হতে। আমি আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি যতক্ষণ না আপনি খুশি হন। সকল ক্ষমতা ও শক্তি আপনারই। আপনার শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া আর কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

এমন সময় একখণ্ড মেঘ এসে নবীজীর ওপর ছায়া দান করতে লাগলো। মেঘ থেকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজীকে ডেকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে, যে আচরণ করেছে সবই আল্লাহ শুনেছেন, সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি পর্বতনিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।'

নবীজী কিছু বলার পূর্বেই পর্বতনিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা নবীজীকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, আল্লাহ সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি পর্বতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।' নবীজী কিছু বলার পূর্বেই পর্বতনিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা নিজেই শাস্তির ধরণ পেশ করে বললেন, 'আপনি যদি চান তাহলে দুই পাহাড় একত্রিত করে তাদেরকে পিষে ফেলি।' এ দুই পাহাড় ছিল মক্কার দুই প্রান্তে। একটির নাম আবু কুবাইস, অপরটির নাম কুআইকিয়ান।

পর্বতনিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমাশীলতা ও মানবতাপ্রেমের অনুপম ও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। দেহ-মনের ব্যথাকে বিস্মৃত করে, প্রতিশোধস্পৃহাকে হজম করে তিনি বললেন, 'না! আমি বরং অপেক্ষা করবো। আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর

সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তারই ইবাদত করবে, অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার ভাববে না।’

**সাহসী হোন...**

হয়তো আছে মোর সাথে মোর সহোদর ভাই কিংবা জ্ঞাতি ভাইদের চিরন্তন কোনো দ্বন্দ্ব

তারা যদি চায় চিবিয়ে খেতে আমার শরীরের গোশত, আমি তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করবো।

তারা যদি করে আমার মর্যাদার কবর রচনা, আমি তাদের জন্য মর্যাদার মিনার তৈরি করবো।

আমার বিপদে যদিও তারা নাই বা ছুটে আসে, তাদের আহ্বানে আমি নিশ্চিত ছুটে যাবো।

তাদের প্রতি আমার নেই কোনো বিদ্বেষ পুরনো, আর বিদ্বেষপ্রবণ ব্যক্তি কখনো পায় না জাতির নেতৃত্ব।

# ৩৭. ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত করুন, উপদেশগ্রহণ সহজ করুন

কিছু মানুষ এমন আছে, যারা অন্যকে নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকে, অন্যদের ভুল ধরতে অধিক তৎপর থাকে। যেচে পড়ে মন্তব্য করা বা সদুপদেশ দেয়ায় তারা বেশ অগ্রসর! তারা চারপাশের মানুষের বেশ বিরক্তির কারণ হয়। বিশেষ করে যখন তাদের মন্তব্য ও উপদেশ ব্যক্তিগত অভিরুচি ও নিজস্ব চিন্তা-চেতনানির্ভর হয়, তখন তো তা অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।

মনে করুন, আপনি অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে খুব পরিশ্রম করার পর একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করলেন এবং অনেক মানুষকে নিমন্ত্রণ করলেন। সব মেহমান যখন আপনার বাড়িতে উপস্থিত, ঠিক তখন কেউ একজন আপনাকে বললো, 'ভাই! আয়োজনটা আমার মনঃপুত হলো না। আমার মনে হচ্ছে, আপনার সব শ্রম জলে গেছে। চাইলে আয়োজনটা আরো মানসম্মত করতে পারতেন।'

আপনি তার কাছে সমস্যা জানতে চাইলে সে বললো, 'দেখুন! গোশতগুলো একেবারে কাবাব হয়ে গেছে! আমার আবার পছন্দ হালকা ঝলসানো গোশত! লেবুর কারণে সালাদটা লাগছে টক টক! এটা আমার একদম পছন্দ নয়! এরপর দেখুন, মিষ্টিগুলোতে ক্রিম দেয়ায় স্বাদটাই কেমন যেন

হয়ে গেছে!' সে আরো বললো, 'অধিকাংশ লোকই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি। তারা কেবল সৌজন্য রক্ষার্থে কিংবা বাধ্য হয়ে দু'চার লোকমা খেয়েছে।'

চিন্তা করে দেখুন, তার এ জাতীয় অসংলগ্ন মন্তব্যে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হবে? অবশ্যই সে আপনার বিরক্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে এবং তার আবদার রক্ষা করা তো দূরের কথা, তার কোনো পরামর্শই আপনি কানে তুলবেন না। কেননা তার প্রত্যেকটা সমালোচনার পেছনে কাজ করেছে নিজস্ব অভিরুচি।

এমনই বিরক্তিকর আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে যেমন আচরণ করে, সবার সঙ্গে তেমন আচরণই করতে চায়। সবাইকে উপদেশ দিতে যায়, সবখানে জোর খাটাতে চায়। কেউ বাড়ি বানাবে, গাড়ি কিনবে, সেখানেও সে ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।

সবসময় মনে রাখবেন, এ জাতীয় সমালোচনা ও উপদেশ ব্যক্তিরুচির ওপর নির্ভরশীল। হ্যাঁ, কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চায় বা আপনার অভিমত জানতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনি নিজের সঠিক অভিমত প্রকাশ করুন এবং তাকে একটি সুন্দর ও স্থায়ী পরামর্শ দিন। একজন অপরাধীকে যেমন করে উপদেশ দেয়া হয়, সেভাবে তাকে উপদেশ বিতরণ করতে যাবেন না।

অনেক সময় দেখা যায়, উপদেশগ্রহীতা উপলব্ধিই করতে পারে না যে, সে কোনো অপরাধ বা ভুল করেছে। তার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা হবে

শান্তভাবে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে তার সঙ্গে কথা বলা। এতে সে আপন ভুল অনুভব করতে পারবে।

কয়েকজন ভদ্রলোক একসঙ্গে সমবেত হয়ে মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। জনৈক দাম্ভিক বেদুঈন পাশে বসে তাদের কথা শুনছিলো। এরই মধ্যে এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করলো, 'ভাই! তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে কেমন আচরণ করো?' বেদুঈন উত্তর দিলো, 'আমি তো মায়ের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করি।'
'আচ্ছা, কেমন সদ্ব্যবহার করো?'
'আমি মাকে কখনো চাবুক দিয়ে আঘাত করিনি!'

অর্থাৎ সে তার মাকে কখনো প্রহার করলে হাত দিয়ে কিংবা হালকা কিছু দিয়ে আঘাত করে। মা হিসেবে সদ্ব্যবহার করা দরকার বলে চাবুক দিয়ে শাস্তি দেয় না! এই হলো নির্বোধ-দাম্ভিক বেদুঈনের সদ্ব্যবহার! তার কাছে না আছে ভালো-মন্দের রূপরেখা; না আছে ভুল-নির্ভুলের মানদণ্ড। তো আমাদের কর্তব্য হলো অপরাধীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও কোমল আচরণ করা, নিজেকে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রমাণ করা এবং এর মাঝেই তার ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলেই কেবল সে আপন ভুল উপলব্ধি করতে পারবে।

নবীযুগে 'মাখযুম' গোত্রের জনৈকা মহিলা আশপাশের মহিলাদের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস ধার নিতো। কিন্তু তা ফিরিয়ে দিতো না। পরে তার কাছে জিনিসটি ফেরত চাওয়া হলে সে অস্বীকার করতো। সে বলতো, 'আমি

কোনো কিছুই ধার করিনি!’ তার এ বদস্বভাব দিন দিন বেড়েই চললো। লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলো। চুরির শাস্তির বিবেচনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার ফয়সালা করলেন।

এ মহিলার বংশপরিচয় কোরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত একটি শাখার প্রতি সম্বন্ধিত ছিলো। তাই কোরাইশ নেতারা হাত কাটার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিলো না। তারা শাস্তিটি তুলনামূলক হালকা করার জন্য রাসূলের কাছে সুপারিশ করার মনস্থ করলো। হাত কাটার পরিবর্তে বেত্রাঘাত বা আর্থিক জরিমানার ফয়সালা হলে তা হবে সম্ভ্রান্ত এই মহিলাটির জন্য তুলনামূলক সহনীয়।

কিন্তু কেউই এ বিষয়ে কথা বলতে রাসূলের কাছে যেতে সাহস করছিলো না। যে-ই রওয়ানা করে, দ্বিধা ও ভয়ের কারণে ফিরে আসে। অবশেষে তারা ভাবলো, এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে একমাত্র ওসামা বিন যায়দই আলোচনা করতে পারবেন। তিনি এবং তার পিতা যায়দ নবীগৃহেই প্রতিপালিত হয়েছেন বিধায় তারা উভয়ে রাসূলের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। রাসূল ওসামাকে আপন সন্তানের মতই স্নেহ করেন। কোরাইশের কিছু লোক ওসামাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করালো।

ওসামা নবীদরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাকে স্বাগত জানিয়ে নিজের কাছে বসালেন। ওসামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উক্ত মহিলার দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করার ব্যাপারে আলোচনা তুললেন। বললেন,

'মহিলাটি যেহেতু উচ্চ বংশীয় তাই একটু অনুগ্রহ করা যেতে পারে।' ওসামা তার যুক্তি ও আবেদন পেশ করে যাচ্ছিলেন। নবীজীও মনোযোগী শ্রোতা হয়ে শুনছিলেন। ওসামা যুক্তির মাধ্যমে নবীজীর সামনে তার মতটিকে সঠিক প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। নবীজী ওসামার দিকে তাকালেন। ওসামা পীড়াপীড়ি করছে, যুক্তি পেশ করছে। কিন্তু সে বুঝতেই পারছে না যে, তার দাবিটি অন্যায়, শরীয়তের নীতিবিরুদ্ধ!

ক্রোধে নবীজীর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গেলো। মুখ খুলে প্রথম বাক্যেই তিনি ওসামার ভুলটা ধরিয়ে দিলেন। নবীজী বললেন, « يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» 'ওসামা! তুমি আল্লাহর বিধানে শিথিলতা করার জন্য সুপারিশ করছো?!' এ কথা বলে নবীজী একদিকে তার সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিলেন, অপরদিকে পরোক্ষভাবে ওসামার প্রতি অসন্তুষ্টির কারণও বলে দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত দণ্ডবিধি পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করা বৈধ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ওসামা রাযি. সতর্ক হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি বুঝতে পারিনি। আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

রাতের বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করলেন। প্রথমে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করার পর নবীজী বললেন, 'হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ধ্বংসের একটি কারণ এও ছিলো যে, যখন তাদের মধ্যে উঁচু বংশীয় কেউ চুরি করতো, তারা তার ওপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ

করতো না। আর যদি চোর বেচারা দুর্বল বা নিম্ন বংশের হতো, তাহলে তার উপর হদ কায়েম করতো। তোমরা ভালো করে শুনে রেখো, আল্লাহর কসম! যদি আমার কলিজার টুকরা ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করে, অতি অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দেবো।' এরপর আদেশ মোতাবেক সেই মহিলার হাত কাটা হলো।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, 'এরপর মহিলাটি তার পূর্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করে আন্তরিকভাবে তাওবা করে। কিছুদিন পর তার বিয়েও হয়। সে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমার কাছে আসা-যাওয়া করতো। আমি তার প্রয়োজনের কথা নবীজীকে জানাতাম।' [সহীহ বুখারী: ৩৪৩০, সহীহ মুসলিম: ১৬৮৮]

ওসামা বিন যায়দের নবীজীর সঙ্গে এমন অনেক ঘটনাই আছে। প্রতিটি ঘটনাতেই তার প্রতি নবীজীর দয়া ও উন্নত আচরণের পরিচয় মেলে। ওসামা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একবার জুহাইনা গোত্রের শাখা 'আল হুরাকা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করলেন। আমরা তাদেরকে পরাজিত করে পলায়নপর যোদ্ধাদের ধাওয়া করলাম। আমি ও জনৈক আনসারী সাহাবী শত্রুপক্ষের একজনের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। লোকটি একটি গাছের পেছনে আত্মগোপন করলো। তাকে ধরার পর তরবারি উত্তোলন করতেই সে বলে উঠলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই)।

আমার আনসারী সঙ্গী আঘাত না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তরবারি নামিয়ে ফেললেন। আমি ধারণা করলাম, এটা মৃত্যুভয়ে কম্পিত শত্রুর একটি কৌশল মাত্র। তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য সে এখন কালিমা পড়ছে। তাই আমি লোকটিকে হত্যা করে ফেললাম। কালিমা পড়ার পর আমি তাকে হত্যা করেছি বিধায় বিষয়টি আমাকে খুব অস্থির করে তুললো। তাই নবীজীকে বিষয়টা জানালাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটি কালিমা পড়া সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?!' আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! সে তো আন্তরিকভাবে কালিমা পড়েনি। সে তা পড়েছিলো আত্মরক্ষার্থে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?! নিশ্চিত অবগতির জন্য তুমি কেন তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখলে না যে, সে আত্মরক্ষার্থে কালিমা পড়েছে কিনা?!'

ওসামা চুপ করে রইলেন। বাস্তবেই তো তিনি লোকটির বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখেননি! কিন্তু তিনি যে ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে, আর লোকটা তার প্রতিপক্ষ যোদ্ধা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসামা রাযি.-এর দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বারবার বলছিলেন, 'লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?! লোকটি কালিমা পড়া সত্ত্বেও তাকে মেরে ফেললে?! কিয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে তখন কী পরিস্থিতি হবে?' রাসূল বারবার ওসামাকে এ কথা বলছিলেন। ওসামা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এত বার কথাটি বললেন যে, আমি মনে মনে

অনুশোচনা করছিলাম, ‘হায়! যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম!’ [সহীহ মুসলিম: ৯৬]

একটু ভেবে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উদারভাবে তার ভুলটি তুলে ধরলেন। এরপর তাকে উপদেশ দিলেন। আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন, যথাসম্ভব তার নীতি-চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতার অনুকূলে কথা বলবেন। বিষয়টিকে তার দৃষ্টিভঙ্গিতেই ভাববেন। তাহলে উপদেশপাত্র আপনার কথা সহজে গ্রহণ করবে।

নবীজী একদিন মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। পবিত্র-হৃদয় সাহাবীদের মোবারক জামাত মজলিসে উপবিষ্ট। হঠাৎ জনৈক যুবক মসজিদে প্রবেশ করে বারবার এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো। মনে হলো, সে কাউকে খুঁজছে। আল্লাহর রাসূলের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই সে রাসূলের দিকে অগ্রসর হলো। স্বাভাবিকতার দাবি এটাই ছিলো যে, সেও মজলিসে বসে নসীহত শুনবে। কিন্তু সে তা করলো না। সে নবীজী ও তার পাশে উপবিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এরপর হঠাৎ সে দুঃসাহস দেখিয়ে বলে উঠলো, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি...।’

সে কী বলেছিলো? ‘আমাকে অনুমতি দিন, আমি ইলম অর্জনের লক্ষ্যে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।’ না, এমনটি সে বলেনি। হায়! যদি সে এমনটি বলতো! ‘আমাকে অনুমতি দিন, আমি জিহাদে যেতে চাই।’ না, এমনটিও সে বলেনি। হায়! যদি সে এ কথা বলতো! সে বললো, ‘ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি যিনা করতে চাই'! আশ্চর্য! এভাবে সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় কেউ এ কথা বলে?! হ্যাঁ, সে সরাসরি স্পষ্ট ভাষায়ই বললো, 'আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের দিকে তাকালেন। তিনি চাইলে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে যুবককে নসীহত করতে পারতেন, সংক্ষেপে কিছু উপদেশবাণী শুনিয়ে তার অন্তরে ঈমানী চেতনা জাগরিত করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি ভিন্ন একটি পন্থা অবলম্বন করলেন। নবীজী খুব কোমলভাবে তাকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার মায়ের সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি পছন্দ করবে?' যুবকটি ঈষৎ কেঁপে উঠলো। তার কল্পনায় আপন মায়ের একটি অসুস্থ দৃশ্য ভেসে উঠলো। সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো 'না, আমি কক্ষনো তা বরদাশত করবো না।' আল্লাহর রাসূল তাকে শান্ত স্বরে বললেন, 'মানুষও তেমনই তাদের মায়ের সঙ্গে এরূপ আচরণ বরদাশত করবে না।'

পরক্ষণেই নবীজী প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তাহলে তোমার বোনের সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি পছন্দ করবে?' যুবকটি আবারও শিউরে উঠলো। তার কল্পনায় আপন সচ্চরিত্রা বোনের একটি অসুস্থ দৃশ্য ভেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো 'না, আমার বোনের ক্ষেত্রেও আমি তা কক্ষনো বরদাশত করবো না।' তখন নবীজী বললেন, 'মানুষও তেমনই তাদের বোনের সঙ্গে এরূপ আচরণ বরদাশত করবে না।'

এরপর নবীজী তাকে একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'আচ্ছা, তাহলে তোমার ফুফুর সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি পছন্দ করবে?' 'আচ্ছা, তাহলে তোমার খালার সঙ্গে কেউ এ কাজ করুক, এটা কি তুমি পছন্দ করবে?' যুবকটিও উত্তর দিতে লাগলো, 'না, না, আমি কখনোই তা বরদাশত করবো না।' তখন নবীজী তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি মানুষের জন্য তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করছো। আর মানুষের জন্য তা ঘৃণা করো, যা নিজের ক্ষেত্রে ঘৃণা করছো।'

এতক্ষণে যুবকটি বুঝতে পারলো, সে কত বড় ভুলের মধ্যে ছিলো! এবার সে বিনম্র চিত্তে নত স্বরে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমার অন্তরজগতকে পূত-পবিত্র করে দেন।' নবীজী তাকে কাছে ডাকলেন। যুবকটি ধীরে ধীরে নবীজীর কাছে এলো। একেবারে কাছে এসে বসলো, নবীজী তার বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! এর অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিন। অন্যায় কাজ হতে তাকে পবিত্র রাখুন।' [শুআবুল ঈমান: ৫১৮১]

নবীজীর দরবার থেকে বের হওয়ার সময় যুবকটি স্বগত কণ্ঠে বলছিলো, 'আল্লাহর শপথ! আমি যখন রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম, আমার কাছে যিনা ও ব্যভিচারের চেয়ে প্রিয় অন্য কিছু ছিলো না। আর যখন নবীদরবার থেকে বের হয়ে এলাম, আমার কাছে যিনার চেয়ে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট আর কিছু নেই।'

দেখুন, প্রথমে কী চমৎকার পন্থায় নবীজী তার ভুল ধরিয়ে দিলেন! এরপর আবেগ ও স্নেহ-আচরণের কী চমৎকার প্রয়োগ করলেন! প্রথমে তার অন্তরে কাজটির কদর্যতা ও জঘন্যতার স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করলেন, যেন সে প্রশান্ত হৃদয়ে তা পরিহার করতে পারে। এরপর তাকে কাছে ডাকলেন। তার বুকে হাত রাখলেন, তার জন্য দোয়া করলেন। অর্থাৎ তার সংশোধনের জন্য সব ধরণের আচরণকৌশল প্রয়োগ করলেন। এর ফলাফল এই হলো যে, ভবিষ্যতে সে এই কাজ কক্ষনো করবে না। না জনসম্মুখে, আর না নির্জনে।

**একটি চিন্তা...**

অপরাধী যদি অপরাধের কদর্যতা ও ভুলের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে তাহলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপদেশ ও নসীহতের প্রয়োজন অনুভব করে। তখন উপদেশ গ্রহণ সহজ হয়, উপদেশের প্রভাবও হয় যথার্থ ও কার্যকর।

# ৩৮. তিরস্কার করবেন না, যা হওয়ার হয়ে গেছে....

অনেকে মনে করে, ভুল-ত্রুটির কারণে অন্যকে তিরস্কার করা হলে তার অধিকতর নিকটভাজন হওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে আপন ব্যক্তিত্ব সমুন্নত ও শক্তিশালী হয়। তাও আবার এমন ভুল-ত্রুটি, যা সাধারণত চোখে পড়ে না। বাস্তবতা হলো, তিরস্কার করতে পারাটা কখনও বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তিরস্কার করা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই কাম্য। এর পরিবর্তে এমন পদ্ধতিতে মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে, যা তার জন্য কষ্টদায়ক এবং অস্বস্তিকর নয়। কখনো কখনো এমন অনেক পরিস্থিতি আসে, যা দেখেও না দেখার ভান করে থাকতে হয়। বিশেষত জাগতিক ও ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। কবি বলেন—

নির্বোধ কভু হয় না জানি শ্রেষ্ঠ জাতির নেতা

তবু শ্রেষ্ঠ নেতাকে হতে হয় কভু নির্বোধ অভিনেতা।

মনে রাখতে হবে, তিরস্কৃত ব্যক্তি তিরস্কারকে তার দিকে তাক করে রাখা এক ধারালো তীর বলে মনে করে থাকে। কেননা তিরস্কারকে সে নিজের ব্যক্তিত্বে আঘাত ও ক্ষত বলে মনে করে। এটি হলো প্রথম লক্ষণীয় বিষয়।

দ্বিতীয় আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, জনসম্মুখে কাউকে উপদেশ প্রদানে যথাসম্ভব বিরত থাকা। কবি বলেন—

লোকচক্ষুর অন্তরালে দাও উপদেশ যত খুশি

কিন্তু সবার সামনে এ কাজ করো না ভাই অত বেশি

লোকসমাজে উপদেশ তো এক ধরণের তিরস্কার

বন্ধু তোমার কাছে আমি চাই না এমন পুরস্কার!

হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কোনো ভুল যদি ব্যাপকভাবে ঘটতে দেখা যায় এবং সতর্ক করার প্রয়োজন হয় তাহলে অবলম্বন করতে হবে নববী নীতি, ‘লোকদের কী হলো যে, তারা এমন এমন কাজ করে...।’ যেমনটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তখন দেখা যাবে, সে তিরস্কার এমন চাবুকের ন্যায় কাজ করে, যা তিরস্কৃতের পিঠে প্রবল কষাঘাত করে।

অনেকে অধিক তিরস্কারবৃত্তির মাধ্যমে অন্যদের দূরে ঠেলে দেয়। আবার অনেক সময় এমন বিষয়ে তিরস্কার করা হয়, যার প্রভাব ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তিরস্কার সেক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাৎ কোনো কাজেই আসে না।

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি পরিবার-পরিজন ফেলে ভিন দেশে প্রবাসী হলো। সেখানে সে ট্রাক চালাতে শুরু করলো। একদিন সে খুব ক্লান্ত ছিলো। ক্লান্তি নিয়েই ট্রাকে চড়ে বসলো এবং দূরবর্তী দুই শহরের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে লাগলো। পথিমধ্যে তন্দ্রা ভাব আসায় সে ট্রাক চালাতে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেললো এবং ভালোভাবে সামনের দিকে লক্ষ না করেই সামনের একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গেলো। পরক্ষণেই দেখলো তার সামনে ছোট্ট আরেকটি গাড়ি। গাড়িটিতে তিনজন যাত্রী। ট্রাকচালক ছোট্ট গাড়িটি

রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু সক্ষম হলো না। একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। যথেষ্ট ধূলো উড়লো। রাস্তার অন্যান্য গাড়িচালকরা গাড়ি থামিয়ে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

ট্রাকচালক নিচে নামলো। দুমড়ে যাওয়া গাড়িটি ও গাড়ির যাত্রীদের দিকে তাকালো। দেখলো, সবাই মারা গেছে। লোকেরা গাড়ি থেকে লাশ বের করছে, অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করছে। ট্রাকচালকও বসে বসে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা করতে লাগলো। সে ভাবতে লাগলো দুর্ঘটনা পরবর্তী কারাভোগ ও আর্থিক দণ্ডের কথা, নিজের স্ত্রী ও ছোট ছোট সন্তানদের কথা। সে এখন অসহায়। তার মাথায় যেন চিন্তার পাহাড় চেপে বসেছে।

এদিকে পথচারীরা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর তাকে তিরস্কার করছে। আশ্চর্য! এটা কি তিরস্কারের সময় হলো? তারা নিজেদের একটুও নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না? কিছুক্ষণ কি দেরি করা যেতো না? একজন বললো, ‘এত দ্রুত গাড়ি চালাও কেন? এবার মজা বোঝো।’ আরেকজন বললো, ‘নিশ্চিত তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলে। এরপরও গাড়ি নিয়ে বের হয়েছো। গাড়ি পার্ক করে ঘুমিয়ে নিলে না কেন?’ তৃতীয় একজন বললো, ‘তোমার মত ব্যক্তিকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়াই উচিত নয়।’ লোকেরা এ ধরণের আরো অনেক কথা খোঁচা মেরে তিরস্কারের স্বরে বলতে লাগলো। হতভম্ব নির্বাক লোকটি দু'হাতে মাথা ঠেক দিয়ে একটি পাথরের ওপর বসে রইলো। হঠাৎ সে একদিকে ঢলে পড়লো এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

প্রকৃতপক্ষে তিরস্কারকারীরাই তাকে তিরস্কারের আঘাতে হত্যা করলো। তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে নিজেদের একটু নিয়ন্ত্রণ করতো, তাহলে একটি প্রাণ বেঁচে যেতো এবং সকলের জন্যই তা কল্যাণকর হতো। নিজেকে সেই ভুলকারী ও তিরস্কৃতের স্থানে রেখে তারপর চিন্তা করুন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি ভাবুন। তাঁর স্থানে হলে হয়তো আপনি এর চেয়েও বড় কোনো ভুল করে বসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল বিষয়ে খুবই লক্ষ রাখতেন।

খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথের ঘটনা। দীর্ঘ সফরের কারণে সকলেই ক্লান্ত। রাত হয়ে গেলে বিশ্রামের জন্য রাস্তার কাছেই এক জায়গায় কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, ‘আমরা যেন একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি, এ জন্য কে ফজর নামায পর্যন্ত পাহারার দায়িত্ব নেবে? আমাদের ফজর যেন কাযা না হয়, কে তার জিম্মাদারী নেবে?’

বেলাল রাযি. সবসময় নেক কাজে অগ্রবর্তী থাকতে চাইতেন। তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দায়িত্ব পালন করবো।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন। সাহাবীগণও ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে বেলাল রাযি. নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। দীর্ঘ সফরের কারণে আগে থেকেই তিনি ক্লান্ত ছিলেন। নামায পড়তে পড়তে একপর্যায়ে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ফলে খানিক বিশ্রামের জন্য পূর্বমুখী হয়ে উটের সঙ্গে হেলান দিয়ে

একটু বসলেন এবং সুবহে সাদিকের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু চোখের কাছে পরাজিত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন তিনিও।

সকলেই ছিলেন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। তাই ঘুমও হলো দীর্ঘ-প্রলম্বিত। রাত শেষ হলো। সুবহে সাদিক হলো। সবাই নিদ্রাক্রোড়ে। সূর্য উদিত হলো। তখনও সকলে ঘুমিয়ে। অবশেষে সূর্যের প্রখর তাপে তাদের ঘুম ভাঙলো। সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি কাফেলার সবাইকে জাগালেন। ঘুম থেকে উঠে সূর্য দেখে সকলে অস্থির হয়ে পড়লেন। সকলের দৃষ্টি বেলালের দিকে নিবদ্ধ। তার ব্যাপারে একটা 'কানাকানি' শুরু হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাযি.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেলাল! আমাদের সঙ্গে তুমি এ কী করলে?' বেলাল রাযি. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। এবং তাতে বাস্তব বিষয়টি পূর্ণ স্পষ্ট হলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যে জিনিস পেয়েছে, আমাকেও সে জিনিস পেয়েছিলো।' অর্থাৎ আমিও মানুষ। চেষ্টা করেও আমি ঘুম প্রতিরোধ করতে পারিনি। আপনাদের মত আমিও ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি সত্য বলেছো।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আর কিছু বললেন না। এ ক্ষেত্রে তিরস্কার করে লাভই বা কী? সাহাবীদের অস্থিরতা প্রত্যক্ষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে যাত্রা শুরু করতে বললেন। কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। অল্প কিছুদূর গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বিরতি দিলেন। কাফেলার সকলকে নিয়ে অযু

করলেন। কাযা নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে সাহাবীদের বললেন:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

**অর্থ: নামায আদায় করতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেবে।** [সহীহ মুসলিম: ১০৯৭]

আল্লাহু আকবার! কী চমৎকার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা! সিদ্ধান্ত গ্রহণে কী দারুণ দূরদর্শিতা!

আল্লাহর রাসূল সব মহলে সকল পরিচালকের অনুসৃত বিদ্যাপীঠ। এখনকার নেতাগণ তো অধীনস্থদের ওপর থেকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার লাঠি নামাতেই চায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ছিলেন না। তিনি নিজেকে অধীনস্থদের স্থানে ভেবে বিবেক দিয়ে বিষয় উপলব্ধি করতেন। দেহাবয়বের আগে দেহাভ্যন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—এরা মানুষ, মেশিন নয়।

অষ্টম হিজরীর (মুতার যুদ্ধের) কথা। রোম সম্রাট তার যুদ্ধবাহিনী প্রস্তুত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিক থেকে অগ্রসর হলো। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যুদ্ধের জন্য আগে সৈন্য প্রস্তুত করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোমীয়দের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবীদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তিন হাজার সাহাবীকে ঢাল-তলোয়ার ও যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে প্রস্তুত করলেন।

রাসূল বলে দিলেন, ‘তোমাদের সেনাপতি হলো যায়দ বিন হারেসা। যায়দ আক্রান্ত হলে সেনাপতি হবে জাফর বিন আবু তালেব। জাফরও যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ কাফেলাকে বিদায় দেয়ার জন্য বের হলেন। সঙ্গে অন্যরাও বের হলো। সকলে সৈন্যবাহিনীকে এই বলে বিদায় দিলো: صَحِبَكُمُ اللَّهُ، وَدَفَعَ عَنْكُمْ، وَرَدَّكُمْ إِلَيْنَا صَالِحِينَ.

**অর্থ: আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। তোমাদেরকে সহী-সালামতে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন।**

হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. শাহাদাতের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন—

হে আল্লাহ! ক্ষমা চাই আমি অনুতাপী হয়ে, ক্ষমা চাই তব মহতী দ্বারে

একটি বর্শা একটি আঘাত চাই যেন বুক বিদ্ধ করে!

বদন-কণ্ঠ সজ্জিত হোক লাল রক্তের অলংকারে

কর্ণকুহর দোলায়িত হোক হুরের নূপুরের ঝঙ্কারে!

কবর পাশে যাবে যে জন বলবে অতি ঈর্ষা করে

পথ পেয়েছো গো বীর মুজাহিদ, তিনিই যে পথ দেখালেন ওরে।

এরপর মুসলিম বাহিনী মুতার দিকে রওয়ানা হলো এবং পথিমধ্যে শামের মাআন নামক স্থানে ছাউনি ফেললো। এখানে পৌঁছে মুসলমানরা জানতে পারলো, বালকা নামক স্থানে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমক সৈন্য

নিয়ে অবস্থান করছে এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন কবিলার আরো এক লক্ষ সৈন্য মিলিত হয়েছে। ফলে রোমক সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ‘দুই লক্ষ’।

মুসলমানরা বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মাআনেই দু'রাত কাটিয়ে দিলো এবং গভীরভাবে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। এ বিষয়ে সাহাবীদের মাঝে যথেষ্ট আলোচনা হলো। কেউ কেউ বললেন, ‘আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চিঠি পাঠিয়ে দুশমনদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত করি। এতে রাসূল হয় অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন, অথবা তিনি যা ভালো মনে করবেন সে অনুযায়ী আদেশ দেবেন। আমরা সে আদেশ পালন করে যাবো।’

এসব কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুজাহিদদের সাহস জুগিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললেন, ‘হে মুজাহিদগণ! আল্লাহর কসম! আজ তোমরা যা কঠিনতর মনে করছো, এর জন্যই তোমরা বেরিয়েছিলে! আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য থেকে তোমরা পিছপা হচ্ছো! মনে রেখো! আমরা সৈন্যসংখ্যা, সামরিক শক্তি বা অস্ত্রাধিক্যের ভরসা করে দুশমনের মোকাবিলায় আসিনি। আমরা তো সেই দ্বীন আর ঈমানের শক্তি নিয়ে মোকাবিলায় এসেছি, যা দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে চলো। মনে রেখো! বিজয় বা শাহাদাত—যাই আমাদের সম্মুখে আছে, উভয়ই আমাদের জন্য কল্যাণকর।’

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি.-এর ঈমানদীপ্ত ভাষণে সাহাবীগণ সামনে এগোতে লাগলেন এবং মুতা নামক স্থানে রোমকদের বিশাল বাহিনীর

কাছাকাছি পৌঁছলেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, 'আমি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মুশরিকরা যখন আমাদের কাছাকাছি হলো, দেখলাম এত সৈন্য যে, ইতিপূর্বে কেউ কোনোদিন এত সৈন্য সমাবেশ করেনি। তাদের একেকজনের সঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ ঢাল-তরবারি, অস্ত্র-সরঞ্জাম, রেশম, স্বর্ণ ইত্যাদি দেখলাম, যা এর আগে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এসব দেখে আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেলো। তখন সাবেত বিন আরকাম রাযি. আমাকে বললেন, "আবু হোরায়রা! তুমি মনে হয় বিপুল সৈন্য-সমাগম দেখছো?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"।'

তিনি বললেন, 'তুমি বদরে আমাদের সঙ্গে ছিলে না! সেখানে আমরা সংখ্যাধিক্যের কারণে নুসরত ও বিজয় লাভ করিনি।'

এরপর সাহাবীগণ শত্রুর মুখোমুখি হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত যায়দ বিন হারেসা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া পতাকা বহন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বল্লমের আঘাতে তাঁর গোটা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাতের গৌরব অর্জন করলেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।)

এবার হযরত জাফর রাযি. পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে স্বহস্তে পতাকা তুলে নিলেন। সুগঠিত অশ্বের পৃষ্ঠ হতে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর জবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো রণতেজ উদ্রেককারী দীপ্ত কবিতামালা—

সুখ মোর জান্নাতে, সুখ তার আশপাশে

সুখ তার সুরভী ও শরাবের আবেশে।

আর রোম! ওদের চরম শাস্তি এই তো ওদের সিথানে বসা

নির্বংশ যে হবে, শীঘ্রই ভাঙবে সকল আশা।

আর শোনো! আমার দায়িত্ব আমি ভালোই জানি

যখনই সামনে পাবো, করবো প্রাণহানি।

হযরত জাফর রাযি. ডান হাতে পতাকা বহন করছিলেন। শত্রুর আঘাতে ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এরপর বাম হাতে পতাকা তুলে নিলেন। তাও বাহু পর্যন্ত কাটা গেলো। তখন বাহু থেকে অবশিষ্ট অংশ দিয়ে পতাকা ঝাপটে ধরলেন। এভাবে লড়াই করতে করতে তেত্রিশ বছরের এই দীপ্ত যুবক শাহাদাতের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হলেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।)

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. বলেন, ‘আমি সেদিন জাফর রাযি.-এর কাছেই ছিলাম। শাহাদাতের পর আমি গুণে দেখলাম, তাঁর শরীরে পঞ্চাশটির মত তীর-তরবারির যখম ছিলো, যার একটিও পেছন দিকে নয়। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁকে দু'টি ডানা দান করেছেন। এ ডানা দিয়ে তিনি জান্নাতে যেথায় খুশি ঘুরে বেড়ান। যুদ্ধের দিন এক রোমক সৈন্য তরবারির আঘাতে এই শহীদের দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছিলো।’

হযরত জাফর রাযি. শহীদ হয়ে গেলে হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. পতাকা তুলে নিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে পতাকা হাতে সামনে এগুতে থাকলেন। তবু

তাঁর মন বারবার যেন পিছনে চলে যেতে চাচ্ছিলো এবং তিনি কিছুটা দ্বিধায় ভুগছিলেন। তাই নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে বারবার তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন:

শপথ করছি তোমার নামে ওহে আমার অন্তরাত্মা

নামবেই তুমি সাওয়ারী ছেড়ে থাক না তোমার অপ্রিয়তা।

শোনো লোকদের গুঞ্জরন, দেখো দেখো কী মহালোড়ন

শুনি তুমি করো অপছন্দ—জান্নাত-বাগে পরিভ্রমণ!

এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদ্বয় যায়দ ও জাফরকে স্মরণ করে বললেন:

ওহে অন্তর মোর হবে মৃত্যু যে তোর

মৃত্যু নয়রে শাহাদাত, এ তো শাহাদাতের সুখবর

লেখা পেয়ে গেলি এক সওগাত

আশা কর যাহা পেয়ে যাবে তাহা

চল যদি আজ তাদের পথে পেয়ে যাবে ‘হিদায়াত’।

এরপর তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে দাঁড়ালেন। এদিকে তাঁর চাচাতো ভাই স্বল্প গোশতযুক্ত একটি হাড্ডি নিয়ে এসে বললো, ‘ক'দিন যাবৎ তোমার পেটে দানাপানি কিছুই তো পড়েনি। এটুকু খেয়ে নাও, গায়ে কিছুটা শক্তি পাবে।’ আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. তাঁর হাত থেকে হাড্ডিটা নিয়ে একটু মুখে দিলেন। ইতোমধ্যে রণাঙ্গনের এক প্রান্তে শোরগোল শুনতে পেয়ে তিনি

হাড্ডিটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে! তুমি এখনো দুনিয়া নিয়ে আছো?' এরপর তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তরবারি হাতে সম্মুখপানে ছুটলেন এবং লড়াই করতে করতে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।)

মুসলিম বাহিনীর পতাকা মাটিতে পড়ে রইলো। মুসলিম বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কাফির বাহিনী নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পতাকাটি অশ্বপদে দলিত হলো, ধূলোয় ধূসরিত হলো। বীর যোদ্ধা সাবেত বিন আরকাম রাযি. অগ্রসর হয়ে পতাকাটি তুলে নিলেন আর চিৎকার করে বললেন, 'ওহে মুসলিম বাহিনী! এই দেখো তোমাদের পতাকা। তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে পতাকা বহনের জন্য নির্বাচন করো।' তাঁর কথা শুনে সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, 'তুমিই গ্রহণ করো। তুমিই গ্রহণ করো।' তিনি বললেন, 'আমি গ্রহণ করতে পারবো না।'

এরপর সর্বসম্মতিতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.কে অধিনায়কের দায়িত্বভার দেয়া হলো। তিনি পতাকা হাতে নিয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে এক সময় তিনি বলেছিলেন, 'মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছে। যুদ্ধ শেষে আমার কাছে শুধু একটি ইয়ামানী পাত বাকি ছিলো।'

যাই হোক, একপর্যায়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মুসলিম সেনাদের নিয়ে কৌশলে পেছনে সরে আসলেন। রোমকরাও তাদের ছাউনিতে ফিরে গেলো। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. সেনাবাহিনী নিয়ে রাতেই মদীনায় ফেরা

বিপজ্জনক মনে করলেন। রোমক সৈন্যরা তাদের অনুসরণ করবে ভেবে যাত্রা স্থগিত রাখলেন। সকাল হলে খালিদ রাযি. সেনাবাহিনীর বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন। অগ্রভাগকে পশ্চাদভাগে আর পশ্চাদভাগকে অগ্রভাগে মোতায়েন করলেন। তদ্রূপ ডানদিকের বাহিনীকে বাম দিকে এবং বামদিকের বাহিনীকে ডানদিকে নিয়ে এলেন।

যুদ্ধ আবার শুরু হলো। রোমকরা অগ্রসর হলো। তাদের প্রত্যেকটি দল মুসলমান বাহিনীতে নতুন নতুন পতাকা ও নতুন নতুন চেহারা দেখতে পেলো। তখন রোমকরা অস্থির হয়ে বলতে লাগলো, 'রাতে মুসলমানদের সাহায্যে অনেক সৈন্য এসেছে এবং সবাই মিলে লড়াইয়ে নেমেছে।' মুসলমানরা তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। মুসলমানদের কেবল বারোজন শহীদ হলেন। হযরত খালিদ রাযি. দিন শেষে বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ-ময়দান থেকে ফিরে এলেন।

এরপর মদীনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। মদীনার কাছাকাছি পৌঁছুলে কিশোর বালকেরা তাদের কাছে ছুটে এলো। মহিলারাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারা সবাই কাফেলার দিকে এই বলে মাটি ছুঁড়তে লাগলো যে, 'হে পলায়নকারীরা! তোমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করেছো।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলা থেকে সবকিছু শুনলেন। তিনি বুঝলেন, তাদের সামনে এ ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না। সাধ্যে যতটুকু ছিলো, তারা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন:

«لَيْسُوا بِالْفُرَّارِ وَلَكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»

**অর্থ: তারা পলাতক নয়, বরং পুনরায় হামলার উদ্দেশ্যে কৌশলে প্রত্যাবর্তনকারী।**

ব্যাস, বিষয়টি শেষ হয়ে গেলো। তারা বীর পুরুষ। চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু তারাও তো মানুষ। এক্ষেত্রে বিষয়টি তাদের সামর্থ্যের বাইরে ছিলো। এখন কাজ হলো শহীদদের জানাযা পড়া, তাদের তিরস্কার করা নয়। এটাই ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের নীতি।

মক্কার কাফিররা যখন শুনতে পেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে আসছেন তখন তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে একজন ঘোষক পাঠালেন। সে ঘোষণা করলো, 'যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ।' 'যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।' 'আর যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ।'

মক্কার কাফিররা পালাতে লাগলো। ওদিকে কিছু অশ্বারোহী কোরাইশ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একত্র হলো। কিন্তু তাদের গোত্রের লোকজন তাদের সঙ্গ দিতে অস্বীকার করলো। অবশেষে খান্দামা নামক স্থানে তাদের একটি দল একত্র হলো। এ দলে ছিলো সাফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরিমা বিন আবু জাহল ও সুহাইল বিন আমর। তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আরো কিছু লোক জমা করলো।

মক্কার কাফির হিমাস বিন কায়স রাসূলের আগমনের পূর্ব হতেই অস্ত্র প্রস্তুত করছিলো এবং বিভিন্ন অস্ত্র মেরামত করে রাখছিলো। একদিন তার স্ত্রী

তাকে বললো, 'এগুলো কেন প্রস্তুত করছো?' সে বললো, 'মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের জন্য।' তার স্ত্রীর মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কথা জানা ছিলো। সে বললো, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের সামনে দাঁড়াতে পারবে, এমন কোনো জাতিই তো নেই।' হিমাস বললো, 'আল্লাহর শপথ! আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, তাদের (মুসলমানদের) দিয়ে আমি তোমার খেদমত করাবো।' অর্থাৎ সে কতক মুসলমানকে বন্দী করবে এবং তাদেরকে স্ত্রীর খাদেম বানাবে! এরপর সে অহঙ্কার করে বলতে লাগলো—

তারা যদি আসে আজিকে সামনে

তবে কেন আমি রহিবো পিছনে

যবে—এই আছে মোর তেজ তরবারি

প্রভু মত তাহা শক্তিধারী

আরো আছে মোর দুই পাশ ধারি হামলাকারী।

এরপর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে খান্দামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, যেখানে তার সঙ্গীরা একত্র হয়েছে। সে সেখানে পৌঁছুতেই মুসলমানরা তাদের মুখোমুখি হলো। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.। যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমান বাহাদুরগণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুহূর্তের মধ্যে বারো-তেরোজনরেও অধিক কাফিরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন। হিমাস বিন কায়স এ অবস্থা দেখে সাফওয়ান ও ইকরামার দিকে তাকালো। দেখলো, তারা বাড়ির

দিকে পালাচ্ছে। সেও তাদের পিছু নিলো এবং পরাজয় মেনে নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগলো।

দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে চিৎকার করে স্ত্রীকে বললো, 'তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করো। তারা ঘোষণা করেছে, "যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ"।' স্ত্রী বললো, 'তুমি যা বলেছিলে, তা গেলো কোথায়? তাদেরকে বন্দী করবে! তাদের দ্বারা আমার খেদমত করাবে!' হিমাস তখন বললো—

খান্দামা রণে যেতে যদি তুমি!

পালিয়েছে হেথা ইকরিমা আর পালিয়েছে সাফওয়ান,

আবু ইয়াযিদ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে, যেন শেষকৃত্য অনুষ্ঠান।

ইস্তেকবাল(!) করছে তাদের মুসলিম তরবারি

কেটে কেটে সব বাহু-ভুজ আর সব মাথা, সব করোটি,

শুনবে যে তুমি শুধু এতটুকু অস্ফুট গোঙানি

যাহাদের তরে আমাদের পরে বিরত ঘোষিত তুমি

—বলতে না তুমি নিন্দার ছলে এই কালিমাখানি।

বাস্তবতাও তাই। তার স্ত্রী যদি খান্দামা যুদ্ধের তীব্রতা প্রত্যক্ষ করতো তাহলে স্বামীর তিরস্কারে সে একটি শব্দও বলতো না।

ওদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি মক্কার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাই সামান্য যুদ্ধ করলেন। এরপর বললেন: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ « إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»

**অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন হতে এ শহরকে সম্মানিত করেছেন, (এ শহরে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম করেছেন)। তাই কেয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এতে রক্তপাত বৈধ করা হয়নি। তবে আজকের দিনের কিছু সময়ের জন্য আমাকে এর বৈধতা দিয়েছেন।** [সহীহ বুখারী: ২৯৫১, সহীহ মুসলিম: ২৪১২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদ তার অশ্বদল নিয়ে মুশরিকদের যাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে বললেন, 'যাও। খালিদ বিন ওয়ালীদকে গিয়ে বলো, সে যেন কাউকে হত্যা করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।'

এই ব্যক্তির এটা জানা ছিলো যে, তারা এখন যুদ্ধাবস্থায় আছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশদের ঘরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা হত্যার শিকার না হয়। অতএব যে নিজ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও থাকবে, সে হত্যার যোগ্য হবে। 'সে যেন কাউকে হত্যা করা থেকে হাত

গুটিয়ে নেয়’—রাসূলের এ কথা থেকে লোকটি এই বুঝলো যে, খালিদ সামনে যাকে পাবে, তাকেই হত্যা করবে। এবং একপর্যায়ে তরবারিসহ হাত গুটিয়ে নেবে। কারণ তখন সে আর কাউকে হত্যা করার মত পাবে না!

আপন বুঝ অনুযায়ী লোকটি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর কাছে এসে চিৎকার করে বললো, ‘খালিদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি যাকে পাবে, হত্যা করতে থাকো!”’ এরপর খালিদ রাযি. সত্তরজন লোককে হত্যা করলেন।

অপর এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো, ‘আল্লাহর রাসূল! খালিদ হত্যা করেই চলছে।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হলেন। নিষেধ করার পরও খালিদ হত্যা করছে! তিনি খালিদকে ডেকে পাঠালেন। খালিদ উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি কি তোমাকে হত্যা করতে নিষেধ করিনি?’

রাসূলের এ কথা শুনে খালিদও অবাক হলো এবং বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি তো আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনার আদেশ হলো, “যাকে পাও হত্যা করো”।’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে দেখলো, খালিদও উপস্থিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ‘আমি কি হত্যা করা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বলিনি?’ লোকটি তার ভুল বুঝতে পারলো। কিন্তু যা হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে। তখন সে বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনি চেয়েছেন একটা,

আর আল্লাহ চেয়েছেন অন্যটা। ফলে আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে। আর আমার মাধ্যমে যা হওয়ার ছিলো তা হয়ে গেছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। তাঁকে আর কিছু বললেন না।

জীবনের নানা দিক নিয়ে যে চিন্তা করবে তার কাছে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অনেক সময় মানুষ সাধ্যের চেয়ে ভালো কাজ করে ফেলে। একবার আমি এক যুবকের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়লাম। তার ড্রাইভিং ছিলো অতুলনীয়। আমি জানতাম, এক সপ্তাহ পূর্বে সে এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলো। আমি তাকে বললাম, 'তোমার ড্রাইভিং তো খুবই চমৎকার! এক সপ্তাহ পূর্বে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলে কী করে?'

সে উত্তর দিলো, 'আমি বাধ্য ছিলাম।'

'আশ্চর্য! এটা কেমন কথা?'

'হ্যাঁ! অ্যাকসিডেন্ট না করে আমার উপায় ছিলো না। জানেন, কেন?'

আমি বললাম, 'কেন?'

সে বললো, 'আমি গাড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে একটি ব্রীজের ওপর উঠেছিলাম। নামতে গিয়ে দেখলাম, আমার সামনে সারিবদ্ধ অনেকগুলো গাড়ি থেমে আছে। কেন, আমি জানি না। সামনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, নাকি চেকপোস্ট বসেছে, আমি জানি না। বড় কথা হলো, আমি হঠাৎ সারিবদ্ধ অনেকগুলো গাড়ির মুখোমুখি হয়েছি।'

'আমার সামনে চারটি রাস্তা ছিলো। সবক'টি রাস্তাই গাড়িতে পূর্ণ। অতএব আমার সামনে তিনটি পথ খোলা। এক. এই সবগুলো পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে

যাওয়া অর্থাৎ ব্রীজের ওপর থেকে পড়ে যাওয়া! দুই. শরীরের পূর্ণ শক্তি দিয়ে ব্রেক চেপে ধরা। তাহলে গাড়ি আমাকে নিয়ে রাস্তায় ডিগবাজি খেতে থাকবে। তৃতীয় আরেকটি পথ খোলা ছিলো। সেটা ছিলো সবচে সহজ।' আমি বললাম, 'সেটা কী?'

সে বললো, 'আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারটি গাড়ির কোনো একটিকে ধাক্কা দেয়া।' আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা! তুমি কী করেছিলে?' সে বললো, 'আমি যথাসম্ভব গতি কমিয়ে নিলাম এবং আমার সামনের গাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কমদামী গাড়িটি বেছে নিয়ে তাতে ধাক্কা দিলাম!' এ কথা বলে সে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো। আমিও হাসলাম। কিন্তু পরে তার কথাগুলো নিয়ে ভেবে দেখলাম, আসলেই সে তিরস্কারের অতটা উপযুক্ত নয়। কেননা, তার সামনে সীমিত কয়েকটি পথই খোলা ছিলো। আর সে তুলনামূলক সবচেয়ে ভালো পথটিই গ্রহণ করেছে।

সারকথা হলো, কিছু সমস্যা এমন আছে, যার কোনো সমাধান নেই। যেমন ধরুন, কারো পিতা বেশ জেদি। পিতাকে সে নানা পন্থায় বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। এখন সে কী করবে?

**কথার বাঁকে...**

নিজেকে তিরস্কৃত ব্যক্তির স্থানে ভেবে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করুন। এরপর তিরস্কৃত ব্যক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।

# ৩৯. ভুল শোধরানোর পূর্বে ভুল সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নিন

যখন সে আমাকে ফোন করলো, তার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, সে প্রচণ্ড রেগে আছে এবং পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমি সবসময় তার যে কণ্ঠস্বর শুনে অভ্যস্ত, এতো তা নয়! যেভাবে সে গর্জে উঠলো, বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। সে তার কথা শুরু করলো মানুষের মাঝে ছড়ানো একটি গুজব নিয়ে। ধীরে ধীরে তার তীব্র কণ্ঠ আরো তীব্র হল। সে বলতে লাগলো, 'আপনি একজন দাঈ, জ্ঞান অন্বেষণকারী। আপনার কর্মের দায় আপনাকেই নিতে হবে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর বান্দা! সরাসরি বলুন, কী হয়েছে?'

লোকটি বললো, 'আপনি অমুক জায়গায় যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন...।'

আমি অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবেকার ঘটনা?'

'তিন সপ্তাহ আগের।'

'তিন সপ্তাহ! আমি তো গত এক বছরেও সেখানে যাইনি।'

সে বললো, 'অবশ্যই গেছেন এবং বক্তৃতায় এই এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।'

এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, সে কোনো গুজব শুনেছে এবং তা বিশ্বাস করে নিয়েছে। শতভাগ সিদ্ধ যে, আমি তাকে ভালোবেসে যাবো।

কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে, তার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা হলেও পাল্টে গেছে। আজ বুঝতে পেরেছি যে, লোকটা গুজবে কান দেয়, যা শোনে তাই বিশ্বাস করে।

বহু লোক আছে, যাদের চিন্তা ও চেতনা গুজব ও কানকথার ওপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয়। আপনাকে অনেকেই উপদেশ দিতে আসবে। পরবর্তীতে দেখা যাবে, সে কোনো গুজব শুনেই আপনার সংশোধনে(!) এগিয়ে এসেছে। এ জাতীয় গুজব অনেকের অন্তরেই বদ্ধমূল হয়ে ডালপালা বিস্তার করে এবং তারা আপনাকে নিয়ে বিভিন্ন কিছু ভাবতে থাকে। অথচ এসব ভাবনার ভিত্তিই সম্পূর্ণ অবান্তর। মাঝে মধ্যে শোনা যায়, অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। তখন সে ব্যাপারে কথা বলার আগে সংবাদটা বাস্তব কিনা, তা নিশ্চিত হয়ে নিন। এতে তার কাছে আপনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর এটিই হলো নবীজীর সুন্নাত।

একবার জনৈক ব্যক্তি নবীজীর কাছে এলো। নবীজী লক্ষ করলেন, লোকটির বেশভূষা জরাজীর্ণ, চুল এলোমেলো, অগোছালো। নবীজী তাকে শোধরানোর জন্য কিছু নসীহত করবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করলেন, লোকটি দরিদ্র হতে পারে, হতে পারে সহায়-সম্বলহীন, অসহায়। তাই নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোনো সম্পত্তি আছে?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, আছে।'

‘কী ধরণের সম্পদ আছে?’

‘উট-ঘোড়া, ভেড়া-বকরি সবই আছে।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যেহেতু আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তাই তোমার মাঝে যেন তাঁর নিদর্শন থাকে।’ তারপর বললেন, ‘তোমাদের উটগুলো তো নিখুঁত অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করে। তারপর তোমরা ক্ষুর দিয়ে সেগুলোর কান কেটে ফেলো। আর বলো, এটি হলো “বুহাইরা”। অথবা তার শরীরে বা চামড়ার কোনো জায়গায় ছিদ্র করে ফেলো। আর বলো, এটা হলো “ছুরম”। সুতরাং এগুলোর কোনোটাই খাওয়া যাবে না।’

সে বললো, ‘হ্যাঁ, আমরা তো এমনই করি।’

রাসূল তখন বললেন, ‘তাহলে আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা তো অবশ্যই তোমার জন্য বৈধ হবে। আর মনে রেখো, আল্লাহর ক্ষুর কিন্তু আরো অনেক ধারালো!’ [মুসতাদরাকে হাকীম: ৭৪৭১]

নবম হিজরীতে আরব ও অন্যান্য জনপদের বিভিন্ন গোত্র থেকে তাদের প্রতিনিধিরা রাসূলের নিকট আসতো। কেউ তো মুসলমান হয়ে আসতো। তারা এসে বাইয়াত গ্রহণ করতো। আবার কিছু লোক আসতো কাফির অবস্থাতেই। তারা এসে ইসলাম গ্রহণ করতো কিংবা সন্ধি করে চলে যেতো। একদিন রাসূল সাহাবীদের নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় দশ-বারোজন লোক এলো। তারা রাসূলের মজলিসে এসে বসলো। কিন্তু সালাম দিলো না। রাসূল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি

মুসলমান?'

তারা বললো, 'হ্যাঁ, আমরা মুসলমান।'

রাসূল বললেন, 'তবে তোমরা সালাম দিলে না যে?'

এরপর তারা দাঁড়িয়ে সালাম দিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিয়ে তাদের বসতে বললেন। তারা বসলো এবং নামাযের সময় সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলো। দেখুন, নবীজী আগে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন, তারা মুসলমান কিনা।

হযরত ওমর রাযি.-এর যুগের ঘটনা। ইসলামী ভূখণ্ড বিশাল বিস্তৃতি লাভ করেছে। হযরত ওমর রাযি. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। কুফাবাসী তখন তাদের রাজ্যে গোলযোগ করছিলো। তাদের একটা দল হযরত ওমরের নিকট সা'দের ব্যাপারে অভিযোগ করে চিঠি লিখলো। চিঠিতে তারা তার অনেক দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করলো। এমনকি এ কথাও লিখলো যে, তিনি নামাযে যত্নবান নন! হযরত ওমর রাযি. চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না এবং নসীহত ও নির্দেশাবলী লিখতেও শুরু করলেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে একটি চিঠি দিয়ে সা'দের কাছে পাঠালেন এবং তার সঙ্গে সফর করে মানুষের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা সা'দের নিকট পৌঁছে খলীফার ফরমান শোনালেন। এরপর তার সঙ্গে বিভিন্ন মসজিদে নামায পড়তে লাগলেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার ব্যাপারে জানতে শুরু করলেন। মুসল্লীরা সকলেই তার

সুনাম করলো। অবশেষে তারা বনু আবসের একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা এখানকার মানুষের কাছে তাদের গভর্নর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই তার সর্বোচ্চ প্রশংসা করলো। মুহাম্মাদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা তার ব্যাপারে ভিন্ন কিছু জেনে থাকলে বলো।' সকলেই বললো, 'আমরা যা বলেছি, ঠিক বলেছি। আমরা তাকে ন্যায়পরায়ণ গভর্নর হিসেবেই পেয়েছি।'

তিনি আবার ভালোভাবে তাদের জিজ্ঞেস করলেন। তখন মসজিদের শেষ প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়ালো। তার নাম ওসামা বিন কাতাদাহ। সে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি যখন শপথ করিয়ে জিজ্ঞেস করছেন তাহলে শুনুন, সা'দ সর্বক্ষেত্রে সমতা বিধান করে না এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে না!'

সা'দ অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি সমতা বিধান করি না! ন্যায়ভাবে বিচার করি না!'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, এমনই করেন।'

এ কথা শুনে সা'দ ফরিয়াদ করলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যা বলে থাকে, সস্তা খ্যাতি ও নাম-যশ কামানোর আশায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তার জীবনকাল দীর্ঘ করে দাও, তার দরিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং তাকে ফিতনার মুখোমুখি করো।' এরপর হযরত সা'দ রাযি. সেই মসজিদ থেকে চলে এলেন এবং মদীনায় ফিরে গেলেন। এ ঘটনার কয়েক বছর পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

অপরদিকে সেই লোকটি সা'দের বদদোয়ার ফল ভোগ করতে লাগলো। তার দুর্বিষহ জীবন দীর্ঘায়িত হলো, পিঠ কুঁজো হয়ে গেলো, অস্থি-মজ্জা দুর্বল হয়ে পড়লো। বার্ধক্যের ভারে তার ভ্রূযুগল ঝুলে পড়লো। দীর্ঘ জীবনের যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে গেলো। এছাড়া প্রচণ্ড দরিদ্রতা তাকে ঘিরে ধরলো। সে রাস্তায় বসে মানুষের কাছে ভিক্ষা করতো। যখনই তার নিকট দিয়ে মহিলারা পথ অতিক্রম করতো সে তাদের দিকে হাত প্রসারিত করে দিতো এবং তাদের পথ আগলে দাঁড়াতো। এ অবস্থা দেখে মানুষ তাকে নিয়ে হৈচৈ করতো এবং তাকে গালিগালাজ করতো। সে আফসোস করে বলতো, 'হায়, আমার কী আর করার আছে!' 'সৎ ও মহৎ গভর্নর সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বদদোয়া আমাকে শেষ করে ফেলেছে!'

**নববী সতর্কবাণী...**

শুধু ধারণায় বিশ্বাস খুবই নিকৃষ্ট। যা শুনেছি তাই বলা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। [সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২১ ও ৪৩৪০]

# ৪০. শাসনের প্রয়োজনে কোমল পদ্ধতি গ্রহণ করুন

আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কাউকে কখনো শাসন করা যাবে না। মাঝে মধ্যেই ছেলে-সন্তান, স্ত্রী কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে সতর্ক করতে হয়। কৃত ভুলের জন্য তিরস্কার করতে হয়, কিছু বলতে হয়। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা সহনীয় পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চড়াও না হয়ে একটু সময় দিতে হবে, যেন সে তার ভুল উপলব্ধি করতে পারে।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। আরবদের মাঝে নবীজীর মর্যাদা তখন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মক্কার অধিকাংশ মানুষ ততদিনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেই মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধে বের হলেন। মুশরিকরা সুসংহত বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলো। তাদের প্রথম সারিতে ছিলো অশ্বারোহী দল। এরপর পদাতিক বাহিনী। এরপর নারী ও শিশুদের কাতার। সবশেষে ভেড়া-বকরি ও গবাদি পশুর পাল। অন্যদিকে মুসলিম বাহিনীতেও সৈন্য-সংখ্যা ছিলো প্রচুর। বারো হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী।

মুশরিকরা আগে ভাগেই হুনাইন প্রান্তরে চলে এলো এবং তারা তাদের দক্ষ তীরন্দাজ বাহিনীকে পাহাড়ে মোতায়েন করে রাখলো। যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনী হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে কাফির বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে বৃষ্টির মত

তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। মুহূর্তে মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। শক্তিধর, বলিষ্ঠ আরবী ঘোড়াগুলো জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। মুসলিম বাহিনী বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। সর্বাগ্রে পলায়ন করলো বেদুঈন সৈন্যরা। অল্পক্ষণেই অমুসলিম বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। আল্লাহর রাসূল দেখতে পেলেন, মুসলিম সৈন্যদল পালিয়ে যাচ্ছে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে, পলায়নপর অশ্বদল দিগ্বিদিক ছুটছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি.-কে মুহাজির ও আনসার বাহিনীর নাম ধরে আহ্বান করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর আহ্বানে প্রায় সত্তর-আশিজন মুসলিম সৈন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ পাকের নুসরত শামিলে হাল হলো। মুসলিম বাহিনীর বিজয়-তাকবীরে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এরপর নবীজীর সম্মুখে গনীমতের মাল একত্রিত করা হলো। দেখা গেলো, যারা রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়েছিলো, তীর-বর্শার ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো, তারাই গনীমত প্রাপ্তির আশায় সবার পূর্বে রাসূলের সামনে হাজির! বেদুঈনরা পালিয়েছিলো সবার আগে। তারাই এখন রাসূলকে ঘিরে ধরে বলছে, ‘আমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দিন। আমাদের প্রাপ্য গনীমত আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিন।’

নবীজী তখন বলতে পারতেন, আশ্চর্য! তোমরা বলছো ‘আমাদের যুদ্ধলব্ধ অংশ’! অথচ তোমরা তো যুদ্ধই করোনি। তোমরা এখন গনীমতের অধিকার

দাবি করছো অথচ রণাঙ্গনে যখন চিৎকার করে তোমাদের আহ্বান করা হয়েছিলো তখন তোমরা সাড়া না দিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়েছিলে। আর এখন বলছো ‘আমাদের গনীমত’! কিন্তু তিনি তা বলেননি। তাদের কঠোর তিরস্কারও করেননি। জগত ও জগত-সম্পদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে সামান্য মোহও ছিলো না।

তারা রাসূলকে চারদিক হতে ঘিরে ফেললো। চারপাশে ভিড় করে চলার পথ রুদ্ধ করে দিলো। বারবার বলতে লাগলো, ‘আমাদের গনীমত বণ্টন করে দিন।’ তারা নবীজীকে একটি বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেলো। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে নবীজী বৃক্ষটির পাশ ঘেষে অতিক্রম করলেন। নবীজীর চাদর বৃক্ষটির ডালে আটকে গেলো এবং চাদর কাঁধ থেকে পড়ে গেলো। শরীরের ঊর্ধ্বাংশের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও তিনি রাগ করলেন না। তিনি তাদের সকলের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং সম্পূর্ণ শান্ত ও কোমল স্বরে বললেন, ‘হে লোকসকল! আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আমার কাছে যদি তিহামা অঞ্চলের বৃক্ষরাজি পরিমাণ ভেড়া-বকরিও থাকতো, আমি তা সব তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। কখনো তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু কিংবা মিথ্যাবাদীরূপে পাবে না।’

হ্যাঁ, নবীজী সত্য বলেছেন। তিনি কৃপণ ও ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। কৃপণ হলে তিনি সব সম্পদ নিজের জন্য রেখে দিতেন। তিনি ভীরু কিংবা কাপুরুষ ছিলেন না। ভীরু হলে তো তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতেন। তিনি মিথ্যুক বা প্রতারক ছিলেন না। মিথ্যাবাদী হলে মহান আল্লাহ কিছুতেই

তাঁকে সাহায্য করতেন না। নবী-জীবনে সহনশীলতার এরূপ প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

আরেকদিনের ঘটনা। নবীজী কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জনৈক মহিলাকে তার শিশু সন্তানের কবরের পাশে কাঁদতে দেখলেন। নবীজী তাকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।' মহিলাটি ক্ষীণস্বরে কাঁদছিলো। সে নবীজীকে চিনতে পারলো না। তাই সে বলে ফেললো, 'যান এখান থেকে! আপনি আমার মুসিবতের কী বুঝবেন?'

নবীজী তাকে আর কিছু বললেন না। তাকে সেভাবেই রেখে চুপচাপ চলে এলেন। তিনি তো তার দায়িত্ব আদায় করেছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মহিলাটির মনের এখন যে অবস্থা, তাতে এখন তাঁকে এর চেয়ে বেশি নসীহত করা সমীচীন হবে না। এদিকে কয়েকজন সাহাবী মহিলাকে গিয়ে বললো, 'এ কী বললে তুমি? তিনি তো ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' মহিলাটি তখন অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং নবীজীর কাছে এসে বিনীতভাবে ওযর পেশ করে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আমি এখন ধৈর্য ধারণ করবো।' নবীজী বললেন, 'ধৈর্য ধারণ তো করতে হয় বিপদের প্রথম মুহূর্তেই।' [সহীহ বুখারী: ১২০৩, সহীহ মুসলিম: ১৫৩৫]

***কোমলতা সব কাজে...***

নবীজী বলেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজের জন্য সুন্দরতম পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাউকে হত্যা করতে হলে সেক্ষেত্রেও সুন্দরতম (অর্থাৎ তুলনামূলক কম কষ্টদায়ক) পন্থা অবলম্বন করবে। (চতুষ্পদ জন্তুকে) যবাই করতে হলে সুন্দরভাবে (অর্থাৎ তুলনামূলক কম কষ্টদায়ক পন্থায়) যবাই করবে। যবাইয়ের পূর্বে ছুরিতে শান দিয়ে নেবে, যেন যবাইয়ের সময় পশুর কষ্ট কম হয়। [সহীহ মুসলিম: ৩৬১৫]

# ৪১. দুশ্চিন্তা ও ঝামেলাকে এড়িয়ে চলুন

আমার মনে হয়, হাসপাতালে লোকটার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা হলে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই অন্তত দশ-বারোটা রোগ ধরা পড়বে। ন্যূনতম ডায়াবেটিস ও প্রেসার তো থাকবেই! অথচ বেচারা সারাদিন অন্যের রোগ-বালাই ও দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, আর অনর্থক মনঃকষ্টে ভোগে। এই হয়তো স্ত্রীর দোষ ধরে চেঁচামেচি করে বলছে—

'নতুন প্লেটটা ভেঙে ফেললি!'

'উঠানটা এখনো ঝাড়ু দিলি না!'

'হায়! হায়! আমার নতুন জামাটা আয়রন করে পুড়ে ফেললি!'

আবার ওদিকে সন্তানদের ব্যাপারে বিরক্ত স্বরে চেঁচাচ্ছে— 'খালিদ গাধাটা এখনো নামতাই শিখেনি!' 'সা'দের পরীক্ষা ভালো হয়নি! স্টার মার্ক অর্জন করতে পারেনি!' 'সারাহ আর হিনদ কী পড়াশোনা করবে? ওদের তো সেই একই অবস্থা!'

এই হলো তার ঘরের হাল, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তো অবস্থা আরো মারাত্মক! কেউ কোনো কৃপণের গল্প বললে সে বলবে, 'ও আমাকেই ইঙ্গিত করেছে।' 'গত রাতে আবু আহমদ পুরনো গাড়ির প্রসঙ্গ তুলে যে হাসাহাসি করলো, তা তো আমার গাড়ি নিয়েই।' এভাবে লোকটা সব নেতিবাচক বিষয় নিজের দিকেই টেনে আনে। কিছু জিনিস এড়িয়ে না গিয়ে নিজের ঘাড়ে বিপদ

ডেকে আনে। প্রবাদে আছে, 'সময় তোমার অনুকূলে না হলে নীরবে সয়ে যাও। নিজেকে সময়ের অনুগামী করে নাও।'

মনে পড়ে, আমার এক বেদুঈন-বন্ধু তার দাদার কাছ থেকে শেখা একটি প্রবাদ বাক্য প্রায়ই আমাকে শোনাতো। যখনই আমি তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কিছু বলতে যেতাম, সে বারবার সেই প্রবাদ বাক্যটি আমাকে শোনাতো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলতো, 'শা-য়-খ! বক্র হাত বাঁকা রেখেই মোসাফাহা করুন!'

গভীরভাবে চিন্তা করলে আপনি দেখবেন, এটাই বাস্তব কথা। যদি আমরা কিছু ভুল-ত্রুটি মেনে নিতে অভ্যস্ত না হই, কখনো কখনো অন্ধ সেজে ঘটনা-প্রবাহকে চলতে না দিই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়গুলো নিয়েও সিরিয়াস হয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে, একসময় আমরাই হেরে গেছি। আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কবি কতো চমৎকার বলেছেন—

নির্বোধ কভু হয় না জানি শ্রেষ্ঠ জাতির নেতা

তবু শ্রেষ্ঠ নেতাকে হতে হয় কভু নির্বোধ অভিনেতা।

সুদর্শন এক যুবক উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী খুঁজে নিতে নিজ মুরব্বীর শরণাপন্ন হলো। তার প্রত্যাশা, স্ত্রী হবে তার জীবন-সফরের আমৃত্যু সহযাত্রী। মুরব্বী যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্ত্রীর মাঝে কী ধরণের গুণাবলী তুমি কামনা করো?' যুবক বললো, 'তার রূপ হবে কমনীয়-দীপ্তিময়, দেহগঠন প্রলম্বিত-লাবণ্যময়, কেশগুচ্ছ মসৃণ-স্নিগ্ধময়। সে হবে সুদর্শিনী, প্রিয়ভাষিণী। তাকে দেখলে আমার হৃদয় জুড়াবে, তার সান্নিধ্যে আমার ক্লান্তি হারাবে।'

'আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। কিছুতেই সে আমার অবাধ্য হবে না। তার পক্ষ থেকে থাকবে না কোনো দুষ্ট-শঙ্কা কিংবা ক্ষতির কোনো আশঙ্কা। সে হবে ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী, পরিমিত প্রজ্ঞার অধিকারী।' এভাবে নারী জাতি যেসব গুণের অধিকারী হতে পারে, সবই সে উল্লেখ করলো এবং তার স্ত্রীর মাঝে সবগুলোর সন্নিবেশ কামনা করলো। একপর্যায়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে মুরব্বী বললেন, 'থামো, থামো বাছাধন! আমার কাছে তার সন্ধান আছে।'

খুশিতে বাগবাগ হয়ে যুবক জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়? কোথায় পাবো তাকে?' শান্তভাবে মুরব্বী বললেন, 'পাবে, কেবল জান্নাতেই তুমি এমন নারী পাবে! আর এ জগত-সংসারে মানুষের কিছু ত্রুটি, কিছু অপূর্ণতা মেনে নিতে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রেখো।'

হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে মানুষের ভুল-ত্রুটি মেনে নিতে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। সহনশীল হোন। শুধু শুধু নিজের ঘাড়ে দুশ্চিন্তার বিপদ টেনে আনবেন না। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বালা খুঁজে ফিরবেন না। তাদের মতো হবেন না, যারা স্বেচ্ছায় দুঃখকে খুঁজে নেয়। যারা হঠাৎ কখনো পাশের কাউকে বলে ওঠে, 'তুমি আমাকে উদ্দেশ্য করেই এসব কথা বলেছো।' কখনো সন্তানকে বলে ফেলে, 'অলসতা করে তুই আমাকে কষ্ট দিতে চাস।' কখনো স্ত্রীকে সামান্য বিষয়ে বলে বসে, 'তুমি এসব করে সংসার ধ্বংস করতে চাচ্ছো।' কেন? কী দরকার এত সব বলার? একটু সহনশীল হোন। কিছু বিষয় মেনে নিন।

নবীজী মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি সয়ে নিতেন। তাই তাঁর জীবন ছিলো সুন্দর ও সুখময়। কখনো এমন হতো যে, ভরদুপুরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি বাড়িতে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'ঘরে কি খাওয়ার কিছু আছে?' তারা বলতো, 'না, কিছুই নেই।' নবীজী বলতেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে! আমি তাহলে রোযা রাখছি।' [সুনানে নাসায়ী: ২২৮৯]

একে কেন্দ্র করে তিনি কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করতেন না, ঘর-দোর মাথায় তুলতেন না। চেঁচিয়ে বলতেন না, 'আমাকে জানালে না কেন? জানালে তো কিছু কিনে আনতাম।' তিনি কেবল বলতেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে! আমি তো রোযাদার।' ব্যাস, সব সমস্যার সমাধান!

নবীজী কাজে-কর্মে মানুষের সঙ্গে পূর্ণ সহনশীলতার পরিচয় দিতেন। কুলসুম বিন হুসাইন ছিলেন উঁচু মাপের সাহাবীদের একজন। তিনি বলেন, রাসূলের সঙ্গে আমি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাবুকের সফরে কোনো এক রাতে আমরা উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলছিলাম। সেই রাতে আমাদের সফর অনেক দীর্ঘ হলো। ফলে আমরা অনেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। চলার পথে প্রায়ই আমার উট নবীজীর উটের সঙ্গে ধাক্কা লাগার উপক্রম হতো। আমি হঠাৎ জেগে উঠে নিজের উট দূরে সরিয়ে নিতাম, যেন আমার উটের জিন নবীজীর পায়ে লেগে না যায়।

মাঝপথে একপর্যায়ে আমি চলতে চলতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। নবীজীর উটের সঙ্গে আমার উট গায়ে গায়ে লেগে গেলো এবং এর ফলে নবীজী পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। ব্যথার চোটে নবীজীর মোবারক বচন হতে 'উফ!'

কাতর ধ্বনি উচ্চারিত হতেই আমার ঘুম টুটে গেলো। আমি অস্থির চিত্তে আরয করলাম, 'আল্লাহর রাসূল! আমাকে ক্ষমা করে দিন।' ক্ষমার আধার, করুণার নবী পূর্ণ শান্তভাবে বললেন, 'চলো, সামনে চলো... কী হয়েছে? কিছুই তো হয়নি!'

হ্যাঁ, 'চলো, সামনে চলো!' কোনো অভিযোগ তিনি করলেন না। রাগ করে বললেন না, 'কেন এত এদিক চলে এলে? রাস্তা তো অনেক প্রশস্ত, কেন এদিকে চেপে গিয়ে আমাকে কষ্ট দিলে?' কোনো অভিযোগই তিনি করেননি। অযথা বিরক্তি ও মনঃকষ্ট নিজের ওপর চাপিয়ে নেননি। পায়ে একটু সামান্য আঘাতই তো! নীরবে সহ্য করেছেন, পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন। ব্যাস, এখানেই সব কিছু মিটমাট। এটিই ছিলো মানবতার দিশারি মহানবীর স্বভাবজাত আদর্শ।

একদিন তিনি সাহাবীদের মাঝে বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে জনৈকা মহিলা একটি চাদর নিয়ে এলো। আরয করলো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি নিজ হাতে এ চাদরটি বুনেছি। আমার হৃদয়ের তামান্না, আপনি এটা পরিধান করবেন।' নবীজীর তখন একটি চাদরের বড় প্রয়োজন ছিলো। তিনি খুশি মনে চাদরটি গ্রহণ করলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে লুঙ্গির মতো করে পরিধান করে বের হলেন।

উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! চাদরটি আমাকে দিয়ে দিন।' নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও!' তিনি আবারও ঘরে প্রবেশ করলেন। পুরনো লুঙ্গিটি পরিধান করে নতুনটি খুলে

নিলেন এবং সুন্দরভাবে ভাঁজ করে সেই সাহাবীকে দিয়ে দিলেন। নবীজী বিরক্ত হলেন না। এটাকে অনভিপ্রেত কোনো ঝামেলা মনে করলেন না। উপস্থিত সকলেই তাকে বললেন, 'বাহ! নবীজী কোনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না, এটা জেনেই তো তুমি চাদরটি চেয়েছো, তাই না?' সাহাবী বললেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলের বরকতময় চাদর মৃত্যুকালে আমার কাফন হবে—কেবল এই প্রত্যাশায়ই আমি চাদরটি চেয়েছি।' [সহীহ বুখারী: ১১৯৮] অবশেষে তিনি যখন মারা গেলেন, প্রিয় নবীজীর মোবারক সেই চাদরটি গায়ে জড়িয়ে তাঁকে দাফন করা হলো। কত সুন্দর আচরণ! কত চমৎকার ব্যবহার! মানব-হৃদয়-রাজ্য এমন করেই তো জয় করতে হয়। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এমন করেই তো অর্জন করতে হয়।

আরেকদিনের ঘটনা। নবীজী সাহাবীদের নিয়ে এশার নামাযে দাঁড়ালেন। ইত্যবসরে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর পুত্রদ্বয় শিশু হাসান ও হোসাইন মসজিদে প্রবেশ করলো। হাঁটতে হাঁটতে তারা নানাজি রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেলো। নবীজী সাহাবীদের ইমামতি করছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, হাসান ও হোসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসলো। সেজদা থেকে ওঠার সময় তিনি কোমলভাবে তাদের নামিয়ে পাশে বসিয়ে দিলেন। আবার যখন সেজদা করলেন, আবার তারা পিঠে উঠে বসে পড়লো। এভাবে তিনি নামায সমাপ্ত করলেন। এরপর আদর করে তাদের কোলে তুলে নিলেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! দিন, তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে দিয়ে আসি।' নবীজী সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না। বরং তাদেরকে নিজের কোলে বসিয়ে

আদর-সোহাগ করলেন। কিছুক্ষণ পর আকাশে বিজলি চমকে উঠলো নবীজী বললেন, 'চলো, চলো, ঘরে মায়ের কাছে চলো।' তারা উঠে তাদের মায়ের কাছে চলে গেলো। [মুসনাদে আহমদ: ১০২৪৬]

আরেক দিনের কথা। নবীজী হাসান বা হোসাইনকে কোলে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সময় সাহাবীদের কাছে এলেন। এরপর নামাযের ওয়াক্ত হলে তাকে পাশে রেখে নবীজী নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। রুকু করলেন, সেজদা করলেন। কিন্তু সেজদা থেকে আর উঠলেন না। দীর্ঘ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদারত থাকায় সাহাবীগণ ভয় পেয়ে গেলেন, রাসূলের না জানি কী হয়ে গেলো! দীর্ঘ সেজদার পর নবীজী মাথা তুললেন। সেজদা থেকে উঠলেন, নামায শেষ করলেন। নামাযান্তে সাহাবীগণ আরয করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি আজকের মত এত দীর্ঘ সেজদা কখনো করেননি। কী হয়েছিলো? নতুন কোনো বিধান কি এসেছে? সেজদায় থাকাকালীন কি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে?' নবীজী বললেন, 'না, তা নয়। আমার এই নাতিটি ঘাড়ে চড়ে বসেছিলো। আমি চাইনি যে, ওর কষ্ট হোক, ও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেমে পড়ুক। এজন্য কিছু সময় বিলম্ব করেছি।' [সুনানে নাসায়ী: ১১২৯, মুসতাদরাকে হাকীম: ৪৭৫৯]

একদিন নবীজী উম্মে হানীর ঘরে আগমন করলেন। নবীজী ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে কি কোনো খাবার আছে?' উম্মে হানী বললেন, 'কয়েক টুকরো শুকনো রুটি ছাড়া কিছুই নেই। আপনার সামনে তা পেশ করতে বড় সঙ্কোচ লাগছে।' নবীজী বললেন, 'তা-ই নিয়ে এসো।' উম্মে

হানী শুকনো রুটি নিয়ে এলেন। নবীজী তা লবণাক্ত পানিতে ভিজিয়ে খেতে লাগলেন। উম্মে হানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তরকারি-ঝোল কিছুই কি নেই?’ উম্মে হানী বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! কিছু সিরকা আছে।’ নবীজী বললেন, ‘নিয়ে এসো।’ উম্মে হানী সিরকা নিয়ে এলেন। নবীজী সিরকা-রুটি দিয়েই আহার সমাপ্ত করলেন। এরপর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, ‘সিরকা কত উত্তম ব্যঞ্জন!’ [আল মু'জামুল আওসাত, তাবারানী: ৭১২৭] হ্যাঁ, নবীজী এমনই সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। জীবনের ঘটনা-প্রবাহকে তাকদীরের ফায়সালা হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতেন।

নবীজী একদিন সাহাবীদের নিয়ে হজের সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে যাত্রাবিরতি হলো। নবীজী জরুরত সেরে অযু করে নামাযে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর জাবের বিন আবদুল্লাহ এলেন। নামাযের নিয়ত করে তিনি রাসূলের বামপাশে দাঁড়ালেন। নবীজী আলতোভাবে তাঁর হাত ধরে তাঁকে ডান পাশে নিয়ে এলেন এবং উভয়ে নামায পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর জাব্বার বিন সখর অযু করে নবীজীর বামপাশে এসে দাঁড়ালেন। নবীজী এবার আলতোভাবে উভয়কে পেছনে সরিয়ে দিলেন। [সহীহ মুসলিম: ৫৩২৮] এভাবেই তিনি বিরক্ত না হয়ে সুন্দরভাবে উভয়কে নামাযের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

একদিন নবীজী কোথাও উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মে কায়স বিনতে মুহসিন তার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার তামান্না—নবীজী বাচ্চাটির

মুখে বরকতস্বরূপ প্রথম খাবার তুলে দেবেন এবং বাচ্চার কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন। নবীজী বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলেন। কিছু সময় না যেতেই অবুঝ শিশু নবীজীর কোলে পেশাব করে দিলো। নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদ সব ভিজিয়ে ফেললো। নবীজী স্থির থাকলেন। একটু পানি নিয়ে আসার জন্য বললেন। কেউ একজন পানি নিয়ে এলে তিনি নিজ হাতে নাপাকি ধুয়ে নিলেন। [সহীহ বুখারী: ২১৬] ব্যাস, বিষয়টি এখানেই শেষ। তিনি না রাগান্বিত হলেন, না বিরক্তভাব প্রকাশ করলেন।

তাহলে আমরা কেন তিলকে তাল বানাবো, আর কেন নিজেদের কষ্ট দেবো? এ কথা ভাবার কোনোই যুক্তি নেই যে, আমার আশপাশের ঘটনা-প্রবাহ একশত ভাগ আমার মনমতো হবে। কবি কী বলেছেন দেখুন—

কারো যদি কভু দোষ পান, সহজেই করে দিন তার সমাধান

দোষ হতে কে মুক্ত বলুন, মুক্ত কেবল যে আল্লাহ মহান।

অনেক মানুষ আছে, মাছি মারতে কামান দাগায়। তুচ্ছ বিষয়কে বিশাল বানিয়ে দেয়। কতেক পিতা-মাতাও মাঝে মাঝে এ ধরণের কাণ্ড ঘটায়। কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাও কখনো কখনো এ জাতীয় আচরণ করে। আসলে এটা মোটেও উচিত নয়। কিছু ভুল দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। গোপন দোষ মোটেও তালাশ করা যাবে না। অন্যের ওযর-আপত্তি, ভুল-ত্রুটি মেনে নিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। বিশেষ করে যে আপনার কাছে ওযর পেশ করে, ক্ষমা চায়; আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে রক্ষা

করুন, সহানুভূতিশীল হোন, নিঃস্বার্থভাবে তাকে ক্ষমা করে দিন। কবি বলেন—

যে এসেছে নত শিরে, করে নিন তার ওযর গ্রহণ

সত্য বলুক, মিথ্যা বলুক; করুন তাকে প্রাণের আপন

পেছনে সে মন্দ বলুক, সামনে তো সে ‘ভেজা বিড়াল’

কাছে এলে তো ‘সালাম, সালাম’! হোক না শত্রু, হলে আড়াল।

একদিন নবীজী মিম্বরে উঠে বসলেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশে বয়ান করলেন। সেদিন তিনি এত উঁচু আওয়াজে বয়ান করলেন যে, গৃহাভ্যন্তরের বৃদ্ধা নারীরাও তা শুনতে পেলো। দেখুন, নবীজী কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, ‘হে লোকসকল! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছো, এখনো সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করোনি, তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি—সাবধান! কোনো মুসলমানের গীবত করো না, দোষ তালাশ করো না। কারণ যে অন্যের দোষ খুঁজে ফেরে, আল্লাহ তার দোষ উন্মোচন করে দেন। আর শুনে রাখো, আল্লাহ কারো দোষ উন্মোচন করলে সে যেখানেই থাকুক তার নিস্তার নাই, অবশ্যই সে লাঞ্ছিত হবে।’ [মুসনাদে আহমদ: ১৮৯৬৩]

হ্যাঁ, তাই কারো দোষ খুঁজবেন না। কারো গোপন বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। কিছু বিষয় এড়িয়ে চলুন। ক্ষমাশীল হোন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রশান্ত, সুশৃঙ্খল সে মজলিসে যে-ই বসে, নববী উচ্চারণ ও আহ্বানে তার দেহ-মন

সিক্ত হয়। সাহাবীদের লক্ষ্য করে নবীজী বললেন, ‘শোনো, তোমরা কেউ আমার কাছে আমার কোনো সাহাবীর দোষ বলো না। আমি প্রশান্ত হৃদয়ে তোমাদের থেকে বিদায় নিতে চাই।’ [সুনানে আবু দাউদ: ৪২১৮, সুনানে তিরমিযী: ৩৮৩১]

**নিজেকে কষ্ট না দিই...**

পথের ধূলো না উড়িয়ে শান্ত জায়গায় থাকতে দিন
উড়ে এসে গায়ে লাগলে আস্তিনে নাক ঢেকে নিন...
জীবনকে এভাবেই উপভোগ করুন। কষ্ট ভুলে জীবনটাকে উপভোগের বানিয়ে নিন।

# ৪২. ভুল করেছেন! স্বীকার করে নিন!!

অনেক সময় দু'জন ব্যক্তির মাঝে দীর্ঘদিন শত্রুতা জিইয়ে থাকে। এক বছর, দু' বছর কখনো বা আজীবন। অথচ একটি মাত্র কথায় সব মিটমাট হয়ে যেতে পারে। একজন শুধু বললেই হয়, 'আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন।' কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন, অসঙ্গত ঠাট্টা-মশকরা করেছেন, কাউকে অনুচিত কোনো কথা বলে ফেলেছেন, এর প্রতিক্রিয়ার ছাইচাপা আগুন জ্বলে ওঠার পূর্বেই নিভিয়ে ফেলুন। বিনয়ের সঙ্গে বলুন, 'আমি দুঃখিত, আসলে আমারই ভুল হয়েছে।' এই ছোট্ট একটি কথা বলে আপনি সম্ভাব্য অনেক মনঃকষ্ট থেকে বেঁচে যাবেন এবং মানসিক প্রশান্তি অনুভব করবেন। কতো ভালো হতো যদি আমরা বিনয়ের সঙ্গে এই কথাগুলো বলতে শিখতাম!

একবার হযরত আবু জর রাযি. ও হযরত বেলাল রাযি.-এর মাঝে কোনো বিষয়ে তর্ক হলো। রাসূলের মহান সাহাবী হলেও তারাও তো মাটিরই মানুষ। একপর্যায়ে হযরত আবু জর রাগের বশে বেলালকে বলে বসলেন, 'বেটা! কালো ঘরের সন্তান!' হযরত বেলাল রাসূলের দরবারে গিয়ে অভিযোগ করলেন। নবীজী আবু জরকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাকে গালি দিয়েছো?'

হযরত আবু জর বললেন, 'হ্যাঁ'।

নবীজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তার মায়ের কথা উল্লেখ করে...?'

হযরত আবু জর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! কেউ কাউকে গালি দিলে তো

বাবা-মায়ের নাম নিয়েই গালি দেয়!'

নবীজী এবার বললেন, 'আবু জর! তোমার মাঝে তো জাহেলী যুগের প্রভাব রয়ে গেছে।' [সহীহ মুসলিম: ৩১৩৯]

এ কথা শুনে হযরত আবু জর রাযি.-এর চেহারার রঙ পাল্টে গেলো। তিনি বললেন, 'এই বার্ধক্যের সময়ও আমার মাঝে জাহেলিয়াত রয়ে গেছে?!' নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ'। এরপর নবীজী আবু জরকে অধীনস্থ ও অপেক্ষাকৃত ছোটদের সঙ্গে আচার-আচরণের রূপ ও পদ্ধতি বাতলে দিলেন। নবীজী বললেন, 'শোনো, তারা তোমাদের ভাই, মহান আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব অধীনস্থ ভাইটির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। তুমি যা খাবে, তাকেও তা খাওয়াবে। তুমি যে মানের কাপড় পরিধান করবে তাকেও সে মানের কাপড় পরিধান করাবে। সাধ্যাতীত কাজের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে না। কাজ করতে তার কষ্ট হলে নিজে তাকে সহায়তা করবে।'

এরপর হযরত আবু জর কী করলেন? সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন হযরত বেলালের কাছে। নতজানু হয়ে হযরত বেলালের সামনে মাটিতে বসে পড়লেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নত হতে হতে নিজের চেহারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন, যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছেন! আর বললেন, 'বেলাল! আপনার পা দিয়ে আমার মুখ মাড়িয়ে দিন! আপনার পদধূলি আমার চেহারায় মিশিয়ে দিন!'

আল্লাহু আকবার! শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত হওয়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলতে সাহাবীদের হৃদয় ও মন সদা এমনই ব্যাকুল ছিলো। কখনো কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হলে কিছুতেই তারা তা দীর্ঘায়িত হতে দিতেন না।

হযরত আবু বকর রাযি. ওমর রাযি.-এর সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা বলছিলেন। আবু বকর রাযি.-এর কোনো এক কথায় হযরত ওমর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর সীমাহীন লজ্জিত হলেন। আশঙ্কা করলেন, না জানি এই মনোমালিন্য দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ওমরের পেছনে। বললেন, 'ভাই! আমাকে ক্ষমা করে দিন।' হযরত ওমর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবু বকর আবারো করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত ওমর মুখ ফিরিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। হযরত আবু বকরও চলতে চলতে ওমরের দুয়ারে হাজির! কিন্তু ওমর তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পেরেশান আবু বকর ছুটে গেলেন রাসূলের দরবারে। দূর থেকেই নবীজী তাঁকে দেখলেন। দেখলেন, আবু বকরের চেহারায় বড় বিষণ্ণতার ছাপ। তাই বললেন, 'তোমাদের ভাই আবু বকর হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে।' তিনি এসে চুপচাপ নবীজীর কাছে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ না যেতেই হযরত ওমরও সেখানে হাজির। তিনি অনুতপ্ত, ভীষণ লজ্জিত। হ্যাঁ, এরাই নবীজীর মহান সাহাবী। মাটির মানুষ হয়েও সফেদ ও শুভ্র হৃদয়ের অধিকারী এক জান্নাতী কাফেলা। এরা ধন্য হয়েছেন নবীজীর সাহচর্যে, রাসূলের সোহবত-সান্নিধ্যে।

হযরত ওমর এসে সালাম দিয়ে রাসূলের মজলিসে বসলেন। তিনি রাসূলকে পুরো ঘটনা অবহিত করলেন। কীভাবে আবু বকর ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, কীভাবে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন—সব খুলে বললেন। সব শুনে নবীজী ওমরের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। নবীজীর অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'হুজুর! আসলে আমিই ভুল করেছি। আমিই যুলুম করেছি। ওমরের কোনো দোষ নেই। ভুল আমিই করেছি, যুলুম আমিই করেছি।' এভাবে তিনি হযরত ওমরকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বারবার তাঁর পক্ষ হয়ে ওযরখাহী করতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ খুললেন। তিনি বললেন, « هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ» অর্থ: 'তোমরা কি আমার বন্ধুর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে? তোমরা কি আমার বন্ধুর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেবে? হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে দ্বীনের পথে, হিদায়াতের পথে আহ্বান করেছিলাম। তোমরা সকলে সেদিন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে। কেবল এই আবু বকর আমাকে সত্যায়ন করেছিলো।' [সহীহ বুখারী: ৪২৭৪]

আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন। আপনি তাদের মতো হবেন না, যারা অন্যের সংশোধন করতে গিয়ে নিজেই সংশোধন-উপযুক্ত হয়ে যায়, যারা গাধার মত চরকির চারপাশে অনবরত ঘুরতে থাকে, কিন্তু কোনো সমাধান বা গন্তব্য খুঁজে পায় না। আপনি যদি কারো দায়িত্বশীল কিংবা অনুসরণীয় হন;

শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের, স্বামী হিসেবে স্ত্রীর কিংবা পিতা বা মাতা হিসেবে সন্তানের তত্ত্বাবধান করেন তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন, আপনার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি ও নড়াচড়ার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। সবাই আপনার প্রতিটি কাজ মনিটরিং করছে। তাই সবসময় সুশৃঙ্খল চলাফেরা করুন।

খলীফা ওমর একবার ইসলামী রাষ্ট্রের সকল জনগণের মাঝে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হতে কাপড় বিতরণ করলেন। প্রত্যেকে এক টুকরো করে কাপড় পেলো, যা দিয়ে শুধু লুঙ্গি কিংবা শুধু চাদরের কাজ চালানো যায়। পরবর্তী জুমার দিন মিম্বরে উঠে খুতবার প্রারম্ভে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর আমার (খলীফার) আনুগত্যকে আবশ্যক করেছেন।' এ কথা বলতেই শ্রোতাদের একজন দাঁড়িয়ে গেলো। সে বললো, 'আমরা আপনার কথা শুনবো না, আনুগত্যও করবো না!'

হতবাক খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?! কী হয়েছে?' লোকটি বললো, 'আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন অথচ নিজে নিয়েছেন দু'টি। দেখা যাচ্ছে, আপনার চাদর-লুঙ্গি দু'টিই নতুন। এই অসম বণ্টননীতি আমরা মেনে নিতে পারি না।' এ কথা শুনে হযরত ওমর উপস্থিত মুসল্লীদের প্রতি নজর বুলাতে লাগলেন। মনে হলো, তিনি কাউকে খুঁজছেন। পুত্র আবদুল্লাহর প্রতি নজর পড়তেই বললেন, 'আবদুল্লাহ! দাঁড়াও। বলো, তুমি কি আমাকে জুমার নামায পড়ানোর জন্য তোমার কাপড়টি দাওনি?' আবদুল্লাহ বিন ওমর বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছি।' এ কথা শুনে লোকটি শান্ত

হয়ে বসে পড়লো এবং বললো, ‘হ্যাঁ, এখন আমরা আপনার কথা শুনবো, অনুসরণ করবো।’

প্রিয় পাঠক! আমিও আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত যে, খলীফাতুল মুসলিমীনের সম্মুখে লোকটির অভিযোগ-পদ্ধতি মোটেও সুন্দর হয়নি। কিন্তু হযরত ওমরের আচরণ লক্ষ করুন। সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার কী আশ্চর্য পরাকাষ্ঠা! ধৈর্যের সঙ্গে কতো সহজে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং সকল উত্তেজনা ও সংশয়ের অবসান ঘটালেন।

অতএব, আপনি যদি মনে-প্রাণেই চান যে, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা-বোন সবাই আপনার উপদেশ গ্রহণ করুক, আপনার কথা মেনে চলুক, তাহলে একগুঁয়েমি না করে আপনাকেও কিছু উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। কিছু অভিযোগের সুন্দর সমাধান দেয়ার শক্তি আপনাকেও অর্জন করতে হবে।

জনৈক ভদ্রলোক প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলতো, ‘সন্তানদের প্রতি আরো যত্নবান হও। রান্নাবান্না ভালোভাবে করো।’ কখনো বা রাগ করে বলতো, ‘আর কত বার বলবো, বেডরুমটা গুছিয়ে রেখো? কথার মূল্য দাও না কেন?’ স্ত্রী বেচারী খুব শান্তভাবে কোমল স্বরে উত্তর দিতো, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই করে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যা বলেন তাই হবে।’

একদিন স্ত্রী তাকে বললো, ‘সামনে তো ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা, আপনি কাছে থাকলে ভালো হয়। বাইরে বন্ধুদের ওখানে দেরি না করে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।’ এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রেগে আগুন হয়ে

গেলো। বলতে লাগলো, ‘আমি পারবো না, আমার অবসর নেই। দেরি করবো, না তাড়াতাড়ি আসবো—এটা বলে দেয়ার তুমি কে? আমার বিষয়ে কখনো নাক গলাতে আসবে না!’ আচ্ছা, বলুন তো, এরপর মহিলাটি আর কোনো দিন তার স্বামীর কথা শুনবে? আর কোনো দিন মন থেকে তার কথা মেনে নেবে?

মনে রাখবেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা না করে নিজের দেয়ালের ছিদ্রই বন্ধ করে দেয়, যেন কেউ উঁকিঝুঁকি দেয়ার সুযোগই না পায়। কোনো কাজ করলে সেখানে কারো সন্দেহ করার অবকাশই রাখবেন না। সন্দেহপূর্ণ কিছু থাকলে নিজেই তা স্পষ্ট করে দিন।

একবার আলবেনিয়ায় একটি দাওয়াতি সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ এক সেমিনারের আহ্বান করা হয়েছিলো। সংগঠনের সভাপতি সেমিনারে উপস্থিত হলে আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, তার মুখে দাড়ির কোনো চিহ্নই নেই। আমরা একে অপরের দিকে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম। এ কী! একজন দায়ী, স্বীকৃত ও স্বনামধন্য একটি দাওয়াহ সংগঠনের সভাপতি, অথচ তার নিজের অবয়বে রাসূলের সুন্নত অনুপস্থিত! সেমিনার যখন শুরু হলো, একটু মুচকি হেসে তিনি বললেন, ‘প্রিয় সুধীবৃন্দ! আপনারা হয়তো আমার শ্মশ্রুবিহীন চেহারা দেখে অবাক হচ্ছেন। আসলে আমার দাড়ি উঠেইনি।’ এ কথা শোনামাত্র আমরা সবাই হেসে ফেললাম। আমাদের সব সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

এসব ক্ষেত্রে নবীজী কী করেছেন? চলুন, কিছুক্ষণের জন্য আমরা নবীর শহর মদীনা হতে ঘুরে আসি। আজকের আলো ঝলমলে মদীনায় নয়, চৌদ্দশ বছর পূর্বের নূরানী মদীনায়। পবিত্র রমযান মাসের নিঝুম রজনী। মসজিদে নববীতে নবীজী ইতেকাফে বসে আছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া রাযি. এলেন নবীজীর দরবারে। কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এত রাতে নবীজী তাঁকে একা ছাড়তে চাইলেন না। তাঁকে পৌঁছিয়ে দিতে নবীজী নিজেই রওয়ানা হলেন। উভয়ে পথ ধরে চলছিলেন। এরই মধ্যে দু'জন আনসারী সাহাবী তাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। নবীজী এবং উম্মুল মু'মিনীনকে দেখে তারা দ্রুত সামনে হাঁটতে শুরু করলেন। নবীজী তাদের ডাকলেন। ডেকে বললেন, ‘শোনো, আমার স্ত্রী সাফিয়া আমার সঙ্গে আছেন।’ তারা বললো, ‘সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে অপরিচিত নারী থাকবে— এমন সন্দেহ তো আমরা কিছুতেই করবো না।’ নবীজী বললেন, ‘শোনো, শয়তান রক্তপ্রবাহের ন্যায় মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। আমার আশঙ্কা হয়েছে, সে হয়তো কোনো বদ ধারণা তোমাদের অন্তরে ঢেলে দেবে।’ [সহীহ বুখারী: ৩০৩৯, সহীহ মুসলিম: ৪০৪০]

## সাহসিকতা...

কৃত ভুলের ওপর অটল থাকা সাহসিকতা নয়। প্রকৃত সাহসী তো সে-ই, যে ভুল স্বীকার করে নেয় এরপর ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না।

# ৪৩. ভুল শোধরানোর সঠিক পদ্ধতি

কেউ কোনো ভুল করলে তার সঙ্গে কী ধরণের আচরণ করতে হবে, সেটিও একটি স্বতন্ত্র শেখার বিষয়। মনে রাখবেন, প্রত্যেক বদ্ধ দুয়ার খোলার যেমন একটি চাবি আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে প্রবেশেরও আছে একটি সুন্দর পথ।

যখন কেউ বড় ধরণের কোনো ভুল করে ফেলে এবং বিষয়টি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে আর সবাই তাকে বিরক্ত বা হেনস্তা করার চেষ্টা করে, তখন আপনি কী করবেন? আপনি তখন সকলের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। এর ফলে আপনি বিষয়টি নিয়ে ভাবার এবং সমাধান করার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে পাবেন। এ সময়ের মধ্যে এমন কোনো ব্যবস্থা নিন যেন এ ধরণের কাজ ভবিষ্যতে কেউ না করে।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধ হতে ফেরার পথের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফেলার সাময়িক বিশ্রামের জন্য একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। এ সুযোগে মুহাজিরগণ জাহজাহ বিন মাসউদ নামক তাদের এক মজুরকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। আনসারগণও সিনান ইবনে জুহানীকে পাঠালেন পানি আনতে। পানির কূপের কাছে গিয়ে উভয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলেন এবং একপর্যায়ে একজন অপরজনকে পেছন থেকে সজোরে আঘাত করলেন।

অমনি জুহানী চিৎকার করে উঠলেন, ‘হে আনসারগণ! সাহায্য করো।’ জাহজাহও চিৎকার করে আহ্বান করলেন, ‘ওহে মুহাজিরগণ! সাহায্য করো।’

আনসারগণ ছুটে এলেন। ছুটে এলেন মুহাজিরগণও। সকলে যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। সবার কাছেই তীর-তলোয়ার। সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। একপর্যায়ে বিরোধ চরম আকার ধারণ করলো। এই পরিস্থিতিতে নবীজী ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। নবীজীর আগমনে পরিস্থিতি শান্ত হলো। কিন্তু ফুঁসে উঠলো বিষধর সাপ। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়লো মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল। সে বলতে লাগলো, ‘এ কী করে সম্ভব?! এত বড় দুঃসাহস ওরা কোথায় পেলো? ওরা আমাদের তুচ্ছ মনে করবে কেন? ওরা আমাদের ঘৃণা করবে কেন? আমরা তো ওদের থাকার জায়গা দিলাম! আপন সম্পদে ভাগীদার করলাম! এ জন্যই তো কথায় বলে, কুকুরকে ভালো খাইয়ে মোটাতাজা করলে শেষে তোমাকেই কামড়াবে, আর না খাইয়ে রাখলে সুবোধ বালকের মতো পেছনে ঘুরঘুর করবে।’ হতভাগা আরো বললো, ‘মদীনায় ফিরে দেখিয়ে দেবো। আমরা সম্মানীরা এসব ইতরগুলোকে এবার মদীনা হতে তাড়িয়ে দেবোই দেবো।’

দুর্ভাগা এরপর নিজের কওমের কিছু লোকের কাছে গিয়ে বললো, ‘এ কী করলে তোমরা? বিপদ নিজেদের ঘাড়ে টেনে নিলে! নিজেদের মাটিতে ওদের জায়গা দিলে। সহায়-সম্পত্তিতে ভাগ দিলে। আর এখন ওরাই আমাদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে। তোমরা জায়গা না দিলে ওরা অন্য

কোথাও চলে যেতো।' এভাবে সে সবাইকে উত্তেজিত করতে লাগলো। আনসারদের মাঝে কিছু মুনাফিক ছিলো। তারা তাকে সমর্থন দিয়ে সাহস জোগাতে লাগলো।

উপস্থিত ছোট্ট একটি বালক সব কথা শুনলো। বালকটির নাম যায়দ বিন আরকাম। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি অবগত করলো। হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। সব শুনে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন। 'কী দুঃসাহস হতভাগার! রাসূলের শানে এমন চরম বেয়াদবি! এমন অশালীন উচ্চারণ! এ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।'

হযরত ওমর রাযি. ভাবলেন, লেজে আঘাত করার চেয়ে বিষধর সাপ মেরে ফেলাই শ্রেয়। কিন্তু মুনাফিকটাকে হত্যার অর্থই হলো নতুন করে ফিতনা উসকে দেয়া। তবে মুহাজিরদের পরিবর্তে আনসারদের কেউ ওকে হত্যা করলে আর কোনো ফিতনার আশঙ্কা নেই। এই ভেবে ওমর রাযি. নবীজীকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আনসারী উব্বাদ বিন বিশরকে বলুন মুনাফিকটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে।'

কিন্তু নবীজী ﷺ ছিলেন প্রজ্ঞার আধার। তিনি চিন্তা করলেন, সবাই মাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরেছে, সবার কাছেই অস্ত্রশস্ত্র। এ পরিস্থিতিতে উত্তেজনাকর কিছু করা মোটেই সংগত হবে না। নবীজী ﷺ হযরত ওমর রাযি.-কে বোঝালেন, 'ওমর! মানুষ কী বলবে? মানুষ তো বলবে, মুহাম্মাদ এখন নিজ সঙ্গীদের

হত্যা করছে। না ওমর! এটা হতে পারে না। তুমি বরং সবাইকে বলে দাও যাত্রাশুরুর প্রস্তুতি নিতে।'

বিশাল মরুভূমির মাঝে একখণ্ড মরুদ্যানের সন্ধান পেয়ে কাফেলা থেমেছিলো একটু বিশ্রামের জন্য, একটু আরাম করার জন্য। কিন্তু এই ধূ-ধূ মরুপ্রান্তরে, প্রচণ্ড সূর্যতাপে, ছাতিফাটা রোদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের নির্দেশ দিলেন! তিনি তো কখনো প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সফর করেন না। এ তো তাঁর সব সময়ের স্বভাববিরুদ্ধ!

কাফেলা চলতে শুরু করলো। আবদুল্লাহ বিন সালুল জানতে পারলো, যায়দ বিন আরকাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সবকিছু বলে দিয়েছে। এবার ইবনে সালুল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। সে বারবার শপথ করে বলতে লাগলো, 'আমি এগুলো কিছুই বলিনি, ছেলেটি আমার নামে মিথ্যা বলেছে।' আবদুল্লাহ ইবনে সালুল ছিলো তার কওমের সরদার; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন। তাই আনসারগণ নবীজীকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! ছেলেটি হয়তো ভুল করেছে, কী শুনতে কী শুনেছে—ঠিকমতো মনে রাখতে পারেনি।'

সবাই আবদুল্লাহ বিন সালুলকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। নবীজী ﷺ কারো কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে পথ চলতে লাগলেন।

একপর্যায়ে আনসার সরদার উসাইদ বিন হুযাইর রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। নবীজীকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রতিকূল আবহাওয়ায় সফর করছেন। এমন পরিবেশে তো কখনো

আপনি সফর করেননি।'

নবীজী ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি শোনোনি, তোমাদের সঙ্গী কী বলেছে?'

উসাইদ রাযি. আরজ করলেন, 'কোন সঙ্গী, হে আল্লাহর রাসূল?'

নবীজী ﷺ বললেন, 'আবদুল্লাহ বিন উবাই।'

'সে কী বলেছে?'

'সে বলেছে, "আমরা সম্মানীরা এসব ইতরগুলোকে এবার মদীনা হতে তাড়িয়ে দেবোই দেবো"।'

সব শুনে উসাইদ রাযি. উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে তাকে বের করে দিন। আল্লাহর কসম আপনিই সম্মানিত, আর সে হলো নিচু, হীন ও অসম্মানিত।' কিছুক্ষণ পর উসাইদ রাযি. একটু শান্ত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমার মনে হয় আপনি তার সঙ্গে একটু কোমল আচরণ করলে ভালো হয়। কারণ যে মুহূর্তে তার কওম তাকে নেতৃত্বের আসনে বসানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, ঠিক তখনই আল্লাহ আপনাকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। তাই তার মনে সর্বদা এ অনুভূতি কাজ করে যে, আপনি তার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন।'

নবীজী ﷺ উত্তরে কিছুই না বলে নিশ্চুপ রইলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। এদিকে কাফেলার লোকদের মাঝে কানাঘুষা চলতে লাগলো। সবাই এসব কথা নিয়েই ব্যস্ত। 'এই প্রতিকূল সময়ে আমরা পথ চলছি কেন?', 'আল্লাহর রাসূল কী বলেছেন?', 'ইবনে সালুল তো সত্যই বলেছে',

'না, না, সে মিথ্যা বলেছে'—এভাবে কানাঘুষা-কানকথা চলতে লাগলো। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, কেউ কিছু বাড়িয়ে বললো, কেউ কমিয়ে। এসব কানাঘুষার কারণে মুজাহিদ বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। অথচ তারা এখনো শত্রু-অঞ্চলে অবস্থান করছে, যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রয়েছে। শত্রুসেনা হয়তো কোথাও ওঁৎ পেতে আছে, যে কোনো মুহূর্তে হামলাও করে বসতে পারে।

নবীজী ﷺ অনুভব করলেন, মুজাহিদ বাহিনীতে ক্রমশ বিভেদ ও বিভক্তি তৈরি হচ্ছে। লোকজন সবাই উত্তেজিত। মুহাজির ও আনসারদের মাঝে লড়াই বেঁধে যাওয়ার উপক্রম। তারা শুধু অপেক্ষায়, কখন কাফেলা থামবে, কখন এ বিষয়টা নিয়ে একদল অন্যদলের মুখোমুখি হবে। কোথাও দু-চারজন একত্রিত হলেও এ বিষয়েই শলাপরামর্শ চলছে। নবীজী ﷺ সবার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি সবার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাইলেন। তাই তিনি সেদিনের প্রচণ্ড সূর্যতাপেও বিশ্রাম নিলেন না। চললেন অবিরত। একসময় সূর্য অস্তমিত হলো। বিরামহীন চলছেন নবীজী ﷺ। সবাই ভাবলো, এই তো নামাযের পরেই বুঝি নবীজী ﷺ যাত্রাবিরতি ঘোষণা করবেন। কিন্তু না, নামায আদায় করেই নবীজী ﷺ আবার সফরের নির্দেশ দিলেন। রাত শেষ হলো, চারদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। সবাই ভাবলো, নবীজী ﷺ এবার বুঝি বিরাম দেবেন। কিন্তু ফজর নামায আদায় করেই নবীজী ﷺ আবার সফরের নির্দেশ দিলেন।

দিবস-রজনী-দিবস, একটানা দীর্ঘ সফরে সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত, অবসন্ন-পরিশ্রান্ত। মাথার ওপর সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপ। নবীজী ﷺ যখন অনুভব করলেন যে, কাফেলার সবাই সীমাহীন ক্লান্ত, তাদের পক্ষে এখন কোনো বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়া কিংবা ঘটে যাওয়া বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভব নয়, তখন তিনি আরাম করার আদেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন সফর বিরতির।

সীমাহীন পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম-বিরতি পেয়ে যে যেখানে জায়গা পেলো শুয়ে পড়লো। ক্লান্তিতে সবাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলো। নবীজী ﷺ এটাই চেয়েছিলেন। এভাবেই তিনি সবাইকে বিশৃঙ্খলার চিন্তা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ বিশ্রামের পর সবাইকে তিনি ঘুম থেকে জাগালেন এবং সফরের নির্দেশ দিলেন। সফর শেষ হলো। মদীনায় পৌঁছে কাফেলার সকলে যার যার বাড়িতে চলে গেলো। এরপর আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন:

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

[সূরা মুনাফিকূন]

অর্থ: তারাই বলে, 'আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্য তোমরা ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা আপনিই পৃথক হয়ে যাবে।' অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা

বোঝে না। তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সম্মানিত লোকেরা নিচু লোকদের বহিষ্কৃত করবে। সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

নবীজী ﷺ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। এরপর ছোট্ট বালক যায়দ বিন আরকামের কান ধরে বললেন, 'এই তো সেই বালক, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার কান ব্যবহার করেছে।' এরপর সবাই ইবনে সালুলকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সবাই তাকে তিরস্কার করলো। নবীজী ﷺ হযরত ওমর রাযি.-কে বললেন, 'ওমর! তুমি যেদিন বলেছিলে, সেদিন তাকে হত্যা করলে বহু বিদ্রোহী উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো এবং বিদ্রোহ করতো। কিন্তু আজ নির্দেশ দিলে তারাই তাকে হত্যা করে ফেলবে।' এ কথা বলে নবীজী ﷺ চুপ থাকলেন। এরপর এ ব্যাপারে তিনি আর কিছু বলেননি।

অনেক সময় কেউ কেউ মানুষের সামনে ভুল করে ফেলে। তখন অন্যরা যেন এই ভুল না করে, এ উদ্দেশ্যে তাকে মানুষের সামনেই সংশোধন করে দিতে হয়। তবে এর জন্যও রয়েছে সঠিক ও সুন্দর পদ্ধতি।

একদিন নবীজী ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে বসে ছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষ চলছিলো। ফল-ফসল নেই, বৃষ্টি নেই, চারদিকে হাহাকার। এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে আল্লাহর রাসূলকে বললো, 'আল্লাহর রাসূল! মানুষ ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, অনাহারে-অর্ধাহারে সকলের পরিবার-পরিজন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সহায়-সম্পত্তি সব শেষ, ভেড়া-বকরি-গবাদি পশু কিছুই নেই। আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। আমরা তো আপনার মাধ্যমেই

আল্লাহর কাছে সুপারিশ করি এবং আল্লাহর মাধ্যমেই আপনার কাছে সুপারিশ করি।'

বেদুঈনের কথা শুনে নবীজীর মোবারক চেহারা মলিন হয়ে গেলো। লোকটা এ কী বলছে?! 'আমরা আল্লাহর মাধ্যমেই আপনার কাছে সুপারিশ করি'! সুপারিশ তো বান্দার পক্ষ থেকে মাওলার কাছে হয়। বড়র কাছে ছোট সুপারিশ-দরখাস্ত করে। মহান আল্লাহ তো সকলের স্রষ্টা, সকলের অধিপতি, সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী সত্তা। তিনি কী করে বান্দার কাছে সুপারিশ করবেন!

নবীজী ﷺ তাকে বললেন, 'আরে বোকা! কী বলছো এসব নির্বোধের মতো?' এরপর নবীজী ﷺ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন। বারবার বলতে লাগলেন, 'সুবহানাল্লাহ!' 'সুবহানাল্লাহ!' 'পবিত্র ও সুমহান সত্তা আল্লাহ তাআলা।' সাহাবীগণের কণ্ঠেও মহান আল্লাহর প্রশংসা-বাক্য ফুটে উঠলো। নবীজী ﷺ এরপর লোকটিকে বললেন, 'আরে নির্বোধ! শোনো, বান্দার মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা হয় না। তিনি তো সবকিছুর স্রষ্টা, মহান তিনি। তুমি কি জানো আল্লাহ কেমন? শোনো, নভোমণ্ডলে এভাবে রয়েছে তাঁর সিংহাসন।' এরপর নবীজী ﷺ হাত দিয়ে গম্বুজের মতো বানিয়ে তাকে সিংহাসনের ধারণা দিলেন। এরপর বললেন, 'আর নতুন সওয়ারী আরোহীকে নিয়ে যেমন আওয়াজ করতে থাকে, তাও তেমনি আওয়াজ করতে থাকে।' [সুনানে আবু দাউদ: ৪১০১]

জনসম্মুখে ভুল করলে তার নববী সমাধানের একটি চিত্র আপনারা দেখতে পেলেন। কিন্তু একান্তে-নির্জনে কেউ কোনো ভুল করে বসলে তার সমাধানের নববী পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন। এবার তারই একটি চিত্র অবলোকন করুন।

একরাতে নবীজী ﷺ আয়েশা রাযি.-এর ঘরে এলেন। ঘুমের সময় হলে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, আয়েশা রাযি. ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন অতি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং চাদর পরিধান করে জুতো পরে নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হলেন। আওয়াজ না করেই দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

এদিকে হযরত আয়েশা রাযি. জেগেই ছিলেন। তিনি সবকিছু দেখলেন। নারীসুলভ আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর মনে আঘাত হানলো। তিনি ভাবলেন, নবীজী ﷺ হয়তো তাঁকে রেখে অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন। তাই তিনিও উঠে বসলেন। ওড়না-চাদর পরিধান করে তিনিও নবীজীর পিছু নিলেন। চুপে চুপে, খুব সন্তর্পণে, নবীজী ﷺ যেন টের না পান।

নীরব রজনীর অন্ধকার ভেদ করে নবীজী ﷺ এগিয়ে চলেছেন। চলতে চলতে তিনি জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছলেন। সারি সারি কবরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন তাঁর প্রিয় সাহাবীদের সমাধির দিকে; যাঁদের দিবস-রজনী কেটেছে এক আল্লাহর ইবাদতে, মৃত্যু যাঁদের পদচুম্বন করেছে জিহাদের সংগ্রামী পথে, যাঁরা ধন্য হয়েছেন দুর্জ্ঞেয় ও নিগূঢ় রহস্যের মহাজ্ঞানী সত্তার সন্তুষ্টি ঘোষণাতে।

নবীজী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কবরের পাশে। ইসলামের জন্য সেই সকল মহান সাহাবীর আত্মত্যাগের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠলো নবীজীর চোখের সামনে। তিনি দু হাত তুললেন মহান আল্লাহর দরবারে। বারবার তাঁদের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। একবার তিনি কবরের দিকে তাকান, আবার তাকান তারাভরা আকাশের দিকে, আবার হাত তোলেন, আবার কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এদিকে আয়েশা রাযি. দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন সবকিছু।

এরপর নবীজী ﷺ পেছনে ফিরে রওয়ানা করলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। নবীজীকে দ্রুত চলতে দেখে আয়েশা রাযি. আরো দ্রুত এগিয়ে চললেন, নবীজী ﷺ যেন তাঁকে দেখতে না পান। তাড়াহুড়া করে ঘরে ঢুকে ওড়না-চাদর রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘুমের ভান করে তিনি শুয়ে পড়লেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলাচল করছিলো। বুক দুরু দুরু কাঁপছিলো। নবীজী ﷺ তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা! কী হয়েছে তোমার? ভয় পেয়েছো?'

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, 'না, কিছুই তো হয়নি।' নবীজী ﷺ বললেন, 'তুমি নিজেই বলবে, না আল্লাহ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন?'

এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. নবীজীকে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি বললেন যে, 'আসলে আমার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লেগেছিলো। তাই আমি

আপনার পিছু নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, আপনি কোথায় যান?' নবীজী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই আমার সামনে ছিলে?' আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।

নবীজী ﷺ তখন আয়েশার কাঁধে আলতোভাবে ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'আয়েশা! তুমি কি মনে করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন?'
হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, 'মানুষ কত কিছু গোপন রাখতে চায়! কিন্তু আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন।'

সম্মতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করে নবীজী ﷺ তাঁকে ঘর হতে বের হওয়ার ঘটনা বিস্তারিত শোনালেন। নবীজী ﷺ বললেন, 'রাতে যখন আমাকে দেখেছো তখন হযরত জিবরাঈল আ. এসেছিলেন। কিন্তু তুমি রাতের পোশাকে ছিলে বিধায় তিনি ঘরে প্রবেশ করেননি। আড়াল থেকেই আমাকে ডেকেছেন এবং মাকবারায়ে বাকীতে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আমিও অতি সন্তর্পণে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে মনে করে তোমাকে আর ডাকিনি।' [সহীহ মুসলিম: ১৬১৯, সুনানে নাসায়ী: ৩৯০১]

হ্যাঁ, আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ ছিলেন এমনই সাদাসিধে, কোমল হৃদয়ের মানুষ। কোনো ভুলকে তিনি বড় করে দেখতেন না, বড় করে তুলতেন না। সাহাবায়ে কেরামকে বারবার বলতেন:
«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

অর্থ: কোনো মুমিন ব্যক্তি যেন তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটা চরিত্র তার অপছন্দ হলে আরেকটি ঠিকই মনঃপুত হবে। [সহীহ মুসলিম: ১৪৬৯]

অর্থাৎ কারো একটি আচরণ বা উচ্চারণ কিংবা স্বভাব বা ব্যবহারের ত্রুটির কারণে তার প্রতি পুরোপুরি অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক নয়। দোষ-গুণ মানুষের থাকেই। দোষ না দেখে আপনি বরং তার গুণকেই গ্রহণ করুন। গুণের কারণে তার ত্রুটিটুকু ক্ষমা করে দিন। কারো কোনো ত্রুটি নজরে পড়লেও আপনি তার ভালো দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। অসুন্দরের পরিবর্তে সুন্দরকে বেছে নিন। তার যে কাজ আপনি পছন্দ করেন না, যে আচরণ আপনার মনঃপুত নয়, একটু কষ্ট করে সেগুলো হজম করুন কিংবা সেগুলো এড়িয়ে চলুন।

চেতনায় আলো...

তিরস্কারযোগ্য সে নয়, যে উপদেশ গ্রহণ করে না, বরং তিরস্কারযোগ্য সে, যে ভুল পন্থায় উপদেশ উপস্থাপন করে।

# ৪৪. আঁটির বাঁধন খুলে দিন

ভুল যদি সমষ্টিগতভাবে কয়েকজন মিলে করে ফেলে, তখন তাদের সবাইকে একত্রে নসীহত করাই সমীচীন। কিন্তু কখনো কখনো আপনাকে আঁটির বাঁধন খুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলতে হবে এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে নসীহত করতে হবে।

মনে করুন, বাড়িতে আপনি ছোট ভাইয়ের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভেতর থেকে ছোট ভাইয়ের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে। বন্ধুরা সবাই তার কাছে বেড়াতে এসেছে। আপনি শুনতে পেলেন, তারা সবাই মিলে একটি দেশে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। আপনি জানেন, সে দেশের পরিবেশ এত অশ্লীল ও নোংরা যে, ভ্রমণে গেলে পর্যটকদের জন্য কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচাও কঠিন হয়ে পড়ে।

আপনি তাদেরকে সেখানে না যাওয়ার নসীহত করতে চাচ্ছেন। কিন্তু কীভাবে তাদের নসীহত করবেন? কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন?

একটি পদ্ধতি তো হলো, আপনি তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে দু'চার কথায় নসীহত করে ফিরে এলেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, অধিকাংশ সময় এ পদ্ধতি কার্যকর ও সফল হয় না। এর পরিবর্তে আপনি যদি আঁটির বাঁধন খুলে ফেলেন এবং প্রতিটি খড়ি আলাদা আলাদা ভেঙে ফেলেন তাহলে কেমন হয় বলুন তো?!

পরামর্শ শেষে তারা সকলে যখন পৃথক হয়ে যাবে, তখন আপনার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যে সবচে বিচক্ষণ তার সঙ্গে একান্তে বসুন। তাকে বলুন, ‘ভাই! জানতে পারলাম তোমরা নাকি শীঘ্রই ভ্রমণে বের হচ্ছো। শোনো, তুমি তো তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবচে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, তোমরা যে দেশে যেতে চাচ্ছো, সেখানে সফরে গিয়ে অধিকাংশ পর্যটক বিপদ-আপদ, ঝুট-ঝামেলা, অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে রেহাই পায় না। আবার কেউ কেউ তো রোগ-ব্যাধি সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। তুমি কি তাদের সৎকর্মের সাওয়াবের ভাগীদার হতে চাও না? তুমি কি তাদের গুনাহ থেকে বাঁচাতে চাও না? তাদের পরামর্শ দাও, তারা যেন অন্য কোনো দেশে ভ্রমণ করে, যেখানে তোমরা কোনো প্রকার অন্যায় ও গুনাহের কাজ না করেও নদী-সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে, বিনোদন ও আনন্দ করতে পারবে।’

আপনি যখন এভাবে সুন্দর শৈলীতে পরামর্শ দেবেন, নিঃসন্দেহে তার আগ্রহ অর্ধেক কমে যাবে। এবার আপনি আরেকজনের কাছে যান। তাকেও এ কথাগুলোই বলুন। এরপর তৃতীয়জনের কাছে যান এবং তাকেও একই কথা বলুন। তবে খেয়াল রাখবেন, তাদের কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, আপনি তার সঙ্গীকেও একই কথা বলেছেন।

পরবর্তীতে তারা যখন একত্রিত হবে, তাদের মধ্য হতে কেউ ভ্রমণস্থানের পরিবর্তনের কথা উত্থাপন করলেই সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষে আরেকজনকে

পেয়ে যাবে। এভাবে আপনি সূচনার পূর্বেই একটি মন্দ কাজের পরিসমাপ্তি সুন্দর পদ্ধতিতে করতে পারেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন। মনে করুন, একদিন আপনি জানতে পারলাম যে, আপনার সন্তানেরা তাদের একজনের কামরায় একত্রিত হয়ে অশ্লীল ভিডিও দেখে, অথবা অশ্লীল কোনো সিনেমা দেখে। এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা নসীহত করা। সকলকে একত্রে নসীহত করতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে এবং তারা জেদ করে অন্যায়ের ওপর অটল হয়ে যেতে পারে।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, নবীজীবনে কি এমন আচরণের কোনো নিদর্শন আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।

নবীজী ও মুসলমানদের প্রতি কোরাইশ কাফিরদের শত্রুতা ও নিপীড়ন যখন চরমে পৌঁছুলো, তখন তারা সবাই মিলে নবীজী ও বনু হাশিমের অন্তর্ভুক্ত নবীজীর সকল নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে বয়কট ঘোষণা করলো। তাদের পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র লেখা হলো যে, ‘বনু হাশিমের কাছ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করা যাবে না, তাদের কাছে কিছু বিক্রয় করাও যাবে না। আমাদের কোনো নারীকে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হবে না এবং আমাদেরও কেউ তাদের কোনো নারীকে বিয়ে করবে না।’

ফল-ফসলহীন অনুর্বর একটি উপত্যকায় নবীজীকে অবরুদ্ধ করে রাখা হলো। খাদ্যাভাব এত চরমে পৌঁছুলো যে, সাহাবীগণ একপর্যায়ে গাছের পাতা চিবিয়ে খেতে বাধ্য হলেন। অবস্থা এত করুণ হলো যে, একদিন

জনৈক সাহাবী প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে বের হলে হঠাৎ পায়ের নিচে খসখস আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাকিয়ে দেখেন, এক টুকরো উটের চামড়া। তিনি চামড়াটুকু তুলে নিলেন এবং ভালোভাবে ধৌত করে আগুনে পোড়ালেন। এরপর তা টুকরো টুকরো করে পানিতে মেশালেন। তিনদিন তিনি এগুলো খেয়েই কাটিয়েছিলেন!

এভাবে চরম কষ্টের মাঝে অবরুদ্ধ অবস্থায় বনু হাশিম ও মুসলমানদের কয়েক মাস কেটে গেলো। একদিন নবীজী চাচা আবু তালিবকে বললেন, 'চাচা! আল্লাহ তাআলা কোরাইশদের ঘোষণাপত্রে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাতে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। জুলুম, সম্পর্কচ্ছেদ এবং মিথ্যা অপবাদ সব মুছে গেছে।'

অর্থাৎ উইপোকা কোরাইশদের সেই চুক্তিনামাটি খেয়ে ফেলেছে। সেখানে 'আপনার নামেই শুরু করছি হে আল্লাহ' এই বাক্যটি ছাড়া আর কোনো শব্দ বাকি নেই! এ কথা শুনে আবু তালিব অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার প্রতিপালক কি তোমাকে এ ব্যাপারে অবগত করেছেন?'

নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ'। আবু তালিব বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমার কাছে কেউ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই আমি কোরাইশদের এ বিষয়ে অবগত করবো।'

এরপর আবু তালিব কোরাইশদের কাছে গিয়ে তাদের বললেন, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আমার ভাতুষ্পুত্র তো আমাকে এই কথা বলেছে। সে যা বলেছে যদি তা সত্য হয় তাহলে তোমরা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের

সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করো এবং এই করুণ অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণ দাও। আর যদি তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি তোমাদের হাতে সোপর্দ করবো। তখন তোমরা যা মন চায়, তাই করো।'

কোরাইশ সম্প্রদায় বললো, 'ঠিক আছে, তোমার কথায় আমরা রাজি আছি।' সবাই মিলে যখন চুক্তিনামাটি দেখলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্য প্রমাণিত হলো। কিন্তু কোরাইশরা কৃত অঙ্গীকার পূরণ তো করলোই না; তদুপরি মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দিলো। অবরুদ্ধ উপত্যকায় দিন কাটতে লাগলো বনু হাশিম, বনু মুত্তালিবের মজলুম সদস্যদের। ক্ষুধা-কষ্ট আর যন্ত্রণায় তারা উপনীত হলো মৃত্যুমুখে।

অবশ্য কোরাইশ কাফিরদের মাঝে কিছু হৃদয়বান লোকও ছিলো। তাদেরই একজন হিশাম বিন আমর। নিজ সম্প্রদায়ে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি রাতের বেলা গোপনে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের অবরুদ্ধ শিবিরে উট বোঝাই খাবার নিয়ে আসতেন। উপত্যকার কাছাকাছি পৌঁছে তিনি উটের গলা থেকে রশি খুলে পেছন থেকে হাঁকাতে থাকতেন। আর খাদ্যবাহী উট শিবিরের ভেতরে চলে যেতো।

এভাবে কেটে গেলো বহুদিন। কিন্তু হিশাম যে আর পারছেন না। প্রতি রাতে এত লোকের খাদ্য সরবরাহ তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। তাই তিনি মনে মনে স্থির করলেন, যেভাবেই হোক এই বর্বরোচিত নীতিহীন চুক্তিনামা ভঙ্গ করতেই হবে। কিন্তু পুরো কোরাইশ যেখানে একমত হয়ে আছে, সেখানে

এমন কিছু করা তো সহজ কাজ নয়। তিনি কী করলেন? তিনি অবলম্বন করলেন আঁটির বাঁধন খুলে ফেলার পদ্ধতি!

প্রথমে তিনি গেলেন যুহাইর বিন আবি উমাইয়ার কাছে। যুহাইর আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার বেটা। তিনি যুহাইরকে বললেন, 'যুহাইর! তুমি মন মতো পানাহার করছো, সুন্দর-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করছো, স্ত্রীর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছো। অথচ তোমার মামাদের অবস্থা দেখো। তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে। কেউ তাদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করছে না, তাদের কাছ থেকে কেউ কিছু ক্রয় করছে না। তাদের মেয়েদের কেউ বিয়ে করছে না, আবার তাদের কাছে কেউ বিয়েও দিচ্ছে না। আমি তো শপথ করে বলতে পারি, তারা যদি আবু জাহলের মামাবংশীয় হতো, আবু জাহল তাদেরকে এভাবে বয়কট করে রাখতো না। (আবু জাহল ছিলো এ দুরভিসন্ধির মূল হোতা এবং মুসলমানদের প্রতি সবচে নির্দয় ও শত্রুতা পোষণকারী।) তুমি বনু হাশিমের ভাগ্নে হয়ে কীভাবে বসে আছো?!'

যুহাইর বললো, 'হিশাম! দেখো, আমি একা কীভাবে কী করবো? যদি আমার সঙ্গে আরো কেউ থাকতো, তাহলে না হয় চুক্তি প্রত্যাহারের একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতো।' হিশাম বললেন, 'তুমি একা কোথায়? এই কাজে তো তুমি আরেকজনকে তোমার সঙ্গে পাবে।'

'কে সে?'

'আমি! আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

যুহাইর বললো, 'আচ্ছা দেখো তাহলে তৃতীয় কাউকে পাওয়া যায় কিনা?' হিশাম বললেন, 'ঠিক আছে। তবে এই মুহূর্তে আমার কথাটা গোপন রেখো।'

এরপর হিশাম গেলেন মুতইম বিন আদীর কাছে। মুতইম ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক। হিশাম তাকে বললেন, 'মুতইম! বনু আবদে মানাফের দু'টি শাখাগোত্র তোমার চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তুমি কোরাইশদের এই নিষ্ঠুর বয়কটকে সমর্থন করে যাবে?!'

মুতইম বললো, 'আরে ভাই, আমি একা আর কী করতে পারবো?' হিশাম বললেন, 'আরে একা কোথায়? এই কাজে তো তুমি আরেকজনকে তোমার সঙ্গে পাবে।'

'কে সে?'

'আমি আছি তোমার সঙ্গে।' হিশাম বললেন।

মুতইম বললো, 'তাহলে তৃতীয় কাউকে তালাশ করো।'

হিশাম বললেন, 'হ্যাঁ, তৃতীয়জনও পেয়েছি।'

মুতইম জিজ্ঞেস করলো, 'কে সে?'

হিশাম বললেন, 'যুহাইর বিন আবি উমাইয়া।'

মুতইম এবার বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে চতুর্থ আরেকজন তালাশ করো।' হিশাম বললেন, 'ঠিক আছে, তাই করবো। তবে শোনো, বিষয়টা একটু গোপন রেখো।'

এরপর হিশাম গেলেন আবুল বুখতারী বিন হিশামের কাছে। সেও শুরুতে প্রথম দু'জনের মত কথা বললো এবং একপর্যায়ে আগ্রহী হয়ে বললো, ‘আচ্ছা, আমাদেরকে সহযোগিতা করার মত আর কেউ কি আছে?’

হিশাম বললেন, ‘হ্যাঁ, আছে।’

‘কে আছে?’ সে জিজ্ঞেস করলো।

হিশাম জানালেন, ‘যুহাইর বিন আবি উমাইয়া, মুতইম বিন আদী। আর আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি।’

সে বললো, ‘আচ্ছা, তাহলে আরো কাউকে তালাশ করো।’

এরপর হিশাম চলে গেলেন যামআহ বিন আসওয়াদের কাছে। তার সঙ্গেও আগের মত কথা বললেন এবং অবরুদ্ধদের সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে এই পরিস্থিতিতে তার কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুললেন। যামআহ জানতে চাইলো, ‘তোমার এই প্রস্তাবের পক্ষে আর কেউ কি আছে?’

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, অমুক অমুক আছে।’

এভাবে সবাই এ বিষয়ে একমত হলেন এবং সবাই পরবর্তী এক রাতে মক্কার উপকণ্ঠে ‘হাতমে হাজুন’ নামক স্থানে একত্রিত হবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। নির্ধারিত সময়ে সকলে সেখানে একত্র হওয়ার পর এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, উক্ত চুক্তিনামা ভঙ্গ করে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে যাবেন না। যুহাইর সকলকে বললো, ‘আমি প্রথমে চুক্তিনামার অসারতা নিয়ে কথা

বলা শুরু করবো। তখন তোমরা সকলে একের পর এক আমাকে সমর্থন দিয়ে যাবে।’

প্রত্যুষে সকলে কাবা চত্বরে উপস্থিত হলেন। লোকজন অন্যান্য দিনের মত লেনদেন-প্রাত্যহিক কাজকর্ম করতে লাগলো। যুহাইর বিন আবি উমাইয়া সাতবার কাবাঘর তাওয়াফ করলো। এরপর উপস্থিত লোকজনের কাছে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললো, ‘হে মক্কার অধিবাসীগণ! আমরা কি মন মতো পানাহার করছি না? পোশাক পরিধান করছি না? স্বাভাবিক জীবন যাপন করছি না? তাহলে বনু হাশেম আমাদের স্বগোত্রীয় হয়েও কেন আজ ধ্বংসের মুখে? কেন তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে? কেন তাদের তিলে তিলে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে? আল্লাহর শপথ! আমি অকুণ্ঠ চিত্তে স্পষ্ট ঘোষণা করছি, যতক্ষণ না ওই বর্বরোচিত নিষ্ঠুর চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলা হবে, ততক্ষণ আমি স্থির হবো না।’

আবু জাহল তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কাছেই বসে ছিলো। সে বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, ‘যুহাইর! তুই মিথ্যা বলছিস। চুক্তিনামা কিছুতেই ছেঁড়া হবে না।’ তৎক্ষণাৎ যামআহ বিন আসওয়াদ দাঁড়িয়ে আবু জাহলের প্রতিবাদ করলো এবং কঠোর ভাষায় বললো, ‘আবু জাহল! মিথ্যা বরং তুই বলছিস। যখন ঐ চুক্তিনামা লেখা হয়েছিলো তখনই আমরা তাতে রাজি ছিলাম না।’

আবু জাহল প্রতিবাদ করার জন্য যামআহ বিন আসওয়াদের দিকে তাকালো। ঠিক তখনই আবুল বুখতারী দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, ‘হ্যাঁ, যামআহ

ঠিকই বলেছে। আমরা এ চুক্তিনামায় রাজি ছিলাম না, আমরা সমর্থনও করিনি।' আবু জাহল বুখতারীর দিকে তাকালো। ওদিক থেকে মুতইম বিন আদী বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা দু'জন ঠিকই বলেছো। এর বিপরীত যে বলছে, সে-ই মিথ্যাবাদী। আমরা এই চুক্তি হতে দায়মুক্ত, এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।' হিশাম বিন আমরও দাঁড়িয়ে একই কথা বললেন।

সবার ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে আবু জাহল আর টিকতে পারলো না। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় এটা পরিকল্পিত কাজ। রাতেই অন্য কোথাও এ পরিকল্পনা করা হয়েছে।' এরপর মুতইম বিন আদী চুক্তিনামাটা ছিঁড়ে ফেলতে কাবাঘরের কাছে গেলো। কিন্তু আশ্চর্য! উইপোকা যে আল্লাহর নাম লিখিত অংশ ছাড়া সবটাই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে!

**বিচক্ষণ হোন...** বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রথমেই রোগীর দেহে সুঁই প্রবেশ করান না। সুঁই প্রবেশ করানোর পূর্বে আঙুল দিয়ে টিপে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেন। এরপর...

# ৪৫. আত্মপীড়ায় ভুগবেন না

জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর একটির কথা খুব মনে পড়ছে। আমরা একবার মরুভূমিতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে বন্ধু 'আবু খালিদ'ও ছিলো। তার দৃষ্টিশক্তি ছিলো খুবই দুর্বল। তাই তার বিভিন্ন কাজে আমরাই তাকে সাহায্য করতাম। খানার সময় খেজুর, কফি ইত্যাদি তার হাতে তুলে দিতাম। সে বারবার নিষেধ করে বলতো, 'আমাকেও তোমাদেরকে সাহায্য করতে দাও। তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে দাও। আমাকেও যে কোনো কাজ দিতে পারো।' কিন্তু আমরা তাকে কোনো কাজ করতে দিতাম না।

পিকনিকের জায়গায় আমরা সবাই খুব ভালোভাবেই পৌঁছলাম। সেখানে আমরা একটি বকরি জবাই করলাম। গোশত কেটে টুকরো টুকরো করে রান্নার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করে একটি পাত্রে রাখলাম। এরপর আমরা তাঁবু টানানোসহ বিভিন্ন জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আগুনের ঝামেলায় না গিয়ে আপাতত গোশতগুলো সেভাবেই রেখে দিলাম। হঠাৎ আবু খালিদ জযবার বশে উঠে পাতিলের দিকে গেলো—এমনটি না হলেই বরং ভালো ছিলো! সে সোজা গোশতের কাছে চলে গেলো এবং দেখতে পেলো, গোশতে এখনো পানিই দেয়া হয়নি! গাড়িতে রাখা জিনিসপত্রের কাছে এসে সে পানি খুঁজতে লাগলো। সেখানে জেনারেটর, তার, কৃত্রিম আলো সরবরাহের জন্য বাতি, পানি ও পেট্রোলের চারটি বোতল এবং অন্যান্য তৈজসপত্র ছিলো। সে তার সবচে কাছের বোতলটি নিয়ে খুশি মনে গোশতের কাছে চলে এলো। তারপর বোতলের অর্ধেকটা পাত্রে ঢেলে দিলো।

তার এ ‘কীর্তি’ দেখে আমাদের একজন দূর থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘না! না! আবু খালিদ! থামো!’ এদিকে আবু খালিদ আপন মনে ঢালছিলো আর বলছিলো, ‘আমাকেও একটু কাজ করতে দাও!’ আমরা তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে বোতলটি কেড়ে নিলাম। গোশতটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যদিও আমাদের খারাপ লাগছিলো কিন্তু আবু খালিদের কাণ্ড দেখে কেউ হাসি থামাতে পারলো না। কারণ বোতলটিতে পানি নয়, ছিলো পেট্রোল!

সেদিন আমাদের দুপুরের খাবার শুধু রুটি আর চা দিয়েই সারতে হয়েছিলো। এত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আমাদের সেদিনের ভ্রমণটি কিন্তু পণ্ড ও বিষাদপূর্ণ হয়ে যায়নি। বরং আনন্দঘন একটি ভ্রমণই হয়েছে। অসতর্কতাবশত যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কেনই বা আমরা নিজেদের শান্তি ও আনন্দ নষ্ট করতে যাবো?

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। আমি তখন মাধ্যমিক স্তরে পড়ি। আমরা সহপাঠীরা মিলে একবার ভ্রমণে বের হলাম। হঠাৎ করে আমাদের একটি গাড়ির ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলো। কোনো মতে ইঞ্জিন স্টার্ট করার উদ্দেশ্যে আরেকটি গাড়ি এনে নষ্ট গাড়িটির মুখোমুখি দাঁড় করানো হলো। এখন এ গাড়ির ব্যাটারি থেকে নষ্ট গাড়িটির ব্যাটারিতে তার সংযোগ দিতে পারলেই ইঞ্জিন চালু করা সম্ভব।

বন্ধু তারিক এসে দুই গাড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে তার দিয়ে দুই গাড়ির ব্যাটারি সংযুক্ত করে দিলো এবং একজনকে ইশারায় বললো, ‘ইঞ্জিন চালু করো।’

এক বন্ধু ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো। দুর্ভাগ্যবশত গাড়িটি তখন ফার্স্ট গিয়ারে ছিলো। স্টার্ট দিতেই গাড়িটি লাফিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে গেলো। বাম্পারের ধাক্কায় তারিক মাটিতে পড়ে গেলো এবং হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেলো। তখনো ড্রাইভিং সিটে বসা বন্ধু চিৎকার করে বলছিলো, 'আবার স্টার্ট দেবো?!' আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ি দু'টিকে দু'দিকে সরিয়ে নিলাম এবং তারিককে দাঁড় করিয়ে হাঁটাতে চেষ্টা করলাম। হাঁটুতে খুব চোট লাগায় তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত ব্যথা পেয়েও সে চিৎকার তো দূরের কথা, কাউকে একটু বকাও দেয়নি। কারো উদ্দেশে সামান্য তিরস্কারের শব্দও উচ্চারণ করেনি। বরং সে যে অসন্তুষ্ট নয়, তা বোঝাতে কিছুটা মুচকি হাসছিলো। আসলে এসব ক্ষেত্রে হইচই করে লাভই বা কী? যা হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে। আমাদের সেই ভাইটিও পরে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

তাই জীবনটাকে যদি আনন্দ ও শান্তির বানাতে চান, যদি জীবনকে উপভোগ করতে চান তাহলে সর্বক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি স্মরণ রাখবেন: 'সাধারণ জিনিসকে কখনো বড় করে দেখবেন না।' অনেক সময় আমরা শুধু শুধু ব্যথিত হই। মনকে পীড়া দিই। নিজেকে ছোট মনে করি ও কষ্ট পাই। এভাবে কষ্ট পাওয়া সমস্যার কোনো সমাধান নয়।

মনে করুন, আপনি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলেন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ সুন্দর ও পরিপাটি। মাথার রুমাল ও ওপরের বন্ধনীটিও বেশ চমৎকার। দেখতে আপনাকে বরের চেয়েও সুন্দর লাগছে! আপনি হাসিমুখে

সবার সঙ্গে মোসাফাহা করছেন। হঠাৎ পেছন থেকে একটি শিশু এসে আপনার রুমাল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই দিলো দৌড়! আপনার রুমাল ও বন্ধনী টুপিসহ মাটিতে পড়ে গেলো আর আপনি হয়ে গেলেন উপস্থিত সকলের হাসির পাত্র। এমতাবস্থায় আপনি কী করবেন?

অনেকেই এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এমন কিছু করে বসে, যা কখনোই তার সমাধান নয়। কেউ হয়তো বাচ্চাটির পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করে, চিৎকার করে ডাকতে থাকে, তিরস্কার করে, শক্ত ভাষায় তাকে খুব শাসায় কিংবা ইচ্ছেমতো বকাঝকা করে। কিন্তু ফলাফল? ছেলেটি তো চেয়েছিলো লোকজনের মনোযোগ আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে একটা কোলাহল সৃষ্টি করতে এবং সবার কাছে আপনাকে হাসির পাত্র বানাতে। এতে কিন্তু সে সফল। হয়তো এই পুরো দৃশ্যটা কেউ ভিডিওতে ধারণ করে ব্লুটুথ দিয়ে একে অপরের কাছে আদান-প্রদানও করবে! তাহলে এবার ভেবে দেখুন, আপনি কি ছেলেটিকে শাসন করছেন, না নিজেকে আরো বিব্রতকর অবস্থায় জড়িয়ে ফেলছেন? তাকে নয়, আপনি তো নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছেন।

কিংবা ধরুন, আপনি একটি নতুন কাপড় পরিধান করেছেন। হয়তো এখনো মূল্যও পুরোপুরি পরিশোধ করেননি। আপনি একটি কোম্পানীতে গেছেন চাকুরীর ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য। যে দরজা দিয়ে ঢুকছেন, তাতে অল্পক্ষণ পূর্বে রঙের প্রলেপ দেয়া হয়েছিলো। দরজার পাশে সতর্কতামূলক ফলকও লাগানো ছিলো। আপনি সেটা খেয়াল করেননি। দুর্ঘটনাবশত কিছুটা রঙ আপনার কাপড়ে লেগে গেলো। এখন আপনি কী করবেন?

বেশিরভাগ সময়ই আমরা এ ধরণের পরিস্থিতিতে এমন কাজ করে বসি, যা আসলে এ সমস্যার কোনো সমাধান নয়। আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ি, রেগে যাই। শ্রমিককে ধমক দিয়ে বলি, 'এখানে স্পষ্ট করে সাইনবোর্ড লাগাতে পারোনি?' স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকও আপনার ওপর রেগে যায়। ফলে রঙ লাগার পর আপনার মান-সম্মান যা বাকি ছিলো, পরবর্তী উত্তেজিত কর্মকাণ্ডে তাও ধূলোয় মিশে যায়। আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, এ ধরণের আচরণ করে আপনি অন্যকে নয় বরং নিজেকেই কষ্ট দিচ্ছেন, নিজেকেই শাসন করছেন?

আপনি কোথাও বক্তৃতা করতে যাবেন বলে সুন্দর পোশাক পরেছেন। বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামতেই একটি গাড়ি কাদা ছিটিয়ে আপনার পুরোটা কাপড় ময়লা করে দিয়ে গেলো। আপনি কি এখানেও নিজেকে কষ্ট দিয়ে চিৎকার করে গাড়ি ও যাত্রীদেরকে গালমন্দ করবেন? একটু ভাবুন, গাড়ি তো চলেই গেছে। আপনার এই বকাঝকা আর চিৎকার এখন কী কাজে আসবে?

এভাবেই আমাদের জীবনে অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে যায়, যেগুলো নিয়ে ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও বেদনাদায়ক এমন অনেক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে।

একদিন তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে একান্তে বসে ছিলেন। আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'ওহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোনো মুহূর্ত কি আপনার জীবনে এসেছে?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতির পর্দায় ওহুদ যুদ্ধের দিন ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দৃশ্যগুলো এক এক করে ভেসে উঠতে লাগলো। আহ! সেদিনের মুহূর্তগুলো কত কঠিন ছিলো! সেদিন তার প্রিয়তম ব্যক্তি, প্রিয়তম চাচা হযরত হামযা রাযি. শহীদ হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানসপটে প্রিয়তম চাচার লাশের দৃশ্য ভেসে উঠলো। তাকে শুধু নির্মমভাবে হত্যাই করা হয়নি, লাশের নাক-কান কেটে বিকৃত করা হয়েছে। বুক-পেট চিরে পুরো শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। সেদিন অসহনীয় আঘাতে নবীজীর দান্দান মোবারক শহীদ করা হয়েছে। নূরানী চেহারাকে যখমী করা হয়েছে। রক্ত ঝরেছে মোবারক শরীর হতে। সেদিন তার প্রিয় সঙ্গীগণ তারই চোখের সামনে এক এক করে শহীদ হয়েছেন। সত্তরজন সাহাবীকে ওহুদ প্রান্তরে দাফন করে তিনি মদীনায় ফিরে এসেছেন। মদীনায় তখন অপেক্ষারত একদল বিধবা নারী ও এতিম শিশু, প্রিয়তম স্বামী ও স্নেহশীল পিতার পথ চেয়ে...। আহ! কী কষ্টের ও বেদনার দিন ছিলো সেটি!

হযরত আয়েশা রাযি. জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তোমার কওমের লোকজন থেকে আমি সবচে বেশি কষ্ট পেয়েছি আকাবার দিন। সেদিন আমি তাদের সামনে আমার নবুয়তের বার্তা উপস্থাপন করেছিলাম।' এরপর নবীজী দ্বীনী কাজে তায়েফবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাদের প্রত্যাখ্যান এবং একদল নির্বোধ

কর্তৃক তাকে পাথর মেরে পুরো শরীর রক্তাক্ত করে দেয়ার ঘটনা সবিস্তারে আয়েশা রাযি.কে শোনালেন।

এ ধরণের মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক অনেক ঘটনাই ঘটেছে তার জীবনে। কিন্তু এসব কিছুই তার পথচলায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই কষ্টগুলোকে তিনি ধরে রাখার চেষ্টা করেননি বরং জীবনকে উপভোগ করেছেন। তাই দুঃখগুলো হারিয়ে গেছে, নেক কাজ ও তার কল্যাণ রয়ে গেছে। সুতরাং শোক ও দুশ্চিন্তায় ভুগে নিজেকে নিঃশেষ করবেন না। দুশ্চিন্তা ও নিন্দার মাধ্যমে অন্যকেও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবেন না।

আবার অনেক সময় আমরা সমস্যার সমাধান এমনভাবে করার চেষ্টা করি, যা মূলত সে সমস্যার সমাধান নয়।

আহনাফ বিন কায়স বনু তামীমের সরদার ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবল, ঐশ্বর্য বা বংশীয় মর্যাদার কারণে নেতৃত্ব লাভ করেননি, বরং সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছিলেন। একবার হিংসার বশবর্তী হয়ে কিছু লোক জনৈক নির্বোধ ব্যক্তিকে বললো, 'এই নাও, তোমাকে এক হাজার দিরহাম দেয়া হলো। তুমি গিয়ে বনু তামীমের সরদার আহনাফ বিন কায়সের গালে কষে একটা চড় মারবে!'

নির্বোধ ব্যক্তিটি তখনই রওয়ানা হলো। এসে দেখলো, আহনাফ বিন কায়স চাদর জড়িয়ে বসে আছেন। হাঁটু দু'টো উঁচু করে বুকে চেপে ধরা। গম্ভীর তার ভাব। আশেপাশের লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটি ধীর পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে এলো। আরো কাছে, আরো কাছে, একেবারে

মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছে এই ভেবে যেই না আহনাফ বিন কায়স তার দিকে মাথা উঠিয়ে তাকালেন, অমনি লোকটি হাত উঁচিয়ে তাঁর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলো! গাল ফেটে রক্ত বের হওয়ার উপক্রম হলো।

আহনাফ বিন কায়স কী করলেন? তিনি উত্তেজিত হলেন না। নিজেকে সামলে নিলেন। শান্তভাবে লোকটাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে কেন মারলে!?' লোকটি বললো, 'ওরা আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বনু তামীমের সরদারকে থাপ্পড় মারতে বলেছে।' তিনি বললেন, 'হায়! হায়! তুমি কী করলে! আমি তো বনু তামীমের সরদার নই!'

'তাহলে! বনু তামীমের সরদার তাহলে কোথায়?' আহনাফ বললেন, 'ওই যে লোকটা দেখছো একা একা বসে আছে, তরবারি পাশে রাখা। সেই বনু তামীমের সরদার।' আহনাফ বিন কায়স হারিসা বিন কোদামাকে দেখিয়ে দিলেন। হারিসা তখন রাগে ও ক্ষোভে ফুঁসছিলো। মনে হচ্ছিলো, তার একার ক্রোধ সব মানুষের মাঝে ভাগ করে দিলেও সবার ভাগে যথেষ্ট পড়বে!

লোকটা বললো, 'হ্যাঁ, দেখেছি। ওই তো বসে আছে।' আহনাফ বললেন, 'যাও, তাকে গিয়ে চড় মেরে এসো। সে-ই বনু তামীমের সরদার!' লোকটি হারিসার একেবারে কাছাকাছি চলে গেলো। তার চোখ থেকে তখন যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিলো। লোকটি তার কাছে গিয়ে থামলো। হাত উঁচিয়ে জোরে একটা থাপ্পড় মেরে দিলো। লোকটির হাত তার গাল থেকে সরানোর

পূর্বেই হারিসা হাতটি ধরে ফেললো এবং তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো! প্রবাদ আছে, ‘জয়ী তো সেই, যে শেষ হাসি হাসতে পারে।’

**প্রত্যয়...** ভুল পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হলে সমাধানের পথ কখনো বের হবে না, বরং নিজের কষ্টই বাড়বে।

# ৪৬. কিছু সমস্যার নেই কোনো সমাধান

অনেক সময় আমরা এমন সমস্যার সম্মুখীন হই, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের হাতে যার কোনো সমাধান নেই। তখন তা মেনে নিতে পারাটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু অনেক সময়ই আমরা তা পারি না। বরং সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাই। যেমন অনেককে দেখবেন, ড্রাইভিং করার সময় প্রচণ্ড রাগের বশে স্টিয়ারিং-এ বারবার ঘুষি মারছে আর বলছে, 'উ-ফ! অসহ্য! সারাদিন জ্যাম!'

কাউকে দেখবেন, প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যেন কারো কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। বিরক্ত হয়ে বারবার অস্ফুট স্বরে বলছে, 'ধ্যা-ত! এ-তো গ-র-ম!'

ঘটনাচক্রে কর্মক্ষেত্রে হয়তো আপনি এমন কারোরই সহকর্মী। তাহলে তো তার সঙ্গে আপনার প্রতিদিন দেখা হওয়াটাও একটা বিরক্তির ব্যাপার। এসে বসতে না বসতেই এটা সেটা বলে আপনাকে বিরক্ত করে তুলবে। 'ভাই! এত কাজ! একা কি এত কিছু করা যায়! উফ! কবে যে বেতন বাড়াবে?' প্রতিদিন সকালে অফিসে তার আগমন ঘটে মলিন বদনে আর বিকেলে প্রস্থান ঘটে বিরক্ত মনে। মাঝে মধ্যেই বলবে, 'শরীরটা খু-ব ব্যথা করছে! ছেলের শরীরটা খু-ব খারাপ!'

মোটকথা, আমরা প্রত্যেকেই জীবনে এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই-হচ্ছি, যার কোনো সমাধান নেই। আমাদেরকে এ বিষয়গুলো

স্বাভাবিকভাবেই নিতে হবে। জনৈক আরব কবি তার কবিতায় এ বিষয়টি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতার পঙক্তিগুলো হলো—

শুধালো আমায় পথিক, দেখো কী বিষণ্ণ আকাশ বাতাস,
বলো কেমনে থাকিবো ভালো?
বলিলাম, হেসে যাও তুমি, আকাশে-বাতাসে তবে হাসিবে আলো।

শুধালো পথিক, হারিয়েছে দেখো পূবালী হাওয়া,
বলো কোথা পাবো হৃদ-উষ্ণতা?
বলিলাম আমি, খুশি থাকো তুমি, তব কান্নায় দূর হবে কি বৈরী হাওয়ার বিষণ্ণতা!

শুধালো পথিক, যে ছিলো আমার হৃদয়ের রাণী, যাকে নিয়ে সদা স্বপ্ন বুনি,
চলে গেছে আজ বহুদূর সে, হৃদয় জুড়িয়া ব্যথার ধ্বনি।
চারদিকে তাই বেদনা-সাগর, পৃথিবীটা লাগে যন্ত্রণা,
হাসিবো কেমনে, ভাগ্যে আমার কেবলই শুধু বঞ্চনা।

বলিলাম আমি, বন্ধু আমার, তবু যদি চাও সঙ্গ তাহার,
দুঃখের বোঝা, বেদনার গ্লানি সদা সাথী হয়ে রবে যে তোমার।
শান্তি-পায়রা, সবুজ নিশানা দেখবে না আর জীবনে কভু,
অশান্তি আর কষ্টরা তবে হয়ে রবে যে তোমার প্রভু।

অভিযোগ তুলে কহিল পথিক, দেখো চারদিকে শত্রু মিছিল,
আসছে ভীষণ রুক্ষতায়, এইসব দেখে আনন্দ মোর কোথায় যে সব মিলিয়া যায়।

বলিলাম আমি, নিন্দা-কুৎসা পুড়ে যায় সদা তাদের জীবন,
চুপ থাকো তুমি, কীভাবে ওরা বলাবে তোমায় নিন্দা-বচন!
বড় হও তুমি, হও গো মহান, কণ্ঠে জড়াও সুখমালা,
তোমার জীবনে রুখবে কে বলো শান্তি-সুখের পথচলা!

আবার শুধালো সে, আঁধারে আঁধারে জীবনটা মোর সদা লাগে বড় রুক্ষ-বিস্বাদ—
জীবনের সব শান্তিগুলোর তাই শুধু আজ তিক্ত স্বাদ।
কহিলাম আমি, তিক্ত গিলেও খুশি থাকো হে, অশান্তি সব ঝেড়ে ফেলো
তোমায় দেখে বলবে সবাই, শান্তিবার্তা বাহক এলো।
বলো তো দেখি, দুঃখ-কষ্ট বয়ে কি তোমার একটি টাকাও হয় সাশ্রয়?
শান্তি-সুখের বাহক হয়ে একটি টাকাও হয় কি ক্ষয়?
তবে কোন দুঃখে জীবনে তুমি হাসতে জেনেও হাসবে না?
কোন সে সুখে বেদনার বোঝা ছাড়তে পেরেও ছাড়বে না?
তাই বলি ভাই, কাঁদিতে যে নাই, হাসি-খুশি থাকো সবসময়
সকলের লাগি জীবন যেন সুখের বার্তাবাহক হয়।
আর মনে রেখো, আঁধার রাতের তারারা যখন জ্বলতে থাকে মিটিমিটি,
হামলে পড়ে রাহুর আঁধার, আলো হয় যেন গুঁটিসুটি।
সংগ্রাম করে তবু জ্বলে থাকে, তারারাই হাসে শেষ হাসি,
তাই তো সর্ব যুগেই আমরা তারাদের বড় ভালোবাসি।

হ্যাঁ, জীবনকে এভাবেই উপভোগ করুন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আপনার আচরণে কেউ যেন কষ্ট না পায়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ঘরে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গেও আচরণের ক্ষেত্রে সজাগ থাকুন। যে ক্ষেত্রে তাদের কোনো অপরাধ নেই, সে ক্ষেত্রে তাদের কেন কষ্ট দেবেন? নিজের বিষণ্নতার কষ্ট তাদের ওপর কেন চাপিয়ে দেবেন? আর এটা এমন সমস্যা, যার সমাধান করা তো তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করবেন না, যার ফলে আপনাকে দেখলে বা আপনার কথা স্মরণ হলেই তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ হয়ে যায়।

বস্তুত এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির জন্য সুর করে কাঁদা, চিৎকার করা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মাথার চুল কামানো—এ জাতীয় কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মৃতের জন্য তো আমাদের করণীয় হলো—গোসল দেয়া, কাফন পড়ানো, জানাযা পড়া, দাফন করা এবং দোয়া করা। শোক ও মাতম কিংবা কান্না ও চিৎকারে তো মৃতের কোনো কল্যাণ হয় না। কেবল জীবিতদের আনন্দময় জীবনে বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে।

মাআফী বিন সুলাইমান একবার জনৈক সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটছিলেন। সঙ্গীটি হঠাৎ ভ্রু কুঁচকে মাআফী বিন সুলাইমানের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘উফ! আজ কী ঠাণ্ডা!’ মাআফী বললেন, ‘তুমি কি চাইলেই এখন নিজেকে উষ্ণ ও গরম করে তুলতে পারবে?’ সে বললো, ‘না’। মাআফী বললেন, ‘তাহলে

অযথাই অভিযোগ তুলে লাভটাই বা কী হলো? এরচে বরং একবার "সুবহানাল্লাহ" বললেও তো তোমার লাভ হতো।'

ভাবুন, কত চমৎকার, কত গভীর ছিলো মাআফীর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা!

**জীবনের বেঁচে থাকা...** খুঁজে খুঁজে সমস্যা বের করার চেষ্টা করবেন না। ছোট ছোট বিষয়ের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে যাবেন না। জীবনের আনন্দ খুঁজে ফিরুন, আর জীবনকে উপভোগ করুন।

# ৪৭. দুশ্চিন্তায় ভুগে নিজেকে নিঃশেষ করবেন না।

ভার্সিটিতে ‘সাদ’ নামে আমার একজন ছাত্র ছিলো। একবার পূর্ণ এক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকার পর সে উপস্থিত হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সাদ! সব ঠিকঠাক আছে তো?’ সে বললো, ‘তেমন কিছু না, একটু ব্যস্ত ছিলাম।’ অথচ তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিলো। আমি বললাম, ‘কী হয়েছে?’

সে বললো, ‘আমার ছেলে অসুস্থ। ওর লিভারে সমস্যা। কিছুদিন আগ থেকে আবার ব্লাড পয়জনিং (রক্তদূষণ) শুরু হয়েছে। এই গতকাল হঠাৎ চিকিৎসক জানালেন, জীবাণুর সংক্রমণ মস্তিষ্ক পর্যন্ত গেছে।’ আমি বললাম, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ভাই! ধৈর্য ধরো। দোয়া করতে থাকো, আল্লাহ যেন ওকে সুস্থ করে দেন। আর তাকদীরের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়েই থাকলে দোয়া করো, আল্লাহ যেন কেয়ামতের দিন ওকে তোমার জন্য সুপারিশকারী বানান।’ সে বললো, ‘সুপারিশকারী! স্যার! আমার ছেলে তো ছোট নয়।’

‘কত ওর বয়স?’

‘সতেরো বছর।’

‘আল্লাহ ওকে সারিয়ে তুলুন। ওর ভাই-বোনদেরও সুস্থ রাখুন।’

ধীরে ধীরে মাথা নুইয়ে সে বললো, ‘স্যার! ওর কোনো ভাই-বোন নেই। আমার এই একটিই সন্তান। ওরও এই অবস্থা হয়ে গেলো!’ ছাত্রটির অবস্থা সত্যিই বেদনাদায়ক ছিলো। তবুও আমি নিজেকে শক্ত রেখে বললাম, ‘সাদ! পরিস্থিতি যাই হোক, ভেঙে পড়ো না। আল্লাহ যা অবধারিত রেখেছেন, তাই হবে।’ এরপর তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম।

হ্যাঁ, আপনিও কখনো দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়বেন না। কেননা, দুশ্চিন্তা কখনোই সমস্যার পূর্ণ কিংবা আংশিক সমাধান করতে পারে না। মনে পড়ে, কিছু দিন আগে আমি মদীনায় গিয়েছিলাম। সেখানে খালিদের সঙ্গে দেখা হলো। সে বললো, ‘চলো, ডা. আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করে আসি।’ আমি বললাম, ‘কেন? কী হয়েছে?’ সে বললো, ‘সমবেদনা প্রকাশের জন্য।’ ‘সমবেদনা প্রকাশ?!’

সে বললো, ‘হ্যাঁ। তার বড় ছেলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পাশের শহরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। ভার্সিটিতে জরুরি কাজ থাকায় তিনি একাই শুধু মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় তারা সকলেই নিহত হন। পরিবারের এগারোজন সদস্য সকলেই!’

ডা. আব্দুল্লাহ সৎ ও নিষ্ঠাবান একজন ব্যক্তি। পঞ্চাশটি বছর পেরিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও ক্লান্ত হলেও তিনি তো একজন মানুষ। তারও আবেগ-অনুভুতি আছে, বক্ষ-পিঞ্জরে একটি অন্তর আছে, অশ্রুসজল দু'টি চোখ আছে। তার হৃদয়ও আনন্দে আপ্লুত হয়, দুঃখে ব্যথিত হয়। তিনি এমন একটি হৃদয়বিদারক খবর শুনলেন। তাদের জানাযাও

পড়লেন। এরপর নিজ হাতে এক এক করে মাটিতে রাখলেন কলিজার এগারোটি টুকরো।

তার বাড়ির ভেতর থমথমে পরিবেশ। তিনি হতবুদ্ধির মতো পায়চারি করেন ঘরের ভেতর। বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা খেলনাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কত দিন হয়ে গেলো খালূদ ও সারা এগুলো নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে না। ওরা যে আজ আর নেই। তিনি বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বিছানাটি এলোমেলো পড়ে আছে। তার স্ত্রী 'উম্মে সালেহ' তো আর নেই। ইয়াসিরের সাইকেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। সেই কবে থেকে নিশ্চল পড়ে আছে। এটি যে চালাতো, সেও তো আজ বেঁচে নেই।

লক্ষ্যহীন পদক্ষেপে একসময় বড় মেয়ের কামরায় প্রবেশ করেন। ঘরটা বিরান পড়ে আছে। বিয়ের লাগেজগুলো গুছিয়ে রাখা। কাপড়গুলো বিছানায় পড়ে আছে। সেও তাকে ফেলে চলে গেলো! সে তো বিয়ের সাজে সজ্জিত হচ্ছিলো!

সুবহানাল্লাহ! ধৈর্য তো আল্লাহর দান! এত বড় ঝড়-ঝাপটার পরও কী আশ্চর্য ধৈর্য তার! কী দৃঢ় মনোবল তার! মেহমানরা আসতে নিজেরাই সঙ্গে চা-কফি নিয়ে আসছেন। কারণ বাড়িতে তার কোনো খাদেম বা সাহায্যকারীও নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সমবেদনামূলক কিছু বলতে গেলে তিনিও আপনাকে সায় দেবেন। তিনিও সমবেদনার শব্দ বলতে শুরু করবেন। অবস্থা দেখে আপনার মনে হবে, তিনি হয়তো সমবেদনা জানাতে আসা মেহমানদের একজন আর এত বড় ট্র্যাজেডি ও দুর্ঘটনার শিকার

ব্যক্তিটি অন্য কেউ। তিনি বারবার বলছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! যা দিয়েছেন, যা নিয়েছেন সবই তো আল্লাহর দান! দেয়া ও নেয়া তো তারই শান! প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই তার ইলমে আছে নির্দিষ্ট সময়-নির্ধারিত আজাল।'

বস্তুত এটাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যদি তিনি এমন না করতেন, চিন্তায় ও দুশ্চিন্তায় নিজেও শেষ হয়ে যেতেন। আমার পরিচিত এক লোক, যখনই তাকে দেখি, সুখী বলে মনে হয়। সংক্ষেপে যদি তার অবস্থা বর্ণনা করি, তবে তা এমন: খুবই অল্প বেতনের চাকুরী, ছোট্ট একটি ভাড়া বাসা, পুরনো একটি গাড়ি, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে... এরপরও তিনি সব সময় হাসি-খুশি, সকলের প্রিয়। ভালোই চলছে তার জীবন।

তো দুশ্চিন্তায় ভুগে নিজেকে কুঁড়ে কুঁড়ে শেষ করবেন না। নিজের সমস্যার কথা মানুষের কাছে একের পর এক বলতেই থাকবেন না। তাহলে তারা আপনার প্রতি বিরক্ত হয়ে যাবে। যেমন কারো একটি প্রতিবন্ধী ছেলে আছে। যখনই আপনার সঙ্গে দেখা হয়, বলতে শুরু করে, 'আমার ছেলেটা অসুস্থ। ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। ছেলেটা আমার বড় অসহায়...' তখন দেখবেন, আপনিও একসময় প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করছেন। আপনার হয়তো চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'ভাই! অনেক হয়েছে। আমরা বুঝেছি। এবার একটু নিষ্কৃতি দিন!' অথবা কারো স্ত্রী হয়তো সারাক্ষণ তার সঙ্গে ঘ্যানর ঘ্যানর করে, 'আমাদের বাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে! গাড়িটা তো প্রায় ভেঙেই গেছে! এই সব কাপড়ের কি এখনো দিন আছে?' বলুন তো, কী

লাভ এ ধরণের অভিযোগ করে? শুধু কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আর কি কিছু হয়? কবি কত চমৎকার বলেছেন—

হতভাগা! হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের মাঝেই জীবনটা শেষ করলে!
হাত-পা গুটিয়ে আছো বসে আর বলছো, 'যুগ আমার প্রতিকূলে!'
কে নেবে দায়িত্ব তোমার, তুমি নিজেই স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হলে!

**আলোকিত চিন্তা...**

নিজের কাছে যা আছে তাই নিয়ে জীবন যাপন করতে থাকুন।

ইনশাআল্লাহ, আপনি সুখী হবেন।

# ৪৮. আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন

একবার কয়েকটি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণের জন্য আমি এক শহরে সফর করলাম। বেশ বড় একটি মানসিক হাসপাতাল থাকার কারণে শহরটির নাম লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিলো। মানুষ অবশ্য মানসিক হাসপাতালকে সহজ ভাষায় বলে 'পাগলগারদ' বা 'মেন্টাল হাসপাতাল'। সেখানে গিয়ে আমি সকাল থেকে পর পর দু'টি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ শেষে বের হলাম। যোহরের আযানের তখনও এক ঘণ্টা বাকি। আমার সঙ্গে শায়খ আ. আযীযও ছিলেন। তিনি একজন স্পষ্টভাষী দায়ী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। আমি গাড়িতে বসে তাকে বললাম, 'ভাই! যেহেতু আমাদের হাতে ঘণ্টাখানেক সময় আছে তাই আমি এখানকার একটা জায়গা একটু ঘুরে দেখতে চাচ্ছিলাম।'

তিনি বললেন, 'কোথায় যেতে চাচ্ছেন? আপনার বন্ধু শায়খ আবদুল্লাহ তো এখন সফরে আছেন। আর ড. আহমদকে আমি ফোন করেছিলাম। তিনি রিসিভ করলেন না। এখন বরং এখানকার প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহশালাটি ঘুরে দেখা যেতে পারে কিংবা...'

আমি বললাম, 'না, না, আমি একটু মানসিক হাসপাতালটা ঘুরে দেখতে চাই।'

তিনি বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'পাগলদের দেখতে যাবেন?!'

'হ্যাঁ, পাগলদের দেখতে যাবো।' আমি বললাম।

তিনি হেসে রসিকতা করে বললেন, 'কেন, আপনি কি আপন মগজ

সম্বন্ধে আশ্বস্ত হতে চাইছেন?'

আমি বললাম, 'না, তবে নিজের ফায়দার জন্যই যাচ্ছি। সেখান থেকে কিছু শিখতে চাই, কিছু উপলব্ধি অর্জন করতে চাই এবং আমাদের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতাবোধ জাগরিত করতে চাই।'

আ. আযীয সাহেব কিছু সময় চুপ করে তাদের অবস্থা একবার চিন্তা করলেন। আমি অনুভব করলাম, তিনি বেশ ব্যথিত। কারণ তিনি যথেষ্ট আবেগী মানুষ। তিনি তার গাড়িতে করেই আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমরা গুহাসদৃশ একটি ভবনের কাছে থামলাম। জায়গাটি চতুর্পার্শ্বে গাছ-গাছালিবেষ্টিত। কেমন যেন মন বিষণ্ণ করা পরিবেশ।

জনৈক চিকিৎসক আমাদের স্বাগত জানালেন এবং হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। আমাদেরকে রোগীদের নানা রকম কষ্টের কথা বললেন। সঙ্গে এও বললেন যে, শোনা আর দেখা কখনো এক হয় না। (বাস্তবতা আরো করুণ, আরো কষ্টদায়ক।)

একটি লম্বা করিডোর পার হওয়ার সময় বিভিন্ন দিক থেকে আমরা নানা ধরণের আওয়াজ শুনছিলাম। করিডোরের দু'পাশে রোগীদের ওয়ার্ড। আমরা ডানদিকের একটি রুম পার হয়ে গেলাম। ভেতরে লক্ষ করলাম, দশটির বেশি বেড খালি পড়ে আছে। শুধু একটিতে একজন লোক শুয়ে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে। আমি ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এর কী হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'ও পাগল। প্রতি পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর পর মৃগীরোগ প্রকাশ

পায়, শরীরে খিঁচুনি ওঠে।'

আমি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করলাম। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন যাবৎ তার এ অবস্থা?'

তিনি বললেন, 'দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে।'

চোখের পানি আড়াল করে নীরবে সামনে অগ্রসর হলাম।

কয়েক পা এগুতেই আরেকটি কামরা সামনে পড়লো। দরজা তালাবদ্ধ। ভেতরে দেখার জন্য দরজায় কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতর থেকে একজন লোক ইশারায় আমাদেরকে কী যেন বোঝাচ্ছিলো। আমরা তার ইশারার আগা-গোড়া কিছুই বুঝলাম না। আমি উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। দেয়াল ও মেঝের সবটাই বাদামী রঙের। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এর কী হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'কী আর হবে! পাগল আর কী!'

মনে হলো, ডাক্তার সাহেব আমার প্রশ্নে কৌতুক বোধ করছেন। তাই তাকে বললাম, 'ভাই! আমি তো জানি যে, সে একজন মানসিক রোগী। ভালো হলে তো আর তাকে এখানে দেখা যেতো না। তার কী হয়েছে, এটাই জানতে চাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'দেয়াল দেখলেই এই লোকটির মাথায় রক্ত উঠে যায়। দেয়ালে কিল-ঘুষি-চড় মারতে থাকে। কখনো লাথি, কখনো মাথা ঠুকতে থাকে। কোনো দিন হাতের আঙুল ফেটে যায়, কোনো দিন পা কেটে যায়। আবার কোনো দিন মাথা ফাটিয়ে ফেলে।' এরপর ডাক্তার সাহেব কষ্টে মাথা নিচু করে ফেললেন আর বললেন, 'তার রোগের কী চিকিৎসা,

আমরা ধরতে পারছি না। তাই তাকে এই ঘরে আটকে রেখেছি। এটার দেয়াল ও মেঝেতে ফোম লাগানো। যখন যেভাবে খুশি আঘাত করুক গিয়ে...।’

ডাক্তার সাহেব থেমে গিয়ে আমাদের সামনে হাঁটা শুরু করলেন। তখনো আমি ও আমার বন্ধু ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মৃদু আওয়াজে শুধু বললাম, «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ» অর্থ: প্রশংসা সমস্তই আল্লাহর, যিনি এদের মতো পরীক্ষায় আমাদেরকে ফেলেননি।

ওয়ার্ডের মাঝ দিয়ে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটি হলরুমের সামনে দাঁড়ালাম। এ কক্ষে কোনো বিছানা নেই। ত্রিশজনের বেশি মানুষ হবে এখানে। একেকজনের একেক অবস্থা। কেউ আযান দিচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কেউ শুধু ঘুরছে, কেউ নাচছে। এদের মধ্যে তিনজনকে চেয়ারে বসিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। এরা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর ঘোরার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই লোকগুলোর কী সমস্যা? আর সবাইকে না বেঁধে এদেরকেই বা বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?’ ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘এরা সামনে যা পায় তার ওপরই চড়াও হয়। জানালা, এয়ার কন্ডিশনার, দরজা সব ভেঙে ফেলে। এজন্য বাধ্য হয়ে ওদেরকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এভাবে বেঁধে রাখতে হয়।’

অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কতদিন হলো তারা এ অবস্থায় আছে?’

তিনি বললেন, ‘এ এসেছে দশ বছর হলো। ও সাত বছর। আর এই লোক নতুন এসেছে, মাত্র পাঁচ বছর হলো!’ ওদের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করতে করতে হলরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় বিগলিত হলো। তিনিই আমাদেরকে এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘বের হওয়ার পথ কোন দিকে?’ ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘এখনো একটা কক্ষ বাকি আছে। হয়তো ওখানে আপনি নতুন কোনো উপদেশ অর্জন করতে পারবেন।’ এই বলে তিনি আমার হাত ধরে বড় একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। দরজা খুলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। এ ঘরের অবস্থাও আগেরটার মতো। অনেক রোগী এখানে। একেকজনের একেক অবস্থা। কেউ নাচছে। কেউ ঘুমাচ্ছে এবং... আশ্চর্য! এ আমি কী দেখছি!

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের একজন লোক, চুল-দাড়ি পেকে গেছে। হাত-পা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে অনেকটা উপুড় হয়ে বসে আছে। আমাদের দিকে ভয়ে ভয়ে নজর বোলাচ্ছিলো। এ সবই স্বাভাবিক দৃশ্য। কিন্তু যে বিষয়টি দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম, বরং বলা ভালো আঁতকে উঠলাম তা হলো, লোকটি ছিলো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র! এক টুকরো সুতাও নেই তার শরীরে! আমার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো। রাগে চোখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তড়িৎ ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালাম।

ডাক্তার সাহেব আমার চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখে বললেন, ‘অনুগ্রহ করে উত্তেজিত হবেন না। আমি তার ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলছি। এই লোকটিকে যখনই আমরা কোনো কাপড় পরিয়েছি, সে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমরা একদিনে তাকে দশবারে দশটা কাপড়ও পরিয়েছিলাম, সবগুলোর একই দশা করেছে। এই লোকটা শরীরে একটা সুতাও রাখতে চায় না। তাই আমরা ওকে শীতে-গ্রীষ্মে এভাবেই ফেলে রাখি। আর যেহেতু এর আশপাশের সবাই মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত, তাই তারা কিছুই মনে করে না।’

আমি ঘরটি থেকে বেরিয়ে এলাম। একটু সময়ও আর সেখানে থাকতে পারছিলাম না। ডাক্তারকে বললাম, ‘আমাকে অনুগ্রহ করে বের হওয়ার দরজা দেখিয়ে দিন।’

তিনি বললেন, ‘আরো কিছু বিভাগ পরিদর্শন তো বাকি রয়ে গেছে।’

আমি বললাম, ‘যা দেখলাম, তাই যথেষ্ট।’

ডাক্তার হেঁটে চললেন। আমরাও সঙ্গে চললাম। তিনি একের পর এক কক্ষ পার হতে লাগলেন, আমরাও নিশ্চুপ তার পেছন পেছন চলছিলাম। হঠাৎ ডাক্তার সাহেব এমন ভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ‘জনাব! ইনি বড় একজন শিল্পপতি। কোটিপতি মানুষ। হঠাৎ মানসিক সমস্যা দেখা দেয়ায় তার ছেলেরা এখানে এনে রেখে গেছে প্রায় দুই বছর হলো। আর ওখানে একজন আছেন, তিনি ছিলেন নামকরা এক কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার। আরেকজন...।’ এভাবে ডাক্তার সাহেব এমন অনেকের কথা বলতে লাগলেন যাদের একসময় সম্মান-

প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পত্তি সব ছিলো। আজ তাদের অসম্মানের-অপদস্থতার জীবন কাটাতে হচ্ছে।

রোগীদের কক্ষ দু'পাশে রেখে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, মহান আল্লাহর কী কুদরত! রিযিক বণ্টন করেছেন। কাউকে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন, কাউকে দেননি। আবার কাউকে ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, পদমর্যাদা সব দিয়েছেন, কিন্তু তুলে নিয়েছেন বুদ্ধি-বিবেক। তাই তো প্রচুর সম্পদের অধিকারী, সুঠাম দেহের অধিকারী লোককেও আপনি বন্দি দেখতে পাবেন 'মানসিক হাসপাতালে'। আরেকজনকে হয়তো দান করা হয়েছে বংশমর্যাদা, সম্পদ প্রাচুর্য, ঈর্ষণীয় মেধা ও জ্ঞানগরিমা কিন্তু তার থেকে তুলে নেয়া হয়েছে সুস্থতার নেয়ামত। তাই সে বিছানায় শুয়ে কাটাচ্ছে বিশ-ত্রিশ বছর। বংশমর্যাদা, সম্পদ প্রাচুর্য তার কোনোই কাজে আসেনি। আবার কাউকে আল্লাহ পাক দান করেছেন সুস্থতা, দেহসামর্থ্য ও বুদ্ধি-বিবেক কিন্তু তার নেই আর্থিক প্রাচুর্য। তাই হয়তো সে হাটে-বাজারে মজুরি করছে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি করছে। কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও নিয়মিত দু'বেলা দু'মুঠো আহার তাদের ভাগ্যে জুটছে না। এভাবেই আল্লাহ কাউকে দেন, কাউকে বঞ্চিত করেন।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আয়ে ۝৬৮ [সূরা কাসাস]

অর্থ: তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন, এবং (যা চান) বেছে নেন।

তাদের এতে কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র ও সমুচ্চ।

সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। সুতরাং বিপদ ও কষ্টের বস্তুগুলোকে গণনা করার আগে সকলের উচিত আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতসমূহকে জানতে চেষ্টা করা, উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহ আপনাকে অর্থ-সম্পদ দেননি, কিন্তু সুস্থতা তো দান করেছেন। সুস্থতা হয়তো দেননি, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেক তো দান করেছেন। আপনাকে অর্থ-সম্পদ, বিচার-বুদ্ধি কিছুই হয়তো দেয়া হয়নি, কিন্তু আল্লাহ যে আপনাকে দান করেছেন ইসলামের মহা দৌলত। ধন্য আপনার জীবন! ধন্য আপনার মরণ! যদি ইসলাম সম্পদকে সঙ্গী করে কাটে আপনার জীবন, আর কিছু না পেলেও আপনি সব পেয়েছেন। অভিনন্দন আপনাকে! তাই এক্ষুণি হৃদয়ের গভীর থেকে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে সজোরে উচ্চারণ করুন—'আলহামদু লিল্লাহ'।

এমনই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যাতুস সালাসিলের' যুদ্ধে আমর বিন আস রাযি.কে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করলেন। আমর সেখানে গিয়ে দেখলেন, শত্রুপক্ষের লোক অনেক বেশি। তাই তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীতে আবু বকর রাযি. ওমর রাযি. ন্যায় প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণও ছিলেন। কাফেলা রওয়ানা

হওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু ওবায়দাকে বলে দিলেন, 'আমর বিন আস ও তুমি কোনো মতানৈক্যে জড়াবে না।'

আবু ওবায়দা রাযি. রওয়ানা হলেন। পৌঁছার পর আমর বিন আস রাযি. তাকে বললেন, 'আপনি তো আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। পুরো কাফেলার আমীর আমিই।' আবু ওবায়দা বললেন, 'না, বরং আমি আমার মতো থাকবো, আপনি আপনার মতো থাকবেন। আমি আমার সঙ্গে আসা সাথীদের আমীর, আর আপনি আপনার সঙ্গে থাকা সাথীদের আমীর।' আবু ওবায়দা রাযি. সহজ সরল মানুষ ছিলেন। তার কাছে দুনিয়া ছিল মূল্যহীন। আমর বললেন, 'না, (আমিই আমীর), আপনি কেবল আমাদের সাহায্যকারী।'

আবু ওবায়দা রাযি. বললেন, 'আমর! আসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "তোমরা দু'জন কোনো বিষয়ে মতানৈক্য করো না।" সুতরাং আপনি আমার বিরোধিতা করলেও আমি আপনার আনুগত্য করবো।' আমর আবারও বললেন, 'আমি আপনারও আমীর, আপনি শুধুই সাহায্যকারী।' আবু ওবায়দা রাযি. আমর রাযি.-এর রায় মেনে নিলেন। আমর রাযি. অগ্রসর হয়ে সকলের নামাযের ইমামতি করলেন।

যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম যিনি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন, তিনি হলেন আওফ বিন মালিক রাযি.। মদীনায় পৌঁছে তিনি হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নবীজী তাকে দেখতেই বললেন, 'আওফ! অভিযানের খবর শোনাও।' তিনি

অভিযানের পূর্ণ বিবরণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শোনালেন এবং আমর বিন আস রাযি. ও আবু ওবায়দা রাযি.-এর মাঝে যা ঘটেছে তাও জানালেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. কে রহম করুন।’ হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.কে রহম করুন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কেমন করে মেনে নিতে হয় সবকিছু।

**একটি চিন্তা...**

জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলোর কথা চিন্তা করার পূর্বে আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়গুলোর দিকে তাকান। জীবন আনন্দের হবে, আপনি সুখী হবেন।

# ৪৯. পাহাড়ের মত অটল হোন

দাওয়াতের ময়দানে পদচারণার একদম শুরুর দিকের কথা। একটি গ্রামে আলোচনা করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সেখানকার দাওয়াতের দায়িত্বশীল ভদ্রলোক আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি তার গাড়িতে উঠলাম। গাড়িটি পুরনো, ভগ্নপ্রায়। আমি তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম আর গাড়ি এগিয়ে চলছিলো। কথাবার্তার এক ফাঁকে তিনি আমাকে জানালেন যে, তিনি সদ্য বিয়ে করেছেন। তিনি অভিযোগ করলেন, তাদের এলাকায় বিয়েতে মাত্রাতিরিক্ত মোহর ধার্য করা হয়। তিনি এও জানালেন যে, এ জন্যই তিনি নতুন গাড়ি বা ন্যূনপক্ষে এর চেয়ে ভালো গাড়ি কিনতে পারেননি। আমি দোয়া করলাম, আল্লাহ যেন তাকে ভালো গাড়ি কেনার তাওফীক দান করেন।

এরপর মসজিদে গিয়ে বয়ান করলাম। বয়ান শেষে আমাকে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন পড়ে শোনানো হলো। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো অতিরিক্ত মোহর ধার্য করা সম্পর্কে। প্রশ্নটি পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম এবং স্বগতোক্তি করলাম, ‘বাছা! দেখো, মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি!’ এরপর আমি অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ ও তরুণ-তরুণীদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। বললাম, ‘হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়েদেরকে পাঁচশত দিরহামের বেশি মোহরে বিবাহ দেননি।’ এরপর স্বর উঁচু করে বললাম, ‘তাহলে কি বিষয়টি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, আপনাদের বংশের মেয়েরা নবীকন্যা হতেও সুন্দরী?!’

এ কথা বলতেই এক পাশ থেকে জনৈক বৃদ্ধ চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের মেয়েদের নিয়ে কথা বলার কে?' উত্তেজিত আরেকজন বললো, 'কী! আমাদের ঘর-কন্যা নিয়ে সমালোচনা!' তৃতীয় আরেকজন উত্তেজনায় হাঁটুতে ভর করে প্রায় দাঁড়িয়ে গেলো। সে বললো, 'এত বড় স্পর্ধা! আমাদের মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে!'

আমি এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। দাওয়াতি জীবনের সূচনা মাত্র। সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়েছি। চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বললাম না। প্রথমজন যখন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে কেবল মুচকি হাসলাম। দ্বিতীয়জন কথা বলার সময়ও তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। তৃতীয়জনের ক্ষেত্রেও তাই।

মসজিদের পেছনের অংশে কিছু যুবক বসে ছিলো। তাদের কেউ কেউ আমার দুরবস্থা দেখে হাসছিলো, কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাণ্ড দেখছিলো। তারা যেন আমার অবস্থা দেখে বলছিলো, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'! আমাকে নীরব-নির্বাক বসে থাকতে দেখে সকলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। তাদের একজন দাঁড়িয়ে বললো, 'সকলে থামুন। হুজুর কী বলতে চান, স্পষ্ট করে বলার সুযোগ তো দিন।' তার এ কথায় সবাই চুপ হয়ে গেলো। আমি লোকটির পদক্ষেপের শুকরিয়া আদায় করলাম। প্রথমে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ায় ওযরখাহী করলাম। তাদের এবং তাদের বংশীয় কন্যাদের প্রশংসা করলাম। এরপর আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললাম।

আপনি যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, ওঠা-বসা করেন, বিভিন্ন আচরণ করেন তখন প্রকৃতপক্ষে আপনি নিজের ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ করেন। তাদের মস্তিষ্কে আপনার একটি ভাবমূর্তি অঙ্কন করেন। আপনার কথা-বার্তা, আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে তাদের মস্তিষ্কে যে ধারণা অঙ্কিত হয়, তার ওপর ভিত্তি করে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, আপনার সঙ্গে তারা কেমন আচরণ করবে, আপনাকে কী পরিমাণ সম্মান করবে।

মনে রাখবেন, বাতাসের গতিবেগ যত বেশি, যত তীব্রই হোক; শেকড় মজবুত থাকলে বৃক্ষ তাতে কখনোই উপড়ে যায় না। আর বিজয় তো হলো সামান্য সময়ের ধৈর্যেরই নাম। আপনার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা যত বৃদ্ধি পাবে, অজ্ঞতা তত হ্রাস পাবে। মূল্যবোধ যত বাড়বে, ক্রোধ তত হ্রাস পাবে। এর দৃষ্টান্ত হতে পারে সাগর, নিজে উত্তাল না হলে কেউ তাকে উত্তাল করতে পারে না। দৃষ্টান্ত হতে পারে পাহাড়, প্রচণ্ড ঝড়ও যাকে এক বিন্দু টলাতে পারে না।

মোটকথা, কেউ যদি আপনাকে উত্তেজিত করার মতো কোনো কাজ করে—হোক মজলিসে কিংবা বাড়িতে, কোথাও সাক্ষাৎকার দানকালে কিংবা বক্তৃতার মজলিসে—আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনি যদি উত্তেজিত না হয়ে শান্ত থাকেন, কোনো প্রকার ক্রোধের ভাব প্রকাশ না করেন, মানুষ আপনার প্রতিই ঝুঁকে যাবে, আর তার বিপক্ষে চলে যাবে। এটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য।

আবু সুফিয়ান বিন হারব ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরছিলো। মুসলমানগণ তাদের ওপর হামলা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবু সুফিয়ান কৌশলে কাফেলা নিয়ে পালিয়ে গেলো। এদিকে মক্কায় কোরাইশগণ তাদের ব্যবসায়ী কাফেলার সম্ভাব্য আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে অস্ত্রসজ্জিত বিরাট এক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়লো। বদর প্রান্তরে সংঘটিত হলো ইসলামের প্রথম জিহাদ, হক-বাতিলের লড়াই। মুসলমান ও কোরাইশদের মাঝে যুদ্ধ হলো। মুসলমানগণ জয়লাভ করলেন। কোরাইশ কাফিরদের সত্তরজন নিহত হলো, বন্দি হলো আরো সত্তরজন। যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলো; ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে আর ক্ষুধায় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো রকমে পালিয়ে এলো মক্কায়।

কৌশলে পালিয়ে আসা আবু সুফিয়ানের কাফেলা মক্কায় পৌঁছে প্রত্যক্ষ করলো পরাজিত কোরাইশ বাহিনীর করুণ দশা। আবদুল্লাহ বিন আবী রাবীয়া, ইকরিমা বিন আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়াসহ বদর প্রান্তরে যারা নিজেদের পিতা-পুত্র-ভাইদের হারিয়েছে তারা সকলে মিলে আবু সুফিয়ানের কাছে গেলো। বাণিজ্য-কাফেলায় যাদের বিনিয়োগ ছিলো তাদেরকে তারা বললো, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ তোমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতাদের হত্যা করেছে। সুতরাং তোমাদের সম্পদ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা যা করেছিলো, তার বর্ণনা পবিত্র কোরআন মাজীদে এভাবে এসেছে:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ

عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ
আয়ে ৩৬ [সূরা আনফাল]

অর্থ: যারা কুফরি অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা দেয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং (ফল এই হবে যে,) তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করবে, তারপর তা তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে, এরপর তারা পর্যুদস্ত হবে। আর যারা কুফরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামে জড়ো করা হবে।

কোরাইশগণ সকলে কোমর বেঁধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো তাদের অনুসারী দু'গোত্র বনু কিনানা ও বনু তিহামা। যুদ্ধে বের হওয়ার সময় সবাই নিজ নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিলো, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পুরুষদের পালানোর কোনো পথ না থাকে। আবু সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দা বিনতে ওতবাকে সঙ্গে নিলো। ইকরিমা বিন আবু জাহল তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেসকে নিয়ে বেরুলো। হারেস বিন হিশাম সঙ্গে নিলো তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে ওলীদ বিন মুগীরাকে।

কোরাইশ বাহিনী রওয়ানা হলো। মদীনার মুখোমুখি উপত্যকার প্রান্তে তারা তাঁবু গাড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশ বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নবীজী তাদের বললেন, 'আমরা মদীনাতেই অবস্থান করি। তারা মদীনায় প্রবেশ করলে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবো। এ ব্যাপারে তোমাদের মত কী?'

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এমন কয়েকজন সাহাবী বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে ওহুদ প্রান্তরে তাদের মোকাবেলা করবো।’ তারা এ কথা বলেছিলো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতো ফযীলত লাভের আশায়। তাদের বারংবার পীড়াপীড়িতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদে গমনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে বের হয়ে এলেন। নবীজীকে যুদ্ধসাজে দেখে পীড়াপীড়িকারীরা লজ্জিত হলো এবং বুঝতে পারলো যে, তারা নবীজীকে মদীনা হতে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে একরকম বাধ্য করেছে। তাই তারা বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে মদীনায় অবস্থানের সিদ্ধান্তও দিতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যুদ্ধসাজে সজ্জিত হওয়ার পর ততক্ষণ পর্যন্ত তা ত্যাগ করা কোনো নবীর পক্ষে সমীচীন নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা নবী ও তার শত্রুদের মাঝে কোনো ফায়সালা করেন।’

আবু সুফিয়ানসহ কোরাইশ পৌত্তলিক বাহিনী যখন ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিলো, বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম শত্রুর মুখোমুখি হবেন ভেবে খুশি হলেন। তারা বলতে লাগলেন, ‘আল্লাহ আমাদের আশাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।’

নবীজী সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘শত্রুপক্ষের অবগতি ছাড়াই ভিন্ন কোনো সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে আমাদের দ্রুত নিয়ে যেতে পারে, এমন কেউ

আছে কি?’ হারেসা বিন হারেস গোত্রের জনৈক সাহাবী আবু খাইসামা দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ‘আমি পারবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ।’

আবু খাইসামা মুসলিম বাহিনীকে বনু হারেসার বিভিন্ন পথ ও শস্যক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে নিয়ে চললেন। এ পথ ধরে যাওয়ার সময় মুসলিম বাহিনীকে মিরবা' বিন কায়যীর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে হলো। সে ছিলো এক দৃষ্টিশক্তিহীন মুনাফিক। নবীজী ও মুসলিম বাহিনীর আগমন অনুধাবন করতে পেরে সে মুসলমানদের দিকে ধুলো-মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো। আর বলতে লাগলো, ‘আপনি যদি আল্লাহর রাসূল হন তবে জেনে রাখুন আমার বাগানে আপনার প্রবেশের অনুমতি নেই।’ এরপর সেই হতভাগা বড় একটি মাটির চাকা হাতে নিয়ে বললো, ‘খোদার কসম হে মুহাম্মাদ! আমি যদি নিশ্চিত জানতাম যে, এই মাটির চাকা নিক্ষেপ করে তোমাকে লাগাতে পারবো তাহলে অবশ্যই এটা তোমার মুখে মারতাম।’

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং তাকে উচিত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু নবীজী তাদেরকে নিবৃত্ত করে বললেন, ‘তাকে মেরো না। সে তো অন্ধ। তার চোখও অন্ধ, অন্তর্চক্ষুও অন্ধ।’ নবীজী পথ ধরে সামনে চলে গেলেন। হতভাগা অন্ধ মুনাফিকের দিকে ফিরেও তাকালেন না। কারণ তিনি ছিলেন গাম্ভীর্য, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার আধার। নির্বোধদের কথায় তিনি কান দিতেন না। তুচ্ছ কারণে তিনি উত্তেজিত হতেন না। কবি কত চমৎকার বলেছেন—

বন্ধু! পথের পাশে চিৎকার করা সব কুকুরকেই যদি পাথর ছুঁড়ে মারতে যাও,
তাহলে একসময় পাথরকে এক তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে কিনতে হবে! পথের ধারে কত কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে... আর কাফেলাও চলতে থাকে আপন গন্তব্যে, অবিরাম... কাফেলার সময় কোথায় পিছু তাকাবার, ঘেউ ঘেউ থামাবার!

**প্রত্যয়...** বায়ু কখনো পাহাড়কে নাড়াতে পারে না কিন্তু বায়ু বালুকে নিয়ে খেলা করে বালুকে যেমন ইচ্ছা তেমন বানাতে পারে... পাহাড়কে নয়।

# ৫০. মদ পান করেছে! তাই বলে অভিশাপ দেবেন না!

আমরা অনেকের সঙ্গেই ওঠাবসা করি। তাদের কেউ কেউ নানা অন্যায়-অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রত্যেকের মাঝেই কোনো না কোনো ভালো গুণ অবশ্যই আছে। আমরা যদি সেই ভালো দিকটি খুঁজে বের করতে পারি, তবে সেটাই হবে উত্তম। বড় ধরণের এক অপরাধী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, সে মানুষের বাসা-বাড়িতে চুরি-ডাকাতি করে বেড়াতো। আর লুণ্ঠিত সম্পদের একটি অংশ অসহায় এতিমদের কল্যাণে ব্যয় করতো! কখনও আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণ করতো! এমন অসহায় মহিলার কথাও আপনি শুনতে পাবেন, যে শুধু ক্ষুধার্ত এতিমদের মুখে দু' মুঠো খাবার তুলে দিতে পতিতাবৃত্তি করছে। কবি বলেন—

হারাম অর্থে সে গড়তে চায় আল্লাহর ঘর মসজিদ
আল্লাহর দয়ায় হয়নি তাহার এ নেক কাজের তাওফীক!
সম্ভ্রম বেচে এতিমের মুখে তুলে দিতে চাও আহার
ধিক তোমাকে! ব্যভিচার ছাড়ো, নাই প্রয়োজন সদকার!

ধারালো অস্ত্র হাতে মানুষ খুন করতে উদ্যত সন্ত্রাসী ছোট্ট শিশু কিংবা অসহায় নারীর করুণ আবেদনে থমকে দাঁড়িয়েছে এবং হাতের অস্ত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। এই ঘৃণিত সন্ত্রাসীর মনের গহীনেও আছে কোমল একটি অংশ। তাই প্রথমেই কারো প্রতি মন্দ ধারণা

পোষণ না করে তার ভালো গুণটির কথা স্মরণ করুন এবং তার সঙ্গে সদাচরণ করুন।

আমাদের প্রিয়তম নবী রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও মহৎ একটি গুণ ছিলো এই যে, তিনি অপরাধীর ওযর-আপত্তি তালাশ করতেন এবং পাপিষ্ঠদের প্রতি ভালো ধারণা রাখতেন। কোনো অপরাধীর মুখোমুখি হলে তার অপরাধ ও প্রবৃত্তিদাসত্বের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে তার ঈমানের গুণকে বড় করে দেখতেন। কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করতেন না। সবার সঙ্গে স্বীয় পুত্র ও আপন ভাইয়ের মত আচরণ করতেন। নিজের জন্য যেমন ভালোটা পছন্দ করতেন তেমনি সবার জন্য ভালোকেই বেছে নিতেন।

নবীজীর যুগে জনৈক ব্যক্তি প্রায়ই মদ পান করতো। একদিন লোকেরা তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নবীজীর কাছে নিয়ে এলো। নবীজীর নির্দেশে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। কিছুদিন অতিবাহিত হলো। আবার সে মদ পান করলো। নবীজীর কাছে নিয়ে আসা হলে আবারও বেত্রাঘাত করা হলো। এভাবে কেটে গেলো আরো কিছু দিন। একদিন তাকে আবার নিয়ে আসা হলো। আবার সে মদ পান করেছে। নবীজী এবারও তাকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। নবীজীর দরবার থেকে যখন লোকটি বের হচ্ছিলো, জনৈক সাহাবী বলে উঠলেন, 'তার ওপর আল্লাহর লানত হোক! একই কাজ সে আর কত বার করবে!'

এ কথা শুনে নবীজীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি সেই সাহাবীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ‘তাকে অভিশম্পাত করো না। আল্লাহর শপথ! আমি তো জানি, সে আল্লাহ-আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে।’ [সহীহ বুখারী: ৬২৮২]

কাজেই মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা ও আচার-ব্যবহারের সময় ভারসাম্য বজায় রাখুন। তাদের ভালো গুণগুলো অকৃপণভাবে স্মরণ করুন, আলোচনা করুন। তাদেরকে এ কথা উপলব্ধি করতে দিন যে, সমূহ অপকর্ম সত্ত্বেও তাদের গুণগুলো আপনি ভুলে যাননি। তখন তারা আপনার অনেক কাছের মানুষে পরিণত হবে।

**শিক্ষা...** মানুষের ভেতরের মন্দ বৃক্ষটি উপড়ে ফেলার আগে খুঁজে বের করুন তার গুণের বৃক্ষটি, এবং প্রথমে তাতেই জল সিঞ্চন করুন।

# ৫১. যা চাচ্ছেন তা যখন হচ্ছে না, যা হচ্ছে তাই কামনা করুন!!

‘কোনো কিছুতে তুমি যখন বাধ্য, তখন সেটাকেই উপভোগ করো।’ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত এক যুবককে আমি এ কথাটিই বলতাম। সে চিনি ছাড়া চা পান করতো, আর নিজের অবস্থার জন্য কেবলই আফসোস করতো। আমি তাকে বলতাম, ‘চা পান করার সময় শত আফসোস করলেও তোমার পানসে চা কি মিষ্টি হবে?’ ‘না, তা হবে না।’ সে বলতো। আমি বলতাম, ‘তাহলে এ কাজে যেহেতু তুমি বাধ্য, তাই এটাকেই উপভোগ্য করে তোলো।’

আমরা যেভাবে চাই, পৃথিবী ঠিক সেভাবে আমাদের হাতে ধরা দেবে না। জীবনে চলার পথে আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। কখনো দেখবেন, আপনার গাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে, এয়ার কন্ডিশনার নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা গাড়ির সিট কভারগুলো ফেটে গেছে। অথচ এগুলো ঠিক করার সামর্থ্য এই মুহূর্তে আপনার নেই। এ অবস্থায় আপনি কী করবেন? সমাধান এটাই যে, যতদিন এভাবে থাকতে হয় ততদিন এ অবস্থাকেই উপভোগ্য করে রাখুন।

আপনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলেন। ঠাঁই মিললো এমন একটি ফ্যাকাল্টিতে, যাতে পড়ার আগ্রহ আপনার একেবারেই নেই। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই এখানে আপনাকে থাকতে হচ্ছে। তিন তিনটি বছর আপনাকে থাকতে হবে এখানেই। মনকে আপনি একেবারেই মানাতে

পারছেন না। কী করবেন এখন আপনি? সমাধান এটাই যে, যেহেতু আপনাকে থাকতেই হচ্ছে, সময়টিকে উপভোগ্য করে তুলুন।

আপনি কোনো স্থানে চাকুরীর দরখাস্ত দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে আপনার চাকুরি হলো না। হলো অন্য জায়গায়। এবং যথারীতি সেখানে চাকুরি শুরুও করে দিলেন। এখন মন না চাইলেও এখানেই আপনাকে চাকুরি করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় কী করবেন? এখানেই যেহেতু আপনাকে থাকতে হবে, তো এ জায়গাকেই আপনি উপভোগ্য করে তুলুন।

কোনো মেয়েকে আপনি বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অন্য কারো কাছে বিয়ে বসলো। যেহেতু আপনাকে এটা মেনে নিতেই হবে তো সহজেই মেনে নিন। তার বিচ্ছেদকেই উপভোগ্য করে তুলুন।

অনেকেই মনে করে, এ ধরণের পরিস্থিতির সমাধান হলো অবিরত প্রলাপ বকা আর অনবরত আফসোস করে যাওয়া, চেনা-অচেনা সবার কাছে অনুযোগ-অভিযোগ করে বেড়ানো। অথচ এমনটি করলে যা হারিয়ে গেছে তা কিছুতেই ফিরে আসবে না। ভাগ্যে যা লেখা নেই, তাও চটপট হাতে এসে পড়বে না। তাহলে এর সমাধান কী? যেহেতু আপনি যা চাচ্ছেন তা হচ্ছে না, তাহলে যা হচ্ছে তাই কামনা করুন এবং সেটাকেই উপভোগ্য করে তুলুন।

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ তো সে-ই, যে নিজেকে যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সুন্দরে রূপান্তর করার আগ পর্যন্ত সেটাকেই উপভোগ্য করে রাখে। আমার এক বন্ধু একটি মসজিদ

নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলো। কিন্তু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগেই তাদের টাকা ফুরিয়ে গেলো। কাজটি শেষ করার জন্য কিছু সাহায্যের আশায় তারা একজন ব্যবসায়ীর কাছে গেলো। তিনি তাদেরকে বসতে দিলেন। নিজেও তাদের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং সাধ্যানুযায়ী সাহায্যও করলেন। এরপর পকেট থেকে ঔষধ বের করে খেতে লাগলেন। তখন একজন জিজ্ঞেস করলো, 'জনাব! আপনি কি অসুস্থ?' 'না, এগুলো ঘুমের ট্যাবলেট।' ব্যবসায়ী বললেন। 'দশ বছর যাবৎ এই ঔষধ না খেলে আমার ঘুম হয় না।'

তার জন্য দোয়া করে সবাই বেরিয়ে পড়লো। ফেরার সময় তারা দেখলো, শহর থেকে বের হওয়ার মুখে রাস্তার কাজ চলছে এবং বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। আলোর প্রয়োজনে সেখানে একটি বড় জেনারেটর চালিয়ে রাখা হয়েছে। অসহ্য আওয়াজে পুরো এলাকাটা যেন অস্থির হয়ে আছে। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জেনারেটরের ঠিক পাশেই জেনারেটরের দায়িত্বশীল জনৈক দরিদ্র শ্রমিক পত্রিকার কয়েকটি টুকরো বিছিয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে!

হ্যাঁ, জীবনে বাঁচার মতো বাঁচুন। এখানে দুশ্চিন্তা করার মতো সময়ও নেই। আল্লাহ যেটুকু দিয়েছেন, সেটুকুই কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে কোনো এক যুদ্ধে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলো। সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। নবীজী যার কাছে যেটুকু খাবার আছে সব জমা করার নির্দেশ

দিলেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। সবাই খাবার জমা করতে লাগলেন। কেউ একটি খেজুর, কেউ দু'টি খেজুর, আবার কেউ জমা করলেন এক-আধটুকরো রুটি। মোটকথা, যার কাছে যা ছিলো, সবাই সবকিছু চাদরের ওপর জমা করলেন। এরপর সবাই মিলে সেখান থেকে খেলেন এবং সবাই এই অল্প খাবারকেই উপভোগ করলেন। কেউই হয়তো পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারেননি; কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হয় এতটুকু তো সবার হলো। নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই তো সুখী হতে হয়, সুখী হওয়া যায়।

**এক পলক...** মানুষ যা চায়, সবই সে পায় না। কিশতির অনুকূলে বাতাস সদা প্রবাহিত হয় না।

# ৫২. করতে পারি মতবিরোধ বজায় রেখেও ভ্রাতৃত্ববোধ!

বর্ণিত আছে, ইমাম শাফেয়ী রহ. একদিন জনৈক আলিমের সঙ্গে একটি জটিল ফিকহী মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একপর্যায়ে উভয়ের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলো। দীর্ঘক্ষণ তারা তর্ক-বিতর্ক করলেন। দু'জনের গলার স্বরই একসময় উঁচু হতে শুরু করলো। কিন্তু কেউ তার যুক্তি দিয়ে অপরজনকে তুষ্ট করতে পারলেন না। সেই আলিমের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বেশ উত্তেজিত ও রাগান্বিত হলেন। মজলিস শেষে যখন উভয়ে উঠে চলে যাচ্ছিলেন, শাফেয়ী রহ. তার হাত ধরে বললেন, 'ভাই! এমন কি হতে পারে না যে, আমাদের মাঝে মতভেদ হবে, কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃত্বে কোনো বিভেদ সৃষ্টি হবে না?'

হাদীসবিশারদ কয়েকজন আলিম জনৈক খলীফার দরবারে সমবেত হয়েছিলেন। মজলিসে কেউ একজন একটি হাদীস বর্ণনা করলো। উপস্থিত জনৈক আলিমের কাছে হাদীসটি অপরিচিত মনে হলো। তাই তিনি বললেন, 'আপনি এই হাদীস কোথায় পেলেন? আপনি তো দেখছি আল্লাহর রাসূলের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছেন।' লোকটি বললো, 'এটি তো সুবিদিত সুপ্রমাণিত হাদীস।' আলিম বললেন, 'না, এটা হাদীস নয়। এ ধরণের কোনো হাদীস আমরা শুনিনি, মুখস্থও করিনি।' মজলিসে একজন বিচক্ষণ উজির উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই আলিমের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'হযরত!

আপনার কি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীস মুখস্থ আছে?' আলিম বললেন, 'না'। উজির বললেন, 'তাহলে নিশ্চয়ই অর্ধেক মুখস্থ আছে?' 'অর্ধেক হতে পারে।' আলিম উত্তর দিলেন। এবার উজির বললেন, 'তাহলে ধরে নিন, আপনি যে অর্ধেক পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করেননি, এ হাদীসটি তারই একটি।' ব্যাস, সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো!

হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. পরস্পর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। উভয়ে ছিলেন একদিকে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিম, অপরদিকে দুনিয়াবিমুখ দরবেশ। কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. জিহাদ ও সীমান্ত প্রহরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে ফুযাইল বিন ইয়ায হারাম শরীফে অবস্থান করে নামায ও ইবাদতে মগ্ন রইলেন।

একদিন ফুযাইল রহ.-এর মন ভাবাবেগে ভরে উঠলো। গণ্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। প্রিয় বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে তার খুব বেশি মনে পড়লো। স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো যিকিরের মজলিসে উভয়ের একত্র হওয়ার স্মৃতি। ফুযাইল রহ. ইবনে মুবারকের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। হারামে ফিরে এসে ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হওয়ার অনুরোধ করলেন। যিকির-আযকার ও কোরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ইবনে মুবারক রহ. পত্রটি পড়লেন। এরপর এক টুকরো কাগজ নিয়ে ফুযাইলের উদ্দেশ্যে লিখলেন—

হে আবিদুল হারামাইন!
যদি দেখো তুমি আমাদের, জানিবে জরুর
করছো তামাশা ভান ধরে ইবাদতের!
ভাসায় যে জন কপোল তাহারি চোখের অশ্রু দিয়ে,
এদিকে মোদের শিরা রঞ্জিত মোদেরই রক্ত বয়ে।
করছে তাহার ঘোড়াকে ক্লান্ত অকর্মে অপ্রয়োজনে,
এদিকে মোদের ঘোড়া যে শ্রান্ত প্রভাতে যুদ্ধ দিনে।
রইল সুবাসী তোমাদের আমাদের তরে তরবারি-ধুলো শ্রেষ্ঠ সুরভী আমাদের।
খোদার রাহের ধূলি যাহার বদনে লেগেছে কভু
জাহান্নামের অগ্নি তাতে লাগাবেন না তো প্রভু।
এ মর্মে আমরা পেয়েছি মোদের মহান নবীর বাণী
সত্য-সঠিক মিছা নয় কভু দৃঢ়ভাবে মোরা জানি।
এই কথা ভাই খোদার কিতাবও বলছে যে আমাদের,
মিছা নয় ভাই 'শহীদ কখনো মৃত নয়' জানো ফেরত।

এরপর তিনি লিখলেন, 'আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যাদেরকে আল্লাহ রোযা রাখার তাওফীক দান করেন। তাই তারা এত রোযা রাখে; যেমনটি অন্য কেউ পারে না। আবার কাউকে আল্লাহ পাক তাওফীক দান করেন কোরআন তেলাওয়াতের... কাউকে জিহাদ করার... আবার কাউকে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার...। আপনি যে কাজে মগ্ন আছেন, তা আমার মগ্নতা হতে

উত্তম নয়। আবার আমি যে কাজে আছি, তাও আপনার কাজ থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। আমরা উভয়ে ভালো কাজ করছি। উভয়ে আছি কল্যাণের পথে!'

কী চমৎকারভাবে উভয়ের চিন্তাবিরোধের নিরসন হলো! পথের ভিন্নতা আছে, লক্ষ্য তো এক! মতানৈক্যের মাঝেও আছে মতৈক্য! আছে মতভেদ, নেই কোনো বিভেদ! কী চমৎকার কথা 'উভয়েই তো কল্যাণের পথে আছি'!

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

আয়ে ৬৮ [সূরা কাসাস]

অর্থ: তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন, এবং (যা চান) বেছে নেন।

মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শও ছিলো এমনই। কাফিররা একবার সংঘবদ্ধ হয়ে মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করলো। বিশাল এক বাহিনী নিয়ে তারা মদীনার উপকণ্ঠে হাজির হলো। এত বড় ও ভয়ঙ্কর বাহিনী আরববাসী আগে কখনো দেখেনি। সাহাবীগণ পরিখা খনন করলেন। কাফিররা তা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশ করতে পারলো না। তারা পরিখার অপর পাশেই তাঁবু গাড়লো এবং মদীনা অবরোধ করে রাখলো। ইহুদি গোত্র 'বনু কোরায়যা' মদীনায় বসবাস করতো। তারা সবসময় মুসলমানদের সঙ্গে গোলযোগ বাঁধানোর অপেক্ষায় থাকতো। এই সুযোগে তারা কাফিরদের সঙ্গে আঁতাত করে তাদের মদদে এগিয়ে এলো এবং মদীনার ভেতরে বিশৃঙ্খলা ও লুটপাট শুরু করলো। মুসলমানদের মূল জামাত পরিখার কাজে ব্যস্ত থাকায় তারা সেদিকে খেয়াল করতে পারলেন না। সঙ্কটের কয়েকটি দিন বড় উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে

অতিবাহিত হলো। এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের নুসরতে অদৃশ্য সাহায্যরূপে প্রেরণ করলেন প্রচণ্ড ঝড়োহাওয়া এবং আসমানী সৈন্যদল। সম্মিলিত কাফির বাহিনীর তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। ব্যর্থ মনোরথে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে তারা লেজ গুটিয়ে পালালো। পরদিন ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। সাহাবীগণ সকলেই যুদ্ধসাজ ত্যাগ করে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন। নবীজীও বাড়ি ফিরে যুদ্ধপোশাক খুলে রেখে গোসল করলেন।

যোহরের সময় হযরত জিবরাঈল আ. উপস্থিত হয়ে বাড়ির বাইরে থেকে নবীজীকে ডাকতে লাগলেন। জিবরাঈলের ডাক শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলেন। হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি কি যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধপোশাক খুলে ফেলেছেন?' নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ'। জিবরাঈল আ. বললেন, 'ফেরেশতারা তো এখনো যুদ্ধসাজ ত্যাগ করেনি। আমরা এইমাত্র কাফিরদের ধাওয়া করে ফিরলাম। একেবারে "হামরাউল আসাদ" পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ধাওয়া করেছি।' অর্থাৎ খন্দকে পরাজিত হয়ে কোরাইশরা যখন মদীনা ছেড়ে মক্কায় পালাচ্ছিলো, ফেরেশতাদের বাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে মদীনা থেকে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে বনু কোরায়যা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমিও আমার বাহিনী নিয়ে সেখানে যাবো এবং তাদের পদতলের ভূমি কাঁপিয়ে দেবো।'

এ কথা শুনে নবীজী একজন ঘোষককে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। ঘোষক নবীজীর বাণী ঘোষণা করলেন, ‘যে ব্যক্তি (এ ঘোষণা) শ্রবণ করে এবং আনুগত্য করে, সে যেন বনু কোরায়যায় পৌঁছেই আসর নামায আদায় করে।’ ঘোষণা শুনে সবাই অস্ত্র তুলে নিলেন। নববী নির্দেশের নিঃসর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে সাহাবীগণ বনু কোরায়যার আবাসভূমি অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেলো। কেউ কেউ বললেন, ‘নবীজী যেহেতু বনু কোরায়যায় পৌঁছে আসর পড়তে বলেছেন, আমরা বনু কোরায়যায় গিয়েই আসর নামায পড়বো।’ আবার কেউ কেউ বললেন, ‘নবীজীর ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিলো আমরা যেন দ্রুত পথ চলি এবং আসরের পূর্বেই বনু কোরায়যায় পৌঁছে আসর সেখানে পড়ি। নবীজীর উদ্দেশ্য তো এই ছিলো না যে, নামাযের সময় অতিবাহিত হলেও পথে নামায পড়া যাবে না, বরং বনু কোরায়যায় পৌঁছেই নামায পড়তে হবে। সুতরাং আমরা এখানেই নামায পড়ে নেবো।’ এ কথা বলে কয়েকজন সাহাবী নামায আদায় করে নিলেন। এরপর অবশিষ্ট পথ পাড়ি দিলেন। অন্য সাহাবীগণ বনু কোরায়যায় পৌঁছার পর আসর আদায় করলেন।

এ ঘটনা নবীজীকে অবগত করা হলে তিনি কোনো পক্ষকেই তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করেননি। এরপর নবীজী বনু কোরায়যাকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। মহান আল্লাহ তাআলা নবীজীকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। লক্ষ করুন, সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেও মতবিরোধ করেছেন। মতের পার্থক্য তাদের মাঝে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। সৃষ্টি করতে পারেনি কোনো কলহ-বিবাদ কিংবা সম্পর্কের ফাটল। বিশ্বাস

করুন, আপনি যখন এভাবে উদার মনে শান্তভাবে মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করবেন; মানুষ নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসবে, আপনি তাদের হৃদয়রাজ্যে জায়গা করে নিতে পারবেন। বরং এরও পূর্বে লাভ করবেন উচ্চ এবং অতি উচ্চ এক নেয়ামত—'মহান আল্লাহর মুহাব্বত'। কারণ, আপনি পরিহার করেছেন অতি মন্দ একটি বিষয়—'বিভেদ ও বিবাদ'।

**দৃষ্টিভঙ্গি...** সব বিষয়ে আমরা একমত থাকবো, এমনটি জরুরি নয়... জরুরি হলো মতভেদ আমাদের বিভেদের কারণ যেন না হয়।

# ৫৩. কোমলতা আনে সৌন্দর্য

আমরা কারো আচার-ব্যবহার বা কর্মগুণে মুগ্ধ হলে বারবার বলে থাকি, 'লোকটি বেশ গম্ভীর, শান্ত ও কোমল স্বভাবের।' পক্ষান্তরে কারো আচার-ব্যবহারের নিন্দা করতে চাইলে বলি, 'লোকটা ছোট মনের, অভদ্র, খিটখিটে স্বভাবের।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اَلرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

[সহীহ মুসলিম: ৪৬৯৮]

অর্থ: কোমলতা বস্তুর সৌন্দর্যকেই বৃদ্ধি করে আর কোমলতার অভাব তার সৌন্দর্যকেই হ্রাস করে।

আপনি কি এক টন লোহা আঙুল দিয়ে নাড়াতে পারবেন? একটি ক্রেন আনুন। লোহাকে কোমলভাবে বাঁধুন। ধীরে সুস্থে ওপরে ওঠান। লোহা যখন বাতাসে ভাসছে, হাতের ছোট আঙুলটি দিয়েও তা নাড়াতে পারবেন।

দুই বন্ধু একবার সিদ্ধান্ত নিলো, তারা জনৈক লোকের দুই কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে। এক বন্ধু অপরজনকে বললো, 'আমি ছোটজনকে বিয়ে করবো। তুমি বড়জনকে বিয়ে করো।' অপর বন্ধু সজোরে চিৎকার করে উঠলো, 'না, বরং তুমি বড়জনকে, আর আমি ছোটজনকে বিয়ে করবো।' প্রথমজন এবার বললো, 'ঠিক আছে, তুমি ছোটজনকেই নাও। আর আমি তার থেকে ছোটজনকে নেবো।' দ্বিতীয়জন বললো, 'আমি রাজি!' বেচারা

বুঝতেই পারেনি যে, তার বন্ধু নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি। কোমল ভাষায় কথার ধরণ পাল্টে দিয়েছে মাত্র। হাদীস শরীফে আছে:

إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ شَرًّا نَزَعَ مِنْهُمْ.

[মুসনাদে আহমদ: ২৩২৯০]

অর্থ: আল্লাহ যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তাদেরকে কোমলতা দান করেন। আর যখন কোনো পরিবারের অকল্যাণ চান, তখন তাদের মাঝ থেকে কোমলতা উঠিয়ে নেন।

হাদীস শরীফে আরো এসেছে:

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

[সহীহ মুসলিম: ৪৬৯৭]

অর্থ: আল্লাহ তাআলা কোমল। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। আর কোমলতার কারণে যা দান করেন, রুক্ষতা থাকলে তা দান করেন না। বরং কোমলতা ছাড়া অন্য কিছুতেই তা দান করেন না।

একজন শান্ত, কোমল ও নম্র স্বভাবের মানুষ সবার কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। তার কাছে গেলে মনে প্রশান্তি অনুভূত হয়, তার ওপর আস্থা রাখা যায়; বিশেষ করে তার কথাও যদি হয় ওজনদার, আর ব্যবহার হয় শালীন ও আকর্ষণীয়।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ইমাম হলেন কাযী আবু ইউসুফ রহ.। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শ্রেষ্ঠতম ছাত্র। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বাল্যকালে খুব দরিদ্র ছিলেন। তার বাবা তাকে আবু হানীফা রহ.-এর দরসে উপস্থিত হতে নিষেধ করতেন এবং বাজারে গিয়ে কামাই-রোজগারে মন দিতে বলতেন। কিন্তু উস্তাদ আবু হানীফা রহ.-এর তার প্রতি বিশেষ নজর ছিলো। আবু ইউসুফ দরসে অনুপস্থিত থাকলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করতেন।

একদিন আবু ইউসুফ রহ. উস্তাদের কাছে পিতার আপত্তির ব্যাপারটি খুলে বললেন। আবু হানীফা রহ. আবু ইউসুফের পিতাকে ডেকে জানতে চাইলেন, 'ছেলে দিনে কত রোজগার করে?'
'দুই দিরহাম'। পিতা বললেন।
আবু হানীফা রহ. বললেন, 'আমি আপনাকে দৈনিক দুই দিরহাম করে দেবো। আপনি ওকে পাঠিয়ে দেবেন। ও ইলমে দ্বীন অর্জন করবে।'

এরপর আবু ইউসুফ রহ. দীর্ঘদিন উস্তাদের খেদমতে অবস্থান করলেন। এরপর কেটে গেলো অনেক বছর। আবু ইউসুফ রহ. এখন পূর্ণ যুবক। প্রাজ্ঞতা ও জ্ঞানের গভীরতায় ছাড়িয়ে গেছেন সকল সহপাঠীকে। এরই মধ্যে একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

আবু হানীফা রহ. প্রিয়তম শিষ্যকে দেখতে গেলেন। আবু ইউসুফকে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। অবস্থা দেখে তার আশঙ্কা হলো, আবু ইউসুফ হয়তো মারা যাবেন। বের হয়ে আসার সময় তিনি আনমনে বলতে লাগলেন,

‘আহ! ইয়াকুব! আমি তো মানুষের জন্য আমার পরে তোমাকেই আশা করেছিলাম।’

হযরত আবু হানীফা রহ. ভারাক্রান্ত মনে ছাত্রদের মজলিসে ফিরে এলেন। এর দু'দিন পরই আবু ইউসুফ রহ. সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং গোসল সেরে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে উস্তাদের দরসে রওনা হলেন। পথিমধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, ‘কোথায় যাচ্ছেন?’
ইমাম আবু ইউসুফ বললেন, ‘শায়খের দরসে শরীক হতে যাচ্ছি।’
তার উত্তর শুনে কেউ কেউ বললো, ‘এখনো শিষ্য হয়েই থাকবেন? যথেষ্ট ইলম তো অর্জন করেছেন। শোনেননি আপনার শায়খ আপনার ব্যাপারে কী বলে গেছেন?’
ইমাম আবু ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী বলেছেন?’
‘শায়খ বলেছেন, আমি তো মানুষের জন্য আমার পরে তোমাকেই আশা করেছিলাম। অর্থাৎ আপনি আবু হানীফার সকল ইলম হাসিল করে ফেলেছেন। আল্লাহ না করুন, আজ তিনি ইন্তেকাল করলে আপনিই হবেন তার স্থলাভিষিক্ত।’

উস্তাদের প্রশংসাবাণী শুনে ইমাম আবু ইউসুফের মন আনন্দে ভরে উঠলো। মনের মাঝে তৈরি হলো খানিকটা আত্মপ্রসাদ-আত্মতৃপ্তি। এরপর ধীর পদক্ষেপে রওনা হলেন মসজিদের দিকে। মসজিদে গিয়ে দেখলেন এক কোণে আবু হানীফা রহ.-এর দরস চলছে। তিনি গিয়ে বসলেন অন্য কোণে। শুরু করলেন দরসদান, ফতোয়াপ্রদান।

আবু হানীফা রহ. মসজিদের আরেক কোণে নতুন মজলিস দেখতে পেয়ে তালিবে ইলমদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কোন শায়খের মজলিস?'
শাগরিদরা জানালো, 'আবু ইউসুফের মজলিস।'
'সে সুস্থ হয়েছে?!' আবু হানীফা রহ. অবাক হয়ে বললেন।
'হ্যাঁ', শাগরিদরা জানালো।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আমাদের দরসে বসলো না যে?!'
'আপনি তাকে দেখতে গিয়ে যা বলেছিলেন, লোকেরা তাকে তা জানিয়ে দিয়েছে। তাই তিনি এখন নিজেই দরস দিচ্ছেন। নিজেকে আর আপনার মুখাপেক্ষী মনে করছেন না।'

আবু হানীফা রহ. বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন, কোমলভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি কী হতে পারে। কিছুক্ষণ ভাবার পর তিনি উপস্থিত ছাত্রদের একজনকে ডেকে বললেন, তুমি ওই শায়খের দরসে যাও। তাকে গিয়ে বলো, 'হযরত! আমার একটি মাসআলা জানার ছিলো'। তোমাকে দেখে সে খুশি হবে। নিশ্চয়ই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কী সমস্যা?' মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে—এই আশায়ই তো সে বসেছে! তখন তুমি বলবে, একজন লোক তার জামাটি কেটে ছোট করে দেয়ার জন্য দর্জীকে দিলো। কয়েকদিন পর লোকটি এসে জামা চাইলে দর্জী অস্বীকার করে বসলো। বললো, আপনি আমাকে কোনো জামা দেননি। অগত্যা লোকটি থানায় গিয়ে পুলিশকে জানালো। পুলিশ এসে তল্লাশি চালিয়ে দোকান থেকেই জামাটি বের করলো। প্রশ্ন হলো, দর্জী জামা ছোট করে দেয়ার মজুরি পাবে কিনা? জবাবে সে যদি বলে, 'মজুরি পাবে', তুমি

বলবে, 'ভুল বললেন'। যদি বলে, 'মজুরি পাবে না', তখনও বলবে, 'ভুল বললেন'।

ছাত্রটি জটিল এই মাসআলা শুনে খুব খুশি হলো। সে আবু ইউসুফ রহ.-এর কাছে গিয়ে বললো, 'হযরত! আমার একটি মাসআলা জানা দরকার।' আবু ইউসুফ রহ. বললেন, 'বলো, কী তোমার মাসআলা?' 'একজন লোক জনৈক দর্জীর কাছে একটি জামা দিলো...।' ছাত্রটি পুরো প্রশ্ন করলো। প্রশ্ন শুনে আবু ইউসুফ রহ. তড়িঘড়ি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, যদি সে কাজ পূর্ণ করে থাকে, তাহলে মজুরি পাবে।' ছাত্রটি বললো, 'ভুল বললেন।'

আবু ইউসুফ রহ. আশ্চর্যান্বিত হলেন। মাসআলাটি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন। এরপর বললেন, 'না, মজুরি পাবে না।' প্রশ্নকারী বললো, 'ভুল বললেন।'

আবু ইউসুফ রহ. তার দিকে তাকালেন। আল্লাহর কসম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলো তো তোমাকে কে পাঠিয়েছে?' সে আবু হানীফা রহ.-এর দিকে দেখিয়ে বললো, 'হযরত পাঠিয়েছেন।'

আবু ইউসুফ রহ. এবার মজলিস থেকে উঠে সোজা আবু হানীফা রহ.-এর মজলিসে গিয়ে বসে বললেন, 'হযরত! একটি প্রশ্ন'।

আবু হানীফা রহ. তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আবু ইউসুফ রহ. উঠে একেবারে উস্তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। পূর্ণ আদব ও বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'হযরত! একটি প্রশ্ন...'।

আবু হানীফা রহ. বললেন, ‘কী প্রশ্ন তোমার?’

আবু ইউসুফ রহ. বললেন, ‘হযরত! আপনি তো জানেন।’

‘দর্জী ও কাপড়ের মাসআলা?’ আবু হানীফা রহ. জিজ্ঞেস করলেন।

‘জ্বী’, আবু ইউসুফ রহ. বললেন।

আবু হানীফা রহ. বললেন, ‘দাও, তুমিই জবাব দিয়ে দাও। তুমি না শায়খ হয়ে গেছো!’

আবু ইউসুফ রহ. বললেন, ‘না, হযরত! শায়খ তো আপনিই।’

তখন আবু হানীফা রহ. মাসআলার জবাবে বললেন, ‘আমরা লক্ষ্য করবো, জামাটি সে কতটুকু খাটো করেছে। যদি মালিকের মাপ অনুযায়ী ছোট করে থাকে, তাহলে তো সে কাজ পূর্ণ করেছে। পরবর্তীতে তার থেকে অস্বীকৃতির বিষয়টি প্রকাশ পেলেও যেহেতু সে কাজ পূর্ণ করেছে, তাই পারিশ্রমিকের হকদার হবে। আর যদি মালিকের মাপের পরিবর্তে নিজের মাপ মতো খাটো করে থাকে তাহলে বলা যায়, সে নিজের জন্য কাজ করেছে। তাই এক্ষেত্রে তার কোনো মজুরি প্রাপ্য হবে না।’

আবু ইউসুফ রহ. উঠে এসে উস্তাদের কপালে চুমু খেলেন। উস্তাদ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তার দরবারেই শাগরিদ হয়ে পড়ে ছিলেন। আবু হানীফা রহ.-এর মৃত্যু হলে আবু ইউসুফ রহ. তার স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং সফলতার সঙ্গে দরসদান ও ফতোয়াপ্রদানের খেদমত আঞ্জাম দিতে লাগলেন।

ঠাণ্ডা মাথায় কোমলভাবে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের কী চমৎকার দৃষ্টান্ত! স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে, বাবা-মা সন্তানের সঙ্গে, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে, শিক্ষকগণ ছাত্রদের সঙ্গে যদি এমন কোমল আচরণ করেন তাহলে অনেক বিরোধ, অনেক সমস্যা সহজেই মিটে যেতে পারে। আমাদের সব কাজ, সকল আচরণেই কোমলতা ও শান্তভাব কাম্য। গাড়ি চালানোর সময়, ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের সময় এবং ছাত্রদের দরসদানের সময়ও আমরা কোমল ও নম্র আচরণ করবো।

অবশ্য কখনো কখনো কঠোরও হতে হয়। এমনকি নসীহতদান ও উপদেশপ্রদানের ক্ষেত্রেও ক্ষেত্র বিশেষে রাগ করাটাই প্রজ্ঞার দাবি। তখন রাগ না করলে, কঠোর না হলে উপদেশ কার্যকর হয় না। বস্তুত কোমলতার ক্ষেত্রে কোমলতা ও কঠোরতার ক্ষেত্রে কঠোরতা তথা প্রতিটি বিষয়কে যথাস্থানে রাখার নামই হিকমত ও প্রজ্ঞা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র দ্বীনী বিষয়েই রাগ করতেন। ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে তিনি কখনো রাগ করেননি। আল্লাহর নিকট মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলোর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো ছাড় দিতেন না।

একদিন হযরত ওমর রাযি.-এর সঙ্গে জনৈক ইহুদির সাক্ষাৎ হলো। ইহুদি তাকে তাওরাতের একটি বাণী শোনালো। তাওরাতের বাণী শুনে হযরত ওমর বিমুগ্ধ হলেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে নিলেন। এরপর তাওরাতের এই বাণী নিয়ে হযরত ওমর রাসূলের দরবারে হাজির হলেন। রাসূলকে তিনি পাঠ করে শোনালেন তাওরাতবাণী। নবীজী লক্ষ্য করলেন, ওমর এই

বাণীতে বেশ মুগ্ধ। নবীজী ভেবে দেখলেন, এভাবে যদি আগেকার ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় তাহলে তো তা কোরআনের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। প্রকৃত কোরআনের বাণী নির্ণয়ে মানুষ তখন দ্বিধায় পড়ে যাবে। ওমর এই কাজ কীভাবে করলেন? নবীজীর অনুমতি ছাড়া কীভাবে তিনি তাওরাতবাণী লিখে রাখলেন?!

নবীজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ওমরকে বললেন, 'ওমর! আমার আনীত ধর্মের ব্যাপারে তোমার মনে কি কোনো সন্দেহ আছে?' এরপর নবীজী বললেন, 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের নিকট স্বচ্ছ ও শুভ্র দ্বীন নিয়ে এসেছি। তাদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। কারণ হতে পারে তারা তোমাদেরকে সত্য বিষয়েই অবগত করবে, আর তোমরা তা অস্বীকার করে বসবে। অথবা তারা বলবে মিথ্যা, কিন্তু তোমরা তা সত্য মনে করে বসে থাকবে। তোমরা ভালোভাবে শোনো, সেই সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! যদি নবী মূসাও এখন জীবিত থাকতেন, তারও আমাকে অনুসরণ করতে হতো।' [মুসনাদে আহমদ: ১৪৬২৩]

আমরা শুধু নম্রতা, কোমলতা ও বিনয়ের কথা বলি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মাঝে মাঝে কঠোর হওয়া এবং মাঝে মাঝে রাগ করাও দরকার। নবীজীর রাগান্বিত ও অনমনীয় হওয়ার আরেকটি ঘটনা দেখুন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রথম দিকের ঘটনা। নবীজী কাবা প্রাঙ্গণে নামায পড়তে আসতেন। এদিকে কোরাইশরা কাবাচত্বরে গল্প করতো। নবীজী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

কোরাইশরা নবীজীকে অনেক কষ্ট দিতো। দয়ার নবী সব সহ্য করতেন। নীরবে ধৈর্য ধারণ করতেন।

একদিনের ঘটনা। কোরাইশ নেতৃবর্গ হাজরে আসওয়াদের পাশে একত্রিত হলো। নবীজীকে নিয়ে তারা নানা ধরণের কথা বলতে লাগলো। তারা বললো, 'এই লোকের কাজকর্ম আমরা যেভাবে সহ্য করেছি, কোনো কালে কেউ এমন সহ্য করেছে বলে মনে হয় না।'

'সে আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে।'

'সে আমাদের পিতৃপুরুষকে গালমন্দ করেছে।'

'সে আমাদের ধর্মকে কলুষিত করেছে।'

'সে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে।'

'সে আমাদের প্রভুদের গালি দিয়েছে।'

'তাকে নিয়ে এখন আমরা ভীষণ বিপাকে।'

এভাবে তারা বিভিন্ন মন্তব্য করে যাচ্ছিলো। ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল সেখানে উপস্থিত হলেন। পবিত্র কাবার স্তম্ভ চুম্বন করলেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করলেন। তাওয়াফরত অবস্থায় নবীজী যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, নবীজীকে ইশারা করে তারা কিছু কথা বললো। কথাগুলো শুনে নবীজীর চেহারার রঙ পাল্টে গেলো। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন। কিছু না বলে চুপ থাকলেন এবং সামনে চলতে লাগলেন।

তাওয়াফের দ্বিতীয় চক্করে নবীজী যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা আবার নবীজীকে ইঙ্গিত করে কিছু বললো। এবারও নবীজী চুপ থাকলেন। তাদের কিছু না বলে চলে গেলেন। তৃতীয় তাওয়াফের সময় তারা আবার আগের মতোই নবীজীকে লক্ষ্য করে কিছু বললো। নবীজী বুঝলেন, এ ধরণের লোকদের সঙ্গে কোমলতা প্রদর্শন করে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘হে কোরাইশদল! শুনে রাখো, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে যবাই করার বস্তু নিয়ে এসেছি।’

দুর্বার সাহস নিয়ে এ কথা বলে নবীজী কাফিরদের সামনে অটল-অবিচল দাঁড়িয়ে রইলেন। হতভাগারা নবীজীর বজ্রকণ্ঠ শুনে একেবারে ঘাবড়ে গেলো। যবাই...! মুহাম্মাদ তো সদা সত্যবাদী। বিশ্বাসী তিনি, বিশ্বস্ত তিনি। তিনি যা বলেন, তা তো কখনো মিথ্যে হয় না। ভাবতেই তারা কেঁপে উঠলো। সবাই একেবারে স্থির হয়ে গেলো। উড়ন্ত বাজপাখি যেন হঠাৎ তাদের মাথায় বসেছে! তাদের সবচে দুষ্ট ব্যক্তিটিও নবীজীর সঙ্গে কোমলতা প্রদর্শন করতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো, ‘আবুল কাসিম! আপনি তো শরীফ-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনি চলে যান। আপনি তো আর সবার মত অজ্ঞ নন।’ এ কথা শুনে নবীজী চলে এলেন।

আরবকবি তার কবিতাপংক্তিতে এ দর্শনের কথাই বলেছেন:

আমায় বলে নম্র হও, বলি, সবখানে নয় নম্রতা
অপাত্রেতে নম্র হওয়া শুধু যে কেবল মূর্খতা।

সীরাত অধ্যয়নকারী নবীজীবনের বাঁকে বাঁকে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আচরণে ও উচ্চারণে নম্রতা ও কোমলতাকেই প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু ভালোভাবে বুঝে নিন, এটা তার স্বভাব দুর্বলতা কিংবা ভীরুতা ছিলো না। এ ছিলো সর্বোত্তম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী মহামানবের স্বভাব নম্রতা-স্বভাব বিনয়।

কোমল আচরণের আরেকটি উপমা দেখুন। বদরযুদ্ধের এক মাস পরের ঘটনা। নবীতনয়া যায়নাব রাযি.-এর স্বামী আবুল আস তাকে মদীনায় নবীজীর কাছে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। তাকে নিয়ে আসার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ বিন হারেসা ও একজন আনসারী সাহাবীকে মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করলেন এবং মক্কার অদূরে মদীনার পথে এক জায়গায় তাদেরকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'তোমরা বাতনে ইয়াজাজ নামক স্থানে থাকবে। এ পথেই যায়নাব আসবে। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

উভয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে আবুল আস তার স্ত্রীকে সফরের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। স্বামীর অনুমতি পেয়ে যায়নাব রাযি. সামানা গোছগাছ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো। সে বললো, 'যায়নাব! শুনলাম, তুমি নাকি তোমার বাবার কাছে চলে যাচ্ছো।' যায়নাব তার প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। যাওয়ার কথা জানতে পারলে না জানি এরা আবার কোন অঘটন ঘটায়। তাই তিনি বললেন, 'না, আসলে তেমন কিছু নয়।'

হিন্দা বললো, ‘বোন! তুমি যদি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকো তাহলে তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা বলো। সফরে তোমার কোনো সামানার দরকার হতে পারে। তোমার বাবার কাছে পৌঁছার জন্য রাহাখরচের প্রয়োজন হতে পারে। লজ্জা করো না। আমাকে বলো, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। আরে! যা হবার তা তো পুরুষদের মাঝে হয়েছে, আমাদের মাঝে তো কিছুই হয়নি।’ হযরত যায়নাব রাযি. বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, সে এ কথাগুলো আন্তরিকভাবেই বলেছে। কিন্তু তারপরও আমার দ্বিধা ও আশঙ্কা কাটলো না। তাই আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম না।’

যায়নাব রাযি. সফরের পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু কোরাইশদের টের পাওয়ার ভয়ে তার স্বামী নিজে তাকে নিয়ে বের হতে শঙ্কাবোধ করলেন। তাই তার ভাই কিনানাকে এ কাজের দায়িত্ব দিলেন। আদেশ পেয়ে কিনানা যায়নাবের কাছে একটি উট নিয়ে এলেন। হযরত যায়নাব তাতে আরোহণ করলেন। কিনানা সঙ্গে করে তীর-ধনুকও নিয়ে নিলেন। এরপর দিনের বেলায় তারা বের হলেন। কিনানা উটের লাগাম ধরে আছেন আর যায়নাব বসে আছেন উটের হাওদায়।

কিছুদূর যেতেই লোকেরা তাদের দেখে ফেললো। কয়েকজন কোরাইশ বলতে লাগলো, ‘বদরযুদ্ধে মুহাম্মাদের সঙ্গে আমাদের এতকিছু হয়ে গেলো, আর তার কন্যা আমাদের সামনে দিয়ে এভাবে নিরাপদে তার কাছে চলে যাবে?’ এদের কথায় উত্তেজিত হয়ে কোরাইশরা তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। যু-তাঈ নামক স্থানে গিয়ে তারা তাদের পেয়ে গেলো। সর্বপ্রথম

হুবার বিন আসওয়াদ তাদের কাছে পৌঁছালো। সে হাওদায় উপবিষ্ট যায়নাব রাযি.কে বর্শা নিক্ষেপ করার ভয় দেখালো। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এসময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির ভয়ে তার অকাল গর্ভপাত হয়ে যায়।

কোরাইশ কাফিররা তাদের দিকে ধেয়ে এলো। সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। যায়নাবের সঙ্গে কেবল তার দেবর কিনানা। কিনানা এ দৃশ্য দেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং তূণীর খুলে তীরগুলো সামনে রাখলেন। এরপর উচ্চ স্বরে বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! আমার কাছে যে আসবে, আমি তীর নিক্ষেপ করে তাকে খতম করে ফেলবো।’ কিনানা আরবের প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন। তাই ভয়ে সবাই দূরে সরে গেলো এবং দূর থেকেই তাদের লক্ষ্য করতে লাগলো। এর ফলে তারা দু'জনও সামনে অগ্রসর হতে পারলেন না। এদিকে কাফিররাও সাহস করে তাদের কাছে ভিড়তে পারলো না।

ইতোমধ্যে আবু সুফিয়ানের কাছে সংবাদ পৌঁছালো যে, যায়নাব রাযি. তার পিতার কাছে চলে যাচ্ছেন। সংবাদ শুনে কোরাইশদের একটা দল নিয়ে সে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো এবং দেখতে পেলো একদিকে কিনানা তীর নিয়ে প্রস্তুত, অপরদিকে কিছু কোরাইশও লড়াইয়ের জন্য তৈরি। আবু সুফিয়ান গলা উঁচিয়ে বললো, ‘কিনানা! তুমি তোমার ধনুক নামিয়ে ফেলো। আমাদেরকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দাও।’ আবু সুফিয়ানের কথা শুনে তিনি তীর-ধনুক নামিয়ে ফেললেন।

আবু সুফিয়ান কিনানার সামনে এসে বললো, ‘কিনানা! তুমি ভুল করেছো। কী দরকার ছিলো একে নিয়ে প্রকাশ্যে লোকজনের সামনে বেরিয়ে আসার? তুমি তো বদরপ্রান্তরে ঘটে যাওয়া আমাদের দুরাবস্থা ও দুর্ভাগ্যের কথা জানো। তোমার এও জানা আছে যে, মুহাম্মাদের কারণে আমাদের মাঝে কী অবস্থা বিরাজ করছে। সে আমাদের নেতাদের হত্যা করেছে। নারীদের বিধবা করেছে।’

‘কাজেই লোকেরা যখন জানবে, আরবের বিভিন্ন গোত্র যখন শুনবে যে, তুমি তার মেয়েকে আমাদের সামনে দিয়ে সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে নিয়ে যাচ্ছো তখন লোকেরা ভাববে, আমরা নতি স্বীকার করেছি এবং আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি।’

‘আমি শপথ করে বলছি, তাকে তার বাবার কাছে যেতে বাধা দিয়ে আমাদের কোনো লাভ নেই এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ারও কিছু নেই।’

‘তাই বলি কী, এখনকার মতো তাকে নিয়ে ফিরে যাও। যখন লোকজন শান্ত হবে এবং তারা বলাবলি করবে যে, আমরা তাকে ফেরাতে সক্ষম হয়েছি তখন তুমি গোপনে তাকে তার বাবার কাছে দিয়ে এসো।’

কিনানা আবু সুফিয়ানের কথায় আশ্বস্ত হলেন এবং যায়নাবকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। যায়নাব রাযি. এরপর কয়েক রাত মক্কায় অবস্থান করলেন। ধীরে ধীরে যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলো, সুযোগ বুঝে এক রাতে কিনানা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং কিছু দূর গিয়ে নবীজীর পক্ষ থেকে প্রেরিত যায়দ বিন হারেসা ও তার সঙ্গীর কাছে তাকে সোপর্দ করলেন। এরপর তারা দু'জন যায়নাবকে নিয়ে নবীজীর দরবারে ফিরে এলেন।

পাঠক! গভীরভাবে ভেবে দেখুন, আবু সুফিয়ান কোমলতা ও নম্র আচরণের মাধ্যমে কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলো। কীভাবে নিমিষেই অগ্নিমূর্তি কিনানাকে শান্ত করে ফেললো এবং কীভাবে সম্ভাব্য একটি রক্তপাতের ঘটনাকে রোধ করলো; যাতে নবীতনয়া 'যায়নাবের' নিহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিলো। অথচ এ ঘটনার সময় আবু সুফিয়ান কাফির ছিলো। তাহলে আপনিই ভেবে বলুন, একজন মুসলমানের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

**নববী প্রত্যাদেশ...**

কোমলতা বস্তুর সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে আর কোমলতার অভাব তার সৌন্দর্যকে হ্রাস করে।

# ৫৪. না মৃত! না জীবিত!

মৃতও নয়, জীবিতও নয়—এ ধরণের চেতনাহীন মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। সহপাঠী, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-বন্ধু, সাথী-সঙ্গী এমনকি সন্তান-সন্ততিও তাকে অপছন্দ করে। হ্যাঁ, আসলেই সে সবার কাছে বিরক্তিকর। তাই লোকমুখে বারবার তাকে শুনতে হয়, 'আরে ভাই! আপনি তো দেখছি একটা অপদার্থ! আপনার মাঝে চেতনা বলতে তো কিছুই নেই।' এ ধরণের লোক কখনো অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে পারে না।

মনে করুন, বাবার কাছে একদিন তার আদরের ছোট ছেলেটি খুশিতে বাগবাগ হয়ে এসে বললো, 'দেখো বাবা! ওস্তাদজী আমার খাতায় "মুমতায" [স্টার মার্ক] লিখে দিয়েছেন!' কিন্তু কী অদ্ভুত! বাবা সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে...।' বলুন তো, ছেলেটি কি তার বাবার কাছে আদৌ এমনটি আশা করেছিলো? আমি তো শপথ করে বলতে পারি, এ ছেলে একদিন যদি ডক্টরেট সার্টিফিকেট এনেও প্রদর্শন করে, তার বাবার অবস্থা এমনই থাকবে।

অথবা ধরুন একজন শিক্ষক। তার এক ছাত্র বেশ চঞ্চল। ছাত্রটি একদিন লক্ষ্য করলো, আজকের পড়া বড় কঠিন। সবার মাঝে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে। তাই একটা কৌতুক বলে পরিবেশটা সে আনন্দঘন করতে চাইলো। তার রসিকতায় সবাই বেশ উৎফুল্ল বোধ করলো। কিন্তু বেচারা শিক্ষকের চেহারায় কোনোই পরিবর্তন পরিলক্ষিত

হলো না। উল্টো সে বললো, ‘এত চালাকি শিখেছো কোথায়?’ বলুন তো, উচিত কি এটাই ছিলো না যে, সেও সবার সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করবে?

অথবা মনে করুন, সে একটি মুদি দোকানে গেলো। দোকানের কর্মচারীটি তাকে দেখে বললো, ‘আলহামদু লিল্লাহ! বাড়ি থেকে আমার পরিবার চিঠি পাঠিয়েছে।’ সংবাদটি শোনার পর তার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না। নিজের বিবেককে তো তার প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিলো, লোকটা আমাকে এই সংবাদ কেন শোনালো? নিশ্চয়ই বেচারা দোকানি তার সুখের ভাগী হতেই সংবাদটি তাকে শুনিয়েছে। কিন্তু সে যেন অচেতন; কিছুতেই তার চেতনায় জোয়ার ওঠে না।

অথবা ধরুন কেউ তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলো। বন্ধু তাকে চা-কফি দিয়ে আপ্যায়ন করলো। এরপর ঘরে প্রবেশ করে সে তার নবজাতক শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো। এই শিশুটি তার প্রথম সন্তান। শিশুটির জন্য স্নেহ-ভালোবাসায় আপ্লুত তার হৃদয় মন। পারলে যেন সে তাকে চোখের পাতায় জড়িয়ে রাখে। বন্ধুকে সে বললো, ‘দেখো, দেখো, আমার বাছাধন। কেমন হয়েছে? দেখো তো...’

শিশুটির দিকে সে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকালো। এরপর শুধু বললো, ‘মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তাকে তোমার চোখের শীতলতা বানান।’ এতটুকু বলেই সে আবার আগের মতো চা-কফিতে মনোযোগী হয়ে পড়লো। অথচ তার বন্ধুর আশা ছিলো, ছেলেটিকে সে কোলে নেবে। তাকে একটু আদর করে চুমু খাবে। তার সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের প্রশংসা করবে। অবশেষে তার

জন্য দোয়া করবে। কিন্তু সে কিছুই করলো না। এই কাজগুলো করার অনুভব-অনুভূতিও তার মনে জাগলো না।

আপনি অন্যের সঙ্গে মিশে যখন কোনো কাজ করবেন তখন অন্যের নিকট যেটি গুরুত্বপূর্ণ, সেটিই করুন। আপনার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা নয়। লক্ষ্য করুন, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে 'মুমতায' শব্দটি আপনার সন্তানের কাছে ডক্টরেট ডিগ্রীর চেয়েও মূল্যবান। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নবজাতক শিশুটিই আপনার বন্ধুর কাছে পৃথিবীর সবচে প্রিয় বস্তু। শিশুটিকে দেখা মাত্র তার অন্তরজুড়ে ভালোবাসা আর ভালোলাগার অপূর্ব শিহরণ দোল খায়। হৃদয়-মন উজাড় করে ছোট শিশুটিকে গভীর মায়া-মমতায় জড়িয়ে রাখতে তার ইচ্ছে করে। বন্ধু হিসেবে সে আপনার কাছে এতটুকু দাবি কি করতে পারে না যে, আপনি তার ভালোবাসার মূল্যায়ন করবেন? সন্তানের প্রতি তার মায়া-মমতায়, অনুভব-অনুভূতিতে কিছুটা অংশীদার হবেন?

কখনো কেউ কোনো বিষয়ে উৎসাহী হলে আপনারও উচিত তার সঙ্গে সে বিষয়ে উৎসাহী হওয়া। আপনি একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে, সামাজিকতামুক্ত হয়ে থাকবেন না। বরং মানুষের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করুন। সহমর্মিতা প্রদর্শন করুন। তাদের সুখে হাসুন, তাদের দুঃখে কাঁদুন। কেউ কোনো বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলে আপনিও বিস্ময় প্রকাশ করুন। না হয় আপনি জীবিত—না জীবস্মৃত, তা নিয়ে মানুষের মনে সংশয় জাগবে!

এজন্যই দেখবেন, যারা মানুষের সঙ্গে যথোপযুক্ত আচরণ করে চলতে জানে না, প্রায়ই তারা অভিযোগ তোলে, 'আমার সন্তানরা কেন আমার সঙ্গে গল্প

করতে চায় না? আমার সঙ্গে কেন তারা বেশি বেশি মেশে না?’ আমরা তাকে বলবো, এর কারণ হচ্ছে তারা অনেক সময় আপনাকে [তাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়] অনেক কিছু শোনায়, কিন্তু আপনার মাঝে এর কোনো প্রভাব দেখে না। তারা আপনার কাছে তাদের মাদরাসার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে, কিন্তু তাদের বুঝতে কষ্ট হয়, তারা কথা বলছে কোনো মানুষের সঙ্গে, নাকি শ্রবণশক্তিহীন কোনো দেয়ালের সঙ্গে! এ পরিস্থিতিতে আপনার কাছে বসার উৎসাহই তারা হারিয়ে ফেলে। গল্প করা তো বহু দূরের কথা!

আমি তো বলি, ‘যদি কেউ আপনাকে এমন কোনো ঘটনাও শোনায়, যা আপনি আগে থেকে জানেন, তবু তার সঙ্গে এমন আচরণ করুন, যেন তার আগ্রহে ভাটা না পড়ে।’ হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক রহ. বলেন, ‘কখনো এমন হয় যে, কেউ এসে আমাকে একটি হাদীস শোনায়। হাদীসটি আমি তার জন্মের আগ থেকে জানি। তবুও হাদীসটি তার কাছ থেকে এমনভাবে শুনি, যেন এই প্রথম বার শুনছি।’ আল্লাহু আকবার! কত মহান ছিলেন তিনি ও তাঁরা! কত চমৎকার তাঁদের আচরণদক্ষতা! মানুষকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করার কত চমৎকার পদ্ধতি!

খন্দক যুদ্ধের ঘটনা। মুসলমানগণ পরিখা খননে ব্যস্ত। তাদের মাঝে একজনের নাম ছিলো ‘জুআঈল’। নবীজী সেই নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখলেন ‘আমর’। এত ব্যস্ততার মাঝেও সাহাবীগণ তাকে নিয়ে কবিতা তৈরি করে আবৃত্তি করছিলেন:

سَمَّاهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا *** وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهْرًا

জুআঈল ছিলো তার নাম, এখন হলো আমর
অসহায়কে সাহায্য করে মরেও হবে অমর।

নবীজীও শেষ শব্দগুলোতে তাদের সঙ্গে সুর মেলালেন। তখন সবাই আরো উৎসাহিত হলো। এই ভেবে তাদের মন আনন্দে ভরে গেলো যে, নবীজীও আমাদের সঙ্গে আছেন। দিন শেষে যখন রাত নেমে এলো, শীত প্রচণ্ড বেড়ে গেলো। কিন্তু তখনো সাহাবীগণ খনন কাজ করে যাচ্ছিলেন। এ সময় নবীজী এসে দেখলেন, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খনন করছে। নবীজীকে দেখেই তারা আবৃত্তি শুরু করলেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا *** عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

আমরা তো ভাই নবীর হাতে করেছি দীপ্ত পণ
জিহাদের পথে থাকবো অটল, লড়বো আমরণ।

সাহাবীগণের জিহাদী জযবা দেখে নবীজীও সুর মেলালেন:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ *** فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

আসল জীবন সেই জীবন তাই বলি, পরওয়ারদেগার!
ক্ষমা করে দাও সব পাপ এদের—মুহাজির-আনসার।

দিন-রাত এভাবেই নবীজী সাহাবীদের হাসি-খুশি রেখেছেন। তাদের মনজয়ী আচরণ করেছেন। একবার তিনি দেখলেন, কর্মে শ্রান্ত, ধুলোয় ধূসরিত সাহাবীরা আবৃত্তি করছেন:

وَاللَّهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا *** وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا *** وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا *** إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

শপথ আল্লাহর! যদি না দিতেন পথের দিশা, পেতাম না তো পথের দেখা
জানতাম না কী নামায-রোযা, কাকে যে বলে দান-সদকা।
তাই হে খোদা! নাযিল করো দয়া তোমার, অটল রেখো রণাঙ্গনে
অনাচারের জবাব দেয়ার শক্তি দিও ক্ষণে ক্ষণে।

নবীজীও তাদের সঙ্গে শেষের শব্দটি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন: 'أَبَيْنَا، أَبَيْنَا' (আমরা মানি না, আমরা মানি না)।

নবীজীর সঙ্গে কেউ রসিকতা করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। এক চিলতে মুচকি হাসি উপহার দিতেন। প্রদত্ত খোরপোশষের চেয়ে অধিক দাবি করায় একদিন রাসূল আপন স্ত্রীগণের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। এমন সময় হযরত ওমর রাযি. উপস্থিত হলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ যে করেই হোক, নবীজীর রাগ ভাঙ্গাতে হবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। হযরত ওমর নবীজীর দরবারে প্রবেশ করেই বলতে শুরু করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কোরাইশ বংশের লোক। আমাদের স্ত্রীরা সবসময় আমাদের বশে থাকতো। আমাদের কথামতো চলতো। কেউ অতিরিক্ত খোরপোশষ চাইলে আমরা তার গলা টিপে ধরতাম!'

'মদীনায় এসে দেখতে পেলাম, এখানকার নারীরা পুরুষদের ওপর কর্তৃত্ব খাটায়। এখানে পুরুষরাই বরং মহিলাদের কথামতো চলে। এদের দেখাদেখি আমাদের নারীরাও এখন আমাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটানো শুরু করেছে। তারাও এখন আমাদের ওপর সরদারী করতে শুরু করেছে।' হযরত ওমর

কথাগুলো এমন ভঙ্গিতে বললেন যে, নবীজী শুনেই হেসে ফেললেন। ওমর আরো অনেক কথা বললেন। রাসূলও তার কথার সঙ্গে হাসতে লাগলেন। এভাবে রাসূলের রাগও কমে এলো।

আপনি অনেক হাদীসে পড়েছেন, 'আল্লাহর রাসূল এত বেশি হেসেছেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিলো।' ভেবে দেখুন, আচরণ ও উচ্চারণে কত মহান ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী! কত অনুপম আখলাক ও চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী! তাই তো আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আয়ে ۝৪ [সূরা কলাম]

অর্থ: এবং নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রগুণের সর্বোচ্চ স্তরে আছেন।

আর আমাদের উদ্দেশে বলেছেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

আয়ে ۝২১ [সূরা আহযাব]

অর্থ: বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

নবীজীকে এমন মানুষের সঙ্গেও ওঠাবসা করতে হতো, যারা আচার-ব্যবহার জানতো না, সভ্যতা বলতে কিছুই যারা বুঝতো না। বরং তারা ছিলো সমাজবিচ্ছিন্ন তড়িৎপ্রবণ লোক। নবীজী তবু তাদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে চলতেন, সুন্দর আচরণ করতেন। একবার সফরকালে নবীজী মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি অবস্থিত 'জিঈররানাহ' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। নবীজীর সঙ্গে হযরত বেলাল রাযি.ও ছিলেন।

একজন বেদুঈন এসে নবীজীর কাছে কিছু সাহায্য চাইলো। নবীজী তাকে সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিলেন। লোকটা ছিলো বড় তড়িৎপ্রবণ। নবীজীর আশ্বাসবাণী শোনার পর বিলম্ব না করে সে বলে উঠলো, ‘হে মুহাম্মাদ! আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার কি পূরণ করবে না?!’ নবীজী তাকে বিনম্র ভাষায় বললেন, ‘তোমার জন্যে একটা খুশির সংবাদ আছে। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো।’ কী চমৎকার বাক্য বিনিময়! ‘সুসংবাদ গ্রহণ করো।’ এর চাইতে ভালো আচরণ আর কী হতে পারে? কিন্তু বেদুঈন লোকটি একে সুন্দরভাবে গ্রহণ করবে তো দূরের কথা, এর কোনো প্রভাবই তার মাঝে পড়লো না। উল্টো সে ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ‘কথা অনেক বলেছেন, আর শুনতে চাই না।’ [নাউযুবিল্লাহ]

তার এ উক্তি শুনে নবীজী ভীষণ রাগ করলেন, কিন্তু ক্ষণিকের মাঝে তিনি তা হজম করে নিলেন। হযরত আবু মূসা রাযি. ও বেলাল রাযি. কাছেই বসে ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে নবীজী এবার বললেন, ‘সুসংবাদটি সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তোমরা চাইলে তা গ্রহণ করতে পারো।’ তাঁরা দু'জন বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমরা সুসংবাদ গ্রহণ করলাম।’

এরপর নবীজী এক পেয়ালা পানি আনালেন। তিনি তাতে হাত-মুখ ধৌত করলেন, কুলি করলেন। তারপর বললেন, ‘এ পানি তোমরা পান করো। তোমাদের চেহারা ও কণ্ঠমূলে ঢেলে দাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো।’ সুসংবাদটি ছিলো নবীজীর চেহারা-বিধৌত সেই পবিত্র পানির বরকত।

অতএব, বিলম্ব না করে পেয়ালাটি নিয়ে আনন্দ মনে উভয়ে নবীজীর হুকুম তামিল করলেন।

এদিকে আম্মাজান উম্মে সালামা রাযি. নিকট থেকেই তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনিও এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। পর্দার আড়াল থেকে ডাক দিয়ে বললেন, ‘তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু রেখে দিও।’ এ কথা শুনে তাঁরা আম্মাজান উম্মে সালামার জন্যও কিছু পানি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেই পানি নিয়ে নবীজীর হুকুম তামিল করলেন। [সহীহ বুখারী: ৩৯৮৩, সহীহ মুসলিম: ৪৫৫৩]

পাঠক! আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, চোখের মধ্যমণি, রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুকোমল আচরণের অধিকারী। অত্যন্ত আন্তরিক এবং চূড়ান্ত সহনশীল একজন মহামানব। সবকিছুর বিপরীতে গিয়ে তিনি কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। একদিন আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. নবীজীর সঙ্গে বসা ছিলেন। নবীজীকে তখন তিনি কিছু মেয়েলোকের কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন। নবীজীও ধৈর্য সহকারে শুনতে থাকলেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা কথা খুব দীর্ঘ করছিলেন। আর নবীজী শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং বিভিন্ন মন্তব্য করে তার কথায় সায় দিচ্ছিলেন। এভাবে নবীজী ঘটনার একেবারে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। কী ছিলো সেই ঘটনাটি? আসুন জেনে নিই, হযরত আয়েশা সেদিন নবীজীকে কোন ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন:

“ঘটনাটি জাহেলী যুগের। একবার এগারোজন মহিলা মিলে একটা গল্পের আসর জমালো। সকলে প্রতিজ্ঞা করলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর দোষ-গুণ তুলে ধরবে। কেউ কিছু গোপন করবে না। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী একে একে বলা শুরু করলো।

১. প্রথম মহিলা বললো, ‘আমার স্বামী হলো দুর্বল উটের গোশতের মতো, যাকে রাখা হয়েছে দুর্গম পাহাড়চূড়ায়, যেখানে সহজে কেউ আরোহণ করে না। আবার গোশতও এত উৎকৃষ্ট নয় যে, কষ্ট করে সেখানে থেকে সংগ্রহ করা হবে।’ [অর্থাৎ তার স্বামী যেন এক টুকরো গোশত, যার মাঝে প্রাণের স্পন্দন নেই। গোশতের এই টুকরাটাও আবার উটের, যার নেই কোনো স্বাদ। সে অহঙ্কারী ও মন্দ স্বভাবের। অহঙ্কারের দাপটে তার কাছে কেউ ভিড়তেই চায় না, আবার মন্দ স্বভাবের হওয়ায় তার প্রতি কেউ আগ্রহও দেখায় না। অথচ তার কাছে অহঙ্কার করার মতো কিছুই নেই। সে এক কঞ্জুস, সম্বলহীন পুরুষ।]

২. দ্বিতীয়জন বললো, ‘আমি বাপু আমার স্বামীর কথা বলতে পারবো না। কারণ আশঙ্কা হয়, শুরু করলে তার কাহিনী আর শেষ করতে পারবো না! আমি যদি তার দোষ-গুণ বলতে শুরু করি তাহলে তার কদাকার কুঁজ ও স্ফীত পেট [অর্থাৎ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য] সবকিছুর কথাই বলে ফেলবো।’ [অর্থাৎ তার স্বামীর দোষের শেষ নেই। কিন্তু সে তা বলতে ভয় পাচ্ছে। পাছে স্বামী শুনতে পারলে তাকে তালাক দিয়ে দেবে। এদিকে সন্তানাদির

মায়ায় শত কষ্ট সত্ত্বেও সে তাকে ছাড়তে রাজি নয়। অবশ্য সে একেবারেই কিছু বলেনি, এমনও নয়! কদাকার কুঁজ ও স্ফীত পেটের কথা বলে সে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব দোষের দিকেই ইঙ্গিত করে দিয়েছে।]

৩. তৃতীয় মহিলা বললো, 'আমার স্বামী অস্বাভাবিক লম্বা। আমি নিজের কোনো প্রয়োজনের কথা বললে সে আমাকে তালাক দেবে আর কিছু না বলে চুপ থাকলে ঝুলিয়ে রাখবে। আমাকে সে ছাড়েও না যে, অন্য স্বামী গ্রহণ করবো। আবার তার কাছে থেকে স্ত্রীর মর্যাদাও পাই না। সে যেন আমার জীবনে এক দু'ধারী তলোয়ার!' [অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছে, তার স্বামী দৃষ্টিকটু পর্যায়ের লম্বা, চরিত্রও নোংরা। তার সঙ্গে স্ত্রীসুলভ আচরণও করে না। সে যেন এক ধারালো তরবারি। সবসময় তাকে তালাক দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কোনো কথা বললেই হলো, কোনো অভিযোগ তুললেই হলো; সঙ্গে সঙ্গে তালাক। স্ত্রীসুলভ আচরণও সে পায় না, আবার কিছু বলতেও পারে না। না পরিতৃপ্ত জীবনসঙ্গিনী, না বন্ধনমুক্ত জীবনধারিণী—এই ঝুলন্ত অবস্থায় কাটছে তার দিন।]

৪. চতুর্থজন বললো, 'আমার স্বামী তিহামা অঞ্চলের রজনী সদৃশ। অতি উষ্ণ নয়, অতি শীতলও নয়; বরং যাকে বলে নাতিশীতোষ্ণ, অনেকটা সে রকম। আমি তাকে নিয়ে ভীত নই, আবার বিরক্তও নই।' [তিহামা অঞ্চলে রাতে তীব্র বাতাস থাকে না, তাই ধুলাও ওড়ে না। সেখানকার লোকজনের জন্যে এ পরিবেশ বড় উপভোগ্য ও আনন্দের। মহিলা এর মাধ্যমে তার

স্বামীর উত্তম আচরণের বিবরণ দিলো। স্বামীর কাছে তার কোনো কষ্ট নেই। বরং সুখেই তার দিন কাটছে।]

৫. পঞ্চম মহিলা বললো, 'আমার স্বামী যখন গৃহে পদার্পণ করেন তখন চিতাবাঘের মতো হয়ে যান! আর বাইরে বেরুলে যেন বিক্রমতেজী সিংহ! ঘরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি কোনো প্রশ্ন তোলেন না।' [অর্থাৎ সে যখন ঘরে ঢোকে তখন চিতার মতো হয়ে যায়। আর চিতার উদারতা ও কর্মোদ্যম তো সুপ্রসিদ্ধ। যখন সে বাইরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মেশে তখন সিংহের মতো সাহসী ভাব নিয়ে থাকে। সে একজন উদার ও মহৎ ব্যক্তি। পরিবারের কেউ তার প্রাপ্য নিয়ে গেলে অথবা খরচ করে ফেললে অযথা প্রশ্নবানে সে বিরক্ত করে না।]

৬. ষষ্ঠজন বললো, 'আমার স্বামী আহার শুরু করলে সব শেষ করে ফেলে, পান করতে শুরু করলে পানপাত্র শুকিয়ে ফেলে। আর ঘুমাতে গেলে পুরো লেপ নিজের গায়ে জড়িয়ে ফেলে। এমনকি হাত বাড়িয়ে আমার খবরটুকুও নেয় না।' [অর্থাৎ তার স্বামী একজন মন্দ প্রকৃতির লোক। পানাহার করতে বসলে তো সবকিছু একাই খেয়ে ফেলে; ঘুমানোর সময়ও স্ত্রীকে গায়ে লেপ জড়াতে না দিয়ে পুরোটাই নিজে জড়িয়ে নেয়। আর স্ত্রী কোনো কারণে ব্যথিত হলে সে একটু হাত ধরে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না, 'ওগো! কী হয়েছে?']

৭. সপ্তম মহিলা বললো, 'আমার স্বামী যৌন-দুর্বল, অক্ষম। সব ধরণের রোগে সে আক্রান্ত। তাছাড়া সে এত বদমেজাজী যে, কেউ তার সঙ্গে

রসিকতা করতে গেলে তার মাথা বা শরীরে আঘাত করতে পারে! ভাগ্য সুপ্রসন্ন(!) হলে মস্তক-দেহ সর্বাঙ্গে আঘাত জুটতে পারে।'

৮. অষ্টমজন বললো, 'আমার স্বামীর স্পর্শ খরগোশের স্পর্শের মতো কোমল এবং তার দেহসৌরভ যাফরানের সুবাসের মতো মাদকতা আনে। আমি তার ওপর জয়ী থাকি। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সে থাকে জয়ী।' [অর্থাৎ স্বামী তার প্রতি বিনম্র। সে যা-ই চায়, পূর্ণ করে। কিন্তু অন্যদের সামনে তার ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী ও দৃঢ়তাপূর্ণ।]

৯. নবমজন বললো, 'আমার স্বামী উঁচু উঁচু প্রাসাদের অধিপতি। [তার বাড়ি মেহমানদারীর জন্য সদা উন্মুক্ত।] আর তার ছাই-ভস্মের পরিমাণ প্রচুর [অতিথি আপ্যায়নে চুলোয় জ্বলে প্রচুর লাকড়ি]। তার বৈঠকখানা বাড়ির সন্নিকটেই [পরিবারের অবস্থা জানতে সবসময় মন তার উন্মুখ]। কোনো রাতে মেহমান থাকলে তিনি বেশি খান না। কোনো রাতে শত্রু কিংবা অন্য কিছুর আশঙ্কা থাকলে আর ঘুমান না। পরিবারের কল্যাণ চিন্তায় জেগে থাকেন, রাত জেগে পাহারা দেন।'

১০. দশমজন বললো, 'আমার স্বামীর নাম মালিক। মালিকের আর কী প্রশংসা আমি করবো? এ পর্যন্ত তোমরা যাদের প্রশংসা করেছো, তাদের সবার চেয়ে সে উত্তম। কিংবা বলতে পারি, আমি তার যে প্রশংসা করবো; সে তার চেয়েও উত্তম। বহু উটের মালিক সে। উটগুলো তার ঘরের নিকটে আস্তাবলে থাকে। কয়েকটি কেবল চারণভূমিতে যায়। [যেন চাহিবা মাত্র অতিথি আপ্যায়নে দুগ্ধ দোহন করা যায়, যবাই করা যায়।] এই উটগুলো

ঝনঝন ধ্বনি [ছুরি ধার করার শব্দ] শোনামাত্রই বুঝতে পারে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে।'

**১১.** একাদশ মহিলা বললো, 'আমার স্বামীর নাম আবু যারআ। আবু যারআর আমি কত আর প্রশংসা করবো! অলঙ্কারে সে আমার দু'কান ঝুলিয়ে দিয়েছে। চর্বিতে আমার দু'বাহু স্থূল করে দিয়েছে। [তার কাছে এসে আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়েছি।] আমাকে সে এত সুখ দিয়েছে, এত আনন্দ দিয়েছে যে, আমি নিজেতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম! এমন এক পরিবারে সে আমাকে পেয়েছে, যারা ছিলো নিতান্ত দরিদ্র। কেবল যুদ্ধলব্ধ কয়েকটি বকরীর মালিক। অতি কষ্টে তারা জীবন যাপন করতো। এরপর সে আমাকে এমন এক ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যাদের আছে উট ও ঘোড়ার বহু আস্তাবল, আছে অনেক রাখাল। আছে প্রভূত সম্পত্তি। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারও ছিলো অত্যধিক সুন্দর। আমি যা-ই বলতাম, সে আমাকে মন্দ বলতো না এবং ভর্ৎসনাও করতো না। সুখের সেই দিনগুলোতে সুখনিদ্রায় যেন শুতে না শুতেই সকাল হয়ে যেতো। আমি সকালে খুব দেরি করে ঘুম থেকে জাগতাম। কোনো কিছু পান করার সময় তৃপ্তি সহকারে আমি পান করতাম।

আবু যারআ'র মায়ের কথা কী বলবো। তার পাত্রগুলো ছিলো সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিলো অনেক প্রশস্ত। [অর্থাৎ তার ঘরে সবসময় মেহমান থাকতো।] আবু যারআর ছেলেও খুব ভালো ছিলো। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিলো যে, মনে হতো যেন কোষমুক্ত তরবারি। [অর্থাৎ সে ছিলো ছিমছাম

দেহবিশিষ্ট।] বকরীর একটি বাহুই তার জন্য যথেষ্ট হতো। [অর্থাৎ সে সামান্য খাবারেই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। স্বল্পভোজী বীর বাহাদুর ছিলো সে।] আবু যারআর কন্যা সম্পর্কে কী বলবো! সে ছিলো পিতা-মাতার পূর্ণ অনুগত। নিজেকে সদা পর্দায় আবৃত রাখতো সে। তার সুঠাম ও সুঢৌল দেহসৌন্দর্যের কারণে সতীন মেয়েরা হিংসায় জ্বলে মরতো। আবু যারআর ক্রীতদাসীটাও ছিলো গুণবতী। ঘরের গোপন কথা সে বাইরে ফাঁস করতো না। ঘরের খাবার বাইরে পাচার করতো না। সে ছিলো খুবই বিশ্বস্ত ও আমানতদার। এমনকি কোনো কিছু সে ময়লা করেও রাখতো না।

এরপর মহিলা বললো, ‘এভাবে সুখে শান্তিতেই আমি দিনযাপন করছিলাম। একদিন আবু যারআ মরুভূমির সফরে বের হলো। বসন্তের সেই দিনটিতে বাড়িতে মাখন তৈরির জন্য দুধের পাত্রগুলো ঘোঁটা হচ্ছিলো। পথিমধ্যে সে এক রমণীকে দেখতে পেলো। রমণীর সঙ্গে ছিলো তার দুই পুত্র সন্তান। ছেলে দু'টি তাদের মায়ের কোলে দু'টি ডালিম নিয়ে খেলা করছিলো। আবু যারআ এ রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করলো। এরপর আরেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। সে তরবারি হস্তে আরবের তেজি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতো। অবিরত ধাবমান উন্নত ও শক্তিশালী অশ্বে আরোহণ করতো এবং সবসময় সে হাতে বর্শা রাখতো। আমাকে সে অনেক কিছু দিয়েছে। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি সব কিছুই তার কাছে আমি পেয়েছি। আমাকে সুখে রাখতে কখনো কোনো ত্রুটি সে করেনি। এমনকি এ কথাও সে বলেছে যে, উম্মে যারআ! আমার সম্পত্তি তুমি ভোগ করো। চাইলে পরিবারের কাছেও পাঠাতে পারো।’

এরপর মহিলাটি তার প্রথম স্বামী আবু যারআর প্রতি তার আগ্রহের বিবরণ দিতে গিয়ে বললো, ‘আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে যা কিছু দিয়েছে তার সবগুলোকে যদি একত্র করি তবু আবু যারআর ছোট্ট একটি পানপাত্র বরাবরও হবে না।” [সহীহ বুখারী: ৪৭৯০, সহীহ মুসলিম: ৪৪৮১, শামায়েলে তিরমিযী: ২৫৯] [সুবহানাল্লাহ! আবু যারআর প্রতি সে এখনো দুর্বল। এখনো তার মন পড়ে আছে তার কাছে! ভালোবাসা? সে তো কেবল প্রথম সখার জন্য!] ঘটনাটি শেষ হলো!

পাঠক! দেখতেই পাচ্ছেন, এগারো নারীর বিশাল এক ঘটনা। উম্মতের চিন্তায় সদাব্যস্ত নবীজির সময় কোথায় দীর্ঘক্ষণ বসে বসে এত বড় ঘটনা শোনার? তবু তিনি জীবনসঙ্গিনীর ভাবাবেগকে মূল্যায়ন করে অফুরন্ত প্রেম-ভালোবাসায় সিক্ত করে আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি.-এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বিশাল ঘটনাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করলেন। যেখানে আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করা দরকার, সেখানে আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করলেন। একেবারে পরিপূর্ণরূপে ঘটনাটি উপভোগ করলেন। কোনো রূপ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করলেন না। অথচ উম্মতের ফিকিরে সদা মগ্ন কত ব্যস্ত একজন মহামানব তিনি! এমনকি যখন আম্মাজান ঘটনা বর্ণনা শেষ করলেন, নবীজী তাকে বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং এর মর্ম উপলব্ধি করে ঘটনাটি পুরোপুরি উপভোগ করেছেন। এমন হয়নি যে তিনি ঘটনা বলেছেন আর নবীজী অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলেন। তাই নবীজী তাকে বললেন, ‘আয়েশা! আমি তোমার জন্য কেমন জানো? যেমন ছিলেন আবু যারআ উম্মে যারআর জন্য।’

[অর্থাৎ আবু যারআ যেমন উম্মে যারআকে ভালোবেসেছে, উপহার দিয়েছে, আমিও তোমাকে তদ্রূপ ভালোবেসেছি, তোমার সঙ্গে তেমন আচরণ করেছি। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, আবু যারআ শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দিইনি; বরং আজীবন তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছি।]

পাঠক! তাহলে এ ব্যাপারে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং মানুষকে মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মনে করুন, আপনার সন্তান সুন্দর পোশাক পরিধান করে সেজে-গুজে আপনার কাছে এসে বললো, 'আব্বু! দেখো তো আমাকে কেমন লাগছে?' তখন আপনিও তার আনন্দে আনন্দিত হয়ে বলুন, 'সুবহানাল্লাহ! বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো!' এভাবে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-কন্যা, সাথী-সঙ্গী যাদের সঙ্গেই আপনার ওঠাবসা হয়, সবার সঙ্গেই জীবন্ত ও প্রফুল্ল ভাব নিয়ে থাকুন।

মনে করুন, কেউ আপনাকে বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ! আমার বাবা সুস্থ হয়ে গেছেন।' আপনার মনেই নেই যে, তার পিতা অসুস্থ হয়েছিলেন। তখন আপনি কিছুতেই এ কথা বলবেন না যে, 'তিনি অসুস্থ হলেন কবে?' বরং বলুন, 'আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তাকে স্থায়ী সুস্থতা এবং উত্তম প্রতিদান উভয়টাই দান করুন। তুমি আমাকে আনন্দের সংবাদ শোনালে। আল্লাহ তোমাকেও আনন্দিত করুন।' অথবা কেউ বললো, 'আমার ভাই কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে।' তখন আপনি কিছুতেই এ কথা বলবেন না যে, 'আমি

তো জানিই না যে, সে জেলে গিয়েছে!’ বরং তার আনন্দে অংশ নিয়ে বলুন, ‘আলহামদু লিল্লাহ! খুশির সংবাদ শোনালে। আল্লাহ তোমাদের চির জীবন সুখে রাখুন।’

সবশেষে বলছি, ‘উৎসাহ প্রদান ও সহানুভূতি প্রকাশ কেবল মানুষ কেন, প্রাণীদের বেলায়ও যথেষ্ট কার্যকর হয়।’ আবু বকর রাকী রহ. বলেন, আমি তখন মরুপ্রান্তরে ছিলাম। সেখানে আরবের একটি গোত্রের নিকট গেলাম। তাদের একজন আমাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং আমাকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। তাঁবুতে প্রবেশ করেই আমি একটি কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে বাঁধা দেখলাম। আরো লক্ষ্য করলাম, তাঁবুর সামনে কতগুলো মৃত উট! এগুলোর পাশেই জীর্ণকায় একটি উট দাঁড়িয়ে আছে। অবস্থা দেখে মনে হলো, এটাও যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবে। ক্রীতদাসটি আমাকে বললো, ‘আপনি মেহমান হিসেবে আপনার অধিকার আছে। আমার মুনীবের কাছে আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন। তিনি মেহমানের খুব সম্মান করেন। তাই আপনার সুপারিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। আশা করি, আপনার সুপারিশে তিনি আমার বাঁধন খুলে দেবেন।’

আমি কিছু বললাম না। বুঝতে পারছিলাম না, তার অপরাধ কী? যখন আমার সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো, আমি বললাম, ‘এ ক্রীতদাসের ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ না করা হলে আমি খাবো না।’ তার মুনীব বললো, ‘জনাব! সে তো আমাকে নিঃস্ব করে ফেলেছে। আমার সমুদয় সম্পত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী করেছে?’

মুনীব বললো, ‘তার কণ্ঠ ভারী সুন্দর। সুমিষ্ট তার আওয়াজ। তার আওয়াজে প্রাণীও প্রভাবিত হয়ে যায়, পাগলপারা হয়ে পড়ে। এই যে উটগুলো দেখছেন; এগুলোর মাধ্যমে আমার জীবিকার ব্যবস্থা হতো। এগুলোর ওপর সে অনেক ভারী বোঝা চাপিয়েছে। তারপর সেই সুমধুর কণ্ঠ দিয়ে এগুলোকে প্রভাবিত করেছে। যে কারণে সুরের তানে মাতাল হয়ে উটগুলো তিন দিনের পথ এক দিনে অতিক্রম করেছে। এরপর বোঝাগুলো নামানোর সঙ্গে সঙ্গে এই উটটি ছাড়া সবগুলোই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েছে। কিন্তু আপনি আমার মেহমান। তাই আপনার সম্মানার্থে ক্রীতদাসটি আপনাকে দিয়ে দিলাম।’ এই বলে সে উঠে গিয়ে ক্রীতদাসটির বাঁধন খুলে দিলো।

আবু বকর বলেন, আমার মনে ক্রীতদাসটির সেই যাদুময় আওয়াজ শোনার আগ্রহ জাগলো। সকাল হলে আমি তাকে একটি উট নিয়ে দূরের একটা কূপ থেকে পানি আনতে বললাম। তাকে উটের স্পৃহাজাগানিয়া সঙ্গীত গাইতে বললাম, যেন উটটি কর্মোদ্যমী হয়ে ওঠে। ক্রীতদাসটি তখন তার সুরেলা কণ্ঠে আওয়াজ করে চলতে শুরু করলো। তার উচ্চ কণ্ঠের সঙ্গীত শুনে উটটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো এবং একপর্যায়ে বাঁধন ছিঁড়ে ফেললো। আর আমি সেই সুর শুনে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো, জীবনে কখনো এর চেয়ে সুন্দর কোনো সুর আমি শুনিনি। [ইহয়াউ উলূমিদ্দীন: শ্রবণ বৈধতা প্রমাণ অধ্যায়]

তাই বলি, প্রাণী যদি সুন্দর আওয়াজে প্রভাবিত হয় আর তাদের জাগাতে জেগে ওঠে এক ক্রীতদাসের চেতনা, সে গায় আরো মধুর করে, তাহলে সৃষ্টিসেরা মানুষের বেলায় কি জাগবে না আপনার সুপ্ত ইচ্ছা?

**অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে নিন...**

মৃত সদৃশ না হয়ে আচরণে জীবন্ত হোন। মিষ্টি কথায়, আকর্ষণীয় অঙ্গ-ভঙ্গিমায় জয় করে নিন মানুষের মন।

# ৫৫. মিষ্টভাষী হোন

জীবনে চলার পথে মাঝেই মধ্যেই অন্যকে উপদেশ দিতে হয়। বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-কন্যা, পাড়া-প্রতিবেশী, বাবা-মা কিংবা অন্য কাউকে প্রায়ই দিকনির্দেশনামূলক কিছু বলতে হয়। এসব ক্ষেত্রে উপদেশের সূচনার পার্থক্যের কারণে সমাপ্তিতেও পার্থক্য হয়। শুরুটা যদি হয় সহনীয় ভঙ্গিতে, কোমল ভাষায় তাহলে শেষটাও তেমনই হয়। আর যদি শুরুটা হয় নিরস ভঙ্গিতে, শক্ত বকুনিতে তাহলে শেষটাও হয় তেমনই।

মানুষকে আমরা যখন কোনো উপদেশ দিই তখন আমরা মূলত তাদের হৃদয়ে বিচরণ করি। দেহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। হৃদয়ের সঙ্গে এর সম্পর্কের কারণেই আপনি লক্ষ্য করবেন, কিছু ছেলে-মেয়ে মায়ের উপদেশ মেনে চলে। কিন্তু বাবার উপদেশ মোটেও মানে না। কারো ক্ষেত্রে হয় সম্পূর্ণ উল্টো। ছাত্রদের বেলায়ও দেখা যায়, একজন উস্তাদজীর আদেশ-উপদেশ যতটা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়, অন্য একজনের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না।

উপদেশ দানের ক্ষেত্রে সবচে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হলো বেশি ভুল না ধরা। খুঁটিনাটি সব বিষয়ে সমালোচনা না করা। এমন হলে কেউ মনে করতে পারে, আপনি তার পেছনে লেগে আছেন। তার প্রতি মুহূর্তের কর্মকাণ্ড ও গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার উপস্থিতি তার কাছে ভারী মনে হবে। এ কথাটিই কবি বলেছেন ছন্দে ছন্দে—

নির্বোধ কভু হয় না জানি শ্রেষ্ঠ জাতির নেতা
তবু শ্রেষ্ঠ নেতাকে হতে হয় কভু নির্বোধ অভিনেতা।

আপনি যদি পরামর্শ প্রদানের ভঙ্গিতে উপদেশ দিতে পারেন তাহলে সেটাই করুন। মনে করুন, আপনার স্ত্রী খাবার পরিবেশন করলো। রান্না শেষে খাবার প্রস্তুত করে সে এখন বেশ ক্লান্ত। খানা খেতে বসে আপনি দেখলেন, লবণ বেশি হয়ে গেছে। তখন কিছুতেই আপনি এ মন্তব্য করতে যাবেন না যে, 'কী পাক করেছো! রান্না একদম বাজে হয়েছে। লবণদানিতে কি আর লবণ ছিলো না?' বরং কোমল স্বরে বলুন, 'লবণটা একটু কম দিলে স্বাদটা আরো ভালো হতো।' আপনার সন্তানকে দেখলেন, ময়লা কাপড় গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি তাকে পরামর্শের ঢংয়ে উপদেশ দিন। বলুন, 'বাবা! তোমার পরনের কাপড় তো ময়লা হয়ে গেছে। পাল্টে ফেললে কেমন হয়?' কোনো ছাত্র মাদরাসায় দেরি করে এলো। তাকে বলুন, 'ভবিষ্যতে আর কখনো বিলম্ব না করলে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।'

মানুষ আদিষ্ট হতে পছন্দ করে না। তাই সর্বদা এভাবে বলুন, 'এমন করলে কেমন হয়? আমি আপনাকে এই করার পরামর্শ দিচ্ছি।' 'এই অভদ্র! কত বার তোমাকে বলবো? তুমি তো কিছুই বোঝো না। আর কত দিন তোমাকে শেখাবো?' এ জাতীয় সম্বোধন করার চেয়ে পূর্বে বর্ণিত কোমল ভঙ্গিতে তাকে পরামর্শ দেয়াই শ্রেয়। তাকে তার মর্যাদা রক্ষা করতে দিন। অপরাধী হলেও তাকে তার মূল্য বুঝতে দিন। হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, 'এটা কেন?' আমি বলবো, 'আপনার উদ্দেশ্য তো সংশোধন করা; প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা

অপমান করা তো মাকসাদ নয়।' স্পষ্ট ভাষায় বললে, কেউ কারো আদেশের গোলাম হতে পছন্দ করে না।

এক্ষেত্রে নববী নীতি লক্ষ্য করুন। একবার নবীজী আবদুল্লাহ বিন আমরকে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের উপদেশ দিতে চাইলেন। তো তিনি তাকে ডেকে এ কথা বলে দিলেন না যে, 'আবদুল্লাহ! নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ো।' বরং পরামর্শের ভঙ্গিতে বললেন, 'আবদুল্লাহ বড় ভালো মানুষ। কত ভালো হতো যদি সে তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত হতো!' [সহীহ বুখারী: ১০৫৪] আরেক বর্ণনামতে রাসূল বললেন, 'আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না। সে পূর্বে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতো আর এখন তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিয়েছে।' [সহীহ বুখারী: ১০৮৪]

আর যদি কারো অজান্তে তার দোষের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন তাহলে তো আরো ভালো। আবদুল্লাহ বিন মোবারক রহ.-এর সামনে এক লোক হাঁচি দিলো। কিন্তু 'আলহামদু লিল্লাহ' বললো না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ হাঁচি দিলে যেন কী বলতে হয়?' সে বললো, 'আলহামদু লিল্লাহ'। আবদুল্লাহ বিন মোবারক এবার বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'!

এ তো আমাদের প্রিয় নবীজীরই সুন্নাত। প্রতিদিন আসরের নামায আদায় করে তিনি স্ত্রীদের কাছে যেতেন। একেক করে সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলতেন। একদিন যায়নাব বিনতে জাহশ রাযি.-এর ঘরে গেলেন। তার কাছে মধু ছিলো। নবীজী মধু ও মিষ্টান্ন পছন্দ করতেন। তাই তিনি

মধুও পান করতে লাগলেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। ফলে অন্যদের তুলনায় এখানে একটু বেশি দেরি হয়ে গেলো। হযরত আয়েশা এবং হাফসা রাযি.-এর নারীসুলভ আত্মাভিমানে বিষয়টি আঘাত হানলো। উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, এরপর নবীজী দু'জনের যার ঘরেই আসুন, তিনিই বলবেন, 'আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ আসছে!' মাগাফীর হলো মধুজাতীয় এক প্রকার মিষ্টিদ্রব্য। কিন্তু কিছুটা দুর্গন্ধযুক্ত। আর নবীজীর জন্য এটা বেমানান ছিলো যে, তাঁর শরীর বা মুখ থেকে কোনো রূপ দুর্গন্ধ আসবে। কারণ জিবরাঈল আ. এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর একান্তে কথা বলতে হয়।

এরপর নবীজী হযরত হাফসা রাযি.-এর গৃহে প্রবেশ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খেয়েছেন আপনি?' নবীজী বললেন, 'যায়নাবের কাছ থেকে মধু পান করেছি।' হাফসা রাযি. পরিকল্পনা অনুযায়ী বললেন, 'আমি তো আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি।' নবীজী বললেন, 'না, আমি মধুই পান করেছি।' এরপর আয়েশা রাযি.-এর ঘরে উপস্থিত হলে তিনিও একই কথা বললেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা নবীজীকে সম্পূর্ণ বিষয়টি অবগত করলেন। এর কিছুদিন পর নবীজী হাফসা রাযি.-কে একটি গোপন কথা বললেন। কিন্তু তিনি সেটা গোপন রাখলেন না। এরপর একদিন হাফসার কাছে গিয়ে নবীজী দেখলেন, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাযি. সেখানে উপস্থিত। তিনি একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে

মানুষের সেবা করতেন। এ সময় নবীজী হাফসাকে তার ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। কিন্তু সরাসরি না বলে নবীজী অবলম্বন করলেন ভিন্ন পন্থা। হাফসাকে কিছু না বলে শিফাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তুমি তো হাফসাকে লেখা শিখিয়েছো। তাকে রুক্কিয়্যাতুন নামলাহ বা পিপীলিকার মন্ত্র শেখাতে পারো না?’ রিক্কিয়্যাতুন নামলাহ হলো এক ধরণের মন্ত্র, যা আরব নারীরা বলতো। সকলেই জানতো, এ মন্ত্র শুনলে ক্ষতি-উপকার কিছুই হয় না। তাদের প্রসিদ্ধ পিপীলিকা মন্ত্র ছিলো:

নববধূ আসর জমায়... বয়স ঢাকতে খেজাব লাগায়... মন্দ চোখে সুরমা লাগায়... বলেও ফেলে অনেক কথা... কিন্তু হ্যাঁ, করে না স্বামীর অবাধ্যতা।

নবীজী এ কথা বলে হাফসাকে ইঙ্গিতে ভর্ৎসনা ও কৌশলে শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই ‘করে না স্বামীর অবাধ্যতা’ বাক্যটি বারবার বললেন। অন্যকে শোধরানোর জন্য কত চমৎকার এ কৌশল! এতে পারস্পরিক ভালোবাসা অটুট থাকে। কৌশলে বারবার উপদেশ দিলেও ভালোবাসায় সামান্য ঘাটতি আসে না।

জনৈক বুযুর্গের কাছ থেকে একজন একটি কিতাব ধার নিয়েছিলো। কিছুদিন পর সে যখন ফেরত দিলো, দেখা গেলো—তাতে খাবারের দাগ লেগে আছে। হয়তো সে কিতাবের ওপর রুটি বা আঙুর রেখেছিলো। বুযুর্গ তাকে কিছু বললেন না। কিছুদিন পর লোকটি আরেকটি কিতাব ধার নেয়ার জন্যে বুযুর্গের কাছে এলো। বুযুর্গ তাকে একটি প্লেটের ওপর রেখে কিতাবটি

দিলেন! লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললো, ‘আমি তো শুধু কিতাব চেয়েছি। সঙ্গে প্লেট দিলেন যে?!’ বুযুর্গ বললেন, ‘কিতাব দিয়েছি পড়ার জন্য আর প্লেট দিয়েছি খাবার রাখার জন্য’! এ কথা শুনে সে কিতাব নিয়ে চলে গেলো। আসল রহস্যটা বুঝতে তাকে আর বেগ পেতে হলো না। ইঙ্গিতেই তার কাছে বার্তা পৌঁছে গেছে।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা মনে পড়ে গেলো। তিনি রাতে বাড়ি ফিরেই জামা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। এ সুযোগে স্ত্রী মানিব্যাগ খুলে কিছু টাকা নিয়ে নিতো। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি কাজে চলে যেতেন। এভাবেই চলতে থাকলো। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দোকানে গেলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেখেন একটি টাকাও নেই! তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। টাকা গেলো কোথায়? সন্দেহবশত স্ত্রীকে তিনি পর্যবেক্ষণে রাখলেন। একদিন তার কাছে মূল রহস্য স্পষ্ট হয়ে গেলো। পরদিন আসার সময় পকেটে করে তিনি একটি ব্যাঙ নিয়ে এলেন। আগের মতো কাপড় ঝুলিয়ে রেখে তিনি ঘুমের ভান করে নাক ডাকা শুরু করলেন আর চুপে চুপে কাপড়ের দিকে নজর রাখলেন। এদিকে স্ত্রী অভ্যাস অনুযায়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। চুপিসারে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো। ব্যাঙের খসখসে শরীরে হাত লাগতেই সে চিৎকার দিয়ে উঠলো। ‘উহ! আমার হাত!’ এবার স্বামীও চোখ খুলে বলে উঠলো, ‘হায়! আমার পকেট!’

আমরাও যদি আমাদের ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী কোনো ভুল করে বসলে সংশোধনের জন্য এ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করতাম, তাদের ভুলগুলো যদি এভাবেই শোধরাতে পারতাম, কত ভালো হতো!

আমার এক বন্ধুর নাম নায়িফ। তার মা অত্যন্ত মুত্তাকী মহিলা। ঘরে কোনো ছবি থাকা তিনি একদম পছন্দ করতেন না। কারণ, যে ঘরে প্রাণীর ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আগমন করেন না। তার একটি ছোট্ট মেয়ে ছিলো। মেয়েটির হরেক রকম খেলনা ছিলো। ছিলো না শুধু পুতুল। মা তাকে পুতুল নিয়ে খেলতে বারণ করেছেন। এ ছাড়া যে কোনো খেলনা সে কিনতে চায়, অনুমতি আছে। তার খালা একদিন তাকে একটা নববধূর পুতুল গিফট করে বললো, ‘চুপিচুপি তোমার রুমে বসে খেলবে। সাবধান! তোমার আম্মু যেন না দেখে।’ দু'দিন পর মা বিষয়টি জেনে ফেললেন। কিন্তু সরাসরি তিনি মেয়েকে কিছু বললেন না, বরং কৌশলে তাকে উপদেশ দিতে চাইলেন।

সবাই যখন খাবার টেবিলে বসলো, নায়িফের মা হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘সোনামণিরা! দু'দিন যাবৎ আমার মনে হচ্ছে, আমাদের ঘরে কোনো ফেরেশতা প্রবেশ করছেন না। আমি বুঝতেই পারছি না, তারা কেন আমাদের ঘরে প্রবেশ করছেন না। আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহ ছাড়া তো আমাদের কোনো উপায় নেই।’ ছোট্ট মেয়েটি খাওয়া দাওয়া শেষে সোজা গিয়ে নিজের রুমে ঢুকলো। রুমে ঢুকেই সে তার খেলনাগুলো দেখতে পেলো। আছে সেই পুতুলটিও। পুতুলটি নিয়ে সে মায়ের কাছে ফিরে এলো

এবং বললো, 'আম্মু! আম্মু! এটাই আমাদের ঘর থেকে ফেরেশতাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি এটাকে যা খুশি করো।'

মানুষের ভুল-ত্রুটি শোধরানোর জন্য এ জাতীয় কৌশল কত চমৎকার! কেউ এটাকে বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক মনে করে না। সবাই সহজভাবে মেনে নেয়। আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাকে আত্মমর্যাদা রক্ষার সুযোগ দিন। মৌচাক ভাঙা ছাড়াই যদি মধু পান করা যায় তাহলে কেন অন্য পথ ধরবো? আপনার উপদেশের ধরণ যেন এমন না হয় যে, সে বুঝি কুফরিই করে ফেলেছে। বরং তার প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। কথার ভঙ্গি যেন এমন হয় যে, সে অনিচ্ছায় কিংবা অজান্তে ভুল করে ফেলেছে।

ইসলামের শুরু যুগে মদপান বৈধ ছিলো। এরপর ধাপে ধাপে নিরুৎসাহিত করে একপর্যায়ে তা হারাম করা হয়। প্রথম ধাপে আল্লাহ তাআলা মদের প্রতি মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করলেন, পরিপূর্ণ হারাম করলেন না। আয়াত নাযিল হলো:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

আয়ে ۝২১৯ [সূরা বাকারা]

অর্থ: লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দু'টোর মধ্যে মহা পাপও রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে।

এরপর দ্বিতীয় ধাপে নামাযের পূর্বে মদপান হারাম করে ইরশাদ করলেন:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

আয়ে ۝৪৩ [সূরা নিসা]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন সালাতের কাছেও যেয়ো না; যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো।

তখন দেখা গেলো, একের পর এক আগত নামাযের ব্যস্ততায় মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিও মদপানের সময়ই পাচ্ছে না। এরপর সবশেষে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

আয়ে ۝৯০ [সূরা মায়িদাহ]

অর্থ: হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদী ও জুয়ার তীর এসবই অপবিত্র, শয়তানি কাজ। অতএব, এসব পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই মদপান ছেড়ে দিলো এবং চিরতরে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

অবশ্য মদীনার বাইরে থাকায় সাহাবীদের কেউ কেউ মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি তখন জানতে পারেননি। একদিন মহান সাহাবী আমির বিন রাবী'আ সফর থেকে ফেরার সময় নবীজীর জন্য এক মশক মদ হাদিয়া হিসেবে নিয়ে এলেন। নবীজী নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে কিংবা পরে কখনো মদ পান করেননি। কিন্তু সে যুগে হাদিয়া শুধু নিজে ব্যবহারের জন্যই দেয়া হতো না। চাইলে হাদিয়া গ্রহীতা অন্যকে সেটা হাদিয়াও দিতে পারে, আবার বিক্রিও করতে পারে। তাই দেখা গেছে, নবীজীকে কেউ কেউ স্বর্ণ বা রেশম

হাদিয়া দিতো। কিন্তু তিনি সেগুলো ব্যবহার না করে স্ত্রীদেরকে অথবা অন্য কাউকে হাদিয়া দিয়ে দিতেন।

নবীজী আশ্চর্য হয়ে মদের দিকে তাকালেন। এরপর আমির বিন রাবী'আর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'মদ হারাম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুমি অবগত হওনি?' তিনি বললেন, 'মদ হারাম হয়ে গেছে? আল্লাহর রাসূল! আমি তো বিষয়টি জানতে পারিনি।' নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ, মদ হারাম করা হয়েছে।' এবার আমির রাযি. নবীজীর সামনে থেকে মদের মশকটি সরিয়ে ফেললেন। কেউ এসে তাকে গোপনে এই মদ বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিলো। নবীজীর কানে এ কথা পৌঁছামাত্র তিনি বললেন, 'না, আল্লাহ যখন কোনো বস্তুকে হারাম করেন, তার বিক্রিত মূল্যও হারাম করে দেন।' আমির রাযি. এ কথা শোনামাত্র দ্বিধাহীন চিত্তে সবটুকু মদ মাটিতে ঢেলে দিলেন। [আল মু'জামুল কাবীর: ১৫৭৭০]

আরেকটি বিষয়। কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় নিজের প্রশংসা করে নিজেকে আসমানে উঠিয়ে দিলেন আর সেই বেচারাকে নামিয়ে ফেললেন পাতালে—এমন যেন কিছুতেই না হয়। এটা কেউ পছন্দ করবে না। কতেক বাবাকে দেখা যায়, ছেলেকে উপদেশ দেয়ার সময় নিজের প্রশংসা করে। 'আমি এই ছিলাম, আমি সেই ছিলাম'। ছেলের বুঝি বাবার পূর্ণ ইতিহাস মুখস্থ আছে! কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় যদি কোনো উপমা পেশ করতে হয় তাহলে যথাসাধ্য নিজের উপমা পেশ না করে বড়দের-মনীষীদের উপমা

পেশ করতে চেষ্টা করুন। অন্যথায় আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন সে ভাববে—নিজের প্রশংসা করে আপনি তাকে অপমানিত করছেন।

**সংক্ষেপে...**

উত্তম কথাও একটি সদকা অর্থাৎ এতেও আছে সদকার সাওয়াব।

# ৫৬. সংক্ষেপ করুন... তর্ক পরিহার করুন...

জ্ঞানীগণ বলেন, ‘উপদেশদাতা হলেন জল্লাদের মতো। জল্লাদের আঘাত-দক্ষতা যেমন হয়, শাস্তি ভোগকারীর কষ্টের তীব্রতা ও স্থায়িত্বের পরিমাণও তেমনই হয়।’ লক্ষ্য করুন, আমি জল্লাদের শাস্তিদানের দক্ষতার কথা বলেছি। তার শক্তির কথা কিন্তু বলিনি। কারণ, শক্তিশালী জল্লাদ সজোরে আঘাত করলেও এর যন্ত্রণা কখনো সাময়িক হয়। অপরাধীর দেহ-মন থেকে কিছুদিন পরই তা মুছে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ জল্লাদের সজোরে আঘাত করার প্রয়োজন হয় না। জায়গামতো একটা বসিয়ে দিলেই যথেষ্ট! অপরাধীর আজীবন মনে থাকে, সারা জীবন সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। উপদেশদাতার অবস্থাও তেমন। বেশি কথা বলা, দীর্ঘ নসীহত করার দরকার হয় না। বরং বলার ও উপদেশদানের কৌশল ও শৈলীই এখানে মুখ্য বিষয়।

তাই কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় কথা সাধ্যানুযায়ী সংক্ষেপ করুন। সদুপদেশ দেয়াই যখন উদ্দেশ্য, বিরক্তিকর দীর্ঘ ভাষণের তো কোনো প্রয়োজন নেই। বিশেষত উপদেশের বিষয়বস্তু যখন সর্বজনস্বীকৃত কোনো বিষয় হয়, তখন তো কথা দীর্ঘ করার প্রশ্নই আসে না। আপনি কাউকে ক্রোধ সংবরণ করার বা মদপান পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন, অথবা নামায না ছাড়ার এবং মাতা-পিতার অবাধ্য না হওয়ার উপদেশ দিলেন—এক্ষেত্রে তো আপনার বক্তব্য দীর্ঘ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এসব ক্ষেত্রে নবীজীর উপদেশদানের পদ্ধতি নিয়ে আমি গবেষণা করেছি। আমি দেখেছি, এক-দু’কথায় নবীজী তাঁর উপদেশ সমাপ্ত করেছেন। কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন:

- ‘আলী! কোনো বেগানা নারীর ওপর অনিচ্ছায় একবার নজর পড়ে গেলে তুমি তার প্রতি দ্বিতীয়বার আবার নজর দিও না। কেননা, প্রথম বারের অনুমতি থাকলেও তোমাদের জন্য দ্বিতীয়বার তাকানোর অনুমতি কিন্তু নেই।’ [মুসনাদে আহমদ: ১২৯৮]
- ‘আবদুল্লাহ বিন ওমর! তুমি দুনিয়াতে এমন হও যেন তুমি পরদেশী, বরং পথিক মাত্র।’
- ‘মুআয! শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে মুহাব্বত করি। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর কিছুতেই এ দোয়া পড়তে ভুলো না: اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ অর্থ: আয় আল্লাহ! আমায় তাওফীক দিন আপনার যিকর ও স্মরণের, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকরের এবং যথাযথভাবে আপনার ইবাদত আদায়ের।’ [সুনানে আবু দাউদ: ১৩০১]
- ‘ওমর! আপনি তো শৌর্য-বীর্যের অধিকারী বীর পুরুষ। আপনি হাজরে আসওয়াদের কাছে ধাক্কাধাক্কি করবেন না।’

কত সুসংক্ষিপ্ত অথচ সুসমৃদ্ধ একেকটি নসীহত! উম্মাহর বিভিন্ন যুগের মনীষীগণও উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করতেন। একবার হযরত আবু হোরায়রা রাযি.-এর সঙ্গে বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের সাক্ষাৎ

হলো। হযরত আবু হোরায়রা তাকে বললেন, 'ভাতিজা! তোমার পদযুগলকে তো ছোট মনে হচ্ছে। জান্নাতে এদের জায়গা দিতে হলে কিছু আমল করো। আর কবিতায় সতী-সাধ্বী নারীদের অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকো।'

হযরত ওমর রাযি. মৃত্যুশয্যায় শায়িত। লোকজন তাঁর কাছে এসে শেষ মোলাকাত করছে এবং তাঁর গুণকীর্তন করছে। জনৈক যুবক এসে বললো, 'আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি তো নবীজীর সাহচর্য লাভ করেছেন। প্রথম যুগেই ইসলামের নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন। এরপর খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যথাযথ ইনসাফের সঙ্গে সবকিছু আঞ্জাম দিয়েছেন। সর্বশেষ এখন শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মাওলার সন্নিধানে গমনের প্রতীক্ষায় আছেন।'

হযরত ওমর বললেন, 'আমার মন বলছে—এগুলো আমার বিরুদ্ধেও যাবে না, আমার পক্ষেও কোনো কাজে আসবে না।'

যুবকটি যখন চলে যেতে উদ্যত হলো, হযরত ওমর লক্ষ্য করলেন, তার পরিধানের কাপড় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছে। লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলে আছে। তিনি তাকে এ ব্যাপারে কিছু নসীহত করার ইচ্ছা করলেন। তাই উপস্থিত লোকদের বললেন, 'যুবকটিকে ডাক দাও।' যুবকটি হযরত ওমরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওমর রাযি. তাকে বললেন, 'বৎস! কাপড় ওপরে উঠিয়ে পরো। এতে তোমার কাপড়ও পবিত্র থাকবে, আল্লাহর ভয়ও অর্জিত হবে।' [সহীহ বুখারী: ৩৪২৪]

হযরত ওমরের উপদেশ এখানেই শেষ। মূল বার্তাটি তিনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যুবকের কাছে। আরেকটি কথা হলো—যথাসাধ্য বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বিশেষ করে আপনি যখন বুঝতে পারেন যে, সামনের লোকটি অহঙ্কারী, জেদের বশে তর্ক করছে তখন তার সঙ্গে বিতর্ক-বাহাসে জড়িয়ে না পড়ে একটু এড়িয়ে চলুন। আপনার উদ্দেশ্য তো সদুপদেশ দেয়া, তর্কে জেতা নয়। সুতরাং উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকুন। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে তর্ক-বিসংবাদের নিন্দা করে বলেছেন:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا

আয়ে ৫৮ [সূরা যুখরুফ]

অর্থ: তারা কেবল কূটতর্কের জন্যই এ দৃষ্টান্ত আপনার সামনে পেশ করে।

নবীজী বলেছেন:

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ

অর্থ: কোনো জাতির হিদায়াতপ্রাপ্তির পর পুনরায় পথভ্রষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হলো তর্ক-বিতর্ক। [সুনানে তিরমিযী: ৩১৭৬]

তিনি আরো বলেছেন:

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا

অর্থ: আমি জান্নাতের উপকণ্ঠে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি প্রাসাদপ্রাপ্তির যিম্মাদারী নিচ্ছি, ন্যায়ের পথে হওয়া সত্ত্বেও যে তর্ক করা থেকে বিরত থাকে। [সুনানে আবু দাউদ: ৪১৬৭]

মানুষ প্রায়ই আত্মসিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট থাকে। কারণ অধিকাংশের মাঝেই রয়েছে অহঙ্কার। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্যকে উপলব্ধি করেছিলো এবং তাদের অন্তরও তার স্বীকৃতি দিয়েছিলো, কিন্তু আত্মঅহঙ্কারের কারণে তারা সত্যের অনুসরণ করেনি। এ কারণেই আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

আয়ে ۝১৪ [সূরা নামল]

অর্থ: অন্তর দৃঢ় স্বীকৃতি দেয়ার পরও সীমালঙ্ঘন ও অহমিকাবশত তারা (আমার নিদর্শনাবলীকে) অস্বীকার করেছে।

কাউকে উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্য হলো, সে যেন নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং ভবিষ্যতে তা এড়িয়ে চলে। তার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়ে বিজয় ছিনিয়ে নেয়া তো কিছুতেই আপনার মাকসাদ নয়। আপনারা তো কোনো লড়াইয়ের ময়দানে নামেননি। নবীজী একরাতে হযরত আলী ও ফাতেমার গৃহে প্রবেশ করলেন। এরপর তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাহাজ্জুদ পড়বে না?' হযরত আলী রাযি. বললেন, 'আমাদের রূহ আল্লাহর হাতে। তিনি যখন ইচ্ছা জাগাবেন, আমরা জাগবো।'

নবীজী মুখ ঘুরিয়ে চলে এলেন। ফিরে আসার সময় তিনি ঊরু মোবারকে হাত চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন:

وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

আয়ে ۝৫৪ [সূরা কাহাফ]

অর্থ: মানুষ অতিশয় তর্কপ্রবণ।

কখনো দেখবেন, আপনি যাকে উপদেশ দিচ্ছেন সে নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে এমন ওযর পেশ করছে, যা কোনো ওযরই নয়। এক্ষেত্রে আপনি তর্ক না করে উদার চিত্তে তার ওযর মেনে নিন। আপনি তার সঙ্গে কঠোরতা করতে যাবেন না। কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় তাকে একেবারে আটকে ফেলবেন না। বের হওয়ার পথ খোলা রাখুন। সে যদি কোনো ভুল কথাও বলে ফেলে, আপনি কৌশলে তা সংশোধন করে দিন। প্রয়োজনে তার গুণকীর্তন করুন। তার সাহসিকতা ও তার বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করুন। এরপর বলুন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে, ...।' এভাবে সুন্দরভাবে তার ভুলটা ধরিয়ে দিন।

**দৃষ্টিভঙ্গি...** কারো ভুল হলে সংক্ষেপে ধরিয়ে দিন। এর জন্য দীর্ঘ ভাষণের বা তর্ক-বাহাসের কোনো প্রয়োজন নেই।

# ৫৭. কানকথার পরোয়া করবেন না

আমার ছেলে আবদুর রহমান একদিন একটি বাক্য বারবার বলছিলো। বাক্যটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার ধারণা, এ কচি বয়সে সে নিজেও বাক্যটির অর্থ বোঝেনি। সে বলছিলো, "طَنِّشْ تَعِشْ تَنْتَعِشْ" অর্থ: পরকথা উপেক্ষা করো, বেঁচে থাকো, জীবনকে করো সক্রিয় ও কর্মোদ্যম।

কচি মুখের এ বাক্যটি নিয়ে আমি চিন্তা করলাম। ভাবলাম সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের আলোচনা-সমালোচনা, চিন্তা-চেতনা ও কথা-বার্তার বিষয় নিয়ে। আমি দেখলাম, এসব ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। কেউ কেউ তো সাচ্চা দিলে মানুষকে উপদেশ দেন। কিন্তু আচরণদক্ষতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি খুশির চেয়ে বেশি ব্যথিত করে ফেলেন। কেউ আছে হিংসুটে, যার উদ্দেশ্যই হলো আপনাকে চিন্তিত ও পেরেশান করে রাখা। কেউ আছে যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বড় অভাব। না জেনে-না বুঝে বলে ফেলে অনেক কিছু। অথচ কিছু না বলে চুপ থাকলেই তার বরং ভালো ছিলো। আবার কেউ তো এমন, যার স্বভাবই হলো সমালোচনা করা। এদের সমাজদর্শন কালো চশমার আঁধারে ঢাকা।

প্রাচীন প্রবাদে আছে, ‘সব মানুষের রুচি যদি অভিন্ন হতো, বৈচিত্র্যময় পণ্যসম্ভার অচল হয়ে পড়তো।’ আরবী গল্পের আকর্ষণীয় চরিত্র যোহার একটি ঘটনা শুনুন। যোহা একদিন গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলো। সঙ্গে ছিলো তার ছেলে। ছেলে পায়ে হেঁটে পাশে পাশে চলছিলো। কিছু

লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা বললো, ‘দেখো, কত পাষাণ এই লোকটা! ছেলেকে রোদের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়ে নিচ্ছে, আর নিজে আরামে চলছে গাধায় চড়ে।’

যোহা তাদের কথা শুনে নিজে নেমে ছেলেকে গাধার পিঠে বসালো। আর নিজে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলো। যোহা মনে মনে বেশ আনন্দ বোধ করছিলো। এবার আর কোনো কটূক্তি শুনতে হবে না। কিছু দূর চলার পর পথের পাশ থেকে এক লোক বলে উঠলো, ‘দেখেছো, কী অবাধ্য ছেলে! নিজে আরামে গাধায় চড়ে যাচ্ছে, আর বাবাকে নিচ্ছে পায়ে হাঁটিয়ে।’ এ কথা শুনে যোহা এবার ছেলের সঙ্গে নিজেও গাধার পিঠে চড়ে বসলো। যাক, এবার হয়তো মানুষের সমালোচনা থেকে বাঁচা যাবে।

কিছু দূর যাওয়ার পর একদল লোকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতেই তাদের একজন বলতে লাগলো, ‘দেখেছো নিষ্ঠুর লোকদু'টির কাণ্ড! বোবা প্রাণীটার প্রতি সামান্য মায়াও নেই এদের!’ এ কথা শুনে যোহা আবার গাধার পিঠ হতে নেমে পড়লো। ছেলেকে বললো, ‘বাবা! তুমিও নেমে এসো।’ এবার দু'জনই হেঁটে হেঁটে চলতে লাগলো। গাধার পিঠে চড়লো না কেউ।

কিছু দূর যেতে না যেতেই পাশ থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, ‘এই দেখো সবাই দুই নির্বোধের কারবার! গাধার পিঠ খালি রেখে নিজেরা হেঁটে যাচ্ছে। আরে! পায়ে হেঁটেই যদি যেতে হবে, তাহলে গাধার সৃষ্টি কেন?’ লোকসমালোচনায় অতিষ্ঠ যোহা অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো এবং

উপায়ান্তর না দেখে এবার ছেলেকে নিয়ে গাধাটা নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিলো!

আমি যদি তখন তাদের সঙ্গে থাকতাম আর যোহার এ পরিণতি দেখতাম, তাহলে তাকে বলতাম, 'প্রাণের ভাই আমার! তোমার মন যা চায়, তা-ই করো। লোকে কী বলে, সেদিকে নজর দিও না। মানুষের সন্তুষ্টি এমনই এক গোলকধাঁধা, যা ভেদ করার সাধ্য কারো নেই।' কবির ভাষায়:

ঈগল পাখির ডানার আড়ে লুকাও যদি তুমি,
এড়াতে চাও পরনিন্দা আর পরচর্চার ভূমি!
তবু জেনো, পেছনেতে থাকবেই সদা নিন্দা
যতদিন এই পৃথিবীতে আছে ইনসান যিন্দা।

কিছু মানুষ আছে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হুট করে একটা কথা বলে ফেলে। মনে করুন, আপনি বিয়ে করার পর একজন এসে বললো, 'ভাই! এই মেয়েটাকে প্রস্তাব দিলেন কেন? এই মেয়েটাকে বিয়ে করলেন কেন?' আমার মনে চায় আপনাকে বলি—আপনি তার মুখের ওপর বলে দিন, 'ভাই! বিয়ে করেছি। ব্যাস, বিষয়টি শেষ হয়ে গেছে। আপনার কাছে এত পরামর্শ চেয়েছে কে?' অথবা আপনি আপনার গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন। একজন এসে বললো, 'আপনি আমাকে আগে জানাবেন না? অমুক তো আরো বেশি দামে কিনতো।' আমি বলি, 'ভাই! তাঁর গাড়ি বিক্রি করার প্রয়োজন ছিলো, বিক্রি করে দিয়েছি। এটা নিয়ে আপনার এত মাথা ঘামানোর কী প্রয়োজন?'

তাই তো আরেক কবি বলেছেন:

পালাও যদি পাহাড়চূড়ায়, বেড়াও খুঁজে নির্জনতা
দেখবে বন্ধু সেথাও আছে শত্রুজনের কটু কথা।

তাই অযথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দেয়ার আর কী প্রয়োজন?

**অভিজ্ঞতা...** বড়রা বলেছেন, গায়ে পড়ে ঝগড়া করা স্বভাব হয় যার, আজ এখানে, কাল ওখানে—এই নিয়তি তার।

# ৫৮. হাসুন... মুচকি হাসুন... এবং হাস্যোজ্জ্বল থাকুন...

তাকে আমি বহু বছর ধরে চিনি। আমার এক সহকর্মী। সবসময় একসঙ্গেই থাকি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস কি করবেন, আমি এখনো জানি না—তার মুখগহ্বরে দাঁত উঠেছে কিনা! সর্বদা সে মুখ মলিন করে রাখে। গোমরা মুখে বসে থাকে। চেহারায় কখনো হাসির রেখা ফোটে না। যেন হাসি হাসি মুখ করলেই আয়ু কমে যাবে! কিংবা ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে! অথচ নববী আখলাক দেখুন। হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখলেই ভুবনভোলানো এক টুকরো মুচকি হাসি উপহার দিতেন।'

মুচকি হাসিরও ধরণ আছে, স্তর আছে। তারই একটি হলো, সর্বদা হাসিমুখ থাকা। চেহারায় সব সময় এক টুকরো মুচকি হাসির রেখা ফুটিয়ে রাখা। আপনি যদি শিক্ষক হন, শ্রেণীকক্ষে প্রবেশকালেই প্রফুল্লতায় ছাত্রদের হৃদয় ও মন ভরে দিন। বিমানে চড়েছেন কিংবা পথ ধরে হাঁটছেন, মানুষ দেখছে আপনাকে, আপনার অবয়বে যেন সর্বদা থাকে হাসির ঝলক।

আপনি কোনো সভাকক্ষে উপস্থিত আছেন। সেখানে কেউ প্রবেশ করে উচ্চ স্বরে সালাম দিলো এবং উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টি বুলাতে লাগলো। আপনি মিষ্টি হেসে তাকে বরণ করে নিন। চোখে চোখ পড়তেই চেনাজনের মতো হাসিমুখে তাকান। আপনি নিজে কোনো সভাকক্ষে প্রবেশ করলে

হাসিমুখে সকলের সঙ্গে মোসাফাহা করুন। মনে রাখবেন, এক টুকরো মুচকি হাসি সীমাহীন ক্রোধের আগুন মুহূর্তে নিভিয়ে দিতে পারে। দ্বিধা-সংশয় ও সন্দেহের ঘন কুয়াশা মুহূর্তে দূরীভূত করতে পারে। তাই সবসময় চেহারায় হাসির আভা ছড়িয়ে রাখুন। প্রকৃত বীর তো সে-ই, যে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কঠিন মুহূর্তেও এক টুকরো হাসি উপহার দিতে পারে।

একদিন হযরত আনাস রাযি. নবীজীর সঙ্গে হাঁটছিলেন। নবীজীর পরনে ছিলো নাজরানী মোটা চাদর। পথিমধ্যে জনৈক বেদুঈন পেছন থেকে তাদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ছুটে এলো এবং কাছাকাছি এসেই নবীজীর চাদর ধরে সজোরে টান দিলো। হযরত আনাস বলেন, ‘জোরে টান দেয়ার কারণে আল্লাহর রাসূলের পিঠ প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং আমি দেখতে পেলাম, নবীজীর পিঠে দাগ বসে গেছে।’

কী চায় এই বেদুঈন? হয়তো তার ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই সে সাহায্যের জন্য এসেছে। কিংবা কাফিরদের আক্রমণে সহায়-সম্পত্তি সব হারিয়ে সে ছুটে এসেছে নবীজীর দরবারে। শুনুন, সে কী বললো। সে বললো, ‘হে মুহাম্মাদ!’ [লক্ষ করুন, সে কিন্তু ‘আল্লাহর রাসূল’ বলে সম্বোধনও করেনি]। সে বললো, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার কাছে যে সম্পদ আছে, তা হতে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ করুন।’

নবীজী তার দিকে তাকালেন, একটু মুচকি হাসলেন। এরপর তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কত মহান ছিলেন আমাদের নবী! কত

প্রশস্ত, কত উদার ছিলো তাঁর হৃদয়! তিনি ছিলেন উদারতার মহান প্রতীক এক বীর-বাহাদুর। তাই এ ধরণের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও নিজেকে তিনি পূর্ণ সংযত রেখেছেন এবং উদারতা দেখিয়েছেন। এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে সবকিছু মেনে নিয়েছেন।

এভাবে সবসময় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। উদারতা দেখাতেন। কাজের পূর্বেই তার পরিণাম নিয়ে ভাবতেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও চেহারায় একরাশ স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে রাখতেন। রাগ করে লোকটাকে ধমক দিলে বা তাড়িয়ে দিলে কী লাভ হতো? নবীজীর পিঠের ব্যথা কি প্রশমিত হয়ে যেতো? বেদুঈন লোকটির আচরণ ও ব্যবহার সংশোধন হয়ে যেতো? কিছুই হতো না। সবর ও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা দ্বারা যা অর্জিত হয়েছে, তার কিছুই হতো না। মাঝে মাঝে এমন কিছু কাজ ও আচরণে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ি, রেগে যাই। অথচ উত্তেজনা ও ক্রোধ এর সমাধান নয়, সমাধান সম্পূর্ণই ভিন্ন। সুকোমল আচরণ, বিনম্র ব্যবহার এবং এক টুকরো মুচকি হাসি দিয়ে আমরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারি। সকলের প্রতি সুধারণা, ক্রোধ সংবরণ ও মানুষের মন জয় করে আমরা সব সংশয়কে মুছে দিতে পারি। নবীজী বলেছেন:
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
অর্থ: কাউকে ধরাশায়ী করে শক্তিশালী সাব্যস্ত হওয়া যায় না। শক্তিশালী তো সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। [সহীহ বুখারী: ৫৬৪৯, সহীহ মুসলিম: ৪৭২৩]

নবীজী মুচকি হাসি দিয়ে উদ্ভাসিত অবয়বে সকলকে কাছে টেনে নিতেন। খায়বর যুদ্ধের ঘটনা। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাযি. শত্রুদুর্গ থেকে ঘি-ভর্তি একটি পাত্র বাজেয়াপ্ত করলেন। খুশি মনে তিনি তা কাঁধে নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরতে লাগলেন। পথিমধ্যে গনীমত সংগ্রহ ও বিন্যাসের দায়িত্বশীল সাহাবীর সঙ্গে তার দেখা হলো। সেই সাহাবী পাত্রটি আটকে দিলেন। বললেন, 'এটা দিয়ে দাও। আমি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেবো।' কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ পাত্রটি শক্ত করে ধরে রাখলেন। তিনি বললেন, 'আমি এটা হস্তগত করেছি। খোদার কসম! কিছুতেই তোমাকে এটা দেবো না।' সেই সাহাবীও নাছোড়বান্দা! তারও একই কথা—দিতেই হবে! দু'জনই পাত্রটি নিয়ে টানাটানি করছেন। ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল সেখানে উপস্থিত। তিনি দৃশ্যটি দেখলেন। এরপর মুচকি হেসে গনীমতের দায়িত্বশীল সাহাবীকে বললেন, 'তুমি ছেড়ে দাও। আবদুল্লাহকে এটা দিয়ে দাও।' রাসূলের নির্দেশ তামিল করে তিনি ছেড়ে দিলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ খুশি মনে পাত্রটি নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের কাছে চলে গেলেন।

লক্ষ করুন, একটু মুচকি হেসে নবীজী উদ্ভূত সমস্যার কত সুন্দর সমাধান দিয়ে দিলেন। শেষ কথা হলো, কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে আপনার একটু মুচকি হাসির বিনিময়েও আছে সদকার সাওয়াব।

**আদর্শ...** নবীজী যখনই আমাকে দেখতেন, একটু মুচকি হাসতেন।

# ৫৯. সীমার ভেতরে থাকুন

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ছাত্র ছিলো। সামাজিকতা রক্ষায় সে বেশ সচেতন। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ায়ও যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু ছাত্ররা তাকে খুব একটা সহ্য করতো না। সবার কাছেই সে ছিলো অপ্রিয়, বরং বিরক্তিকর। একদিন সে আমার কাছে এসে বললো, 'ডক্টর সাহেব! আমার সহপাঠীরা সবসময় আমার ওপর রেগে থাকে। আমার ঠাট্টা-মশকারি সহ্য করে না। আমাকে তারা সহজে মেনে নেয় না।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আমি তো তোমার নিশ্চুপ উপস্থিতিই সহ্য করতে পারছি না! তোমার কথা বলার মুহূর্তটা কীভাবে বরদাশত করবো? বিশেষত যখন তুমি নিজেই নিজেকে বিরক্তিকর করে তোলো এবং বেহুদা তামাশায় লিপ্ত থাকো তখন তো...।' মুখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কোনো ধরণের রসিকতাকে সহপাঠীরা সহ্য করতে পারে না? আমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাও তো।'

সে বললো, 'একবার এক সহপাঠী হাঁচি দিলো। আমি দুষ্টুমি করে বললাম, "আল্লাহ তোর ওপর লানত করুন।" এতটুকু বলে আমি চুপ থাকলাম। যখন সে প্রচণ্ড রেগে গেলো তখন আমি আমার কথা পূর্ণ করে বললাম, "(আল্লাহ তোর ওপর লানত করুন) হে শয়তান। আর হে আমার বন্ধু! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন।"'

এবার আমি বুঝলাম, তার রসিকতা কত অসহ্যকর ও পীড়াদায়ক! কত বড় বোকা! এ ধরণের ঠাট্টা করে সে নিজেকে রসিক ভাবছে। মনে করছে, সে মানুষকে খুব আনন্দ দিচ্ছে। মানুষ আপনার ঠাট্টা ও রসিকতাকে ভালো চোখে দেখবে, যদি তা সীমার মধ্যে থাকে। সীমা অতিক্রম করে ফেললে মানুষ আপনাকে আর মেনে নেবে না। বিশেষত দশজনের উপস্থিতিতে ঠাট্টা-রসিকতা অনেকেই পছন্দ করে না।

কিছু মানুষ এ বিষয়টি লক্ষ রাখে না। ফলে প্রায়ই এরা সীমা অতিক্রম করে এবং অন্যের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ আপনার মোবাইল থেকে যত্রতত্র ফোন করে ইচ্ছামতো কথা বললো। অথবা আপনার ব্যক্তিগত মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকের কাছে মুঠোবার্তা পাঠালো। অথচ আপনার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর এরা কেউ জানুক, এটা আপনার পছন্দ নয়। আপনার অনুমতি ছাড়া কেউ আপনার গাড়ি নিয়ে গেলো। অথবা কেউ আপনাকে গাড়ির জন্য বিরক্ত করে ফেললো। শেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি তাকে গাড়ি নেয়ার অনুমতি দিলেন। ছাত্ররা অনেকে একসঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকে। এসব হলে অনেক সময় দেখা যায়, এক ছাত্র কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখে, তার জামা গায়ে জড়িয়ে একজন চলে গেছে! জুতাজোড়া আরেকজনের পায়ে!

কিছু মানুষকে দেখবেন, সে তার সঙ্গী-সাথীকে অযথা ঠাট্টা করে বিরক্ত করছে, অন্যদের উপস্থিতিতে বিরক্তিকর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করছে। সীমালঙ্ঘনের এমন অনেক ধরণ রয়েছে। একজন মানুষ আপনাকে যতই

পছন্দ করুক না কেন, মনে রাখবেন—সেও একজন মানুষ। তার সন্তোষ যেমন আছে, অসন্তোষও আছে। আনন্দ যেমন আছে, ক্রোধও আছে। এটাই স্বাভাবিক।

নবীজী যে মাসে তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরেছিলেন, সে মাসেই হযরত উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী রাযি. নবীজীর কাছে আগমন করলেন। তিনি সাকীফ গোত্রের সম্মানিত সরদার। গোত্রের লোকদের ওপর তার বেশ প্রভাব ছিলো। মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই নবীজীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নিজে ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি নবীজীর কাছে অনুমতি চাইলেন। নবীজীর আশঙ্কা হলো—এর ফলে তিনি নিজ কওমের পক্ষ থেকে অনিষ্টের শিকার হতে পারেন। তাই নবীজী বললেন, ‘তাহলে তো তারা তোমার বিরুদ্ধে লড়াই বাঁধিয়ে দেবে।’

নবীজী ভালো করেই জানতেন, সাকীফ গোত্রের লোকদের মাঝে অহমিকাবোধ প্রবল। আচার-আচরণে তারা খুবই কঠোর। এমনকি তাদের সম্মানিত নেতার সঙ্গেও কঠোর হতে তারা কুণ্ঠিত হবে না। হযরত উরওয়া রাযি. বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের কাছে আপন কন্যা-জায়ার চেয়েও বেশি প্রিয়। রূপসী, কুমারী নারীদের চেয়েও বেশি আপন।’ বাস্তবেও তিনি তাদের মাঝে একজন সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তারা তাকে মানতো, মান্য করতো।

যাই হোক, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানিত হওয়ায় তিনি আশা করলেন, কেউ তাঁর বিরোধিতা করবে না। হযরত উরওয়া রাযি. একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করে উচ্চ আওয়াজে সকলকে আহ্বান করলেন। সরদারের আওয়াজ শুনে সবাই সমবেত হলো। এবার তিনি সকলকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইসলামের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন। বারবার পাঠ করতে লাগলেন, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।'

এ কথা শুনতেই সকলে উত্তেজিত হয়ে গেলো। উরওয়া প্রতিমাপূজা বর্জন করায় তারা তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো এবং তাঁর প্রতি নির্বিচারে তীর-বর্শা ছুঁড়তে লাগলো। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে একপর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। প্রাণ তাঁর ওষ্ঠাগত। তারা বললো, 'উরওয়া! তুমি কি তোমার রক্তকে বৃথা মনে করো? অবশ্যই আমরা এর প্রতিশোধ নেবো। অবশ্যই আমরা তোমার হত্যাকারীদের হত্যা করবো।'

প্রত্যুত্তরে হযরত উরওয়া বললেন, 'শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করিয়ে আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন। অতএব, রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের যে মর্যাদা, সে মর্যাদাই আমি কামনা

করি। আমার বদলায় তোমরা কাউকে হত্যা করো না এবং কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো না।'

বলা হয়ে থাকে, নবীজী তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ জানার পর বলেছেন, 'আপন কওমের মাঝে তাঁর উপমা সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত হাবীব আন নাজ্জারের মতো।'

সুতরাং প্রিয় পাঠক! আপনিও এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব অনুভব-অনুভূতি আছে। তাই আপনি কারো যত আপনই হোন না কেন; রসিকতা, আচরণ ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে সীমারেখা বজায় রাখুন। রেড লাইন ও লাল সীমারেখা হতে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। মানুষের কাছে আপনি যতই প্রিয় হোন, তবু যখন তখন তাদেরকে বিব্রত করা থেকে বিরত থাকুন। এমনকি বাবা-ভাইয়ের বেলায়ও এই উপদেশ মেনে চলুন। নবীজী এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং মুমিনদের ভীতি প্রদর্শন করতে বারণ করেছেন।

একদিন নবীজী সাহাবীদের নিয়ে পথ চলছিলেন। সবার সঙ্গে আসবাবপত্র ছিলো। অস্ত্র-শস্ত্র, বিছানাপত্র ও খাদ্যদ্রব্য সবই ছিলো। পথিমধ্যে এক স্থানে কাফেলা যাত্রাবিরতি করলো। এই অবসরে জনৈক সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় আরেকজন সাহাবী দুষ্টুমি করে তাঁর একটা রশি লুকিয়ে ফেললেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি সামানা অগোছালো দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন এবং সবকিছু খুঁজতে আরম্ভ করলেন। নবীজী সব জানতে পেরে বললেন:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

অর্থ: কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে পেরেশান করা বৈধ নয়। [সুনানে আবু দাউদ: ৫০০৪]

আরেক দিনের ঘটনা। সাহাবীগণ একটি পথ ধরে নবীজীর সঙ্গে চলছিলেন। পথিমধ্যে একজন সাহাবী নিজ বাহনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অন্যজন তাকে উদাসীন ভেবে তার তূণীর থেকে একটি তীর নিতে চাইলেন। সেই মুহূর্তে তিনি টের পেলেন কেউ তার তূণীর টানাটানি করছে। ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলেন। নবীজী অবস্থা জেনে বললেন:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

অর্থ: কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে ভয় দেখানো বৈধ নয়। [সুনানে আবু দাউদ: ৫০০৪]

যে আপনাকে আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে রসিকতা করে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, আপনার অন্তরে ভয়-ভীতি ও চিন্তা-পেরেশানী সঞ্চার করছে, তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মনে করুন, একজন দেখলো, রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে আপনি কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকছেন। গাড়ি স্টার্ট দেয়াই ছিলো। সে এসে আপনাকে না বলেই গাড়িটা চালিয়ে দূরে কোথাও রেখে দিলো। আপনি পেরেশান হয়ে গেলেন। ভাবলেন, গাড়ি চুরি হয়ে গেছে। অথচ ঠাট্টা করে সে আপনার গাড়িটা নিয়েছে। তদ্রূপ আপনার বন্ধু রসিকতার ছলে ভীতিকর কিছু করে

আপনাকে হাসানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু দেখা গেলো, সেই রসিকতার পরিণাম বড় বেদনাদায়ক। কবির ভাষায়:

ধৈর্যশীলগণ অনেক সময় সহেন নীরবে সব যাতনা হৃদয়ে তার হচ্ছে ঠিকই রক্তক্ষরণ আর বেদনা। বাগ্মী হয়েও ধৈর্য-গুণে রাশ টেনে নেন ভাব প্রকাশের কথার পিঠে আসবে কথা, আশ্রয় তাই নীরবধ্যানের।

**দৃষ্টিভঙ্গি...** সীমাতিক্রম করলে সকল বস্তুই ক্রিয়ার পরিবর্তে করে বিপরীত-ক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে রসিকতার শেষ পরিণতি হয় পারস্পরিক বিভেদ ও ঝগড়া!

# ৬০. একান্ত কথা সংরক্ষণ করুন

প্রাচীন প্রবাদে আছে, ‘গোপন কথা দুই ছাড়ালে / সবাই জানে, সবাই বলে’। জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ‘এখানে কোন দু'জনের কথা বলা হলো?’ সে নিজের ঠোঁটজোড়া দেখিয়ে বললো, ‘এ দু'জন’! তার উত্তরে রসিকতার ছাপ থাকলেও একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিতও কিন্তু আছে।

ইতোমধ্যে আমি জীবনের পঁয়ত্রিশটি বসন্ত অতিবাহিত করেছি। এ দীর্ঘ জীবনে যখনই কাউকে গোপন কিছু বলেছি এবং গোপন কথাটি গোপন রাখতে অনুরোধ করেছি, সবাই দৃঢ় শপথ করে বলেছে—

গোপন কথাটি তব পরম বিশ্বাসে,
রাখিবো সযতনে হৃদয়তলদেশে!

মনে পড়ে না, এর ব্যতিক্রম কখনো হয়েছে। আমার মনে পড়ে না, কোনো গোপন কথা বলার পর কেউ আমাকে বলেছে, ‘ভাই মুহাম্মাদ! আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার এ কথাটি গোপন রাখতে পারবো না।’ বরং যাকেই আপনি কোনো গোপন কথা বলবেন, দৃঢ় প্রত্যয়ে বুকে চাপড় মেরে সে বলবে—

শপথ আল্লাহর! দিবাকর-নিশাকর যদি দু'হাতে তুলিয়াও দেয়
কভু খড়গ হস্তে মোর পিছু যদি দাঁড়ায় ঘাতক
তবু বাঁধিয়া রাখিবো বুকের ভেতরে তব এই আমানত
প্রলোভনে কিবা শত নিপীড়নেও করিবো না খেয়ানত।

ব্যাস, আপনি নিশ্চিন্তে পরম বিশ্বাসে তার কাছে নিজের একান্ত কিছু কথা বলে দিলেন। এরপর ধৈর্য ধরে দু'-তিন মাস অপেক্ষা করুন; দেখবেন, আপনার 'অতিগোপন কথাটি' এক কান দু'কান হয়ে আপনার কাছেই ফিরে এসেছে! অন্যকে দোষ দেবেন কেন? ভুল তো আপনিই প্রথম করেছেন। আপনি ভুলে গেছেন, 'গোপন কথা দুই ছাড়ালে, সবাই জানে, সবাই বলে'। বস্তুত কারো ওপর সাধ্যাতীত কোনো কিছু আরোপ করা উচিত নয়। কবি কত চমৎকার বলেছেন:

গোপন কথা বক্ষে লুকাতে যবে হলে অক্ষম তুমি
তোমার কথা তোমার চেয়ে লুকাবে সে কার বক্ষভূমি!

আমি অনেককে যাচাই করে দেখেছি, ফলাফল একই। সমস্যা হলো, আপনি হয়তো কারো কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়ে গোপন কিছু বলতে বাধ্য হবেন। সে আপনাকে পরামর্শও দেবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাবে, সে আপনার 'গোপন বিষয়টি' ফাঁস করে দিয়েছে। ফলে আপনার চোখে সে চিরদিনের জন্য নিন্দিত হয়ে গেলো এবং শ্রদ্ধার পরিবর্তে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হলো।

ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনুন। বদরযুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাম থেকে কোরাইশ-বাণিজ্যকাফেলার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের মনস্থ করলেন এবং সাহাবীদের কাফেলা নিয়ে শত্রুকাফেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কোরাইশ-কাফেলার সরদার আবু সুফিয়ান বিষয়টি আঁচ করতে পেরে গিফার গোত্রের 'যামযাম বিন আমর' নামক জনৈক ব্যক্তিকে কিছু অর্থ দিয়ে

বললো, ‘যাও, কোরাইশদের দ্রুত এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও।’ যামযাম খুব দ্রুতগতিতে মক্কার পথে অগ্রসর হলো।

সেখান থেকে মক্কা ছিলো কয়েকদিনের পথ। এদিকে মক্কাবাসী এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানে না। এরই মাঝে এক রাতের ঘটনা। [নবীজীর ফুফু] আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ভয়ঙ্কর একটি দুঃস্বপ্ন দেখলেন। রাত শেষে ভোর হতেই তিনি আপন ভাই আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে ডেকে আনালেন এবং তাকে বললেন, ‘ভাই! গত রাতে আমি অত্যন্ত ভীতিকর একটি স্বপ্ন দেখেছি। এ কারণে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সম্প্রদায়ের ওপর কোনো দুর্যোগ ও বিপদ অত্যাসন্ন। আমি তোমাকে এখন যা বলবো, তা আমাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবে। কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না।’

আব্বাস বললেন, ‘ঠিক আছে। তুমি কি দেখেছো, বলো।’ ‘আমি জনৈক উট-আরোহীকে দেখলাম দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। সে “আবতাহ” উপত্যকায় এসে থেমে গেলো এবং সজোরে চিৎকার করে বললো, “হে প্রতারকের দল! তিনদিনের মধ্যে আপন মৃত্যু উপত্যকায় যাও!”’

আতিকা আরো বললেন, ‘এরপর আমি দেখলাম, আওয়াজ শুনে লোকেরা তার কাছে সমবেত হলো। সে মসজিদে চলে গেলো। লোকেরাও তার পিছু পিছু চললো। হঠাৎ তার উটটি তাকে নিয়ে কাবার ছাদে আরোহণ করতে লাগলো। সে পূর্বের ন্যায় আবার চিৎকার করে বললো, “হে প্রতারকের

দল! তিনদিনের মধ্যে আপন মৃত্যু উপত্যকায় যাও!'" 'তারপর সে তার উটটি নিয়ে "আবু কুবাইস" পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে পূর্বের ন্যায় আওয়াজ দিলো, "হে প্রতারকের দল! তিনদিনের মধ্যে আপন মৃত্যু উপত্যকায় যাও!" এরপর সে পাহাড়-চূড়া থেকে একটি পাথর নিয়ে নিচে নিক্ষেপ করলো। পাথরটি গড়িয়ে পড়তে পড়তে পাহাড়ের পাদদেশে এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হলো। মক্কার এমন কোনো ঘর নেই যাতে উক্ত প্রস্তরখণ্ড আঘাত হানেনি।'

আব্বাস অস্থির হয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই এ বড় ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!' আব্বাস এ স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করলেন। তিনি ভাবলেন, স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়লে তার ওপর বিপদ আসতে পারে। তাই তিনি আতিকাকে সতর্ক করে বললেন, 'তুমি এসব একদম গোপন রাখবে। কারো কাছে প্রকাশ করবে না।'

আশ্চর্য এই স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে আব্বাস বেরিয়ে এলেন। পথিমধ্যে বন্ধু ওয়ালীদ বিন ওতবার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো। ওয়ালীদকে তিনি স্বপ্নটির কথা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিলেন যে, 'তুমি এ স্বপ্নের কথা গোপন রাখবে। কাউকে বলবে না।' ওয়ালীদ আপন কাজে চলে গেলো। পথে ওয়ালীদের সাক্ষাৎ হলো আপন পুত্র ওতবার সঙ্গে। পুত্রকে সে স্বপ্নের ঘটনাটি জানিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ না যেতেই ওতবা তার কয়েকজন বন্ধুকে স্বপ্নটির কথা বললো। এভাবে এ স্বপ্নের কথা মক্কার

লোকদের কানে-কানে ছড়িয়ে পড়লো। কোরাইশরা নিজেদের বৈঠকগুলোয় এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

দ্বিপ্রহরে আব্বাস কাবা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে হারামে গেলেন। আবু জাহল তখন কাবার ছায়ায় বসে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আতিকার 'অতিগোপন' স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছিলো। আব্বাসকে দেখে আবু জাহল বললো, 'আবুল ফযল! তাওয়াফ শেষ হলে একটু এদিকে এসো।' আব্বাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আবু জাহল তার কাছে কী চায়? আব্বাসের কল্পনাতেও ছিলো না যে, আবু জাহল তাকে আতিকার স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে।

তাওয়াফ শেষ করে আব্বাস আবু জাহলের কাছে এসে বসলেন। আবু জাহল তাকে বললো, 'আবদুল মুত্তালিবের বেটা! তোমাদের বংশে এ ঘটনা আবার কখন ঘটলো?'

আব্বাস বললেন, 'কিসের কথা বলছো?'

'আতিকার স্বপ্ন...।'

আব্বাস ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আতিকা! আতিকা কী দেখেছে?' আবু জাহল বললো, 'আবদুল মুত্তালিবের বেটা! এতদিন তোমাদের বংশের পুরুষরা বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করতো। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও?! এখন দেখি তোমাদের নারীরা ভবিষ্যদ্বাণী করছে! আতিকা নাকি স্বপ্নে জনৈক আগন্তুককে বলতে শুনেছে, "তিনদিনের মধ্যে আপন মৃত্যু উপত্যকায় যাও"। আমরা তিনদিন অপেক্ষা করবো। এর মধ্যে যদি আতিকার স্বপ্ন

বাস্তব হয়, তাহলে তো হলো। আর যদি তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোনো কিছু প্রকাশ না পায়, তাহলে তোমাদের নামে "আরবের শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী" উপাধি প্রচার করে দেবো।'

আব্বাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। আবু জাহলকে কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। তিনি স্বপ্নের কথা অস্বীকার করলেন। এরপর সবাই আপন আপন কাজে চলে গেলো।

আব্বাস সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসতেই বনু মুত্তালিবের সকল মহিলা ক্রোধে অধীর হয়ে তার কাছে সমবেত হলো। তারা তাকে বললো, 'এতদিন এই পাপিষ্ঠ খবীসটাকে পুরুষদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছো। এখন সে নারীদের ব্যাপারেও নাক গলাতে শুরু করলো আর তুমি শান্ত মনে শুনে গেলে! তোমাদের পুরুষদের মাঝে কি আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছুই নেই?' মহিলাদের এসব কটূক্তি আব্বাসের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলো। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আবু জাহল যদি আবারো এমন কিছু বলে, তাহলে অবশ্যই চূড়ান্ত কোনো পদক্ষেপ নেবো।'

আতিকার স্বপ্ন পরবর্তী তৃতীয় দিন আব্বাস কাবার দিকে গেলেন। তখনো তার মাঝে সেদিনের ক্ষোভ জমে ছিলো। মসজিদে প্রবেশ করেই আবু জাহলকে দেখতে পেয়ে তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন, আবু জাহল যেন সেদিনের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তাহলেই তিনি আজ উচিত জবাব দিয়ে দেবেন! কিন্তু আবু জাহল হঠাৎ মসজিদের দরজা দিয়ে দ্রুতগতিতে বের হয়ে গেলো। আব্বাস তার দ্রুতগমনে অবাক

হয়ে গেলেন। কারণ আজ তিনি গায়ে পড়ে বিবাদ-বিসংবাদ কিছু একটা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন!

আব্বাস মনে মনে বললেন, 'হলো কী অভিশপ্তটার! আমার শক্ত কথা শোনার ভয়েই কি তার এই দ্রুত পলায়ন!' ঠিক সেই মুহূর্তে আবু জাহল যামযাম বিন আমর গিফারীর চিৎকার শুনতে পেলো। সেই যামযাম বিন আমর গিফারী, আবু সুফিয়ান যাকে কোরাইশদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলো। যামযাম উন্মুক্ত উপত্যকায় উটের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলো। সেকালের রীতি অনুযায়ী আসন্ন বিপদের নিদর্শনরূপে সে তার উটের নাকে জখম করেছে, আর সেখান থেকে অঝোর ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তাজা খুন! যামযাম গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেললো। এরপর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে কোরাইশের অনাথ-এতিম জনগোষ্ঠী! আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলায় তোমাদের যে অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তা ছিনিয়ে নিতে মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের নিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তোমরা তা ফিরে পাবে বলে মনে হয় না!' এরপর সে ততোধিক উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে বললো, 'সাহায্য! সাহায্য!'

এ সংবাদ পেয়েই কোরাইশরা যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। পরিণামে কোরাইশদের জন্য বদরপ্রান্তরে ছিলো পরাজয় ও লাঞ্ছনা। ভেবে দেখুন, গোপনীয়তা রক্ষার পূর্ণ দৃঢ়তা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নের বিষয়টি কীভাবে মূহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো!

গোপন তথ্য ফাঁসের আরেকটি ঘটনা শুনুন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার পর হযরত ওমর রাযি. তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সবাইকে জানাতে চাইলেন। তাই তিনি গোপন কথা ছড়ানোতে মক্কার সবচে পারদর্শী ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে বললেন, 'ওহে! তোমাকে একটি গোপন কথা বলছি। তুমি তা গোপন রাখবে। কাউকে বলবে না কিন্তু।'

সে বললো, 'কী আপনার গোপন কথা?'

ওমর রাযি. বললেন, 'আমি মুসলমান হয়েছি। সাবধান! কাউকে বলবে না যেন।'

এরপর ওমর তার কাছ থেকে চলে এলেন। এখনো তিনি অদৃশ্য হতে পারেননি, এরই মধ্যে সেই ব্যক্তিটি মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো, 'ভাই! শুনেছো, ওমর তো ইসলাম গ্রহণ করেছে! জানো, ওমর তো ইসলাম গ্রহণ করেছে!' আশ্চর্য! যেন এক ভ্রাম্যমাণ সংবাদসংস্থা!

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস রাযি.কে কোনো প্রয়োজনে কোথাও পাঠালেন। হযরত আনাস রাযি. তার মায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী জন্য পাঠিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় কিছুতেই প্রকাশ করবো না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের গোপনীয়তা রক্ষার শিক্ষা এজন্যই দিয়েছেন, যেন তারা দায়িত্ব পালনে যোগ্য হয়। সেই শৈশবেও হযরত আনাস রাযি. গোপনীয়তা রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। আজকের যুগে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে আনাসের দৃষ্টান্ত!

আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, ‘একদিন হযরত ফাতিমা রাযি. হেঁটে আসছিলেন। তার হাঁটার ভঙ্গি যেন রাসূলের ভঙ্গি! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “মারহাবা বেটি! স্বাগতম মা আমার!” এরপর নবীজী ফাতিমা রাযি.কে তার ডানে বা বামে বসিয়ে গোপনে কিছু বললেন। শুনে ফাতিমা রাযি. কাঁদতে শুরু করলেন। আমি [আয়েশা রাযি.] তাকে বললাম, “তুমি কাঁদছো কেন?” এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার কানে কানে কিছু বললেন। এবার ফাতিমা রাযি. হাসতে লাগলেন। আমি [আয়েশা রাযি.] বললাম, “আজকের ন্যায় বেদনা-আনন্দের এরূপ নিকট উপস্থিতি আর কখনো আমি দেখিনি!”’

আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বললেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত কথা প্রকাশ করতে পারবো না।’ এর কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর আমি তাকে পুনরায় বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম। ফাতিমা বললেন, ‘নবীজী আমাকে বলেছিলেন, জিবরাঈল আ. প্রতিবছর একবার আমাকে পুরো কোরআন শরীফ শোনাতেন, আমিও শোনাতাম। কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার দাওর করেছেন। আমি এটাকে আমার তিরোধানের পূর্বলক্ষণ বলে মনে করছি। আর আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে। রাসূলের এ কথা শুনে আমি কেঁদেছি। এরপর রাসূল বলেছেন, “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতি নারীদের সরদার হবে?” রাসূলের এ কথা শুনে আমি হেসেছি।’

মনে রাখবেন, মানুষের একান্ত তথ্যগুলো আপনি যত গোপন রাখতে পারবেন, তাদের কাছে আপনি তত বেশি আস্থাভাজন হবেন। আপনার জন্য তারা হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবে। তাদের কাছে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তারা উপলব্ধি করবে, 'আপনি একজন বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল ব্যক্তি।' তাই অভ্যস্ত হোন নিজের একান্ত কথাগুলি আপন বক্ষে ধারণে, অন্যের গোপন তথ্য সযতনে সংরক্ষণে।

**বড়রা বলেছেন...**

যে আপনার একান্ত তথ্য জেনে গেলো, আপনি যেন তার হাতে বন্দি হয়ে গেলেন।

# ৬১. অন্যের পাশে দাঁড়ান

মাস্টার্সে পড়ার সময় আমি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতাদর্শ সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণ অধ্যয়ন করেছি। এর মধ্যে একটি মতাদর্শ ছিলো 'প্রাগম্যাটিজম' বা বারাজামাতি মতবাদ। [আরবীতে একে اَلْمَذْهَبُ الْبَرَاجَمَاتِيُّ বলা হয়। বাংলাতে একে স্বার্থবাদী বা প্রয়োগবাদী মতবাদ বলা যায়।]

স্বার্থবাদী মতবাদের ওপর দীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণা করার পর আমার সামনে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেলো। আমরা শুনে থাকি ইউরোপ-আমেরিকায় অনেক ছেলে তার পিতাকে ত্যাগ করে এবং তাড়িয়ে দেয়। পিতা ও সন্তান কোনো রেস্টুরেন্টে একই সময় উপস্থিত হলেও প্রত্যেকে নিজ নিজ বিল হিসাব করে, অপরের বিল পরিশোধের কল্পনাও করে না। স্বার্থবাদী মতবাদ নিয়ে অধ্যয়নের পর আমি বুঝতে পারলাম কেন এমন হয়?

সত্যিই তো! পিতাকে যখন আমার আর কোনো কাজে আসছে না, আমি কেন খামোখা তাঁর সেবা করে যাবো?! আমি কেন তাঁর পেছনে অর্থ ব্যয় করবো?! আমার অতি মূল্যবান সময় 'নষ্ট' করবো?! কেন শ্রম দেবো, পরিশ্রম করবো?! সেবা, অর্থ ব্যয়, মূল্যবান সময় নষ্ট, শ্রম ও পরিশ্রমের বিনিময়ে তো আমার পার্থিব কোনো অর্জন হচ্ছে না!

এই হলো বস্তুবাদী জগতের স্বার্থবাদী চিন্তাধারা। বিনিময় ও বৈষয়িক স্বার্থ এখানে মুখ্য, আর সবকিছু গৌণ। ইসলাম কিন্তু পার্থিব স্বার্থকে সেবার মানদণ্ড নির্ণয় করেনি। দেখুন, কোরআন কী বলেছে:

وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আয়ে ১৯৫ [সূরা বাকারা]

অর্থ: তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

আর নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কোনো ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করতে পারা আমার কাছে আমার এ মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও প্রিয়।' তিনি আরো বলেছেন:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.

[সহীহ মুসলিম: ৪৬৭৭]

অর্থ: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো হাজত পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার হাজত পূরণ করবেন।

একদিন নবীজী ﷺ পথ চলছিলেন। পথে জনৈক ক্রীতদাসী তাঁকে থামিয়ে বললো, 'আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে।' নবীজী ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁর প্রয়োজনে কথা শুনলেন এবং তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে তাঁর মালিকের ঘর পর্যন্ত গেলেন। বরং নবীজী ﷺ তো মানুষের প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে মিশতেন এবং এজন্য তাদের কটু কথা, নির্যাতন-নিপীড়নও ধৈর্য ধরে সহ্য করতেন।

অতিকোমল হৃদয়, অশ্রুসিক্ত নয়ন, কল্যাণকামী উচ্চারণ—এই ছিলো তাঁর মানবসেবার পাথেয়। তিনি অনুভব করতেন, 'আমি, তুমি, তিনি—সকলে এক দেহ, এক আত্মা।' দরিদ্রের দীনতা, দুঃখীর দুঃখ অনুভব করতেন।

অসুস্থের রোগযন্ত্রণায়, অভাবীর অভাবে তিনিও কাতর হতেন। অভাবীর অভাবদর্শনে নবীজীর বেচাইনি ও অস্থিরতা দেখুন।

নবীজী ﷺ একদিন মসজিদে নববীতে বসে উপস্থিত সাহাবীদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে কিছু লোককে এগিয়ে আসতে দেখলেন। নবীজী ﷺ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন, তারা মুযার গোত্রের দরিদ্র এক কাফেলা। নজদ থেকে নবীজীর সাক্ষাতে এসেছে। অত্যধিক দারিদ্রতার কারণে তারা গলায় কাপড় ঝুলিয়ে পরেছিলো। অর্থাৎ তাদের কারো কারো কাছে যদিও সামান্য কাপড় ছিলো কিন্তু সেলাই করার জন্য সুঁই-সুতা জোগাড়ের সামর্থ্যও তাদের ছিলো না। তাই তারা কাপড়ের মাঝখান বরাবর ছিঁড়ে মাথা ঢুকিয়ে বাকি অংশ শরীরে ঝুলিয়ে নিয়েছিলো। পরনে এই সেলাইহীন আবা আর কোমরে ঝোলানো তরবারি। আর কিছু নেই। না ছিলো কোনো লুঙ্গি বা পায়জামা, না পাগড়ি, না চাদর।

তাদের অভাব-অনটন, খাদ্য ও বস্ত্রের নিদারুণ কষ্ট দেখে নবীজীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাদেরকে দেয়ার মতো কোনো কিছু পেলেন না। বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে। এভাবে অনেকক্ষণ তালাশ করেও কিছু খুঁজে পেলেন না।

এরপর নবীজী ﷺ মসজিদে গিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে মিম্বরে বসে প্রথমে আল্লাহ তাআলার শানে হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ

করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

۝১ [সূরা নিসা]

অর্থ: হে লোকসকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার ওসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় করো। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

এরপর নবীজী ﷺ তেলাওয়াত করলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

۝১৮ [সূরা হাশর]

অর্থ: হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। আর (তোমরা সকলে) আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চিত জেনো, তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন আয়াত পড়তে লাগলেন আর নসীহত করতে লাগলেন। এরপর উঁচু কণ্ঠে বললেন, ‘তোমরা সদকা করতে অক্ষম হওয়ার

পূর্বেই সদকা করো। দান করতে প্রতিবন্ধকতা আসার আগেই দান করো। দীনার-দিরহাম, গম-যব যে যা পারো, দান করো। কোনো দানকেই যেন কেউ তুচ্ছ মনে না করে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে শেষে বললেন, 'অন্তত এক টুকরো খেজুর হলেও যেন প্রত্যেকে দান করে।'

জনৈক আনসারী সাহাবী বড় একটি থলে নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসেই তা গ্রহণ করলেন। এ সময় নবীজীর অবয়বে আনন্দের আভা প্রতিভাত হচ্ছিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:
مَنْ سَنَّ فِي اَلْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي اَلْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.
[সহীহ মুসলিম: ২৩৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২০৩]
অর্থ: যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো সুন্দর প্রথা ও আদর্শ চালু করবে এবং তার ওপর আমল করবে, তাকে তার এ কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। পরবর্তীতে অন্য কেউ এ অনুযায়ী আমল করলে সে তারও প্রতিদান পাবে। তবে এ কারণে আমলকারীর সওয়াব হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো কুপ্রথা চালু করবে এবং তার ওপর আমল করবে, তাকে তার এ কাজের গুনাহ বহন করতে হবে। পরবর্তীতে অন্য কেউ তার অনুসরণ করে এ কাজ করলে সে তার বোঝাও বহন করবে। তবে পরবর্তীদের অপরাধকারীর গুনাহ বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না।

উপস্থিত লোকেরা উঠে যার যার ঘরে চলে গেলো এবং বিভিন্ন বস্তু নিয়ে ফিরে এলো। দীনারের মালিক দীনার নিয়ে এলো, দিরহামের মালিক দিরহাম; গমের মালিক গম নিয়ে এলো, কাপড়ের মালিক কাপড়। নবীজীর সামনে দু'টি স্তূপ হয়ে গেলো। একটি খাবারের, অপরটি কাপড়ের। এসব দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক খুশিতে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছু আগত দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে তাদের মনে স্থান করে নিতেন। মানুষের প্রয়োজন পূরণে শ্রম-সময়-সম্পদ সবই ব্যয় করতেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি.-কে একবার নবীজীর গৃহে অবস্থানকালীন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘নবীজী ঘরে থাকা অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতেন, কিংবা তাদের কাজে সহায়তা করতেন।’

এবার আপনি বলুন, মানুষের মন জয় করার জন্য কি আপনি এই নববী পন্থা অবলম্বন করবেন না? তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবেন না? একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন, আপনি পৌঁছিয়ে দিন। বিপদে পড়ে একজন আপনার সহায়তা চাইলো, সাধ্যমতো সাহায্য করুন। যখন সে তার বিপদে আপনাকে পাশে পাবে, প্রয়োজনে আপনার সহায়তা পাবে আর অনুভব করবে, ‘অনুগ্রহের বিনিময়ে আপনার না কৃতজ্ঞতা কাম্য, না প্রতিদান’; তখন নিশ্চয়ই সে আপনাকে ভালোবাসবে, আপনার জন্য দোয়া

করবে। ভবিষ্যতে আপনার যে কোনো বিপদে সহযোগিতার জন্য সে প্রস্তুত থাকবে। কবি বলেন:

অন্যের প্রতি যদি করো দয়া, যদি করো ইহসান
হৃদয়রাজ্যের হবে অধিপতি, অনুগত সব প্রাণ
যুগে যুগে দেখো আর কিছুতেই জয় হয়নি কোনো হৃদয়
ইহসানগুণেই জয় হয়েছে হৃদয়জগৎ সদা নিশ্চয়।

**দর্শন...** অন্যের কল্যাণে যার জীবন কাটে তার জীবনে হয়তো আসবে ক্লান্তি-শ্রান্তি, কিন্তু সে জীবন হবে মর্যাদার জীবন, মৃত্যু হবে সম্মানের মৃত্যু।

# ৬২. সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্বই নেবেন না

আমার এক বন্ধু; স্বভাব-চরিত্র, ধার্মিকতা, বিচক্ষণতা—সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। বাড়ির পাশের মসজিদেই তিনি ইমামতি করতেন। কিন্তু আমি অনেকের মুখেই তাঁর সমালোচনা শুনতাম। আমি রীতিমতো আশ্চর্যবোধ করতাম, এমন ভালো মানুষেরও কেউ সমালোচনা করে! কিন্তু রহস্য অমীমাংসিতই থেকে গেলো।

একবার তাঁর এক প্রতিবেশী আমাকে এসে বললো, ‘জনাব! আপনার বন্ধু আমাদের সঙ্গে নামাযও পড়েন না, ইমামতিও করেন না।’

আমি বললাম, ‘কেন?!’

সে বললো, ‘তা জানি না। তবে ইমাম তিনিই। তা সত্ত্বেও প্রায়ই তিনি মসজিদেই আসেন না।’

আমি বন্ধুর পক্ষ হয়ে ওযরখাহী করার চেষ্টা করলাম। বললাম, ‘হয়তো তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন কিংবা হতে পারে তিনি বাড়িতেই নেই।’

সে বললো, ‘জনাব! তাঁর গাড়ি বাড়ির গেটেই পড়ে আছে। আমি নিশ্চিত, তিনি বাড়িতেই আছেন। কিন্তু তারপরও ইমাম হয়ে তিনি জামাতে শরিক হচ্ছেন না।’

আমি বন্ধুকে সদুপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে এর প্রকৃত কারণ খুঁজতে লাগলাম এবং একপর্যায়ে তা জেনেও ফেললাম। ঘটনা হলো, মসজিদের ইমাম

হওয়ায় সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসতো। আর তাদের অনেকেই তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করতো।

- কেউ এসে বলতো, 'হযরত! আমার ঘাড়ে বিশাল ঋণের বোঝা। আপনি যদি বিত্তশালী কাউকে বলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিতেন।'
- কেউ বলতো, 'আমি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপন করেছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য একটু সুপারিশ চাই।'
- কেউ কেউ অসুস্থ আত্মীয়কে হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য সাহায্য চাইতো।
- কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আসতো মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে।
- কেউ এসে বলতো, 'ঘর-ভাড়া বাকি। আদায় করতে পারছি না।'
- আবার কেউ আসতো ফতোয়ার দরখাস্ত নিয়ে, মুফতী সাহেবের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য।

এভাবে বিভিন্ন লোক এসে তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনে কথা বলতো। অথচ তিনি সাধারণ একজন ব্যক্তি। বিত্তের প্রাচুর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিত্তশালীদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক; এসব তাঁর ছিলো না। অধিকন্তু বেচারার ছিলো স্বভাবজাত লজ্জা ও দ্বিধা। তাই কারো আবেদন তিনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। কাউকে ঋণ আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন। কারো মোবাইল নম্বর লিখে রেখে বলতেন, 'তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত

থাকো।' কাউকে বলতেন, 'দু'দিন পরে আসুন। হাসপাতালের ভর্তির কাগজটি প্রস্তুত পাবেন।'

তারা প্রতিশ্রুত সময়েই আসতো। তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে অন্য আরেকটি তারিখ দিতেন। একপর্যায়ে তিনি মানুষের চোখের আড়াল হতে লাগলেন। মোবাইল রিসিভ করাও বন্ধ করে দিলেন। এমনকি কোনো কোনো সময় তিনি বাড়ি থেকেও বের হতেন না। মাঝে মধ্যে কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে শুনতে হতো তির্যক মন্তব্য, কটু কথা। মানুষ বলতো, 'ভালো কথা! আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন? আপনার ওপর নির্ভর করালেন কেন? আপনি প্রতিশ্রুতি না দিলে তো আমি আশার জাল বুনতাম না।' কেউ বলতো, 'আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেই তো আমি আর কারো সঙ্গে কথা বলিনি।'

সবকিছু জানার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো, তিনি নিজেই নিজের জন্য গর্ত খুঁড়েছেন এবং আজ সেই গর্তে পতিত হয়েছেন। একবার আমি দেখলাম, তিনি জনৈক আগন্তুককে ওযর পেশ করে বলছেন, 'দুঃখিত, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না।' আগন্তুক চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'ভালো কথা, আমাকে আগে বলেননি কেন? কেন আমার সময় নষ্ট করেছেন?'

তখন আমার জনৈক দার্শনিকের একটি বিজ্ঞবচন স্মরণ হলো, 'অজুহাত-কৈফিয়ত পেশ করতে হলে শেষে নয়; শুরুতেই পেশ করা শ্রেয়।'

কতো ভালো হতো, যদি প্রত্যেকের আপন সামর্থ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বোধ ও উপলব্ধি থাকতো! প্রত্যেকের প্রতিশ্রুতি ও পদচারণা যদি তাঁর সামর্থ্যের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো! মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে। ইরশাদ হয়েছে:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ায়ে ۝২৮৬ [সূরা বাকারা]

অর্থ: আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

ায়ে ۝৭ [সূরা তালাক]

অর্থ: আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশি ভার তাঁর ওপর অর্পণ করেন না।

নবী কারীম ﷺ-ও কাউকে তাঁর সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব নিতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও আছে। মনে পড়ে, একবার আমি রিয়াদে এক সামরিক একাডেমিতে বক্তৃতা করেছিলাম। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত একজন আমাকে এসে বললেন, ‘জনাব! আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

আমি বললাম, ‘বলুন, কী বিষয়।’

তিনি বললেন, ‘এখন তা আলোচনা করার উপযুক্ত সময় নয়। লম্বা সময় নিয়ে অবশ্যই একসময় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।’

তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরতে লাগলেন। আমিও শান্তভাবে শুনতে লাগলাম। জীবন থেকে আমার অভিজ্ঞতা হলো,

অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে পরিমাণের চেয়ে বড় করে তুলে ধরে। দায়গ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত দায়চিন্তায় বোধহীন-পাগলপ্রায় থাকে।

যাই হোক, তিনি আমাকে বললেন, ‘আপনার সম্ভবত আগামীকাল রিয়াদ থেকে দু'শত মাইল দূরে অমুক শহরে আলোচনা করার কথা রয়েছে।’
আমি বললাম, ‘জ্বী! ঠিক বলেছেন।’
তিনি বললেন, ‘আমি সেখানে যাবো এবং বক্তৃতার পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।’

আমি তাঁর আগ্রহ দেখে বেশ আশ্চর্য হলাম। পরদিন সেই শহরে বক্তৃতা শেষ করে আমি যখন বের হলাম, দেখলাম, বাস্তবেই তিনি সেখানে এসেছেন। আমাকে বের হতে দেখে তিনি জুতো ছাড়াই দ্রুত পায়ে ছুটে এলেন। তাঁর হাতে ছোট একটি কাগজ। আমি তাঁকে নিয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়ালাম। বললাম, ‘আল্লাহর শুকরিয়া! আসুন, আসুন। আপনার প্রয়োজনে কথা বলুন।’

তিনি বললেন, ‘জনাব! আমার ছোট ভাই প্রাইমারী সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। আমার আশা, আপনি তার জন্য কোথাও একটি চাকুরির তদবির করবেন।’
আমি বললাম, ‘ব্যাস, এতটুকুই?!’
‘হ্যাঁ, এতটুকুই!’

লোকটিকে দেখে মনে হলো, তিনি আমার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছেন। তাঁর চেহারা দেখে বড় মায়া লাগলো। মনে হলো, বাস্তবেই হয়তো তাঁর ভাই কঠিন সময় অতিক্রম করছে। কিন্তু আমি ভেবে-চিন্তে দেখলাম, এখন যদি তাকে প্রতিশ্রুতি দিই, তবে তা পূরণ করতে পারবো না। কারণ, এখনকার যুগে প্রাথমিক ডিগ্রি তো দূরের কথা, স্নাতক ডিগ্রিধারী বহু মানুষই চাকুরি খুঁজে পাচ্ছে না। আর নিজের সামর্থ্যের পরিধি তো আমার জানাই আছে।

পরিস্থিতিটি আমার জন্য বড় পীড়াদায়ক ছিলো। মনে মনে ভাবছিলাম, কোনোভাবে যদি এই অভাবী লোকটির সহযোগিতা করতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তাঁর আশা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত আবেগময় কোনো পন্থায় আমার অপারগতা ও কৈফিয়তের কথা পেশ করবো।

আমি বললাম, ‘ভাই! কসম করে বলছি, আমার প্রবল ইচ্ছা—আপনাকে সহায়তা করবো। আপনার ভাই তো আমারও ভাই। আপনি যেমন তার জন্য কষ্ট অনুভব করছেন, আমিও করছি। এতদসত্ত্বেও আমি আপনাকে সহায়তা করতে পারছি না। আশা করি, আপনি আমার অপারগতাকে ক্ষমা করবেন এবং বিষয়টি উদার দৃষ্টিতে দেখবেন।’ তিনি বললেন, ‘জনাব! একটু চেষ্টা করে দেখুন।’ আমি বললাম, ‘না ভাই! আমার পক্ষে আসলেই সম্ভব নয়।’

তিনি হাতের কাগজটি আমাকে দিয়ে বললেন, ‘জনাব! অন্তত এই কাগজটি রাখুন। এতে আমার ফোন নাম্বারও দেয়া আছে। কখনো যদি তার জন্য কোনো চাকুরি পেয়ে যান, তবে আমাকে ফোন করার অনুরোধ রইলো।’

আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমাকে একটি প্রত্যাশার রশিতে বাঁধতে চাচ্ছেন। তিনি ফোনের অপেক্ষায় থাকবেন। আশায় বুক বাঁধবেন। তাঁর ভাইকেও আশার বাণী শোনাবেন। আমি বললাম, ‘তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন। কাগজটি আপনার কাছেই রাখুন এবং আমার নাম্বার নিয়ে যান। তার জন্য উপযুক্ত কোনো চাকুরির সন্ধান পেলে আমাকে ফোন করবেন। আমি সেই পদে তাকে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবর সুপারিশনামা লিখে দেবো।’

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। আমি অপেক্ষায় রইলাম, তিনি হয়তো আমাকে বিদায় জানাবেন। হঠাৎ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জনাব! এক বছর পূর্বে যুবরাজের সঙ্গেও আমার ভাইয়ের বিষয়ে আলাপ করেছি। তিনি কাগজও রেখে দিয়েছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফোন করেননি। মেজর জেনারেল সাহেবের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছি। তিনিও কাগজ রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফোন করেননি, বিষয়টিকে গুরুত্বও দেননি। ওনারা দুর্বল অসহায়দের কোনো গুরুত্ব দেননি। আল্লাহ এদের বিচার করুন। আল্লাহ...।’

এভাবে তিনি তাদের নামে বিভিন্ন বদদোয়া করতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম, 'আলহামদু লিল্লাহ! যদি আমিও কাগজটি গ্রহণ করতাম তাহলে আমি হতাম বদদোয়া ও অভিশাপের তৃতীয় লক্ষ্যবস্তু!'

তো প্রতিশ্রুতিভঙ্গের চেয়ে শুরুতেই অপারগতা পেশ করা উত্তম। কত ভালো হতো, যদি আমরা স্পষ্টভাষী হতাম! নিজ সামর্থ্য ও সক্ষমতার সীমারেখা বুঝে কাজ করতাম! শুধু অন্যান্য মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই নয়; নিজের স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও এ নীতি অবলম্বন করা উচিত। মাঝে মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রী হয়তো চেঁচিয়ে বলবে, 'ফেরার সময় দুধ-চিনি, রাতের নাস্তা নিয়ে এসো।' তখন সতর্ক হোন। যদি জানেন যে, আজ কিছু আনতে পারবেন না, তাহলে এখন 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' না বলে আপনিও স্ত্রীকে সরাসরি চেঁচিয়ে বলুন, 'আজ নয়। আজ পারবো না!' ফিরে এসে 'সময় ছিলো না', 'দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো', 'ভুলে গিয়েছিলাম'—এসব অজুহাত পেশ করার চেয়ে এটাই উত্তম। সহপাঠী-সহকর্মী, ভাই-বোন সবার সঙ্গেই এ নীতি অবলম্বন করুন। আশা করি, চিন্তাধারাটি যথাস্থানে পৌঁছে গেছে!

**অভিজ্ঞতা...** অজুহাত-অপারগতা পেশ করতে হলে শেষে নয়; শুরুতেই পেশ করা শ্রেয়।

# ৬৩. বিড়ালটাকে কে মারলো লাথি!?!

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে পুরো ঘটনাটি শুনুন। জনৈক ব্যক্তি এক বদমেজাজি পরিচালকের সেক্রেটারি পদে চাকুরি করতো। সেই পরিচালকের না ছিলো কোনো আচরণদক্ষতা, না ছিলো মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার কোনো যোগ্যতা। সে অনেক কাজ জমা করে রাখতো। সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিতো।

একদিন সে তার সেক্রেটারিকে ডাকলো। সেক্রেটারি সামনে এসে দাঁড়াতেই সে তাকে ধমক দিয়ে বললো, 'আমি তোমার রুমে ফোন করলাম, তুমি রিসিভ করলে না কেন?'
সে বললো, 'স্যার! আমি দুঃখিত, আমি পাশের রুমে ছিলাম।'
'কিছু হলেই দুঃখিত! দুঃখিত! নাও, এই কাগজপত্রগুলো সংরক্ষণ বিভাগের প্রধানের কাছে পৌঁছে দিয়ে দ্রুত ফিরে এসো।'

সেক্রেটারি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো। সংরক্ষণ বিভাগের প্রধানের কাছে কাগজগুলো দিয়ে বললো, 'কার্যসম্পাদনে বিলম্ব করবেন না।' সেক্রেটারির আচরণে সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান অবাক হলো। সে বললো, 'ঠিক আছে, কাগজগুলো নিয়মমতো রেখে যান।'
'নিয়ম-অনিয়ম বুঝি না। এতটুকু বুঝি, গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দ্রুত সেরে দিবেন।'
এভাবে উভয়ের মাঝে বাক্যবিনিময় চলতে লাগলো। একপর্যায়ে উভয়ের স্বর উঁচু হলো। সেক্রেটারি তার রুমে চলে গেলো।

ঘণ্টাদুয়েক পর সংরক্ষণ বিভাগের নিম্নপদের এক কর্মচারী প্রধান অফিসারকে এসে বললো, 'স্যার! আমার সন্তানদের স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য একটু যেতে হবে। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো।'

প্রধান অফিসার তাকে ধমক দিয়ে বললো, 'তুমি দেখছি প্রতিদিনই এভাবে বের হচ্ছো।'

কর্মচারী বললো, 'আমার চাকুরির দশ বছর যাবতই তো যাচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে এই প্রথম এ কথা বললেন।'

প্রধান অফিসার বললো, 'তোমার মতো লোকদের সঙ্গে চোখ লাল করে কথা না বললে হয় না। যাও, রুমে ফিরে যাও।'

প্রধান অফিসারের এমন আচরণে বেচারা হতাশ-হতভম্ব হয়ে নিজের রুমে ফিরে এলো। এরপর তার সন্তানদের স্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্নজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো। অবশেষে অনেকক্ষণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর তাদেরকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিলো।

অফিস শেষে কর্মচারী রাগান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরলো। বাবাকে দেখেই ছোট ছেলেটি একটি খেলনা হাতে দৌড়ে এলো। বলতে লাগলো, 'বাবা! দেখো দেখো, স্যার আমাকে এটা কিনে দিয়েছেন। আমি পরীক্ষায়...' কিন্তু তার বাবা তাকে আদর করার পরিবর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ধমকের স্বরে বললো, 'যাও তো এখন। তোমার আম্মুর কাছে যাও।'

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এলো। তার সবসময়কার খেলার সঙ্গী ছোট্ট-সুন্দর বিড়ালছানাটি তাকে কাঁদতে দেখে দৌড়ে এলো এবং অভ্যাসবশত তার দু'পায়ে শরীর ঘষতে লাগলো। কাঁদো-কাঁদো বিরক্ত ছেলেটি বিড়ালটিকে এক লাথি দিলো। বিড়ালটি ছিটকে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আঘাত খেলো।

এখন প্রশ্ন হলো, এই বিড়ালটিকে আসলে কে লাথি দিলো? আশা করি আপনি মুচকি হেসে উত্তর দেবেন, 'সেই বদমেজাজি পরিচালক'। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। সেই বদমেজাজি পরিচালকই এর জন্য দায়ী। কারণ সে নিজেই নিজের ওপর সাধ্যাতীত কাজের চাপ নিয়েছিলো, যা অতি চাপে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে।

আসলে আমাদের উচিত হলো, কাজ বিভক্ত করে নিতে অভ্যস্ত হওয়া। আমি নিজে যা পারিনা, তা ছেড়ে দেয়া। কারণ এর দায়িত্ব আমার নয়। যেসব কাজে আমরা সক্ষম নই, পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে আমরা বলে দেবো, 'না, আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।' বিশেষ করে যখন নিজের ওপর কোনো কাজ চাপিয়ে নিলে আপনার কাজ-কর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া এ কাজে শরিক নয় এমন ব্যক্তিদের ওপরও সংক্রমিত হয়, তখন তো অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় 'না' করে দেবো।

পাশাপাশি সচেতন থাকতে হবে, কেউ যেন আমাকে প্রভাবিত করতে না পারে। কারো চাপাচাপিতে আমি যেন এমন কোনো ওয়াদা না করে বসি,

যা করতে আমি সক্ষম নই। তাহলে চলুন একটু ঘুরে আসি সোনালী মদীনায়। বিচরণ করে আসি সীরাতে নববীর বর্ণীল ভুবনে।

নবীজী ﷺ বসে আছেন সাহাবীদের নিয়ে তাঁর মোবারক মজলিসে। ইতোমধ্যে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে ইসলামের দাওয়াত, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এক আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা। বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আগমন করছেন নবী দরবারে। কেউ আসছেন ইসলামের নেয়ামত গ্রহণ করে; ইসলামের নবীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। আবার কেউ আসছে কলুষতা ও বিদ্বেষভরা মন নিয়ে।

একদিনের ঘটনা। আরব গোত্রপ্রধানদের একজন নবী দরবারে এলো। নাম তার আমর বিন তুফাইল। নিজ গোত্রের ওপর তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক। আরবের সবখানে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দেখে একদিন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বললো, 'আমর! আর কিসের অপেক্ষা করছো! সবাই তো ইসলাম গ্রহণ করছে, তুমিও ইসলাম গ্রহণ করে নাও।'

আমর ছিলো বড় দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। সে তাদেরকে বললো, 'শপথ আল্লাহর! আমি তো শপথ করেছি, যতদিন না আরববাসী আমাকে তাদের নেতৃত্বের আসনে বসাবে, যতদিন না তারা আমার বশ্যতা স্বীকার করবে, ততদিন আমার মৃত্যুই হবে না। সেই আমি আনুগত্য করবো এই কোরাইশ-যুবকের!'

আমর যখন দেখলো দিন দিন ইসলাম সুসংহত হচ্ছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মানুষের আনুগত্য বেড়েই চলছে তখন সে তার কতিপয় সাঙ্গপাঙ্গ

নিয়ে উটের পিঠে চড়ে নবীজীর সাক্ষাতে এলো। নবীজী ﷺ সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন মসজিদে নববীতে, তাঁর মোবারক মজলিসে। আমর নবীজীর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'মুহাম্মাদ! আমি তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

নবীজী ﷺ এ ধরণের দুষ্ট লোক থেকে সবসময় সতর্ক থাকতেন। তাই তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ না তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছো, তোমার সঙ্গে একান্তে বসার প্রশ্নই আসে না।' সে আবার বললো, 'মুহাম্মাদ! আমি একান্তে কথা বলতে চাই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারও তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সে বারবার বলতে লাগলো, 'মুহাম্মাদ! আসো বলছি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' 'মুহাম্মাদ! আসো বলছি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' একপর্যায়ে নবীজী ﷺ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে মজলিস থেকে উঠলেন।

আমর ইতিপূর্বে ইরবাদ নামক তাঁর এক সঙ্গীকে বলে রেখেছিলো, 'আমি মুহাম্মাদকে কথায় ব্যস্ত রেখে অমনোযোগী করে ফেলবো। তুমি এই সুযোগে তরবারির আঘাতে তাঁকে হত্যা করবে।' ইরবাদও মনে মনে নবীজীকে ﷺ হত্যা করার ইচ্ছা লালন করে আসছিলো। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে এই প্রস্তাবে সম্মত হলো। নবীজী ﷺ আমরের সঙ্গে উঠে এলেন এবং একটি প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। ইরবাদ তরবারির বাঁটে হাত রেখে অপেক্ষা করছিলো কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের। কিন্তু যতবারই সে তরবারি কোষমুক্ত করতে যাচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত অবশ হয়ে আসছিলো। ফলে

কিছুতেই সে তরবারি কোষমুক্ত করতে পারলো না। আমর নবীজীকে ﷺ কথায় ব্যস্ত রেখে বারবার ইরবাদের দিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু ইরবাদ যেন নিষ্প্রাণ জড়বস্তু! কোনো নড়াচড়া নেই তার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরবাদের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলেন ইরবাদ কী করতে চাচ্ছে। নবীজী ﷺ আমরকে বললেন, 'আমর! ইসলাম গ্রহণ করে নাও।'

'মুহাম্মাদ! আমি ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি আমাকে কী দেবে?' আমর বললো।

'অন্যান্য মুসলমানগণ যে অধিকার লাভ করে, তুমিও তাই লাভ করবে। অন্যদের ওপর যা বর্তায়, তোমার ওপরও তাই বর্তাবে।' নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন।

আমর বললো, 'আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে কি তুমি তোমার মৃত্যুর পর এই রাজত্ব আমাকে প্রদান করবে?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি নন, যা কখনো বাস্তবায়ন হওয়ার নয়। তাই তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, 'না, নেতৃত্ব-রাজত্ব তোমার জন্যও নয়, তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও নয়।' এবার আমর তার দাবিতে কিছুটা নমনীয় হলো। সে বললো, 'আমি এ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি যে, আমি হবো কাঁচা ঘরগুলোর মালিক, আর তুমি হবে পাকা ঘরগুলোর মালিক।' অর্থাৎ আমি থাকবো মরু অঞ্চলের বাদশাহ, আর তুমি হবে শহরাঞ্চলের বাদশাহ।'

কিন্তু এবারও নবীজী ﷺ আমরকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হলেন না, যা বাস্তবায়ন হবে কিনা, তা তিনি জানেন না। তাই তিনি আবারও স্পষ্ট ভাষায় 'না' বলে দিলেন। এ উত্তর শুনে আমর খুব উত্তেজিত হয়ে গেলো। রাগে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ! আমি অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে তেজী ঘোড়া আর অনড়-অটল এক পদাতিক বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকবো। প্রতিটি খেজুর গাছের সঙ্গে একটি করে ঘোড়া বাঁধা থাকবে। এক হাজার সুঠামদেহী, এক হাজার সুগঠিত সৈন্য দিয়ে গাতফানে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো।'

এ কথা বলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গজরাতে গজরাতে সে বের হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমরের দিকে তাকালেন। এরপর আকাশের দিকে মুখ করে বললেন, 'আয় আল্লাহ! তুমি আমরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। আর তার সম্প্রদায়কে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করো।'

আমর তার সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে গেলো। মদীনা ছেড়ে রওনা হলো নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে। মনে ক্রোধের প্রজ্জ্বলিত আগুন, আর ইচ্ছা সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার, মদীনায় আক্রমণ করার। পথ চলতে চলতে আমর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ক্লান্ত শরীরে উদ্যম ফিরে আসতে প্রয়োজন একটু বিশ্রামের, কোথাও যাত্রাবিরতির। পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ হলো 'সুলুলিয়া' নামক এক মহিলার সঙ্গে। মহিলাটি এমনই মন্দ স্বভাবের ছিলো যে, মানুষ তাঁর নিন্দা তো করতোই; কেউ তাঁর তাঁবুতে ঢুকলে সবাই তার ওপরও অন্যায় আর পাপের অপবাদ বর্তাতো।

মহিলাটি তখন তাঁর তাঁবুতেই ছিলো। ক্লান্ত-শ্রান্ত আমর উপায়ান্তর না পেয়ে বিশ্রামের জন্য সুলুলিয়ার তাঁবুতেই আশ্রয় নিলো এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যেই সে আক্রান্ত হলো ঘাড়ের টিউমার [লালাগ্রন্থি] রোগে। এ ধরণের রোগ সাধারণত উটের ঘাড়ে হয়ে থাকে। আক্রান্ত উটের লালাগ্রন্থি ফুলে স্ফীত হয়ে যায় এবং তাকে মেরে ফেলতে হয়। আমর খুব ভীত ও অস্থির হয়ে পড়লো। সে বারবার ঘাড়ের টিউমারটি স্পর্শ করে বলতে লাগলো, ‘হায়! উটের মতো লালাগ্রন্থি! সুলুলিয়ার ঘরে মৃত্যু!’ অর্থাৎ এ যে বড় অসম্মানের মৃত্যু! অসম্মানের স্থানে মৃত্যু! তাঁর কামনা ছিলো মৃত্যু হবে রণক্ষেত্রে, সাহসী কোনো বীর যোদ্ধার তরবারির আঘাতে। কিন্তু আজ তাঁর মৃত্যু হচ্ছে পশুরোগে আক্রান্ত হয়ে! তাও এক নষ্টা-মহিলার ঘরে! হায়! ধিক্কার! লাঞ্ছিত আর অপমানিতদের জন্য ধ্বংসই তো অবধারিত!

সে চিৎকার করে তার সঙ্গীদের ডাকতে লাগলো এবং তার ঘোড়াটি কাছে নিয়ে আসতে বললো। তারা ঘোড়া নিয়ে আসতেই সে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়লো এবং বর্শা হাতে তুলে নিলো। ঘোড়াও তাকে নিয়ে চলতে শুরু করলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে বারবার চিৎকার করছিলো। বারবার ঘাড় স্পর্শ করে সে বলছিলো, ‘হায়! উটের মতো লালাগ্রন্থি! সুলুলিয়ার ঘরে মৃত্যু!’ ঘোড়া তাকে নিয়ে চলছিলো আর সে যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলো। এরই মধ্যে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এবং তার লাশ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। সঙ্গীরা তার লাশ পথেই ফেলে গেলো। তারা যখন নিজেদের এলাকায় পৌঁছলো, সবাই ইরবাদকে ঘিরে জানতে চাইলো, ‘ইরবাদ! বলো, কী খবর নিয়ে এলে?’ সে বললো, ‘না, তেমন কিছু নয়। মুহাম্মাদ

আমাদেরকে এমন কিছুর ইবাদত করতে বলছে, আল্লাহর শপথ! সে যদি এখন আমার নাগালে থাকতো, আমি তাকে তীর মেরে হত্যা করতাম।'

সুবহানাল্লাহ! পবিত্র সত্তা আল্লাহ! সুমহান সত্তা আল্লাহ! আল্লাহর বিরুদ্ধে এত বড় ধৃষ্টতা! এ কথা বলার এক-দু'দিন পর সে তার একটি উট বিক্রি করতে বাড়ি থেকে বের হলো। পথেই আল্লাহ তাআলা তাকে তার উটসহ বজ্রাঘাতে জ্বালিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এই আমর ও ইরবাদের পরিণতি বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ
بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ
وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ
﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ
بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ
شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا َفِي اللَّهِ وَهُ
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا
دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

[সূরা রা'দ]

অর্থ: প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে আল্লাহ তা জানেন এবং মাতৃগর্ভে যা বাড়ে ও কমে তাও এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন। তাঁর সত্তা অনেক বড়, তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ। তোমাদের মধ্যে কেউ চুপিসারে কথা বলুক বা উচ্চ স্বরে, কেউ রাতের বেলা আত্মগোপন করুক বা দিনের বেলা চলাফেরা

করুক, তারা সকলে (আল্লাহর জ্ঞানে) সমান। প্রত্যেকের সামনে-পিছনে এমন প্রহরী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে পালাক্রমে তাঁর হেফাজত করে। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর কোনো বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোনো রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না। তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে বিজলীর চমক দেখান, যা দ্বারা তোমাদের (বজ্রপাতের) ভীতি দেখা দেয় এবং (বৃষ্টির) আশাও সঞ্চার হয় এবং তিনিই পানিবাহী মেঘ সৃষ্টি করেন। বজ্র তাঁরই তাসবীহ ও হামদ জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতাগণও (তাসবীহরত রয়েছে)। তিনিই গর্জমান বিজলী পাঠান তারপর যার ওপর ইচ্ছা তাকে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর সম্বন্ধেই তর্কবিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড। তিনিই সেই সত্তা, যাঁর কাছে দু'আ করা সঠিক। তারা তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেবদেবীদেরকে) ডাকে তারা তাদের দু'আর কোনো জবাব দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে পানির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আশা করে তা আপনিই তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তা কখনো নিজে-নিজে তার মুখে পৌঁছাতে পারে না। আর (দেব-দেবীদের কাছে) কাফেরদের দু'আর ফল এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তা শুধু বৃথাই যাবে।

যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ আস্থা আছে যে, আল্লাহর রহমতে আপনি তা সম্পাদন করতে পারবেন, কেবল সে বিষয়ের দায়িত্বই মাথায় তুলে নেবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন জনসম্মুখে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি আখেরাতের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। একপর্যায়ে স্বর উঁচু করে বলতে লাগলেন—"হে মুহাম্মাদ-কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর শাস্তি থেকে আমি তোমাকে বিন্দুমাত্রও রক্ষা করতে পারবো না।"

এ বিষয়ে শেষ কথা এটাই বলবো যে, আপনি কোনো বিষয়ে অক্ষম হলে, বিষয়টি সম্পাদনের পূর্ণ আস্থা না থাকলে অবশ্যই তার দায়িত্ব নেবেন না, কাউকে এ বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না। তবে হ্যাঁ, আপনার অক্ষমতা প্রকাশের ভঙ্গি ও শৈলীও যেন সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ আপনার কাছে তার ভাইয়ের জন্য চাকুরির খোঁজে এলো। কারণ আপনি নিজে কিংবা আপনার ভাই বা পিতা বড় কোনো পদে চাকুরি করেন। এদিকে আপনি নিশ্চিত যে, এ মুহূর্তে আপনি তার কোনো সাহায্য করতে সক্ষম নন।

আপনি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলুন, যেন তার মুখের হাসিটুকু অটুট থাকে। সে যেন উপলব্ধি করে যে, তার দুঃখ ও চিন্তায় আপনিও অংশীদার। আপনি তাকে বলুন, 'ভাই! আমি তোমার কষ্ট ও পেরেশানি উপলব্ধি করতে পারছি। তোমার ভাইকে আমি আমার ভাইয়ের মতোই মনে করি। আমার যদি পাঁচ ভাই থাকে, সে আমার ষষ্ঠ ভাই। কিন্তু সমস্যা হলো, এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু করতে পারছি না। আমার অপারগতার প্রতি লক্ষ্য করে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তোমার

ভাইয়ের জন্য উত্তম কোনো চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন।' এ কথাগুলো আপনি তাকে বলুন খুব কোমল স্বরে, মুখে হাসি বজায় রেখে, প্রতিটি বাক্য বলার সময় চেহারায় উপযুক্ত ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে। আপনার এই শালীন-সুন্দর প্রত্যাখ্যানের পরও তার মনে হবে, আপনি যেন তার চাওয়া পূর্ণ করেছেন, তাকে ফিরিয়ে দেননি। তাই নয় কি?

**দৃষ্টিভঙ্গি...** নিজের সঙ্গে স্পষ্টবাদী হোন। মানুষের সঙ্গে হোন স্পষ্টভাষী। নিজের সামর্থ্যকে জানুন এবং সামর্থ্যের সীমাতেই অটল থাকুন।

# ৬৪. বিনয়ী হোন

একবার বিশিষ্ট ক'জন ব্যক্তির সঙ্গে এক মজলিসে বসা ছিলাম। নিজেকে অনেক কিছু ভাবা উপস্থিত এক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু বলছিলো। দাম্ভিক এ লোকটি একপর্যায়ে বলে উঠলো, 'একবার আমি এক শ্রমিকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি প্রথমে ইতস্তত বোধ করলাম। পরে অবশ্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে মোসাফাহা করেছিলাম।' এরপর সে দাম্ভিকতার সুরে বললো, 'আমি সাধারণত কারো সঙ্গে মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়াই না।'

কী চমৎকার উক্তি! 'আমি সাধারণত কারো সঙ্গে মোসাফাহা করার জন্য হাত বাড়াই না।' অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ দেখুন। অতি দুর্বল এক ক্রীতদাসী রাস্তার মধ্যেই রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মালিকের জুলুম কিংবা সাধ্যাতীত কাজ চাপানোর অভিযোগ করলো। নবীজী ﷺ নিজের কাজ রেখে তাঁর জন্য সুপারিশ করতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মালিকের কাছে গেলেন। নবীজী ﷺ তখন বলছিলেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

[সহীহ মুসলিম: ১৩১]

অর্থ: যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কতজনকে কতবার বলতে শুনেছি, 'ভাই! অমুক তো বড় অহঙ্কারী।' 'অমুক তো নিজেকে অনেক কিছু ভাবে।' অহঙ্কার নামের এই মন্দ স্বভাবের কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করে, তাঁর নিন্দা করে। আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তোমার অমুক প্রতিবেশীকে তাঁর কাজে সাহায্য করো না কেন?' সে বলবে, 'সে তো আমাদের সঙ্গে অহঙ্কার প্রদর্শন করে। আমাদেরকে চেহারা দেখাতেও রাজি নয়! তাকে কী সাহায্য করবো?' হায়! অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা প্রকাশের কারণে মানুষের কাছে সে কত ঘৃণিত! কতটা পরিত্যাজ্য! সমাজচ্যুত! অথচ নিজেকে এরা ভাবে অমুখাপেক্ষী! স্বয়ংসম্পূর্ণ! কেউ দম্ভভরে পথ চলে। মানুষকে দেখলে গণ্ডদেশ কুঞ্চিত করে ফেলে। আবার কেউ শ্রমিক, চাকর ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে। এদের সঙ্গে কথাবার্তা, মোসাফাহা, একসঙ্গে বসা—সব বিষয়েই অহঙ্কার।

অথচ নববী আদর্শ দেখুন। বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশের পর নবী কারীম ﷺ মক্কার পথে পথে, অলিতে-গলিতে হাঁটতে লাগলেন। এসব পথে তাঁর প্রতি হয়েছে কত নির্যাতন-নিপীড়ন, শুনতে হয়েছে কত কটূক্তি, সইতে হয়েছে উৎপীড়ন। কতবার তিনি শুনেছেন, 'হে পাগল!', 'হে যাদুকর!', 'হে জ্যোতিষী', 'হে মিথ্যাবাদী!' আরো কত কী! আজ তিনি সেই মক্কায় প্রবেশ করেছেন একজন প্রতাপশালী, কর্তৃত্বধারী নেতা হিসেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ তিনি বিজয়ী; আর মক্কাবাসী তাঁরই সামনে পরাস্ত। বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশের সময় কেমন ছিলো নবীজীর অনুভূতি?

হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বকর রাযি. বলেন, 'যী-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনম্র হয়ে নিজ বাহনের ওপর থেমে গেলেন। নবীজী ﷺ তখন একটি লাল চাদরে আবৃত ছিলেন। মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন, তা অনুভব করে নবীজী ﷺ বিনম্রচিত্তে মাথা নত করে ফেললেন। অধিক নত হওয়ায় নবীজীর দাড়ি উটের পিঠ স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিলো।' হযরত আনাস রাযি. বলেন, 'মক্কাবিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তাঁর থুতনি নিচু হয়ে বাহনের পিঠের সঙ্গে লেগে ছিলো।' হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোনো বিষয়ে কথা বলছিলো। ভয়ে তাকে কাঁপতে দেখে নবীজী ﷺ বললেন, 'শান্ত হও। আরে! আমি তো শুকনো গোশত আহারকারিণী এক কোরাইশ-মহিলার অতিসাধারণ এক সন্তান!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'আমি বসি ক্রীতদাসের মতো, আহার করি ক্রীতদাসের মতো।'

যিনি বলেছেন বড় চমৎকার বলেছেন:

আকাশ ছেড়ে তারারা যে দিঘির জলে এলো
কিন্তু তবু দেখতে তাদের লাগছে বড় ভালো।
অগ্নিধোঁয়া জমীন ছেড়ে ছুটলো গগনমুখে
ভুলেও সেদিক তাকায় না কেউ, একাই মহাসুখে।
বিনয়গুণের মানুষ যে ভাই দিঘির তারার মতো
অহংবোধের মানুষগুলো শূন্য ধোঁয়া যত।

**সারকথা...** আল্লাহর ওয়াস্তে যে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তাওয়াযূ ও বিনয়ের কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন।

# ৬৫. নির্জনে ইবাদত...

দশ বছর আগের কথা। বসন্তের এক শীতল রজনী। আমরা কয়েক বন্ধু মরুভূমির পথে চলছি। হঠাৎ আমাদের একটি গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে রাতটা মরুর বুকেই কাটাতে হলো। এখনো মনে পড়ে, আমরা আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে গোল হয়ে বসে ছিলাম। কনকনে শীতের রাতে এভাবে আগুনের পাশে বসে গল্প করা কতই না আনন্দের! গল্প চলতে থাকে অনেকক্ষণ। হঠাৎ এক বন্ধু কাউকে কিছু না বলে আমাদের মাঝ থেকে চুপিসারে উঠে গেলো।

এ বন্ধুটি ছিলো বড় নেককার ইনসান। সে নির্জনে ইবাদত করতো, করতে ভালোবাসতো। জুমার নামাযের জন্য [প্রথমে উপস্থিতির ফযীলত লাভের আশায়] সে খুব সকালে মসজিদে চলে যেতো। কখনো কখনো তো এত তাড়াতাড়ি মসজিদে উপস্থিত হতো যে, তখনো মসজিদের দরজাই খোলা হয়নি! সে আমাদের থেকে একটু দূরে গিয়ে একটি পানির পাত্র হাতে নিলো। আমি ভাবলাম, সে হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গিয়েছে। অনেক সময় কেটে গেলো, তাঁর ফিরে আসার নামগন্ধও নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম। দেখলাম, এই প্রচণ্ড শীতের রাতে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে সে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে আছে। রাতের অন্ধকারে প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় নিমগ্ন রয়েছে।

আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাঁর প্রেম ও ভালোবাসা কেবল আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহও নিশ্চয়ই তাঁর এই পাগল প্রেমিককে ভালোবাসেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো, শুধু পরকালেই নয়; পরকালের পূর্বে এই মাটির পৃথিবীতেই তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে মর্যাদা ও সম্মানের পয়গাম। এরপর কেটে গেলো বহু বছর। এখন আমরা দেখছি, আল্লাহ তাকে মানুষের মাঝে প্রভূত সম্মান দান করেছেন। সর্বত্র তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষের হিদায়াত ও দাওয়াত ইলাল্লাহ-এর কাজে তাঁর রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। ঘরে-বাইরে, বাজার-মসজিদে যেখানেই যায়, ছোট-বড় সকলেই, বরং বড়দের পূর্বে ছোটরা ছুটে আসে একটু মোসাফাহার জন্য, একটু সাক্ষাতের জন্য, হৃদয়ের সুপ্ত ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য।

জগতের ধনী, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মানুষের ভালোবাসা লাভ করার জন্য কত কিছু করে! সবাই চায়, আমরা যদি তাঁর মতো ইযযত-সম্মান পেতাম! কিন্তু কোথায় সম্মান?! কোথায় মর্যাদা?! সম্মান তো টাকার জোরে মিলে না। মর্যাদা তো ক্ষমতাবলে লাভ করা যায় না। কবির ভাষায়:

তোমার তরে নির্ঘুম আমি, নিদ্রাক্রোড়ে বিভোর তুমি!
তবুও চাও মধুর মিলন! ধন্য আশা কুহকিনী!

হ্যাঁ, পবিত্র কোরআনের ভাষ্যও তাই। আল্লাহ পাক বলেছেন:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا
আয়ে ۝৯৬ [সূরা মারইয়াম]

অর্থ: যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা। অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের হৃদয়ে তাদের প্রতি অনুপম ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, পৃথিবীবাসীর মাঝেও তাঁর ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরাঈল তাকে ভালোবাসতে থাকেন। এরপর জিবরাঈল আ. আসমানবাসী ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে মুহাব্বত করেন, তোমরাও তাকে মুহাব্বত করো।' তখন আসমানবাসী তাকে মুহাব্বত করতে থাকে।" নবীজী ﷺ বলেন, 'এরপর পৃথিবীবাসীদের অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দেয়া হয়।' ওপরের আয়াত যেন এ ঘোষণারই স্বীকৃতি দিচ্ছে।

এরপর নবীজী ﷺ বলেছেন: "আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দার প্রতি রাগান্বিত হন, জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো।' তখন জিবরাঈল তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। এরপর জিবরাঈল আ. আসমানবাসী ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা করো।' তখন আসমানবাসী তাকে ঘৃণা করতে থাকে। এরপর পৃথিবীবাসীদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ঢেলে দেয়া হয়।" [সহীহ মুসলিম: ৪৭৭২]

আল্লাহু আকবার! কী চমৎকার জীবন! আপনি বিচরণ করছেন মাটির পৃথিবীতে, সবার মতো আহার-নিদ্রা করছেন, আর আকাশের মালিক আসমান-জমিনের অধিবাসীদের ডেকে আপনার নাম নিয়ে বলছেন, 'আমি অমুককে ভালোবাসি। তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' মাটির মানুষের জন্য এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে! এর চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে!

হযরত যুবায়র বিন আওয়াম রাযি. বলেছেন, 'তোমাদের কেউ একান্তে ও গোপনে কোনো নেক আমল ও সৎ কাজ করার সুযোগ পেলে তা যেন করে ফেলে।' গোপন আমল ও ইবাদত বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন:

১. নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া। প্রতি রাতে অল্প দু-চার রাকাতই না হয় পড়ুন। এ নামায এশার পর ঘুমের আগে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে, যে কোনো সময় পড়তে পারেন। যখনই পড়ুন না কেন, আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাহাজ্জুদগুযারদের তালিকায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'আল্লাহ তাআলা বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। তাই হে কোরআনের বাহকগণ! তোমরা (নির্জন রাতে বিতিরের তিন রাকাতসহ) বেজোড় করে ইবাদত করো।'

২. মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করা। তা হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, হতে পারে দুই প্রতিবেশীর বিসংবাদ অথবা বন্ধু-বান্ধব কিংবা সহকর্মীদের বাদানুবাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: 'আমি কি তোমাদেরকে সালাত-সাওম ও সদকা হতেও উত্তম আমল সম্বন্ধে অবহিত করবো না?'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন: ‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ‘পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করা। আর পরস্পরে কলহ সৃষ্টি করাই হলো (দ্বীনকে) ধ্বংসকারী।’ [মুসনাদে আহমদ: ২৬২৩৬]

৩. আল্লাহর যিকর বেশি বেশি করা। কারণ, যে যাকে ভালোবাসে, তাকে বেশি বেশি স্মরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন: ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল সম্পর্কে অবহিত করবো না, যা তোমাদের রবের নিকট সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র আমল হিসেবে গণ্য হবে! যা তোমাদের মর্যাদাকে সবচে বুলন্দ করবে! যে আমল আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা ব্যয় করার চেয়েও উৎকৃষ্ট! জিহাদের ময়দানে দুশমনের মুখোমুখি হয়ে শহীদ হয়ে যাওয়া এবং দুশমনকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম!’ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন: ‘আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন, সেই নেক আমলটি কী?’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ‘তা হলো আল্লাহ তাআলার যিকর।’ [মুআত্তা মালিক: ৪৪১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৮০, মুসনাদে আহমদ: ২০৭১৩]

৪. গোপন ইবাদতের আরেকটি প্রকার হলো গোপনে সদকা করা। গোপনে সদকা আল্লাহর ক্রোধকে নির্বাপিত করে।

উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব খোলাফায়ে রাশেদার গোপন ইবাদতের কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রাযি. প্রতিদিন ফজর নামায পড়ে বিস্তৃত মরুভূমিতে বের হতেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে

আবার মদীনায় চলে আসতেন। এতে হযরত ওমর রাযি. বেশ অবাক হলেন। একদিন তিনি গোপনে আবু বকর রাযি.-এর পিছু নিলেন। দেখলেন, আবু বকর রাযি. মদীনা থেকে বের হয়ে মরু এলাকার পুরনো একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ওমর রাযি. একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে বিষয়টি দেখতে লাগলেন।

আবু বকর রাযি. কিছু সময় তাঁবুর ভেতরে অবস্থান করার পর বের হয়ে এলেন। ওমর রাযি. এবার পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে সোজা সেই তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, সেখানে দৃষ্টিশক্তিহীন দুর্বল এক মহিলা ছোট ছোট কয়েকটি শিশু-সন্তান নিয়ে বসবাস করে। ওমর রাযি. মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রতিদিন আপনাদের কাছে যে লোকটি আসেন, তিনি কে?'

মহিলা বললো, 'আমি তাঁর পরিচয় জানি না। শুধু এটুকু জানি, তিনি একজন মুসলমান। কয়েক দিন যাবৎ প্রত্যুষে তিনি আমাদের এখানে আসেন।' ওমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি এসে কী করেন?' মহিলা বললো, 'তিনি এসে আমাদের ঘরদোর ঝাড়ু দেন। ময়দা খামিরা করে দেন। দুগ্ধপশুর দুধ দোহন করে দেন। এরপর চলে যান।'

একথা শুনে ওমর রাযি. জনান্তিকে এই বলতে বলতে বের হলেন, 'আবু বকর! আপনার পরবর্তী খলীফাদের দায়িত্ব অনেক কঠিন করে ফেললেন! আবু বকর! আপনার পরবর্তী খলীফাদের দায়িত্ব অনেক কঠিন করে ফেললেন!' এর অর্থ এই নয় যে, ইখলাস-লিল্লাহিয়াত ও ইবাদত-বন্দেগীতে

হযরত ওমর রাযি. হযরত আবু বকর রাযি.-এর চেয়ে শত ক্রোশ পিছিয়ে ছিলেন।

একবার হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ রাযি. হযরত ওমর রাযি.-কে রাতের আঁধারে বের হয়ে যেতে দেখলেন। তিনি তাঁর পিছু নিলেন। তালহা দেখলেন, হযরত ওমর রাযি. এক ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে আরেক ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে বের হয়ে আরেক ঘরে। তালহা রাযি. অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ওমর রাযি. নির্জন রাতে এ সব ঘরে কী করতে যান? হযরত তালহা কৌতূহল বুকে চেপে রেখে কোনো মতে রাত কাটালেন। ভোর হতেই তিনি গেলেন প্রথম ঘরটিতে। গিয়ে দেখলেন, সেখানে চলৎশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিহীন এক বৃদ্ধা বসে আছে! তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতে আগন্তুক লোকটি আপনার কাছে কেন আসেন?' মহিলা বললো, 'তিনি অনেক দিন যাবৎ আমার দেখাশোনা করেন। আমার বিভিন্ন কাজ-কর্ম করে দেন। দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেন।' তালহা রাযি. বেরিয়ে এলেন আর নিজেকে শুধাতে লাগলেন, 'আরে তালহা! হায়রে পোড়া কপাল! ওমরের ভুল-ত্রুটি খুঁজতে তাঁর পিছু নিয়েছিস?!'

আরেক রাতে খলীফা ওমর রাযি. মদীনার উপকণ্ঠের দিকে বের হলেন। হঠাৎ দেখলেন, জনৈক পথিক পথের ধারে পুরনো একটি তাঁবু গেড়ে তাতেই অবস্থান করছে। অস্থির চিত্তে বসে আছে তাঁবুর দ্বারে পথিক। ওমর রাযি. লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনি?'

লোকটি বললো, 'আমি এক বেদুঈন। আমীরুল মুমিনীনের অনুগ্রহপ্রত্যাশায় মদীনায় এসেছি।' হঠাৎ ওমর তাঁবুর ভেতর থেকে একজন মহিলার মৃদু স্বরের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি লোকটিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিলো, 'ভাই! আপনি নিজ কাজে চলে যান। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।' ওমর রাযি. বললেন, 'এটা জানাও আমার কাজ। দয়া করে বলুন, কী হয়েছে?' লোকটি বললো, 'আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এ কঠিন সময়ে আমার কাছে না আছে কোনো অর্থ-সম্পদ, না কোনো আহার-দ্রব্য, না পাশে থেকে সাহায্য করার মতো কেউ।'

ওমর রাযি. দ্রুত বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী উম্মে কুলসুম [বিনতে আলী বিন আবী তালিব রাযি.]-কে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে নেক কাজে অংশগ্রহণের একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। তুমি কি তাতে অংশ নেবে?' স্ত্রী বললেন, 'কী সে কাজ?' ওমর রাযি. স্ত্রীকে সবকিছু খুলে বললেন। খলীফাপত্নী সন্তান প্রসবের কাজে প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র সঙ্গে নিলেন। আর খলীফা খাদ্যভর্তি একটি থলে, একটি হাঁড়ি ও লাকড়ির বোঝা তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। খলীফাপত্নী তাঁবুর ভেতরে মহিলার কাছে চলে গেলেন। আর ওমর এসে বসলেন লোকটির কাছে। অর্ধজাহানের খলীফা ওমর নিজ হাতে আগুন জ্বালালেন। লাকড়িতে ফুঁ দিতে লাগলেন। লাকড়ির চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে খাবার রান্না করতে লাগলেন। ধোঁয়ায় তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত অবয়ব ঢেকে গিয়েছিলো। বেদুঈন পথিক বসে বসে দেখছিলো ওমরের রান্না।

হঠাৎ তাঁবুর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনার সঙ্গীকে পুত্র-সন্তানের পিতা হওয়ার সুসংবাদ দিন।' 'আমীরুল মুমিনীন' সম্বোধন শুনেই লোকটি স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

'আপনি খলীফা ওমর বিন খাত্তাব?!'

ওমর রাযি. বললেন, 'হ্যাঁ'।

লোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। সে দ্রুত উঠে ওমর রাযি.-এর কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে বসলো। ওমর রাযি. বললেন, 'আরে বসুন, বসুন। আপন স্থানে বসে থাকুন।'

এরপর ওমর রাযি. নিজ হাতে হাঁড়িটি উঠিয়ে তাঁবুর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে ডেকে বললেন, 'বেচারীকে ভালো করে খাবার খাইয়ে দাও।' বেদুঈন মহিলার আহার শেষ হলে উম্মে কুলসুম অবশিষ্ট খাবারটুকু তাঁবুর বাইরে এনে রাখলেন। ওমর রাযি. খাবারটুকু লোকটির সামনে এনে রাখলেন এবং তাকে বললেন, 'নিন, একটু খেয়ে নিন। সারা রাতই তো জেগে ছিলেন।' ওমর রাযি. নিজের স্ত্রীকে ডেকে নিলেন। বিদায়ের সময় তিনি লোকটিকে বললেন, 'আগামীকাল আমার কাছে আসবেন। আমি আপনার উপযুক্ত ভাতা দেয়ার জন্য বলে দেবো।' আল্লাহ হযরত ওমরকে রহম করুন। তাঁর মাঝে ছিলো তাওয়াযূ ও বিনয়ের গুণ, গোপনে ইবাদতের চেতনা ও প্রেরণা। সর্বোপরি সব কিছুর পেছনে লক্ষ্য ছিলো মুহাব্বতে ইলাহী ও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. রাতের আঁধারে রুটিভর্তি থলে পিঠে তুলে নিতেন আর মদীনার অভাবী ঘরগুলোতে পৌঁছিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'নিশ্চয়ই গোপন সদকা আল্লাহর ক্রোধকে নির্বাপিত করে।' ইন্তেকালের পর লোকেরা তাঁর পৃষ্ঠদেশে কালো কালো দাগ দেখতে পেলো। সকলে বলাবলি করতে লাগলো, 'এ তো বোঝা বহনের দাগ! কিন্তু তাকে তো আমরা কখনো কুলিবৃত্তি করতে দেখিনি।' হযরত আলী রাযি.-এর ইন্তেকালের পর মদীনায় এতিম শিশু ও বিধবা মহিলাদের প্রায় শত গৃহের খাবার বন্ধ হয়ে গেলো। এসব ঘরে প্রতি রাতে খাবার পৌঁছে যেতো। এতদিন তারা জানতো না, 'কে তাদের খাবার পৌঁছিয়ে দেয়?' এখন সকলে বুঝতে পারলো, খলীফা হযরত আলী রাযি.-ই রাতের আঁধারে খাবার বহন করে তাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন। এটাই তাঁর কুলিবৃত্তি!

সালাফের জনৈক মনীষার কথা জানি, একাধারে বিশ বছর তিনি রোযা রেখেছেন। এই বিশ বছর তাঁর মামূল ও অভ্যাস ছিলো এক দিন পর পর রোযা রাখা। অথচ তাঁর পরিবারের কেউ এ সম্পর্কে কখনো জানতে পারেনি। তাঁর একটি দোকান ছিলো। সূর্যোদয়ের সময় তিনি সকাল ও দুপুরের জন্য কিছু খাবার নিয়ে দোকানে চলে যেতেন। যেদিন রোযা রাখার পালা, সেদিনের খাবার সদকা করে দিতেন। অন্য দিনটি নিজে খেয়ে নিতেন। সূর্যাস্তের পর বাড়িতে ফিরে পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খেতেন।

হ্যাঁ, তাঁরাই ছিলেন মুত্তাকী। তাঁরাই ছিলেন আল্লাহভীরু। সর্বাবস্থায় তাঁরা আল্লাহর উবূদিয়্যাত ও প্রভুত্ব এবং নিজেদের আবদিয়াত ও দাসত্বের অনুভূতি হৃদয়ে লালন করতেন। মুত্তাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣﴾

[সূরা নাবা]

অর্থ: নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। রয়েছে উদ্যানরাজি ও আঙুরগুচ্ছ। সমবয়স্কা নবযৌবনা তরুণী। কানায় কানায় পূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা না কোনো অনর্থক কথা শ্রবণ করবে, আর না কোনো মিথ্যা কথা। এসবই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরস্কার, (আল্লাহর) এমন দান, যা মানুষের কর্ম হিসেবে দেয়া হবে।

তাই আপনি স্রষ্টার ভালোবাসা অন্বেষণ করুন। আর মানব হৃদয়ের ভালোবাসা! সৃষ্টিকুলের হৃদয়জমিনে আপনার ভালোবাসার বীজ বপণের দায়িত্ব তিনিই নেবেন।

**চেতনায় আলো...** অন্যদের সৌজন্য-ভালোবাসা যেন আপনার লক্ষ্য না হয়; সৌজন্য-ভালোবাসার সঙ্গে তাদের আন্তরিক ভালোবাসাও যেন অর্জিত হয়।

# ৬৬. অন্যকে বিব্রতকর পরিস্থিতি হতে রক্ষা করুন

জনসম্মুখে হঠাৎ একজন আপনাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে বসলো কিংবা আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, চলা-ফেরার ধরণ ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনাকে উপহাস করলো। অপমানে, লজ্জায় আপনার চেহারা লাল হয়ে গেলো। অবয়বে ফুটে উঠলো বিষাদের কালো ছায়া।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ একজন আপনার পাশে দাঁড়ালো। আপনার পক্ষ হয়ে প্রতিউত্তর দিয়ে অপমানকারীর মুখ বন্ধ করে দিলো। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আপনার মন ভরে গেলো। আপনার মনে হলো, প্রথমজন আপনাকে নির্মমভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছিলো অতল গর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে সে এসে আপনাকে আসন্ন পতন হতে উদ্ধার করলো। কখনো কি এমন হয়নি?

এ অভিজ্ঞতাটি আপনি অন্যদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। অবশ্যই আপনি এর জাদুকরী প্রভাব প্রত্যক্ষ করবেন।

একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন—

আপনি কারো বাসায় বেড়াতে গেলেন। গৃহকর্তার ছোট্ট ছেলেটি আপনার জন্য নাশতার প্লেট নিয়ে এলো। মেহমান আগমনের আনন্দে হোক, কিংবা তাড়াহুড়ার কারণে হোক; প্লেটটি তার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্তা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এত তাড়াহুড়া কেন? এইটুকু কাজ করতে পারো না? কত বার তোমাকে শেখাতে হবে?'

হঠাৎ বিস্ফোরণে ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। তার মনের আনন্দ নিমিষেই বিষাদে পরিণত হলো। এমন সময় আপনি বলে উঠলেন, 'আরে না, কী বলছেন? ও তো মাশাআল্লাহ মর্দে মুজাহিদ! এ সবকিছু ও একাই আনতে পারে। হয়তো কোনো কারণে একটু তাড়াহুড়া করে ফেলেছে।'

ছোট্ট এই অনুগ্রহে ছেলেটির মন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে যাবে। সে কোনো দিন আপনার এই অনুগ্রহের কথা ভুলবে না।

অবুঝ বালক যদি এরূপ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হতে পারে; চিন্তা করে দেখুন, বড়দের সঙ্গে এরূপ আচরণ হলে তার ফলাফল কিরূপ হবে?

- আপনার এক সহকর্মীকে সবাই মিলে তিরস্কার করছে। আপনি তাদের সামনেই সহকর্মীর বিভিন্ন গুণের প্রশংসা করলেন।
- পরিবারের সবাই মিলে আপনার এক ভাইকে তিরস্কার করছে। কিন্তু আপনি তার কিছু প্রশংসা করলেন।
- জনৈক যুবককে কেউ জনসম্মুখে বিড়ম্বনায় ফেলে দিলো। সে তাকে প্রশ্ন করলো, 'ভার্সিটিতে তোমার রোল কত?' আচ্ছা বলুন, বিবেকবান কোনো মানুষ মানুষের সামনে এ জাতীয় বিষয় জিজ্ঞেস করে?! আপনি প্রশ্নকর্তাকে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'জনাব! আপনি তার ভার্সিটির রেজাল্ট জানতে চাচ্ছেন কেন? তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন? নাকি আপনার কাছে তার জন্য কোনো চাকুরির সন্ধান আছে?' আপনার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলো এবং একটু পূর্বের সেই বিব্রতকর প্রশ্নের কথা সবাই ভুলে গেলো।

- একজনকে কেউ তার ফলাফল নিয়ে তিরস্কার করলো। আপনি তখন তিরস্কারকারীকে বুঝিয়ে বললেন, ‘ভাই! বেচারাকে বকবেন না। তার এবারের বিষয়টি খুবই কঠিন। ইনশাআল্লাহ, আগামী সেমিস্টারে সে আরো ভালো করবে।’

মনে রাখবেন, হঠাৎ হঠাৎ মানুষের হৃদয় জয় করার বিভিন্ন সুযোগ সামনে আসে। বুদ্ধিমানেরা সেগুলো কাজে লাগান। কবি বলেন—

বাতাস যখন অনুকূলে তব লাগাও সুযোগ কাজে
দ্রুত চালাও বৈঠা মাঝি, শান্ত নদীর মাঝে।
সজাগ থেকো, সুযোগ কিন্তু হঠাৎ করেই আসে
ফুড়ুৎ করেই উড়াল দেবে, কাঁদবে তখন বসে।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি গাছ পড়লো। নবীজী মিসওয়াক বানানোর জন্য তাকে গাছে উঠে একটি ডাল কেটে আনতে বললেন। তিনি গাছে উঠে ডাল কাটতে লাগলেন। ইতোমধ্যে বাতাস এসে তাঁর পায়ের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিলো এবং উভয় পায়ের নলা প্রকাশ পেয়ে গেলো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। তাঁর পায়ের নলা ছিলো তুলনামূলক একটু ছোট ও চিকন। উপস্থিত সকলে তাঁর এই ছোট ছোট নলা দেখে হেসে দিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমরা হাসলে কেন? তাঁর ছোট ছোট নলা দেখে?

যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! তাঁর এ নলা দু'টি মিযানের পাল্লায় ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী।' [মুসনাদে আহমদ: ৩৭৯২]

**দৃষ্টিভঙ্গি**

হঠাৎ হঠাৎ মানুষের হৃদয় জয় করার বিভিন্ন সুযোগ সামনে আসে। বুদ্ধিমানেরা সেগুলো কাজে লাগান। সকলের বিদ্রূপাত্মক হাসি শোনার পর নবীজীর মুখে এর প্রতিবাদ এবং নিজের প্রশংসা শোনার পর আবদুল্লাহ বিন মাসউদের কেমন অনুভূতি হয়েছিলো?

# ৬৭. বাহ্যিক বেশভূষায় সচেতন হোন

ইমাম আবু হানীফা রহ. একদিন মসজিদে বসে ছাত্রদেরকে দরস দিচ্ছিলেন। তখন তাঁর হাঁটুতে কিছুটা ব্যথা ছিলো। তাই তিনি পা দু'টো একটু ছড়িয়ে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি তাঁর দরসে উপস্থিত হলেন। পরনে তাঁর সুন্দর পরিপাটি পোশাক। মাথায় সুন্দর পাগড়ি। আগন্তুকের অবয়বে গাম্ভীর্যভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। ধীর কদমে, ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে হেঁটে আসছিলেন তিনি।

উপস্থিত ছাত্ররা তাকে জায়গা করে দিতে লাগলো। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একদম কাছে এসে বসলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. তার বাহ্যিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব ও গম্ভীরতা লক্ষ্য করে এভাবে পা ছড়িয়ে বসতে বিব্রতবোধ করলেন এবং প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও পা গুটিয়ে বসলেন।

আবু হানীফা রহ. দরস দিচ্ছেন, আগন্তুক গভীর মনোযোগে শুনছেন সবকিছু। একসময় দরস শেষ হলো। দরস শেষে ছাত্ররা ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। আগন্তুক ব্যক্তিটিও প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে হাত উঠালেন। আবু হানীফা রহ. তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন, আপনার কী প্রশ্ন?'

তিনি বললেন, 'হযরত! মাগরিবের সময় শুরু হয় কখন?'
ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, 'সূর্য যখন অস্ত যায়!'
'আচ্ছা, যদি রাত হয়ে যায় অথচ সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, এমতাবস্থায়

আমরা কী করবো?'

আবু হানীফা রহ. বললেন, 'আবু হানীফার পা ছড়িয়ে বসার সময় এসে গেছে!'

এ কথা বলে তিনি পা ছড়িয়ে বসলেন। তিনি এ অসংগতিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বললেন না। কারণ, রাত এসে যাবে অথচ সূর্য অস্ত যাবে না, তা কীভাবে সম্ভব?!

মনস্তত্ত্ববিদগণ বলে থাকেন, প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ছবির ৭০% গেঁথে যায়। [এবং এর ভিত্তিতে আপনার সম্পর্কে তার মনে একটি ধারণা তৈরি হয়।] বরং একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ছবির ৯৫% গেঁথে যায়। পরবর্তীতে কথাবার্তা ও পরিচয় হওয়ার পর এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

আপনি হেঁটে হেঁটে হাসপাতাল বা অফিসে যাচ্ছেন। আপনার পাশেই পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছে। তার চলন-ভঙ্গিমায় পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে। পথের শেষে ভবনে প্রবেশের দরজায় পৌঁছে দেখবেন, আপনি হয়তো অবচেতন মনেই তাকে সৌজন্যমূলক কিছু বলে নিজের গন্তব্যে যাচ্ছেন। [কারণ, প্রথম দর্শনেই আপনার মস্তিষ্কে তার সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ধারণা তৈরি হয়েছে।]

পক্ষান্তরে আপনি আপনার এক বন্ধুর গাড়িতে চড়লেন। উঠেই দেখতে পেলেন সবকিছু কেমন এলোমেলো। একপাটি জুতা একপাশে ফেলে রাখা। ওখানে কী একটা পড়ে আছে। হাতরুমাল, ক্যাসেটের ফিতা বিক্ষিপ্তভাবে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তাৎক্ষণিকভাবে আপনার মনে এ ধারণাই তৈরি হবে যে, এ তো যথেষ্ট অগোছালো স্বভাবের, পরিপাটি চলার মেজাজ এর নেই। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাধারণ চলা-ফেরা দেখেও আমাদের মনে এ জাতীয় বিভিন্ন ধারণা তৈরি হয়ে থাকে।

আমি মূলত বাহ্যিক বেশভূষার ক্ষেত্রে পরিপাটি চলার গুরুত্ব বোঝাতে চাচ্ছি। আমি পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি-বাড়ি ও আসবাবপত্রের বাহুল্য ও প্রদর্শনীর কথা বলছি না। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। রাসূলের সুন্দর একজোড়া কাপড় ছিলো। দুই ঈদ ও জুমার দিন তিনি তা পরিধান করতেন। বহিরাঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পরিধানের জন্য ছিলো ভিন্ন আরেকজোড়া কাপড়।

বাহ্যিক পরিপাটি ও সুগন্ধি ব্যবহারে নবীজী যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী। ঘামের ফোঁটাগুলো মোবারক শরীরে মুক্তোদানার মত চকচক করতো। তিনি হাঁটার সময় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলতেন। নবীজীর হাতের তালুর চেয়ে কোমল কোনো রেশমী বস্ত্র আমি স্পর্শ করিনি। রাসূলের শরীরের সুঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুরভিত কোনো মিশক-আম্বরের ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করিনি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারক সদা সুবাসিত থাকতো, যেন এইমাত্র আতর ব্যবসায়ীর থলে স্পর্শ করেছে। ছড়িয়ে পড়া

সুঘ্রাণে অনুভব করা যেত যে, নবীজী এদিকেই আসছেন। হযরত আনাস রাযি. আরো বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না।'

নবীজী ছিলেন সৃষ্টিকুলের মাঝে সুন্দরতম অবয়বের অধিকারী। সবসময় তা সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল থাকতো। আনন্দঘন মুহূর্তগুলোতে তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, মনে হতো যেন স্নিগ্ধ আলোকময় এক টুকরো চাঁদ। হযরত জাবের বিন সামুরা রাযি. বলেন, 'জোৎস্নাভরা এক পূর্ণিমা-রাতে আমি রাসূলের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম। আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের দিকে তাকাচ্ছিলাম, একবার পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। নবীজীর পরনে ছিলো [ডোরাকাটা] একটি লাল বর্ণের চাদর। নবীজীকে আমার কাছে চাঁদের চেয়েও সুন্দর মনে হচ্ছিলো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকেও বাহ্যিক বেশভূষা ও চাল-চলনে পরিশীলিত থাকতে বলতেন। হযরত আবুল আহওয়াস রাযি. বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমার পরনে ছিলো একটি নিম্নমানের চাদর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'তোমার কি কোনো ধন-সম্পদ নেই?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কী আছে?'

আমি বললাম, 'ক্রীতদাস আছে; আছে ঘোড়া, মেষ, গাভী ইত্যাদিও।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন, তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহের প্রকাশ যেন তোমার মাঝে থাকে।' তিনি আরো বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যাকে নেয়ামত দিয়েছেন, তার থেকে প্রদত্ত নেয়ামতের প্রকাশ দেখতে ভালোবাসেন।'

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে এলেন। তিনি এলোমেলো কেশধারী এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, 'সে কি তার চুল পরিপাটি করে রাখার জন্য কিছু পাচ্ছে না!' আরেক ব্যক্তিকে অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিহিত দেখে নবীজী বললেন, 'সে কি তার কাপড় ধোয়ার মত পানি পায় না!' নবীজী আরো বলেছেন, 'যার চুল আছে, সে যেন তার কদর করে।' [অর্থাৎ সে যেন চুল পরিপাটি করে রাখে।]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাল-চলনের শালীনতা, পোশাক ও অবয়বের সৌন্দর্য-পরিপাটি এবং সুগন্ধি ব্যবহার—ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগী ও যত্নশীল ছিলেন। বিভিন্ন মজলিসে নবীজী প্রায়ই বলতেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।' [সহীহ মুসলিম: ১৩১]

**অভিজ্ঞতা**

প্রথম দর্শনেই দর্শকের মস্তিষ্কে আপনার ছবির ৭০% গেঁথে যায়।

# ৬৮. সত্যবাদী হোন

মনে পড়ে, একদিন আমি পরীক্ষার হলে ছাত্রদের পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলাম। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাসূচীর চাপ ও হার্ড সিডিউলের কারণে আমরা ছুটির দিনই পরীক্ষা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পর এক ছাত্র উপস্থিত হলো। বেচারাকে বেশ অস্থির মনে হচ্ছিলো। আমি তাকে বললাম, 'দুঃখিত, তুমি দেরি করে এসেছো। আমি তোমাকে পরীক্ষার হলে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবো না।' সে জড়োসড়ো হয়ে ভাবে-ভঙ্গিতে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেরি হলো কেন?'

সে বললো, 'প্রফেসর! বিশ্বাস করুন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' ছেলেটির সততা আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি বললাম, 'আচ্ছো, এসো।' ছাত্রটি হলে ঢুকে পরীক্ষা দিতে লাগলো।

এর কয়েক মিনিট পর আরেকজন ছাত্র এলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, দেরি হলো কেন?' ছাত্রটি বললো, 'প্রফেসর! বিশ্বাস করুন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট ছিলো। এত জ্যা--ম! আপনি তো জানেন, সকাল বেলা সব মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। কেউ যাচ্ছে অফিসে। আবার কেউ কারখানায়। এভাবে সে আমার সামনে মানুষের ব্যস্ততার এক লম্বা ফিরিস্তি তুলে ধরতে লাগলো। আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইলো যে, আসলেই রাস্তায়

প্রচণ্ড যানজট ছিলো। বেচারা ভুলেই গেছে যে, আজ চাকুরিজীবীদের ছুটির দিন। হয়তো আজ রাস্তায় আমাদের ছাত্ররা ছাড়া আর কেউই ছিলো না।

আমি তাকে বললাম, 'তার মানে—রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট, গাড়িতে যেন রাস্তা ভরে গেছে, তাই না?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, প্রফেসর! একেবারে ঠিক বলেছেন। সুবহানাল্লাহ! আপনি প্রত্যক্ষদর্শীর মত এমনভাবে বললেন, যেন পুরো পথ আমার সঙ্গেই ছিলেন!'

আমি বললাম, 'আরে প্রতারক! মিথ্যা যদি বলবেই, একটু গুছিয়ে তো বলো!'

'আরে ভাই! আজ তো বৃহস্পতিবার, ছুটির দিন। এ দিন না কোনো অফিস খোলা থাকে, না চাকুরিজীবীদের ব্যস্ততা থাকে। তাহলে যানজট আসবে কোত্থেকে?!'

সে বললো, 'ওহ প্রফেসর! ভুলেই গিয়েছিলাম। ইয়ে... মানে... গাড়ির একটা টায়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ওটা ঠিক করতে দেরি হলো বলেই...' মিথ্যা সাজাতে গিয়ে বেচারা খুব জটিলতায় পড়ে গেলো। তার অস্থিরতা দেখে আমি হেসে ফেললাম। এরপর সেও পরীক্ষা দিতে হলে প্রবেশ করলো।

এভাবে মানুষের কাছে নিজের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যাওয়া বড় লজ্জার, বড় নিকৃষ্ট একটি বিষয়। মিথ্যা আপনাকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে

দেবে। মানুষের কাছ থেকে আপনার সততা হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে আপনার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। কেউ কোনো বিপদে পড়লে আপনার কাছে প্রকাশ করবে না, আপনার সাহায্য চাইবে না। আপনি কিছু বললে তা আন্তরিকতার সঙ্গে শুনবে না।

মিথ্যা কত নিকৃষ্ট স্বভাব! কত গর্হিত বিষয়! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনকে সব স্বভাবগুণ দান করা হয়েছে, কেবল খেয়ানত ও মিথ্যা ছাড়া। [মুসনাদে আহমদ: ২১১৪৯] একবার নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুমিন কি কখনো ভীরু হয়?' নবীজী বললেন, 'হতে পারে'। জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুমিন কি কখনো কৃপণ হয়?' নবীজীর উত্তর, 'হ্যাঁ, হতে পারে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'মুমিন কি কখনো মিথ্যুক হয়?' নবীজী বললেন, 'না, মুমিন কখনো মিথ্যুক হতে পারে না।' [মুআত্তা মালিক: ১৫৭১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. বলেন, একবার আমার মা আমাকে ডাকলেন। নবীজী তখন আমাদের ঘরেই বসা ছিলেন। মা আমাকে বললেন, 'এদিকে এসো! তোমাকে একটি জিনিস দেবো।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তাকে কী দিতে চাচ্ছো?' আমার মা বললেন, 'আমি তাকে একটি খেজুর দেবো।' নবীজী বললেন, 'তুমি যদি তাকে কিছুই না দিতে, [কেবল কাছে ডাকার জন্য তাকে এ কথা বলতে], তাহলে তোমার আমলনামায় মিথ্যার একটি গুনাহ লেখা হতো।' [সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৩৯] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি

জানতেন যে, নিজ পরিবারের কারো সম্বন্ধে সে মিথ্যা বলেছে তাহলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন।

অনেক সময় মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নেয় নিজেকে অন্যের সামনে বড় করে প্রকাশ করতে। তাই কখনো সে রচনা করে নিজেকে নিয়ে সাহসিকতার উপাখ্যান! কখনো বিশাল আবিষ্কারের দাস্তান! কখনো মিথ্যায় রাঙিয়ে বাড়ায় ঘটনার আকর্ষণ। আর কখনো নিজেকে তুলে ধরে অনেক যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে, যেন সবজান্তা শমসের! সব গুণের ডিপো! মিথ্যুকের আরো একটি স্বভাব হলো সে এখন ওয়াদা করবে, একটু পরেই তা ভঙ্গ করবে। যখন কোনো জটিলতায় পড়ে যাবে, বিভিন্ন রকম ওযর-আপত্তি নিয়ে হাজির হবে। অবশ্য একটু পরেই মানুষের সামনে তার এই ভাওতাবাজি প্রকাশ পেয়ে যায়।

সততা রক্ষায় ওলামায়ে কেরাম কতটা সচেতন ছিলেন, তার দৃষ্টান্তরূপে প্রখ্যাত তাবেয়ী হাদীস শাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত ইমাম যুহরী রহ. [১২৫ হি.]-এর একটি ঘটনা শুনুন। একদিন তিনি বাদশাহর কাছে গেলেন। তারপর কোনো একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। বাদশাহ বলে উঠলো, 'ইমাম সাহেব! আপনি তো মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে ইমাম যুহরী গর্জে উঠলেন, 'আল্লাহর পানাহ! আমি মিথ্যা বলবো! আল্লাহর কসম! আসমান থেকে কোনো ফিরেশতাও যদি ঘোষণা করতো যে, মিথ্যা বলা জায়েয; তবুও তো আমি মিথ্যা বলতাম না। আর মিথ্যা বলা হারাম অবস্থায় আমি মিথ্যা বলবো!'

**বাস্তবতা**

মিথ্যা তো মিথ্যাই। মিথ্যার রঙ সবসময়ই কালো। তাই কেউ কেউ আপনাকে ধোঁকা দেবে, বলবে, এটা তো নির্দোষ মিথ্যা! একেবারে ক্লীন! এতে কোনো সমস্যা নেই!

# ৬৯. সাহসী হোন

একদিন আমরা এক দাওয়াত থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ জনৈক বন্ধু আমাকে বললো, 'বিশ্বাস করো, তোমরা যে সাহাবীর ঘটনা আলোচনা করছিলে কিন্তু তার নাম স্মরণ করতে পারছিলে না, আমি তার নাম জানতাম।' আমি বললাম, 'আশ্চর্য! তাহলে তখন তার নাম বলোনি কেন? তুমি তো দেখেছো, বিষয়টা নিয়ে আমরা বেশ পেরেশান ছিলাম।' সে মাথা নিচু করে বললো, 'আমি কথা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম।' আমি মনে মনে বললাম, 'ধিক তোমার কাপুরুষতাকে!'

আরেক বন্ধু আমার সঙ্গে মাধ্যমিক শেষ বর্ষে পড়তো। সেসময় একদিন তার সঙ্গে দেখা হতেই সে বললো, 'আমি দু'দিন আগে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, ছাত্ররা সকলে নীরব। শিক্ষকও চেয়ারে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। আমি আমার সিটে বসে পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? সে বললো, আমাদের এক সহপাঠী "আসসাফ" গত রাতে মারা গেছে। [আল্লাহ তার প্রতি দয়ার আচরণ করুন।] আমাদের শ্রেণীতে আসসাফের অনেক বন্ধুই আছে যারা ঠিকমত নামায আদায় করতো না, বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতো। আমি এই দুঃসংবাদ তাদের মাঝেও সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো। আমার খুব ইচ্ছা হলো, তাদেরকে এ পরিবেশে কিছু উপদেশমূলক কথা বলি; যেন তারা নামায আদায়ে, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারে এবং আত্মসংশোধনে উদ্বুদ্ধ হয়।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভালো, মাশাআল্লাহ! তো তুমি তা বলেছো?' সে সরাসরি বললো, 'না, আমি কিছুই করতে পারিনি। আমার তখন খুব লজ্জা করছিলো। তাই আমি নীরব ছিলাম।' তার কথা শুনে আমি নীরবে শুধু আমার ক্রোধ দমন করলাম, আর মনে মনে বললাম, 'ধিক তোমার কাপুরুষতাকে!'

কোনো মহিলাকে আপনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আপনার স্বামীর কাছে বিষয়টি খুলে বলেননি কেন?' সে বলবে, 'আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, তিনি হয়তো রেগে যাবেন। হয়তো আমাকে ছেড়ে দেবেন। হয়তো...।' ধিক এই ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে!

কোনো যুবককে প্রশ্ন করলেন, 'সমস্যাটি গুরুতর হওয়ার পূর্বে তোমার পিতাকে জানাওনি কেন?' তখন সে বলবে, 'আমার সাহস হয়নি। ভয় করছিলো।' কখনো কখনো এ কথা শুনে অস্থির হবেন যে, 'আমার হাসতে খুব লজ্জা হয়। তার প্রশংসা করতে আমার দ্বিধা লাগে। আমার ভয় হয়, মানুষ বলবে, অমুক ব্যক্তি কৃত্রিম ভদ্রতা দেখায়। মানুষের সামনে কেবল ভদ্রতার অভিনয় করে।'

আমি এ ধরণের কথা জীবনে বহু শুনেছি। আমার ইচ্ছে করে চিৎকার করে বলি, 'হে কাপু-রু-ষে-রা! আর কত কাল এভাবে কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে?!' কাপুরুষ কোনোদিন মহত্ত্ব স্থাপন করতে পারে না। সে সর্বদা পেছনেই থাকে। শূন্য তার অর্জন, শূন্য তার অবদান। কোনো সভা-মিটিংয়ে উপস্থিত হলে সে এক কোণে লুকিয়ে থাকে। সে কোনো অভিমত পেশ

করে না, নীরব বসে থাকে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হলে অন্যরা হাসিমুখে তাতে অংশ নেয়, বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করে, আর সে মাথা নিচু করে কেবল মুচকি হাসে। কোনো সভা-সমিতিতে সে উপস্থিত হলে কেউ তার উপস্থিতি সম্পর্কে জানতেই পারে না। এর চাইতেও করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয় যদি সে হয় একজন পিতা, স্বামী বা একজন পরিচালক, অথবা কারো স্ত্রী-জননী।

কাপুরুষকে সকলে ঘৃণা করে। মানুষের কাছে তার কোনো মর্যাদা নেই। তাই নিজেকে উপস্থাপনায় আপনি সাহসিকতার অনুশীলন করুন। সাহসী হোন কথায়, উপস্থাপনায়। সাহসী হোন অন্যের কল্যাণকামনায়। সাহসী হোন মানুষের সঙ্গে আচরণ ও উচ্চারণ-দক্ষতা প্রয়োগে। ঝেড়ে ফেলুন সব দ্বিধা, সব সংশয়।

**দৃষ্টিভঙ্গি**

ধৈর্য সহকারে আচরণদক্ষতার অনুশীলনে অভ্যস্ত হোন। বস্তুত বিজয় হলো সামান্য সময়ের ধৈর্যের নাম।

# ৭০. আপন নীতিতে অটল থাকুন

কেউ যখন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় এবং আপন নীতিতে অটল থাকে, তা তাঁর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—ঘুষ গ্রহণ না করা আপনার নীতি। অতএব, আপনার চারপাশের লোকেরা নাম পরিবর্তন করে হাদিয়া, বকশিশ বা কমিশনের নামে আপনাকে তা গেলাতে চাইলেও আপনি আপন নীতিতে অটল থাকুন।

একজন আদর্শ স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা না বলা অনেক স্ত্রীর নীতি। সুতরাং অন্যরা যতই মিথ্যাকে কার্যকর বলে অভিহিত করুক, পরিস্থিতির দাবি বলে প্ররোচিত করুক, স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা বলাকে নির্দোষ মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করুক—স্ত্রীর কর্তব্য হলো আপন নীতিতে অটল থাকা। আমাদের জীবনের এমনই কিছু নীতি হলো—বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক না রাখা, মদ পান না করা ইত্যাদি। অধূমপায়ী ব্যক্তি যখন তাঁর সাথীদের সঙ্গে বসে, তখন সে যেন আপন নীতিতে অটল থাকে। বন্ধুদের সঙ্গদোষে সে যেন আপন নীতি হতে বিচ্যুত না হয়।

নীতিতে অটল ব্যক্তির সঙ্গীরা যদিও কখনো মুখে মুখে তাঁর নিন্দা ও সমালোচনা করে, সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না বলে গাল দেয়, কিন্তু তাদের মন-মস্তিষ্কের সার্বক্ষণিক অনুভূতি হলো—আমাদের এ বন্ধু একজন আদর্শ মানুষ। নিজ মত ও পথে অটল একজন সাহসী মানুষ। আর তাই দেখবেন, কোনো বিপদে পড়লে তারা সাধারণত তাঁর কাছেই আশ্রয় খোঁজে।

ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর সঙ্গেই পরামর্শ করে। অন্য সঙ্গীদের চেয়ে তাঁকে অধিক গুরুত্ব দেয়।

এ কথা কেবল পুরুষ, মহিলা বা কোনো বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে নয়, বরং সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য। অতএব আপনি আপন নীতিতে অটল থাকুন। কখনোই নীতি হতে বিচ্যুত হবেন না। আজ কিংবা কাল—একসময় অবশ্যই অন্যরা আপনাকে স্বীকৃতি দেবে। আপনাকে তাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে স্থান দেবে।

মক্কা বিজয়ের পর মানুষের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার হলো এবং ইসলামের শান-শওকত ছড়িয়ে পড়লো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করলো। এরই ধারাবাহিকতায় এলো সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের সদস্যসংখ্যা ছিলো তেরোজন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন, যেন তারা কোরআনে কারীম শ্রবণ করতে পারে।

তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সুদ, যিনা ও মদের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জানালেন যে, এগুলো হারাম। তাদের বিশেষ একটি মূর্তি ছিলো। বাপ-দাদার যুগ থেকেই তারা সেই মূর্তির উপাসনা করতো। মূর্তিটির নাম ছিলো ‘রাব্বা’। আর তারা একে ডাকতো ‘তাগিয়া’ বলে। তারা এই মূর্তির শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী রচনা করে বলে বেড়াতো। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ‘রাব্বা’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, ‘এটির ব্যাপারে কী করা?’

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই বললেন, 'তোমরা তা ভেঙে ফেলো।' এক কথা শুনে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'অসম্ভব! "রাব্বা" যদি জানতে পারে যে, আপনি তাকে ভাঙতে চাচ্ছেন, তাহলে সে আপনার পরিবারের লোকজনকেও অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলবে!'

হযরত ওমর রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মূর্তি ভাঙতে তাদের দ্বিধা-সঙ্কোচ ও ভয় পেতে দেখে তিনি অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'হে সাকীফ গোত্র! শত ধিক তোমাদের! তোমরা এখনো এই মূর্খতাপূর্ণ বিশ্বাস লালন করছো? আরে! "রাব্বা" তো কয়েকটি পাথরের টুকরা মাত্র। এটি মানুষের লাভ-ক্ষতি কিছুই করতে পারে না।' হযরত ওমরের কথা শুনে তারা রেগে গেলো। তারা বললো, 'খাত্তাবের বেটা! আমরা তো তোমার কাছে আসিনি।' তাদের এ কথা শুনে হযরত ওমর রাযি. চুপ হয়ে গেলেন।

তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। তবে আমাদের একটা শর্ত আছে। তাগিয়াকে আমরা আরো তিন বছর রাখবো। তারপর আপনি চাইলে সেটা ভেঙে ফেলতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখলেন, তারা আকীদা-বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ে নমনীয়তা চাচ্ছে। অথচ একজন মুসলমানের জীবনে তাওহীদ ও একত্ববাদই হলো সবচে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একত্ববাদই ইসলামের মূল। তাই যারা মুসলিম পরিচয় ধারণ করবে, মূর্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রাখার দাবি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'না'।

তারা বললো, ‘তাহলে কেবল দু' বছর রাখুন। তারপর না হয় ভেঙে ফেলুন।’ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ‘না’। তারা বললো, ‘তাহলে অন্তত এক বছর রাখুন।’ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ‘না’। তারা বললো, ‘তাহলে কেবল এক মাস রাখার অনুমতি দিন।’ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ‘না’।

তারা যখন দেখলো, নবীজী তাদের মূর্তি রাখার দাবি কিছুতেই মেনে নিচ্ছেন না, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, এটা মূলত শিরক ও ঈমানের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোনো ছাড় নেয়ার সুযোগ নেই। তারা বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনিই তা ভেঙে ফেলার দায়িত্ব নিন। আমরা কখনোই তা ভাঙতে পারবো না।’ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ‘ঠিক আছে। আমিই ভাঙার জন্য তোমাদের এলাকায় লোক পাঠাবো।’

তারা বললো, ‘আরেকটি কথা, আমরা নামায পড়তে চাই না। কেউ তার নিতম্বকে মাথার ওপরে উঠাবে, এটাকে আমরা খুবই ঘৃণা করি।’ অর্থাৎ প্রচণ্ড অহংবোধের কারণে তারা এতে রাজি নয় যে, সেজদার সময় শরীরের পেছনের অংশ মাথার ওপরে উঠে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ‘নিজ হাতে মূর্তি ভেঙে ফেলার বিষয়টি না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু নামায! নামায ছাড়া দ্বীন তো কল্যাণহীন দ্বীন।’ তারা বললো, ‘ঠিক আছে, অপমানকর হলেও অচিরেই আমরা আপনার এ হুকুম দু'টি পালন করবো।’

এরপর তারা রাসূলের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হলো এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো। তারা আপন সম্প্রদায়ের লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলে অনেকটা নিমরাজি হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিছুদিন পর

কয়েকজন সাহাবী মূর্তি ভাঙার জন্য তাদের এলাকায় গেলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ, মুগীরা বিন শো'বা সাক্বাফী প্রমুখ।

সাহাবীগণ মূর্তি ভাঙতে গেলে সাকীফের লোকেরা ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে গেলো। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে বের হয়ে এলো মূর্তির অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে। তাদের স্থির ধারণা ও বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো যে, কিছুতেই এটাকে ভাঙা যাবে না। মূর্তিই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

মুগীরা বিন শো'বা দাঁড়ালেন। কুঠার হাতে নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গী সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, ‘আমি সাকীফ গোত্রের সঙ্গে একটু রসিকতা করে আপনাদের আনন্দ দেবো।’ মুগীরা বিন শো'বা মূর্তির দিকে অগ্রসর হলেন এবং মূর্তিটিকে কুঠার দিয়ে আঘাত করতেই ভূপাতিত হয়ে গেলেন। তিনি ক্রমাগত মাটিতে পা ছুঁড়তে লাগলেন। মুগীরাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সাকীফ গোত্রের লোকেরা চিৎকার করতে লাগলো। তারা নতুন করে আশায় বুক বাঁধলো। তারা বললো, ‘আল্লাহ মুগীরাকে ধ্বংস করুন। রাব্বার অভিশাপে অচিরেই সে ধ্বংস হোক।’ তারা মুগীরার সঙ্গে আসা অন্যান্য সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘তোমাদের কারো সাহস থাকলে যাও না রাব্বার কাছে!’

এ সময় মুগীরা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘আরে সাকীফ গোত্র! শত ধিক তোমাদের প্রতি! আমি তো রসিকতা করেছি! তোমাদের রাব্বা তো পাথর ও মাটির গড়া একটি মূর্তিই মাত্র। তোমরা মূর্তির ভয় ছেড়ে দাও। আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তা গ্রহণ করো। কেবল তাঁরই ইবাদত

করতে থাকো।' এরপর তিনি একটি একটি করে মূর্তির সবগুলো পাথর ভেঙে ফেলতে লাগলেন। তাঁকে দেখে অন্যরাও মূর্তি ভাঙতে লাগলো। অসার বিশ্বাসের প্রতীক মিশে গেলো মাটির সঙ্গে।

**নববী বাণী...**

'যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন, আর তিনি মানুষকেও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। আর যে মানুষের অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্যই বলেছেন।

# ৭১. প্রলোভনের হাতছানি

আমি একবার একটি সংবাদ পড়লাম। ব্রিটেনের জনৈক মুসলিম যুবকের ঘটনা। একবার সে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংবাদ শুনলো। একটি কোম্পানি পাহারা দেয়ার কাজে কিছু লোক নিয়োগ দেবে। চাকুরিপ্রার্থীদের সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়ে সে দেখতে পেলো, মুসলিম-অমুসলিম অনেক চাকুরিপ্রার্থীই সেখানে ইন্টারভিউয়ের জন্য এসেছে।

তারা একে একে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করতে থাকে। যখনই সাক্ষাৎ শেষে কেউ বেরিয়ে আসছিলো, অপেক্ষারত ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞাসা করছিলো, 'ভাই! আপনাকে কী জিজ্ঞেস করলো?', 'আপনি কী উত্তর দিলেন?' চাকুরিপ্রার্থীদের কাছে ইন্টারভিউ কমিটির সবচে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো, 'দৈনিক কয় গ্লাস মদ পান করো?'

একপর্যায়ে সেই মুসলিম যুবকের পালা এলো। সে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং তাকেও একের পর এক প্রশ্ন করা হলো। অবশেষে তারা তাকে প্রশ্ন করলো, 'দৈনিক কত গ্লাস মদ পান করো?' যুবকটি দ্বিধায় পড়ে গেলো। সে কি মিথ্যা বলবে এবং দাবি করবে যে, অন্যান্য যুবকদের ন্যায় সেও মদ পান করে? যেন তারা এ কথা না বলতে পারে যে, তুমি তো কট্টর মুসলমান। নাকি সে সত্য বলবে যে, 'আমি মুসলমান। আর মুসলমান কিছুতেই মদ পান করতে পারে না। আল্লাহ আমার ওপর মদ পান হারাম করেছেন। তাই আমি মদ পান করি না।' একটু ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিলো,

চাকুরি হোক বা না হোক, সে সত্য বলবে। তাই সে বললো, ‘আমি মদ পান করি না।’ তারা জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন? তুমি কি অসুস্থ?’ সে বললো, ‘আমি তো মুসলমান। আর মদ পান আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ও হারাম।’ তারা বললো, ‘তার মানে তুমি সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনেও মদ পান করো না?!’ সে বললো, ‘হ্যাঁ তাই, আমি কখনোই মদ পান করি না।’

অবাক হয়ে তারা একে অন্যের দিকে তাকালো। ইন্টারভিউ শেষে যখন ফলাফল প্রকাশিত হলো, দেখা গেলো, তার নাম চাকুরিপ্রাপ্তদের মধ্যে সবার ওপরে। সে কাজ শুরু করলো। কেটে গেলো কয়েক মাস। একদিন তার সাক্ষাৎ হলো ইন্টারভিউ গ্রহণকারী এক কর্মকর্তার সঙ্গে। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আচ্ছা! আপনারা আমাকে বারবার মদ পানের ব্যাপারে কেন প্রশ্ন করছিলেন?’

সে উত্তরে বললো, ‘এখানে কাজই হলো পাহারা দেয়া। ইতিপূর্বে যে যুবককেই এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, দেখা গেছে, অভ্যাসবশত সে মদ পান করা শুরু করে আর মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। ফলে সে আর তার স্থানে থাকতে পারে না। আর চোর-ডাকাতও কোম্পানির ওপর হামলা করার সুযোগ পায়। যখন আমরা জানলাম যে, তুমি মদ পান করো না, বুঝতে পারলাম যে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেয়েছি। তাই আমরা তোমাকেই নিয়োগ দিয়েছি।’ শত প্রলোভনের হাতছানিতেও নীতির ওপর অটল থাকার কত চমৎকার নমুনা!

সমস্যা হলো, আমরা এমন সমাজে বসবাস করি যেখানে নীতি আঁকড়ে থাকার মতো মানুষের বড় অভাব। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন, যে নীতির ওপর চলার জন্যই বেঁচে থাকে, নীতির ওপর অটল থাকতে প্রয়োজনে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়; শত প্রলোভনেও যে আদর্শচ্যুত হয় না, নীতি হতে বিচ্যুত হয় না।

যখন আপনি সৎ ও সঠিক পথে চলবেন এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরবেন, তখন অন্য নীতির লোকেরা আপনাকে ছাড়বে না। আপনি যদি ঘুষ গ্রহণ না করেন, তাহলে যারা ঘুষ গ্রহণ করে, তারা আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হবে। আপনি অপকর্ম থেকে বিরত থাকলে ব্যভিচারকারীরা আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হবে।

ওমর বিন খাত্তাব রাযি. এক রাতে টহল দিচ্ছিলেন। রাতের আঁধারে এক বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি ভেতর থেকে হাসি-তামাশার শব্দ শুনলেন। বুঝতে পারলেন, এ শব্দ নেশাগ্রস্ত লোকদের শব্দ। তিনি রাতের বেলা দরজা নক করা ভালো মনে করলেন না। তাছাড়া ধারণা তো ভুলও হতে পারে। তিনি বিষয়টি যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি এক টুকরো কয়লা নিয়ে বাড়িটির দরজায় একটি চিহ্ন দিয়ে দিলেন এবং চলে গেলেন।

এদিকে বাড়ির মালিক দরজার কাছে আওয়াজ শুনতে পেলো। বের হয়ে দরজায় চিহ্ন দেখে এবং প্রত্যাবর্তনরত ওমর রাযি.-এর পিঠ দেখে সে যা বোঝার বুঝে নিলো। স্বাভাবিক বুদ্ধির দাবি ছিলো, চিহ্নটি মুছে ফেলা।

এতেই বিষয়টি শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু লোকটি তা করলো না। সে কয়লার টুকরা নিয়ে তার প্রতিবেশীদের বাড়ির কাছে এসে তাদের দরজায়ও চিহ্ন দিতে শুরু করলো! অর্থাৎ সে অন্যদেরকেও তার স্তরে নামাতে চাচ্ছে! তারাও যেন তার মতো মাতাল হয়ে পড়ে! সে নিজে অন্যদের স্তরে উন্নীত হতে চাচ্ছে না; নিজের চিহ্নটি মুছে সে ভালো মানুষের কাতারে আসতে চাচ্ছে না।

প্রাচীন প্রবাদে আছে, ‘পরগামী রমণীর একান্ত কামনা, তার মতো হতো যদি সব নারী-ললনা’। আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হলো—কোনো স্ত্রী সবসময় স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা বলে। কেউ তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করলে সে উল্টো নিজের পক্ষে সাফাই গায়, আত্মপক্ষ সমর্থন করে বারবার বলে, ‘আরে! পুরুষদের সঙ্গে এমন আচরণই করতে হয়। তাদের সঙ্গে মিথ্যা ছাড়া চলে না।’ এভাবে সে সেই সৎ মহিলাকেও নিজের দলে টানতে চায়। তাকে তার সঠিক নীতি হতে বিচ্যুত করে মিথ্যার পথে নিয়ে আসা পর্যন্ত অবিরাম চলতেই থাকে তার প্ররোচনা। নীতিবান মানুষ এসব ঝড়-তুফান মোকাবেলা করে চলেন সহজেই। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে হয় ব্যতিক্রম।

একই কথা প্রযোজ্য এমন ম্যানেজারের ক্ষেত্রেও যে কর্মচারীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে। সে বিশ্বাস করে, এর মাধ্যমে কোম্পানির উন্নতি হয় এবং কর্মকর্তাদের মনও কাজের প্রতি আন্তরিক থাকে। আর এ কারণে পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। তো এমন ম্যানেজারের সঙ্গে যখন বদস্বভাবের কোনো ম্যানেজারের দেখা হয়, তখন সে তাঁর প্রতি হিংসা করতে থাকে।

তাকেও নিজ পথেই প্ররোচিত করতে চেষ্টা করতে থাকে। সে চায় তাঁর আচরণ-উচ্চারণও তাঁর মতো হয়ে যাক। সে তাকে 'উপদেশ' দিতে থাকে, 'কর্মচারীদের সঙ্গে এমন করতে নেই। ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবেন না। তাহলে ওরা বেশি প্রশ্রয় পেয়ে আপনার মাথায় উঠে যাবে।'

একজন দোকানদার তাঁর দোকানে সিগারেট বিক্রি করে না। তাঁর সঙ্গীরা এসে তাঁকে সিগারেট বিক্রির জন্য ফুসলাতে থাকবে। বলবে, 'দোস্ত! সিগারেট বিক্রি করলে তোমার ব্যবসা ভালো হবে, মুনাফা বেড়ে যাবে। সিগারেট নিতে যখন তোমার দোকানে আসবে, কিছুক্ষণ থাকবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আরো কিছু কেনার প্রতি উৎসাহিত হবে।' এভাবেই বিভিন্নভাবে নীতি হতে আমাদের বিচ্যুত করতে অন্যরা প্ররোচনা দিতে থাকে। তাই আপনি সাহসী হোন। নীতির ওপর অটল থাকুন। জোর গলায় বলুন, 'না, কি-ছু-তেই না! কোনো প্রলোভনেই না!'

কাফিররা বহু চেষ্টা করেছিলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেন তাঁর ঈমান ও তাওহীদের নীতি থেকে সরে আসেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নীতির ওপর অটল থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে ইরশাদ করলেন:

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

ায়ে ৯ [সূরা কলাম]

অর্থ: তারা চায় আপনি নমনীয় হোন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

আল্লাহ এ আয়াতে বোঝাতে চেয়েছেন, কাফিররা হলো মূর্তিপূজক। তাদের জীবনে কোনো নীতি ও আদর্শ নেই। আর তাই তাদের নীতির ওপর থাকারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং নীতি থেকে সরে আসতেও কোনো বাধা নেই। সুতরাং সব সময় সজাগ থাকুন, 'তারা' যেন আপনাকে আপনার নীতি হতে বিচ্যুত করতে না পারে।

**জীবনের অটল নীতি...**

৮فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝ ৯وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝

সুতরাং যারা (আপনাকে) মিথ্যাবাদী বলে, আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না। তারা চায় আপনি নমনীয় হোন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

# ৭২. অন্যকে ক্ষমা করুন

কারো জীবনই বেদনাশূন্য নয়। জীবনে সইতে হয় বহু দুঃখ-বেদনা, গুঞ্জন-গঞ্জনা। কখনো ভরা মজলিসে শুনতে হয় ঠাট্টা-উপহাস, কখনো সইতে হয় অপমানজনক মন্তব্য। কেউ ব্যক্তিগত বিষয়ে অনধিকার চর্চা করে, কেউ আবার সবার সামনে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। কখনো দেখা যায় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, কখনো চিন্তা-ভাবনা ও মতামতে পার্থক্য ও দূরত্ব। আবার কেউ কেউ তো তুচ্ছ ঘটনাকে বানিয়ে ফেলে অনেক বড়। ঘটনাটি ভুলে থাকা কিংবা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই।

কেউ আবার অন্যের অপারগতা গ্রহণ করতে একেবারেই নারাজ! অন্যকে ক্ষমা করতে তাঁর অহংবোধে বড় বাধে! কেউ কেউ তো অন্যকে ক্ষমা না করে নিজেই যন্ত্রণায় ভোগে। অন্তরে লুকিয়ে রাখা হিংসার আগুনে নিজেকে পোড়ায়, নিজেকে কষ্ট দেয়। দুর্বিষহ এক যন্ত্রণায় তাঁর জীবন বিষিয়ে ওঠে। আল্লাহর কী কুদরত! হিংসার বিচার বড় ভারসাম্যপূর্ণ। হিংসা প্রথমে হিংসুককেই অন্তরদহনে ভস্ম করে দেয়। বর্তমান এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। এ বিষয়টি আপনাকে মেনে নিতেই হবে। তাই বলি, নিজেকে কষ্ট না দিয়ে উদার হোন, অতীত ভুলে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন। জীবনকে উপভোগ করুন।

মক্কাবিজয় পরবর্তী ঘটনা। নবীজী ﷺ বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। সকলে নিরাপদ, সকলে নিশ্চিন্ত। নবীজী ﷺ পবিত্র কাবাগৃহ তাওয়াফের

উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাওয়াফ শেষ করে ওসমান বিন তালহাকে ডাকলেন। তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তিনি কাবা-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। পবিত্র গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে ফেরেশতা ও মহান ব্যক্তিদের কল্পিত ছবি অঙ্কন করা। মক্কার মুশরিকরা অজ্ঞতা আর কুফরির কারণে এগুলো অঙ্কন করেছে। তিনি দেখলেন হযরত ইবরাহীম আ.-এর একটি ছবি আঁকা, তাঁর হাতে ভাগ্যনির্ণয়ক তীর! নবীজী ﷺ বললেন, 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! ওরা মহান নবী ইবরাহীম আ.-এর হাতে ভাগ্যনির্ণয়ক তীর তুলে দিয়েছে! কোথায় ভাগ্যনির্ণয়ক তীর আর কোথায় সায়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম আ.?! এসবের সঙ্গে তো তাঁর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই!'

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا آয়ে ۝৬৭ [সূরা আলে ইমরান]

অর্থ: ইবরাহীম ইহুদি ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।

এরপর নবীজী ﷺ ছবিগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। নবীজী ﷺ সেখানে কাঠের তৈরি একটি কবুতর পেয়ে নিজ হাতে তা ভেঙে ফেললেন। এরপর তিনি এসে দাঁড়ালেন কাবার দুয়ারে। মুসলিম-কাফির সবাই উপস্থিত কাবা প্রাঙ্গণে। সবাই তাকিয়ে আছে মহানবীর দিকে। নবীজী ﷺ দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর চললেন যমযম কূপের দিকে। যমযমের কাছে গিয়ে পানি পান করলেন, অযু করলেন। সাহাবীগণ নবীজীর অযুর পানির অবশিষ্টটুকুর বরকত লাভের আশায় প্রতিযোগিতা শুরু করলেন। মক্কার মুশরিকরা তো হতবিহ্বল! তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'আশ্চর্য! আমরা

এমন কোনো বাদশাহ ইতিপূর্বে দেখিনি, এমন কোনো বাদশাহর কথা ইতিপূর্বে শুনিওনি (অনুসারীরা তাঁকে এত মানে! এত ভক্তি করে!)’

এরপর নবীজী ﷺ মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন। মাকামে ইবরাহীম কাবার কোল ঘেঁষে ছিলো, নবীজী ﷺ তা একটু দূরে সরিয়ে দিলেন। এরপর নবীজী ﷺ কাবা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার ভিড়ে দৃষ্টি বোলাতে লাগলেন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো কত সৌভাগ্য তাদের! হায়! আমি অভাগা যদি হতাম তাদের একজন!

নবীজী ﷺ সকলের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নাই। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। সকল কুফরি শক্তিকে পরাস্ত-পরাভূত করেছেন। হে লোকসকল! শুনে রাখো, অতীতের সকল অপকর্ম, সকল রক্তপণ ও সুদী ঋণ—সবকিছু আমার পদতলে দাফন করে দিলাম। কেবল কাবাঘরের খেদমত আর হাজীদের পানিপানের বিধান আপন হালতে বহাল থাকলো।’

এরপর নবীজী ﷺ শরয়ী কিছু বিধান বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, ‘চাবুক বা লাঠি দ্বারা অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য একশত উট দিয়াতরূপে প্রদান করতে হবে, এর চল্লিশটাই হতে হবে গর্ভবতী।’ এরপর প্রিয়নবী কোরাইশ-সরদারদের দিকে তাকালেন এবং স্বর উঁচু করে বললেন, ‘কোরাইশ সম্প্রদায়! শোনো, মহান আল্লাহ তোমাদের জাহেলী যুগের আত্ম-অহমিকা বিদূরিত করেছেন, পিতৃপুরুষ নিয়ে অহঙ্কার করাকে অবৈধ

করেছেন। শোনো, সকল মানুষ এক আদম থেকে সৃষ্টি আর আদম হলেন মাটির তৈরি।'

এরপর নবীজী ﷺ তেলাওয়াত করলেন:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
আয়ে ۝১৩ [সূরা হুজুরাত]
অর্থ: হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বহু জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। (এটা শুধু এ জন্য) যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচে মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সবচে মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

নবীজী ﷺ আবার কাফিরদের দিকে তাকালেন। তিনি আজ কাবার দুয়ারে দণ্ডায়মান। মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষচূড়ায় অধিষ্ঠিত। আর মক্কার কাফির দল আজ লাঞ্ছিত, অপদস্ত হয়ে সেই ভূমিতে দাঁড়ানো, যেখানে তারা নবীজীকে মিথ্যাবাদী বলেছে, অপমানিত করেছে। এই ভূমিতে সেজদারত নবীজীর মাথায় তারা আবর্জনা ফেলেছে! সেদিনের অত্যাচারী কোরাইশ দল আজ কাবা প্রাঙ্গণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আজ পরাজিত! তারা আজ পরাভূত! তারা আজ অপদস্ত!

নবীজী ﷺ তাদেরকে বললেন, 'হে কোরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের কী ধারণা? আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবো?' নীরব-নিস্তব্ধ

কোরাইশরা এবার নড়েচড়ে উঠলো। তারা বললো, 'আপনি আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন। আপনি তো মহান! মহানুভব ভ্রাতা আপনি! এক মহান পিতার পুত্র আপনি!'

কী আশ্চর্য! তারা কি ভুলে গেছে এই মহানুভব ভাইয়ের সঙ্গে তারা কী আচরণ করেছিলো?! আজ কোথায় তোমাদের সেই উপহাস? কোথায় সেই বিদ্রূপ? উন্মাদ! যাদুকর! জ্যোতিষী! আরো কত গালি! তিনি মহানুভব ভ্রাতা, এক মহান পিতার পুত্র তিনি! তবে কেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে?! কেন দুর্বল মুসলমানদের ওপর চালালে নির্যাতন-নিপীড়ন? আজ কোথায় তোমাদের সেই নির্যাতন? কোথায় সেই আস্ফালন?

ওই তো দাঁড়িয়ে সেই বেলাল! আজও তাঁর পিঠে দগদগ করছে প্রচণ্ড প্রহারের দাগগুলো! আজই শুকায়নি প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত মরুভূমিতে হেঁচড়ানোর ফলে সৃষ্ট বুকের সেই ক্ষতগুলো! ওই তো সেই খেজুর বৃক্ষটি, যার পাশে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলে হযরত সুমাইয়াকে, শহীদ করেছিলে তাঁর স্বামী ইয়াসিরকে। এই যে তাদের পুত্র আম্মার, নিজ চোখে সে দেখেছে প্রিয়তম পিতা-মাতার অন্তিম মুহূর্ত, অসহায়ের মতো শুনেছে মৃত্যুপথযাত্রী মা-বাবার কাতরধ্বনি। আজ তোমরা বলছো, 'মহানুভব ভ্রাতা'?!

বয়কট ঘোষণা করে এই মহানুভব ভ্রাতাকেই তো তোমরা 'শিয়াবে আবি তালিবে' তিন বছর অবরুদ্ধ করে রেখেছিলে! অবরুদ্ধ করে রেখেছিলে দুর্বল-অসহায় মুসলমানদের! ক্ষুধার তাড়নায় তারা তখন গাছের পাতা ছিঁড়ে খেয়েছিলো, খেতে বাধ্য হয়েছিলো। ছোট ছোট শিশুর করুণ কান্না তোমাদের

হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। তোমরাই তো মৃত্যুশয্যায় তাঁর চাচাকে দাওনি ইসলাম গ্রহণ করতে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ লোকটার সকাতর অনুনয়েও তোমাদের হৃদয় গলেনি। দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননী, গর্ভধারিণী মা—কেউ তোমাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বদরের যুদ্ধ, ওহুদের লড়াই, আরবের বহুজাতিক বাহিনীকে সঙ্গী করে নবীজীর বিরুদ্ধে খন্দক অভিযান—কোথায় সেসব? আজ বলছো, 'মহানুভব ভ্রাতা'?! এই তো কয়েক বছর পূর্বে। কাবার টানে তিনি এসেছিলেন ওমরাহ পালন করতে। কিন্তু তোমরা দাওনি তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে। হোদাইবিয়া থেকেই তাঁকে ফেরত পাঠিয়েছিলে মদীনায়। সব ভুলে গেলে আজ?! কোথায়? কোথায় সেই দিনগুলো?

বেদনা ও যন্ত্রণার এক সুদীর্ঘ স্মৃতিমালা নবীজীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিনি তাকান উপস্থিত কোরাইশদের দিকে; কিন্তু চোখে ভেসে ওঠে পর্বতময় মক্কার দূর সীমানা, মক্কার অলি-গলি, পথ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত—সর্বত্র কষ্টের সেই স্মৃতিগুলো আজও জীবন্ত। কেবল নবীজীই নন; আবু বকর-ওমর, ওসমান-আলী, বেলাল-আম্মার—সবার চোখের সামনেই কষ্টের সেই দিনগুলোর বেদনাবিধুর স্মৃতি। কোরাইশ কাফিরদের সঙ্গে প্রত্যেকেরই আছে দুঃখের স্মৃতি, আছে কষ্টের দাস্তান। নবীজী ইচ্ছা করলে আজ এ সকল কোরাইশদের কঠোর শাস্তি দিতে পারেন, নিতে পারেন নির্মম প্রতিশোধ। তারা তো শত্রুপক্ষ! প্রতিপক্ষ বাহিনী! তারা তো সীমালঙ্ঘনকারী! তারা তো প্রতারক! হ্যাঁ, প্রতারক! তারা হোদাইবিয়া সন্ধির চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, চুক্তিভঙ্গ করে সীমালঙ্ঘন করেছে। অপরাধী কোরাইশ

কাফির সম্প্রদায় আজ ভীত-সন্ত্রস্ত, চিন্তিত, পেরেশান। তারা জানে না, আজ তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে?

কিন্তু দয়ার আধার করুণার নবী অতীতের সব দুঃখ-বেদনা ভুলে গেলেন। শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন এক ঐতিহাসিক বাণী। ইতিহাস তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। তিনি বললেন, ‘যাও, তোমরা সকলে আজ মুক্ত’! নবীজীর কথা শুনে সবাই আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরলো। সবার চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ। আনন্দে আত্মহারা সবাই যেন হাওয়ায় উড়ছে আজ! সবাই আশ্চর্য! সত্যিই তিনি আমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন!

এরপর নবীজী ﷺ কাবাঘরের চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, কাবার আশেপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি। আল্লাহর পবিত্র ঘরের পাশে আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনা করা হয় এই মূর্তিগুলোর! নবীজী নিজ হাতে মূর্তিগুলো ভাঙতে লাগলেন। একদিকে মূর্তিগুলো ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, অপরদিকে নবীজীর পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আয়ে ۝৮১ [সূরা বনী ইসরাঈল]

অর্থ: সত্য এসেছে, মিথ্যা ও অন্যায় পরাভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।

মুসলমানদের ওপর যেসব অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী কোরাইশের আছে নির্মম অত্যাচারের কালো ইতিহাস, তাদের অনেকে নবীজীর আগমনের

পূর্বেই মক্কা ছেড়ে পালিয়ে গেলো। তাদেরই একজন সাফওয়ান বিন উমাইয়া। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেও পালালো মক্কা ছেড়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? থাকবে কোথায়? পেরেশান সাফওয়ান পরিকল্পনা করলো জেদ্দায় পৌঁছে কিশতিতে চড়বে আর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পাড়ি জমাবে ইয়ামেনে।

মক্কাবাসী যখন দেখলো নবীজী সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, বেদনাদায়ক অতীতকে ভুলে সকলকে বরণ করে নিয়েছেন, তখন তাদের একজন ওমায়র বিন ওয়াহাব নবীজীর দরবারে হাজির হলো। সে বললো, 'আল্লাহর নবী! সাফওয়ান বিন উমাইয়া তার গোত্রের সরদার। সে আপনার ভয়ে পালিয়ে গেছে। সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। আপনি দয়া করে তাকে নিরাপত্তা দিন।' এ কথা শুনে নবীজী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন। উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি বললেন, 'তাকে জানিয়ে দাও, সে নিরাপদ।'

ওমায়র বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু দিন, যা দেখিয়ে আমি তাকে বিশ্বাস করাতে পারবো যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।' নবীজী যে পাগড়ি পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, নিজের সেই পাগড়িটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। সাফওয়ান যেন পাগড়িটি দেখেই বুঝতে পারে যে, আসলেই নবীজী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

নবীজীর পাগড়ি নিয়ে ওমায়র রওনা হলো। সাফওয়ানের কাছে পৌঁছে সে দেখলো, সাফওয়ান সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য প্রস্তুত। ওমায়র বললো, 'সাফওয়ান! তোমার জন্য উৎসর্গিত আমার জান! আমার মাতা-পিতার প্রাণ!

কসম খোদার! নিজেকে তুমি ধ্বংসে নিপতিত করো না। আল্লাহর রাসূল তো তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এই যে দেখো তাঁর পাগড়ি। প্রমাণস্বরূপ আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।' সাফওয়ান উত্তর দিলো, 'ধ্বংস হও তুমি! দূরে সরে যাও আমার কাছ থেকে! তুমি তো চরম মিথ্যাবাদী! আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো তুমি?!' মুসলমানদের সঙ্গে কৃত আচরণের পরিণাম-চিন্তায় সে ছিলো ভীত-সন্ত্রস্ত, চরম শঙ্কিত। তাঁর কল্পনাতেও ছিলো না, এতকিছুর পরও কেউ কাউকে ক্ষমা করতে পারে।

ওমায়র চেঁচিয়ে বললো, 'সাফওয়ান! বিশ্বাস করো। তিনি তো আল্লাহর রাসূল। সর্বোত্তম মানব তিনি। সবার চেয়ে দয়াশীল। করুণার আধার তিনি। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। সৃষ্টিকুলের সেরা তিনি। তিনি তো তোমার চাচাতো ভাই! তাঁর সম্মান তোমারই সম্মান! তাঁর রাজত্ব তোমারই রাজত্ব!' সাফওয়ান বললো, 'আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছি না। তিনি হয়তো প্রতিশোধ নেবেন।' ওমায়র বললো, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তিনি অনেক মহান, অনেক উদার তিনি।' ওমায়রের আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হয়ে সাফওয়ান তার সঙ্গে মক্কায় ফিরে এলো। ওমায়র তাকে নিয়ে উপস্থিত হলো নবী দরবারে। সাফওয়ান বললো, 'ও বলছে, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন?' নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।'

এবার সাফওয়ান বললো, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করবো কিনা—এ বিষয়ে ভাবার জন্য আমাকে দু' মাস সময় দিন।' অর্থাৎ আগামী দু' মাস সে নিজ ধর্মে অটল থাকবে এবং মক্কায় অবস্থান করে মূর্তিপূজা করবে! আর এরই

মধ্যে ভাববে যে, ইসলাম গ্রহণ করবে কিনা! নবীজী বললেন, ‘দুই মাস নয়, তোমাকে চার মাস অবকাশ দেয়া হলো।’ কিছুদিন পর সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। ক্ষমার সুযোগ লাভে ধন্য হয়ে সাফওয়ান বিন উমাইয়া হলেন সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু!

ক্ষমার কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত! বেদনাদগ্ধ অতীত ভুলে যাওয়ার কী অনুপম উপমা! নিঃসন্দেহে একমাত্র মহান ও মহানুভব ব্যক্তিরাই পারেন ক্ষমা ও ঔদার্যের এমন চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে। তারাই পারেন হিংসা ও ক্রোধকে উপেক্ষা করে প্রতিশোধ গ্রহণের হীনতা হতে ঊর্ধ্বে উঠতে। জীবন তো সবসময়ই সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত এই জীবনকে হিংসা-বিদ্বেষে কলুষিত করার সময় কোথায়! এমনকি ব্যক্তি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও নবীজী ছিলেন উদার-বিনম্র।

মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাযি. বলেন, আমি ও আমার দু'জন সঙ্গী মদীনায় এলাম। লোকদের কাছে গেলাম, কিন্তু কেউ আমাদের মেহমানরূপে গ্রহণ করলো না। অবশেষে আমরা নবী দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর ঘরের অতিথি হিসেবে বরণ করে নিলেন। নবীজীর কাছে চারটি বকরি ছিলো। তিনি বললেন, ‘মিকদাদ! এগুলো দোহন করবে। এরপর চার ভাগে ভাগ করে চারজনকে যার যার অংশ দিয়ে দেবে।’

মিকদাদ বলেন, ‘নবীজীর নির্দেশমতো আমি তাই করলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি বকরিগুলো দোহন করতাম। আমি ও আমার উভয় সঙ্গী যার যার অংশ পান করে এক অংশ নবীজীর জন্য রেখে দিতাম। নবীজী উপস্থিত

থাকলে তা পান করে নিতেন, অন্যথায় ফিরে এসে পান করতেন।’ এক রাতের ঘটনা। প্রতিদিনের মতো আজও মিকদাদ দুধ দোহন করে নিজে পান করলেন, সঙ্গীদেরকে পান করালেন এবং নবীজীর অংশ রেখে দিলেন। নবীজী ফিরে এসে এই দুধ পান করবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেলো নবীজী ফিরছেন না। অনেক বিলম্ব করছেন। মিকদাদ শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, হয়তো নবীজী আজ কোনো আনসারী সাহাবীর বাড়িতে গেছেন, হয়তো তিনি আহার করেই ফিরবেন। কাজেই আমি তো নবীজীর অংশটুকু পান করে নিতে পারি।

এই ভেবে মিকদাদ নবীজীর অংশ পান করে ফেললেন। নবীজীর জন্য কিছুই রাখলেন না। মিকদাদ বলেন, দুধটুকু পেটে যেতেই আমার হুঁশ হলো। আমি বুঝতে পারলাম, কী করেছি। লজ্জায় আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, এখনি হয়তো নবীজী ফিরে আসবেন ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত অবস্থায়। এসে দেখবেন পেয়ালা খালি। এরপর তিনি হয়তো বদদোয়া করবেন। এসব ভেবে দুশ্চিন্তায় আমি কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম। ধীরে ধীরে রাত যখন আরো গভীর হলো, নবীজী ফিরে এলেন। এমন অনুচ্চ আওয়াজে সালাম করলেন, যেন জাগ্রত ব্যক্তিই শুনতে পায়, ঘুমন্ত কারো ঘুম না ভাঙে। মিকদাদ বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান করে তাকিয়ে আছেন নবীজীর দিকে; দেখছেন, নবীজী কী করেন।

নবীজী দুধের পাত্রের কাছে এসে ঢাকনা সরালেন। দেখলেন, তাতে কিছুই নেই। নবীজী এবার তাকালেন আকাশের দিকে। মিকদাদ ভয় পেয়ে

গেলেন। ভাবলেন, এই বুঝি নবীজী বদদোয়া করছেন। তিনি কান পেতে শুনতে লাগলেন, নবীজী কী বলছেন। তিনি শুনলেন, নবীজী দোয়া করছেন: «اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي» অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে যে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও। আমাকে যে আহার করায় তুমি তাকে আহার করাও।

মিকদাদ এ কথা শুনে মনে মনে ভাবলেন, নবীজীর এই দোয়াকে আমি কাজে লাগাবো। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ধারালো একটি ছুরি নিলেন। এরপর গেলেন বকরিগুলোর কাছে। এগুলোর একটি যবাই করে নবীজীকে আহার করাবেন। কোন বকরিটি বেশি মাংসল ও হৃষ্টপুষ্ট, তা অনুমান করার জন্য মিকদাদ যখন হাত বাড়ালেন, তাঁর হাত একটি বকরীর ওলান স্পর্শ করলো। তিনি অনুভব করলেন, বকরিটির ওলান দুধে পূর্ণ। এরপর হাত দিয়ে দেখলেন, সবগুলোর ওলানই দুধে পরিপূর্ণ। যবাইয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি একটি বড় পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। পাত্রটি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং দুধের ফেনা উপচে পড়তে লাগলো।

দুধের পাত্র নিয়ে তিনি নবীজীর কাছে এলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! পান করুন।’ এত অধিক পরিমাণ দুধ দেখে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, ‘মিকদাদ! তোমরা কি আজ রাতে দুধ পান করোনি?’ মিকদাদ বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন।’ নবীজী পান করলেন। এরপর পাত্রটি এগিয়ে দিলেন মিকদাদের দিকে। মিকদাদ বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আরো পান করুন।’ নবীজী আবার পান করলেন এবং

মিকদাদের দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন। মিকদাদ আবারও বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আরো পান করুন।’

মিকদাদ বলেন, আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, নবীজী পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং নবীজীর সেই দোয়া [হে আল্লাহ! আমাকে যে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও। আমাকে যে আহার করায় তুমি তাকে আহার করাও।] লাভ করার সুযোগ আমি পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা দেখে নবীজী বললেন, ‘মিকদাদ! এ তুমি কেমন কাজ করলে?!’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে আপনি ফিরতে বেশ বিলম্ব করছিলেন। আমি খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো আল্লাহর রাসূল রাতের খাবার কোথাও খেয়ে নিয়েছেন।’ এভাবে মিকদাদ পুরো ঘটনা নবীজীকে খুলে বললেন। জানালেন, কীভাবে বকরিগুলো অস্বাভাবিকভাবে এক রাতে দু'বার দুধ দিলো!

নবীজী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কীভাবে এত দ্রুত বকরিগুলোর স্তন দুধে পূর্ণ হয়ে গেলো! এক রাতে তো বকরি দু'বার দুধ দিতে পারে না! নবীজী বললেন, ‘এ তো আল্লাহর বিশেষ রহমত। মিকদাদ! তুমি আমাকে আগে জানালে না কেন? তোমার সঙ্গীদ্বয়কে জাগালে তারাও কিছু অংশ পান করতে পারতো, তারাও এই রহমতে অংশীদার হতে পারতো।’ মিকদাদ বললেন, ‘সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন! আপনি যখন আল্লাহর রহমতে সিক্ত হয়েছেন আর আমিও তার কিছু অংশ

লাভ করতে সক্ষম হয়েছি তখন আমি এ কথা ভাবার সুযোগই পাইনি যে, আমাদের ছাড়া আর কেউ বাকি রয়ে গেছে'!

**দৃষ্টিভঙ্গি...**

প্রদান ও গ্রহণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আপনার প্রদান যেন গ্রহণ থেকে বেশি হয়।

# ৭৩. উদার হোন

নবীজী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের সরদার কে?’ উত্তরে তারা বললো, ‘আমাদের সরদার অমুক। তবে আমরা তাকে কৃপণ বলেই জানি।’ ‘কার্পণ্য থেকে কঠিন ব্যাধি আর কিই বা আছে?! বরং তোমাদের সরদার তো শুভ্র ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট অমুক।’ নবীজী বললেন।

নওমুসলিম এক আরব-কবীলার সঙ্গে এভাবেই নবীজীর কথা হচ্ছিলো। নবীজী জানতে চেয়েছিলেন তাদের সরদার কে? উদ্দেশ্য ছিলো এ বিষয়টি বিবেচনা করা যে, তাদের ইসলাম পরবর্তী সময়ে বর্তমান সরদারকেই বহাল রাখবেন, নাকি তাকে পরিবর্তন করে অন্য কাউকে সরদার নির্ধারণ করবেন। প্রকৃতপক্ষে কার্পণ্যের চেয়ে কঠিন কোনো ব্যাধি আছে কি?

সীমাহীন নিন্দনীয় ও ঘৃণিত একটি স্বভাব হলো কৃপণতা। কৃপণকে মানুষ ঘৃণা করে। তাঁর উপস্থিতিকেও সবাই বোঝা মনে করে। বেচারা বড় অসহায়! কেউ তাঁর বাড়িতে খানার অনুষ্ঠান হতে দেখে না। বন্ধু-বান্ধবও তাঁর বাড়িতে আসে না। কেউ তাঁর প্রিয়ভাজন হয় না। কাউকে সে কখনো উপহার-উপঢৌকনও দেয় না। নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশেও সে যত্নবান নয়। অর্থলোভী এবং নিচুমনা হওয়ায় সুগন্ধি ব্যবহারেও তাঁর বড় অনীহা।

বিপরীতে উদার ও দানশীল ব্যক্তিকে দেখুন। বন্ধুদের কাছে তিনি প্রিয়ভাজন। নিকটজনদের কাছে তাঁর আছে মর্যাদার আসন। বন্ধুরা পরস্পর মিলিত হতে চাইলে তাঁর বাড়ি সবসময় উন্মুক্ত। বন্ধুদের কেউ

বিপদে পড়লে তিনি এগিয়ে আসেন সবার আগে। উদারতা ও বদান্যতার গুণে তিনি সকলকে মোহিত করে রাখেন। অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাপাশে সকলকে আবদ্ধ করে রাখেন। কবি বলেন—

অন্যের প্রতি যদি করো দয়া, যদি করো ইহসান
হৃদয়রাজ্যের হবে অধিপতি, অনুগত সব প্রাণ
যুগে যুগে দেখো আর কিছুতেই হয়নি জয় কোনো হৃদয়
ইহসানগুণেই জয় হয়েছে হৃদয়জগৎ সদা নিশ্চয়।

অন্যের উপকার করার সময় নিয়ত হতে হবে খালিস ও খাঁটি। মুসলিম ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ, তাদের হৃদ্যতা ও ভালোবাসা অর্জন, সর্বোপরি সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের নিয়ত করবেন। আপনার দয়া ও অনুগ্রহের পেছনে যেন না থাকে নাম-যশ-খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি অর্জনের বাসনা, নেতৃত্ব, মানুষের সাধুবাদ কিংবা প্রশংসা লাভের কামনা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে তিন শ্রেণীর লোক।’ এর মধ্যে এক শ্রেণীর কথা নবীজী বলেছেন, যারা ‘মানুষ দানশীল বলবে’—এই আশায় দান করে। খালেকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা দান করে না। তারা চায় কেবল মাখলুকের সন্তুষ্টি। মানুষকে দেখানোর জন্যই তারা দান করে। পুরো হাদীসটিই আপনার খেদমতে পেশ করছি।

হযরত সুফিয়ান রহ. বলেন, আমি মদীনায় প্রবেশ করার পর দেখতে পেলাম, অনেক মানুষ এক ব্যক্তির কাছে জড়ো হয়ে বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইনি কে?' লোকেরা বললো, 'ইনি আল্লাহর রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাযি.।' এ কথা শুনে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। সবাইকে তিনি হাদীস শোনাচ্ছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. যখন হাদীস বর্ণনা শেষ করলেন এবং সবাই চলে যাওয়ায় একাকী হলেন, একান্তে পেয়ে আমি তাঁকে বললাম, 'হযরত! আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাবেন, যা আপনি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনেছেন এবং মুখস্থ করেছেন!?'

আবু হোরায়রা রাযি. উত্তরে বললেন, 'আমি তোমার আশা পূরণ করবো। আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাবো, যা আমি রাসূলের মোবারক জবান থেকে শুনেছি, ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি এবং মুখস্থ করেছি।' এ কথা বলার পর হযরত আবু হোরায়রা রাযি. দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। এরপর স্বাভাবিক হয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে সেই হাদীসটি শোনাবো, আল্লাহর রাসূল যা আমার নিকট এ গৃহেই বর্ণনা করেছেন। গৃহে তখন আমি ও আল্লাহর রাসূল ছাড়া তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলো না।' এরপর আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমি দীর্ঘক্ষণ তাঁকে ধরে রাখলাম। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

“আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। সকলেই সেদিন নতজানু অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম ডাকবেন একজন কোরআন অধ্যয়নকারীকে। এরপর ডাকবেন আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবানকারী এক শহীদকে। এরপর এক সম্পদশালীকে।

কোরআন অধ্যয়নকারীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘আমি আমার রাসূলের ওপর যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি, তা কি তোমাকে শেখাইনি?’ সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই আপনি আমাকে শিখিয়েছেন।’ আল্লাহ তখন বলবেন, ‘তাহলে তুমি সে অনুযায়ী কী আমল করেছো?’ ‘আয় আল্লাহ! আমি দিবস-রজনী নামাযে তেলাওয়াত করেছি।’ সে উত্তর দেবে। তাঁর উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছো।’ ফেরেশতাগণও বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছো।’ এরপর আল্লাহ বলবেন, ‘মানুষ তোমাকে ক্বারী বলবে, তোমাকে আলেম বলবে—এই কামনায় তুমি দিবস-রজনী ইবাদত করেছো, ইলম চর্চা করেছো। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। (অর্থাৎ তোমার প্রতিদান তো তুমি দুনিয়াতে পেয়েছো। মানুষকে দেখানোর জন্য তুমি আমল করেছো। মানুষের প্রশংসা কুড়াতে চেয়েছো। দুনিয়াতেই মানুষ তোমার প্রশংসা করেছে। মানুষ বলেছে, ‘অমুক কারী সাহেব’, ‘অমুক অনেক জ্ঞানী মানুষ’।)

এরপর সম্পদশালীকে ডাকা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, ‘আমি কি তোমাকে সম্পদ-প্রাচুর্য দিইনি? তোমাকে অমুখাপেক্ষী করিনি?’ সে উত্তর

দেবে, ‘অবশ্যই...’ ‘তাহলে আমার দেয়া সম্পদ দিয়ে তুমি কী আমল করেছো?’ আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন। ‘আমি আত্মীয়তার হক আদায় করেছি, দান-সদকা করেছি।’ সে উত্তর দেবে। তাঁর উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছো।’ ফেরেশতাগণও বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছো।’ এরপর আল্লাহ বলবেন, ‘বরং মানুষ তোমাকে দানবীর বলবে—এজন্য তুমি দান করেছো। দুনিয়াতে তোমাকে দানবীর বলা হয়েছে। তোমার প্রতিদান তোমাকে দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেছে।’

সবশেষে উপস্থিত করা হবে আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবানকারীকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, ‘কেন তুমি জান কোরবান করেছো?’ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার রাস্তায় জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং জিহাদ করতে করতেই আমি শহীদ হয়ে গেছি।’ সে উত্তর দেবে। তাঁর উত্তর শুনে আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছো।’ ফেরেশতাগণও বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছো।’ এরপর আল্লাহ বলবেন, ‘বরং তোমাকে মানুষ সাহসী বলবে, বীরপুরুষ বলবে—এজন্য তুমি জিহাদ করেছো। আর তোমাকে তো তা বলাও হয়েছে। দুনিয়াতেই তুমি তোমার প্রতিদান পেয়ে গেছো।”

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দু' হাঁটুতে চাপড় মেরে বলেন, ‘আবু হোরায়রা! এরাই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।’ [তিরমিযী শরীফ: ২৩৮২]

তাই প্রিয় পাঠক! আপনার অনুগ্রহ ও দান যদি হয় খালিস নিয়তে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাহলে গ্রহণ করুন খোশখবরী ও সুসংবাদ! আপনার সর্বোত্তম ব্যবহার, মায়া-মমতা, অনুগ্রহ-দান এবং ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়ার হকদার হলো আপনার পরিবার, আপনার বাবা-মা, স্ত্রী-কন্যা ও ছেলে-সন্তান। এরপর আপনার একেবারে কাছের আত্মীয়-স্বজন। এরপর পরবর্তী আত্মীয়গণ। এভাবে পর্যায়ক্রমে...। সর্বপ্রথম তো নিজের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে হবে। এরপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আপনার হাতে, তাদের জন্য ব্যয় করুন। অধীনস্থদের ভরণ-পোষণে অবহেলা করা বড় গুনাহ।

অবশ্য দান-দক্ষিণা ও অপচয়-অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্যবোধ থাকাও জরুরি। একদিন একটি প্রাচীন পথ ধরে জনৈক লোক হেঁটে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে সে একটি বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলো। ছোট্ট একটা মেয়ে জীর্ণ কাপড় পরিধান করে দরিদ্র বেশে সেখানে বসে আছে। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?'

'আমি হাতেম তাইয়ের কন্যা।' সে উত্তর দিলো।

লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললো, 'দানবীর-মহৎপ্রাণ হাতেম তাইয়ের কন্যার এই অবস্থা!'

মেয়েটি বললো, 'আমার পিতার দানশীলতাই আমাদের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে।'

দান-অনুদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

আয়ে ۝২৯ [সূরা বনী ইসরাঈল]

অর্থ: (কৃপণতাবশত) আপনি আপন হস্তদ্বয়কে গ্রীবাসংলগ্ন করে রাখবেন না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা একেবারে সম্প্রসারিতও করবেন না। তাহলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।

সুতরাং দানশীল ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত দানকারী ভর্ৎসনার উপযুক্ত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আপনাকে সংকোচন ও সম্প্রসারণ—উভয় প্রান্তিক ধারা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। আদেশ করেছেন মধ্যপন্থা অবলম্বনের। লাঠি ধরতে হবে মধ্যভাগে, শক্ত করে। কবির ভাষায়:

দানশীলতায় বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ি ভাই বর্জিত
মধ্যপন্থার উভয় প্রান্তধারাই সর্বজন নিন্দিত।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সৃষ্টির মাঝে সবচে উদার ও মহানুভব, সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। অন্যের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করে স্বার্থপরের মতো শুধু নিজেকে নিয়ে তিনি কখনো ব্যস্ত থাকতেন না। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, ‘ঐ সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই! ক্ষুধার কারণে আমি মাটিতে পড়ে থাকতাম। অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণে কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।’

একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পথে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর রাযি. সেই পথ ধরে যাচ্ছিলেন। আমি কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না। একটু পর হযরত ওমর রাযি. এলেন। তাকেও কিতাবুল্লাহর একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। ক্ষুধার তাড়নায় আমি সেখানেই বসে রইলাম।

সাহাবীগণ তখন ক্ষুধা ও কঠিন অভাবের মাঝে দিন কাটাচ্ছিলেন। মেহমান-আপ্যায়ন করার মতো খাবারও তাদের কাছে প্রায়ই থাকতো না। সবশেষে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাকে দেখে প্রথমে তিনি মুচকি হাসলেন। আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার অন্তরের অস্থিরতা তিনি বুঝতে পারলেন। এরপর আমাকে ডাক দিলেন, ‘আবু হোরায়রা!’ আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বললাম, ‘লাব্বাইক হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত আছি।’ তিনি বললেন, ‘চলো আমার সঙ্গে।’

এই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতে লাগলেন। আমিও নবীজীর পিছু পিছু নবীগৃহের উদ্দেশে চললাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁর সামনে এক পেয়ালা দুধ পরিবেশন করা হলো। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই দুধ কোত্থেকে এসেছে?’ ঘরের লোকেরা

বললো, ‘অমুক আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে।’ এ কথা শুনে রাসূল আমাকে ডাকলেন। আমি বললাম, ‘আমি উপস্থিত আছি হে আল্লাহর রাসূল!’

নবীজী আমাকে বললেন, ‘আবু হোরায়রা! সুফ্ফার সাথীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দিয়ে এসো।’ আহলুস সুফফা হলেন ইসলামের মেহমান। তারা ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি-ঘর সবকিছু ত্যাগ করেছেন এবং মসজিদে নববীকেই নিজেদের আবাস বানিয়ে নিয়েছেন। সংসার-সম্পদের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ভালোবাসতেন, তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন। সদকা এলে তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন, নিজে খেতেন না। আর হাদিয়া এলে তাদের সঙ্গে নিয়ে খেতেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, নবীজীর কথা শুনে আমার কষ্ট বেড়ে গেলো। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এতটুকু দুধে আসহাবুস সুফ্ফার কী হবে? আমিই তো এই দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হওয়ার অধিক হকদার ছিলাম। তাদের ডেকে নিয়ে এলে নবীজী তো আমাকেই আদেশ করবেন তাদের দুধ পান করানোর জন্য। আমার ভাগ্যে আর কতটুকু জুটবে? কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের সামনে সকল চিন্তা, সকল চাহিদা তুচ্ছ।

আমি তাদেরকে ডেকে নিয়ে এলাম। তারা এসে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বসে পড়লেন। নবীজী আমাকে ডাকলেন, ‘আবু হোরায়রা!’

আমি বললাম, 'আমি উপস্থিত আছি হে আল্লাহর রাসূল!' 'দুধের পেয়ালাটি নিয়ে সবাইকে দুধ পান করাও।' নবীজী আদেশ করলেন।

নবীজীর নির্দেশ পেয়ে আমি দুধের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তাদের একজনকে দিলাম। সে দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হলো এবং পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলো। এরপর আমি আরেকজনকে দিলাম। সেও দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালাটি আমাকে ফেরত দিলো। এরপর দিলাম আরেকজনকে; সেও পরিতৃপ্ত হয়ে আমার কাছে পেয়ালা ফেরত দিলো। সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হলে আমি পেয়ালা নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলাম। নবীজী পেয়ালাটি হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এরপর আমাকে ডাকলেন, 'আবু হোরায়রা!'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত আছি।'

নবীজী বললেন, 'এখন আমি আর তুমিই কেবল বাকি আছি।'

আমি আরজ করলাম, 'জ্বী, আল্লাহর রাসূল! আপনি সত্য বলেছেন।'

নবীজী বললেন, 'এখন তুমি বসে পান করে নাও।'

নবীজীর আদেশ পেয়ে আমি বসলাম এবং পান করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আরো পান করো।' আমি আবার পান করলাম। এরপর আবার বললেন। আমি আবার পান করলাম। এভাবে তিনি যতবার বললেন, আমি ততবার পান করলাম এবং পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে গেলাম। এরপরও তিনি আমাকে বললেন, 'পান করো।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষে আর পান করা সম্ভব নয়।' নবীজী তখন বললেন, 'তাহলে আমাকে দাও।'

আমি নবীজীর হাতে পেয়ালাটি দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধটুকু পান করে নিলেন। [সহীহ বুখারী: ৬৪৫২]

মহানুভবতার ক্ষেত্রেও মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে আপনি হয়তো কখনো তেমন কোনো সম্মানের আচরণ করেননি; সম্মানের আচরণ করেছেন তাঁর কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে। দেখা যাবে, সেও আপনাকে ভালোবাসছে। একদিন আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একটি বক্সে করে নিয়ে এলেন বিভিন্ন মিষ্টান্ন ও খেলনা। এতে নিশ্চয়ই তার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তিনি সেগুলো আমার হাতে দিয়ে বলেন, 'এগুলো ছোটমণিদের জন্য।' বাচ্চারা এসব উপহার পেয়ে খুব খুশি হলো। খুশি হলাম আমিও। কারণ আমি অনুভব করেছি, তিনি আমার সন্তানদের আনন্দ দিতে চান। আর তাদের চেহারায় খুশির ঝিলিক দেখে আমারও ভালো লাগে।

সালাফের এক বিখ্যাত আলিমের ঘটনা। তিনি ছিলেন খুব দরিদ্র। তাই তাঁর ছাত্ররা বিভিন্ন সময় তাকে নানা রকম হাদিয়া দিতো; খেজুর, আটা ইত্যাদি। কেউ যখন তাকে হাদিয়া দিতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করতেন। যতদিন হাদিয়াটি থাকতো, তত দিন তার প্রতি একটু বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। হাদিয়াটি শেষ হয়ে গেলে আবার আগের মতো স্বাভাবিক আচরণ করতেন। তাঁর এক ছাত্র ভাবছিলো, কী হাদিয়া দিতে পারে সে। সে চাইছিলো এমন কোনো জিনিস হাদিয়া দিতে, যার মূল্য

হবে অল্প, তবে থাকবে অনেক দিন। অনেক ভেবে সে তাঁর উস্তাদের জন্য এক প্যাকেট লবণ হাদিয়া হিসেবে নিয়ে গেলো। লবণের মূল্যও কম; আর এক প্যাকেট শেষ হতে লাগেও অনেক দিন। ইচ্ছা করলেই তো আর লবণ বেশি করে ব্যবহার করা যায় না! কখনো কখনো তো এক প্যাকেটে এক-দু' বছরও কেটে যায়।

যদি আপনি আপনার কোনো প্রিয় বন্ধুকে মূল্যবান সুগন্ধি বা আপনার নাম লেখা দেয়ালঘড়ি—এ দু'টির কোনো একটি হাদিয়া দিতে চান এবং কোনটি দিলে ভালো হবে সে বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চান, আমি বলবো, আপনি ঘড়ি হাদিয়া দিন। কেননা তা হবে অধিক স্থায়ী, সবসময় চোখে পড়বে, আবার মূল্যও অনেক কম। আমার এক ছাত্রকে আমি একটি দেয়াল ঘড়ি হাদিয়া দিয়েছিলাম এবং তাতে আমার নাম লেখা ছিলো। এরপর কেটে গেছে কয়েক বছর। ইতোমধ্যে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপন করেছে। একবার আমি দ্বীনী আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এক শহরে গেলাম। হঠাৎ দেখি, আমার সেই ছাত্র সেখানে উপস্থিত। সে আমাকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিলো। তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করতেই সে আমাকে ড্রয়িংরুমের ঘড়িটি দেখিয়ে বললো, ‘এ ঘড়িটি আমার কাছে অনেক মূল্যবান।’ দীর্ঘ সাত বছর পরও সে ঘড়িটির কথা ভোলেনি। ভেবে দেখুন, ঘড়িটির বাজারমূল্য হয়তো অল্প, অতি অল্প; কিন্তু হৃদয়ের বাজারে তার মূল্য অনেক অনেক বেশি, হয়তো অমূল্য।

## দৃষ্টিভঙ্গি

হৃদয়রাজ্য জয় করার সুযোগ অনেক দামী। এ সুযোগ বারবার আসে না।

# ৭৪. কেউ যেন কষ্ট না পায়

মানুষ তাকে অনেক ঘৃণা করতো। কারণ কেউ তার দুর্ব্যবহার থেকে নিরাপদ ছিলো না। আপনি তার হাত থেকে রক্ষা পেলেও জিহ্বা থেকে পাবেন না। আপনার উপস্থিতিতে সে আপনাকে কষ্ট দিতে পারলো না, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনাকে কষ্ট দিয়ে কিছু বলতে সে ভুলবে না। কার্যত লোকটা ছিলো সকলের কাছে ঘৃণিত। তাঁর অস্তিত্ব যেন মানুষের জন্য সুবিশাল পর্বতের চেয়েও ভারী ছিলো।

মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলে আপনি স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে, সাধারণত যাদের কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিই দুর্বল-অসহায়দের প্রতি জুলুম করে। শক্তিশালী ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিদের কষ্ট দেয়ার সাহস দেখায়। সে তাকে হাত দিয়ে প্রহার করে, পা দিয়ে আঘাত করে। যখন তখন অপমানিত-অপদস্থ করে। নিঃস্ব-অসহায় ও দুর্বলদের জন্য হিংস্র হায়েনারূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে অথবা দুঃসাহসিক কোনো কাজে সে ভীরু-কাপুরুষ, যেন এক উটপাখি! অথচ দুর্বলদের বেলায় সে যেন সাহসী সিংহশার্দুল! সম্পদশালীরা দরিদ্রদের ওপর সীমালঙ্ঘন করে। সভা-সমিতিতে তাদের অপমান করে। কথায়-কথায় তাদেরকে কষ্ট দেয়।

একই কথা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য আল্লাহ যাদেরকে মান-মর্যাদা দিয়েছেন, দিয়েছেন পদ বা পদবী, কিংবা দান করেছেন অভিজাত বংশ-

পরিচয়। অসহায়-দুর্বলদের সঙ্গে এদের আচরণ বড় নির্দয় ও কঠোর। সমাজের আম জনতা এসব মানুষকে ঘৃণা করে। তারা সবসময় এদের পতন ও সম্মানহানি কামনা করে। এদের করুণ পরিণতিতে তারা হাসে স্বস্তির হাসি। তাই বাস্তব অর্থে সমাজের সেই সব অসহায়-দরিদ্ররা নিঃস্ব নয়, নিঃস্ব এসব পদ ও পদবীধারীরাই।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এমনটিই বলেছেন। একদিন উপস্থিত সাহাবীদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি বলতে পারো অসহায়-নিঃস্ব ও সম্বলহীন ব্যক্তি কে?’ সাহাবীগণ বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে অসহায়-নিঃস্ব ও সম্বলহীন তো সেই যার টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি কিছুই নেই।’ নবীজী বললেন, ‘না, বরং আমার উম্মতের মাঝে বড় অসহায় ঐ ব্যক্তি, হাশরের মাঠে যে অনেক নামায, অনেক রোযা এবং অনেক সদকার সওয়াব নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু দেখা যাবে, কাউকে সে গালি দিয়েছে। কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। কারো সম্পদ জোরপূর্বক ভক্ষণ করেছে। কাউকে হত্যা করেছে। কাউকে প্রহার করেছে। এবার তাদের প্রত্যেককে তার সওয়াবের অংশ দিয়ে দেয়া হবে। অভিযোগকারীদের একজনকে কিছু সওয়াব দেয়া হবে। আরেকজনকে কিয়দাংশ দিয়ে দেয়া হবে। একপর্যায়ে তার পাহাড় পরিমাণ সওয়াব শূন্য হয়ে যাবে। অথচ এখনো তার অপকর্মের বদলাগুলো দেয়া শেষ হয়নি। এবার সে যাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, যাদের ওপর জুলুম করেছে, সেই অভিযোগকারীদের গুনাহসমূহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। এরপর

গুনাহর বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' [সহীহ মুসলিম: ২৫৮১]

এজন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, 'নবীজী কাউকে কখনো নিজ হাতে প্রহার করেননি। এমনকি স্ত্রী-গোলাম কাউকেই তিনি প্রহার করেননি। কেবল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বিষয়টি ব্যতিক্রম। নির্যাতিত হওয়ার পর নবীজী কারো থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর বিধানে কেউ সীমালঙ্ঘন করলে আল্লাহর ওয়াস্তে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।' [সহীহ মুসলিম: ২৩২৮] আল্লাহর দেয়া নেয়ামতরাজি কেউ মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য ব্যবহার করলে মানুষ তাদের ঘৃণা করে। আখিরাতে শাস্তি প্রদানের আগে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেও বিপদে রাখেন।

আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। সে ছিলো হাফিযে কোরআন, সৎ-মুত্তাকী ও পরহেজগার একজন মানুষ। বিভিন্ন সময়ে বহু লোকজন নানা রোগ-বালাই নিয়ে তার কাছে আসতো। সে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শরীয়তসম্মত ঝাড়-ফুঁক দিতো। মহান আল্লাহ এর ওসিলায় অনেক রোগীকে শিফা দান করেছেন। একদিন তার কাছে এক লোক এলো। লোকটার অবয়বে প্রাচুর্যের ছাপ ফুটে ছিলো। সে আমার বন্ধুর সামনে এসে বসলো এবং বললো, 'শায়খ! দীর্ঘদিন যাবত আমি হাতের ব্যথায় ভুগছি। প্রচণ্ড ব্যথায় মরে যাচ্ছি। রাতে ঘুমাতে পারি না। দিনের

বেলায় একটু বিশ্রাম নিতে পারি না। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা করেই চলেছি। কিন্তু তাতে কোনো উপকার পাইনি। দিন দিন ব্যথা বেড়েই চলছে। জীবন আমার দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। আমার অনেক বাড়ি-গাড়ি, ভবন-বিল্ডিং, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। মনে হচ্ছে, আমার ওপর কোনো হিংসুকের বদ নজর পড়েছে কিংবা কোনো অনিষ্টকারী আমাকে যাদু করেছে।'

শায়খ বলেন, এরপর আমি সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তেলাওয়াত করে তাকে ফুঁক দিলাম। তাঁর অবস্থার তেমন পরিবর্তন হলো না। সে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেলো। কিছুদিন পর সে আবার এলো। আবার সে ব্যথার কথা বললো। আমি কিছু সূরা তেলাওয়াত করে এবারও ফুঁক দিলাম। সে চলে গেলো। কিছুদিন পর আবার এলো। আবার আমি কিছু সূরা তেলাওয়াত করে ফুঁক দিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দিন দিন ব্যথা বেড়েই চললো।

একদিন আমি তাকে বললাম, 'ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন তো, আপনি কখনো কারো হক নষ্ট করেছেন কিনা? কিংবা কোনো দুর্বলের ওপর জুলুম করেছেন কিনা? হয়তো তার পরিণামে আপনি এই শাস্তি ভোগ করছেন। যদি এমন কিছু করেই থাকেন তাহলে দ্রুত তাওবা করুন। সম্পদের মালিককে তার হক ফিরিয়ে দিন এবং অতীত অন্যায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' কিন্তু আমার কথায় সে নরম হলো না। বরং জোর গলায় জেদের সুরে বললো, 'আমি কখনো অন্যের হক অন্যায়ভাবে ভক্ষণ

করিনি। কারো ওপর অত্যাচার করিনি।’ সে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেলো।

দীর্ঘদিন তার সঙ্গে আমার কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হলো না। আমি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলাম। ভাবলাম, লোকটা হয়তো আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে। আমার নসীহতের কারণে হয়তো সে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। অনেকদিন পর একদিন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার সঙ্গে মোলাকাত করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আরে! কী খবর?’

সে বললো, ‘আলহামদু লিল্লাহ! এখন আমি পুরো সুস্থ। কোনো চিকিৎসা বা কোনো ডাক্তার দেখানো ছাড়াই আমার হাত ভালো হয়ে গেছে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কীভাবে ভালো হলো?’ সে বললো, ‘আপনার কাছ থেকে ফিরে আপনার উপদেশ নিয়ে আমি বহু চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার স্মৃতিপটে দীর্ঘক্ষণ বিচরণ করে বারবার স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি, আমি কখনো কারো হক নষ্ট করেছি কিনা। কখনো কারো ওপর জুলুম করেছি কিনা। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, বহু দিন আগে আমি একটি ভবন নির্মাণ করছিলাম। তাঁর পাশেই একখণ্ড জমি ছিলো। জমিটি আমার প্লটের সঙ্গে মিলিয়ে বাড়ি করলে দেখতে বেশ আকর্ষণীয় হবে। আমি ভাবলাম, যে কোনো মূল্যে এই জমি আমার কিনতে হবে। জমির মালিক ছিলো একজন বিধবা মহিলা। কয়েক বছর আগে তাঁর স্বামী মারা গেছে এবং এতিম কিছু ছেলে-সন্তান রেখে গেছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, সে যেন আমার

কাছে জমিটা বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সে বিক্রি করতে চাইলো না। মহিলা বললো, "নগদ টাকা দিয়ে আমি কী করবো? এর চেয়ে বরং জমিটা এভাবেই থাকুক। এতিমের সম্পদ, তাই বড় হয়ে ওরাই এটা কাজে লাগাবে। বিক্রি করে ফেললে আশঙ্কা হয় যে, এই টাকা শেষ হয়ে যাবে এবং এতিমের সম্পদ এদিক সেদিক হয়ে যাবে।" আমি তাঁর কাছে বারবার লোক পাঠালাম জমিটা আমার কাছে বিক্রি করার জন্য। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হলো না।'

শায়খ বলেন, এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছো, তারপর কী করলেন?' সে বললো, 'এরপর আমি আমার বিশেষ ক্ষমতায় জমিটা তার থেকে নিয়ে নিলাম।' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বিশেষ ক্ষমতায়! মানে?' সে বললো, 'আরে! বিভিন্ন মহলে হাত থাকায় জোরপূর্বক আমি তাঁর জমিটা ছিনিয়ে নিলাম এবং আমার জমির সঙ্গে মিলিয়ে ফেললাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর এতিমের মা সেই বিধবা নারী?!' সে বললো, 'জমি দখলের খবর শোনার পর প্রায়ই সেই মহিলা জমির নিকট আসতো। শ্রমিকদের সঙ্গে অনুনয় বিনয় করে কান্নাকাটি করতো। তাঁর জমিতে ভবন তুলতে নিষেধ করতো। আমার ভবনের সেই শ্রমিকরা পাগল মনে করে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। বস্তুত এই মহিলা নয় বরং পাগল তো হয়ে গিয়েছিলাম আমি নিজেই। অসহায় এই বিধবা নারী, নির্যাতিতা এই এতিম-জননী আকাশপানে দু' হাত তুলে কাতর হয়ে ফরিয়াদ করতো। এমন অবস্থা তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হয়তো নীরব রাতে প্রভুর দরবারে তাঁর ফরিয়াদ ছিলো আরো করুণ এবং আরো গভীর।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক। তাহলে এটাই আপনার কষ্টের কারণ হয়েছিলো।' সে বললো, 'আপনার নসীহত শোনার পর আমি সেই মহিলার তালাশে নেমে পড়লাম। অনেক খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে একদিন তাকে পেয়ে গেলাম। তাকে সামনে পেয়েই আমি তাঁর কাছে কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। বিনয়ের সঙ্গে ওযর পেশ করলাম এবং বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। একপর্যায়ে সে আমাকে ক্ষমা করে দিলো। আমার জন্য দোয়া করলো। আল্লাহর কসম! তাঁর ফরিয়াদের সম্প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিয়ে আমার জন্য দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে সুস্থতার আবেশ ছড়িয়ে পড়লো।'

এই কথাগুলো বলে ব্যবসায়ী মাথা নিচু করলো। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললো, 'সত্যি, মহান আল্লাহর হুকুমে তাঁর দোয়ায় আমি এমন উপকৃত হয়েছি, বড় বড় ডাক্তারগণও যা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন।'

**বড়রা বলেছেন...**

গভীর রাতে তুমি যখন থাকো ঘুমের ঘোরে,
অসহায় আর নির্যাতিত তখনো জেগেই থাকে;
স্রষ্টা তব জাগরিত সদা থাকেন সবার তরে,
সাড়া দেন তিনি আহাজারি আর করুণ ডাকে।

# ৭৫. জীবন শত্রুতার জন্য নয়

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন, তাদের আচরণ ও উচ্চারণ এবং মেজাজ ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের। কেউ খুব সহজেই রেগে যায়। আর কেউ খুব শান্ত মেজাজের। কেউ খুব মেধাবী, কেউ বড় নির্বোধ। কেউ শিক্ষিত, কেউ মূর্খ। কেউ সব বিষয়কে ইতিবাচক দৃষ্টিতে ভাবে, আর কেউ সামান্য কিছুতেই খারাপ ধারণা করতে শুরু করে। তাই তো কবি বলেছেন, মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হলে সীমালঙ্ঘন-বাড়াবাড়ি বিভিন্ন আচরণ সহ্য করতে হয়। মানুষকে পরিচালনা করাটাও তো এক ধরণের সীমালঙ্ঘন ও-বাড়াবাড়ি।

অত্যাচারী নিজের অনাচার সম্পর্কে বেখবর। সে ভাবে, জগতে সেই সবচে বড় ইনসাফগার! নির্বোধ লোকটিও নিজেকে ভাবে সবচে মেধাবী। আর অপদার্থ-অধর্ম মনে করে, 'আমিই যুগের গাযালী'!

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন যুবক ছিলাম। অবশ্য এখনো আমি [মনে-প্রাণে] যুবকই আছি। তখন মাধ্যমিক স্তরের শুরুর দিকের কোনো শ্রেণীতে পড়তাম। জনৈক মেহমান আমার কাছে এলো। তাঁর উপস্থিতি আমার কাছে বোঝা মনে হচ্ছিলো। আমি জানি না, সে প্রাইমারি স্তরের পড়াশোনাও শেষ করেছে কিনা। তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে এখনো পড়ালেখা করে।

সে যখন উপস্থিত হলো, আমি তখন একটি শরীয়তি মাসআলার সমাধান খোঁজায় ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু মাসআলাটির কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সে আসার পর আমি তাঁর আপ্যায়নের জন্য নাস্তা পরিবেশন করলাম। এরপর মাসআলাটির সমাধান জানতে ফোনে বারবার শায়খ আবদুল আযীয বিন বায রহ.-এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ফোনে তাঁকে পেলাম না। মেহমান আমাকে এত ব্যস্ত দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন?'

বললাম, 'শায়খ বিন বাযের সঙ্গে। তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা জানার ছিলো।' সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বললো, 'সুবহানাল্লাহ! আমি উপস্থিত থাকতে বিন বাযকে জিজ্ঞেস করতে হবে?!'

জীবনে চলার পথে আপনি এমন অনেক মানুষেরই সাক্ষাৎ পাবেন। তখন তাদের এ কষ্টদায়ক আচরণ আপনাকে সহ্য করে নিতে হবে। আপনি তাদের সঙ্গে বিনম্র আচরণ করুন। বরং তাদের অন্তরকে জয় করার চেষ্টা করুন। সাধ্যমতো চেষ্টা করুন, যেন আপনার শত্রু সৃষ্টি না হয়। মনে রাখবেন, এমন সকলকে সংশোধন করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনি তাদের শাসকও নন। তাই এ ধরণের মানুষ থেকে সাধ্যমতো নিজেকে রক্ষা করে চলুন। তাদের বিষয় নিয়ে চিন্তিত বা পেরেশান হয়ে নিজেকে কষ্ট দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই।

**মতামত...**

জীবন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু কাজ তো অনেক। শত্রুতা সৃষ্টির জন্য নষ্ট করার মতো সময় কোথায়?

# ৭৬. যবানই বাদশা!!

আমি এ বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি যে, মানুষের মাঝে কেন ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়? কেন কিছু মানুষের আচরণ অন্যদের কাছে পাহাড়ের চেয়েও ভারী বোঝা মনে হয়? কেন তাদেরকে অন্যরা পছন্দ করে না? কেন তাদের সঙ্গ ও সাহচর্যকে সবাই অপছন্দ করে? কেন তাদের সঙ্গে কেউ সফরেও যেতে চায় না? এমনকি যে অনুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রিত হয়, সে অনুষ্ঠানকেও অন্যরা এড়িয়ে চলে কেন?

আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, অধিকাংশ মানুষকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এই স্তরে নিয়ে আসার পেছনে মূল কারণ হয় তার জিহ্বা। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্কচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ—কত বার কতখানে ঘটেছে কেবল জিহ্বার অপরিণামদর্শী ব্যবহারের কারণে; পরনিন্দা, গালিগালাজ কিংবা ঝগড়া-বিবাদের কারণে। কবি বলেন—

জিহ্বা হলো মানব-অর্ধেক, বাকি অর্ধেক মন
এছাড়া তো মানুষ কেবল রক্ত-মাংস-গড়ন।

ইচ্ছা করলেই আমরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও মনের কথাকে সুন্দর শৈলীতে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তাহলে কেন আমরা আশ্রয় নেবো মন্দ পদ্ধতির? কথিত আছে, প্রতাপশালী এক বাদশাহ একবার স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর সবগুলো দাঁত পড়ে গেছে। তিনি একজন স্বপ্নব্যাখ্যাকারকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। স্বপ্ন শুনে ব্যাখ্যাকারীর চেহারার রঙ

বদলে গেলো। বারবার সে বলতে লাগলো, ‘আল্লাহর পানাহ! আল্লাহর পানাহ!’ তাঁর কথা শুনে বাদশাহ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার! আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?’

সে বললো, ‘এখন থেকে অনেক বছর কেটে যাবে। আপনার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি মরে যাবে। আপনার আত্মীয়স্বজন মারা যাবে। আপনি একাই রয়ে যাবেন আপনার রাজত্বে।’ তাঁর এই কথা শুনে বাদশাহ চিৎকার করে উঠলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি ব্যাখ্যাকারকে গালিগালাজ করতে লাগলেন এবং তাকে বন্দি করে দোররা মারার আদেশ করলেন।

এরপর বাদশাহ আরেক ব্যাখ্যাকারকে ডেকে ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্ন শুনে তার চেহারায় আনন্দভাব ফুটে উঠলো। সে মুচকি হেসে বললো, ‘বাদশাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার স্বপ্ন খুব ভালো।’ বাদশাহ আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বলো, বলো, কী আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা?’

সে বললো, ‘এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আপনি অনেক দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সবার চেয়ে দীর্ঘায়ু হবেন। আর সারা জীবন আপনি বাদশাহ হয়েই বেঁচে থাকবেন।’ তাঁর ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ অত্যন্ত খুশি হলেন। তাকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন। তাঁর প্রতি বাদশাহ সন্তুষ্ট রইলেন আর প্রথমজনের প্রতি অসন্তুষ্ট।

অথচ প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন, বাস্তবে দুই ব্যাখ্যার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, প্রথম জনের উপস্থাপনরীতি ছিলো একরকম, আর দ্বিতীয় জনের উপস্থাপনরীতি ছিলো একটু ভিন্ন। হ্যাঁ, এভাবে

জিহ্বাই মূলত জীবনের পার্থক্য গড়ে দেয়। জিহ্বাই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁর কারসাজিতেই হয় সবকিছু। জিহ্বাই সবচে বড় সরদার।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'বনী আদম সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে, শরীরের সকল অঙ্গ জিহ্বাকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, "আল্লাহকে ভয় করো। আমাদের পরিচালনা তো তোমার অধীনেই। তুমি যদি ন্যায় পথে থাকো, আমরাও ন্যায় পথে থাকবো। আর তুমি যদি বক্র পথে যাও, আমরাও যাবো বক্র পথে"।' [তিরমিযী শরীফ: ২৪০৭, মুসনাদে আহমদ: ১১৯০৮]

হ্যাঁ, বাস্তবে জিহ্বাই সবকিছুর মূল। বাকশক্তিই জুমার খুতবা ও বয়ানের নিয়ন্ত্রক। মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও জিহ্বাই মূল। মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা এবং ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও বাকশক্তির ভূমিকাই প্রধান। লেনদেনের ক্ষেত্রেও মূল ভূমিকা জিহ্বার। অন্যকে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও বাকশক্তিই পালন করে মূল ভূমিকা।

আমি এ কথা বলছি না যে, কারো যদি বাকশক্তি না থাকে, যদি সে কথা বলতে না পারে তাহলে তার জীবনটাই শেষ হয়ে গেলো। না, বিষয়টি এমন নয়। ইন্দ্রিয়হীনতা বা যোগ্যতার অভাব মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারে না। যোগ্যতার যতই অভাব থাকুক; উচ্চাভিলাষ ও সৎ সাহস থাকলে মানুষ সাহসী বীরের মতোই বেঁচে থাকতে পারে। এমনই একটি ঘটনা এখন আপনাদেরকে শোনাবো।

আমার এক বন্ধুর নাম আবু আবদুল্লাহ। আমার অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে সে একেবারেই ব্যতিক্রম, তা বলছি না। তবে—আল্লাহ সাক্ষী—ন্যায় ও কল্যাণকর কাজে সে সকলের চেয়ে অগ্রসর। তাঁর বিশেষ কিছু দাওয়াতি প্রোগ্রাম ও কর্মসূচি আছে। এ সবকিছুই সে তার মূল কাজের ফাঁকে ফাঁকে করতো। এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, সে মুক ও বধিরদের একটি প্রতিষ্ঠানে তাদের ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করতো। একদিন সে ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বললো, 'আচ্ছা! আমি যদি একদিন তোমার মসজিদে আমাদের মুক ও বধিরদের সংস্থার দু' একজনকে বয়ান করতে নিয়ে আসি তাহলে কেমন হয়?'

তাঁর উদ্দেশ্য শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'বধির ও নির্বাক মানুষ সবাক মানুষদের বয়ান করবে?! এ কী করে সম্ভব?!' সে বললো, 'হ্যাঁ, তাই। আমরা আগামী রোববার আসছি।' আমি অধীর আগ্রহে রোববারের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে এলো সেই প্রতীক্ষিত দিন। আমি তাদের অপেক্ষায় মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে আবু আবদুল্লাহ গাড়ি নিয়ে এলো। মসজিদের দরজার কাছেই গাড়ি থামলো। গাড়ি থেকে সে সঙ্গে আরো দু'জনসহ নেমে এলো। একজন তাঁর পাশেই হেঁটে আসছিলো, আর অন্যজনকে আবু আবদুল্লাহ হাত ধরে নিয়ে আসছিলো।

আমি প্রথম জনের দিকে তাকালাম। সে ছিলো বোবা ও বধির; শুনতে পারে না, বলতেও পারে না, তবে দেখতে পায়। দ্বিতীয় জন বোবা, বধির ও অন্ধ।

শুনতে পারে না, বলতে পারে না, এমনকি দেখতেও পায় না। আমি আমার হাত বাড়িয়ে আবু আবদুল্লাহর সঙ্গে মোসাফাহা করলাম। আবু আবদুল্লাহর ডান পাশে যে ছিলো সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিলো। [আমি পরে জেনেছি, তার নাম আহমদ।] আমি তাঁর দিকে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। আবু আবদুল্লাহ হাত ধরে থাকা লোকটির দিকে ইশারা করে আমাকে বললো, 'ফায়েযকেও সালাম করো।' আমি বললাম, 'আসসালামু আলাইকুম, ফায়েয!' আবু আবদুল্লাহ বললো, 'তুমি তাঁর হাত ধরো। সে তো তোমার কথা শোনেও না, তোমাকে দেখেও না।' আমি আমার হাত ফায়েযের হাতে রাখলাম। সে আমার হাত ধরে নাড়া দিলো।

সবাই একে একে মসজিদে প্রবেশ করলো। আবু আবদুল্লাহ নামাযের পর চেয়ারে বসলো। তাঁর ডানে আহমদ, আর বাঁয়ে ফায়েয। মানুষ হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ বয়ানের মিম্বরে কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে দেখে তারা অভ্যস্ত নয়। আবু আবদুল্লাহ আহমদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। আহমদ হাতের ইশারায় ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। উপস্থিত সকলে তাকিয়ে আছে। তারা কিছুই বুঝছে না। আমি ইঙ্গিতে আবু আবদুল্লাহকে আহমদের অঙ্গভঙ্গির মর্ম ব্যাখ্যা করতে বললাম। কারণ তার ইঙ্গিতের মর্ম বধির ব্যক্তি ও বধিরদের ভাষা শিক্ষাকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ বুঝবে না।

আবু আবদুল্লাহ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললো, আহমদ আপনাদেরকে তাঁর হিদায়াত লাভের কাহিনী শোনাচ্ছে। সে বলেছে, 'আমি জন্ম থেকেই

বধির। আমার শৈশব কেটেছে জেদ্দায়। পরিবারের লোকেরা আমাকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করতো। আমার খোঁজ-খবর নিতো না। আমি মানুষকে মসজিদে যেতে দেখতাম। কিন্তু কেন যায়, বুঝতাম না!'
'আমার পিতাকে দেখতাম জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ছেন, রুকূ-সেজদা করছেন। আমি বুঝতাম না, তিনি এসব কী করছেন!'
'পরিবারের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা অবজ্ঞা করতো, কোনো উত্তর দিতো না।'
এতটুকু বলে আবু আবদুল্লাহ থেমে গেলো এবং আহমদকে পুনরায় আলোচনা শুরু করতে ইঙ্গিত করলো।

আহমদ পুনরায় তার আলোচনা শুরু করলো। হাত দ্বারা বিভিন্ন রকম ইশারা-ইঙ্গিত করতে লাগলো। একটু পর তার চেহারার রঙ বদলে গেলো। মনে হলো, সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তার হৃদয় একেবারে বিগলিত হয়ে গেছে। আবু আবদুল্লাহ মাথা নিচু করে বসে রইলো। আহমদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মানুষ তার এই অবস্থা দেখে সীমাহীন প্রভাবিত হলো। অথচ তারা জানে না, কেন সে কাঁদছে। আহমদের ভাব-ভঙ্গি ও ইশারা-ইঙ্গিতই তাদেরকে প্রভাবিত করে তুললো। কিছুক্ষণ পর আহমদ থেমে গেলো।

আবু আবদুল্লাহ বললো, আহমদ এতক্ষণ আপনাদেরকে তাঁর জীবনের বদলে যাওয়ার কাহিনী শোনালো। কীভাবে রাস্তায় দেখা হওয়া একজন মানুষের মাধ্যমে তাঁর জীবন বদলে গেলো, আর কীভাবে সে মানুষটি তাঁর প্রতি

সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে আল্লাহর পরিচয় দান করেছে, নামায পড়তে শিখিয়েছে, সে কাহিনী সে আপনাদেরকে শুনিয়েছে। সে আরো শুনিয়েছে নামায পড়তে শুরু করার পর থেকে দিনে দিনে কীভাবে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতি অর্জন করছে, অন্ধত্বের এই মুসিবতের বিনিময়ে আজরে আযীম ও মহা প্রতিদান লাভের দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং কীভাবে লাভ করেছে ঈমানের অপার্থিব স্বাদ। এ কথা বলে আবু আবদুল্লাহ আহমদের বদলে যাওয়া জীবনের বাকি অংশও শোনাতে লাগলো।

অধিকাংশ শ্রোতা সীমাহীন প্রভাবিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে তার কথা শুনছিলো। কিন্তু আমি ছিলাম অন্যমনস্ক! আমি একবার তাকাচ্ছিলাম আহমদের দিকে, আরেকবার ফায়েযের দিকে। আর মনে মনে ভাবছিলাম, আহমদ তো অন্তত দেখতে পারে, ইশারার ভাষা বুঝতে পারে। তাই আবু আবদুল্লাহ ইশারায় তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময় করছে। দেখা যাক, আবু আবদুল্লাহ ফায়েযের সঙ্গে কীভাবে ভাববিনিময় করে? ফায়েয তো দেখতেও পায় না, বলতে বা শুনতেও পারে না। আমি বারবার শুধু এ কথাই ভাবছিলাম।

আহমদ তার কথা শেষ করলো এবং চোখে জমে থাকা অশ্রুজল মুছতে লাগলো। আবু আবদুল্লাহ এবার ফায়েযের দিকে তাকালো। আমি মনে মনে বললাম, এবার দেখা যাবে কী ঘটে?! আবু আবদুল্লাহ তাঁর আঙুল দিয়ে ফায়েযের হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফায়েয তীরের মতো সোজা হয়ে বসলো। এরপর শুরু করলো তার হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। কিন্তু

প্রিয় পাঠক! আপনি কি ভাবতে পারছেন, কীভাবে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করেছিলো?

কোনো শব্দ উচ্চারণ করে? না, সে তো মুক, বাকশক্তিহীন। সে তো কথা বলতে পারে না। আকার-ইঙ্গিতে? অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে? না, তাও নয়। সে তো অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। ইশারার ভাষা শেখার সুযোগ তার জীবনে আসেনি। সে তার মনের সকল ভাব প্রকাশ করছিলো কেবল স্পর্শ করে! হ্যাঁ, স্পর্শ করাই ছিলো তার মনোভাব প্রকাশের একমাত্র পুঁজি। আবু আবদুল্লাহ ফায়েযের সামনে তার হাত রেখে দিলো। ফায়েয বিভিন্নভাবে তার হাত স্পর্শ করে নিজের মনোভাব আবু আবদুল্লাহকে বোঝাতে লাগলো।

তারপর আবু আবদুল্লাহ আমাদেরকে তা শোনাতে লাগলো। কখনো একটানা পনেরো মিনিট পর্যন্ত আবু আবদুল্লাহ আমাদেরকে শুনিয়ে যেতো, আর ফায়েয নীরব বসে থাকতো। সে তো জানে না, ভাষ্যকারের কথা শেষ হয়েছে কিনা। কারণ সে শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না। আবু আবদুল্লাহ কথা শেষ করে ফায়েযের হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলো। ফায়েয আবার তার হাত উঠালো। আবু আবদুল্লাহ ফায়েযের হাতের মাঝে তার হাত রাখলো। ফায়েয তার হাত স্পর্শ করে বিভিন্ন কিছু বলতে লাগলো। মানুষ অবাক হয়ে একবার তাকায় ফায়েযের দিকে, আবার তাকায় আবু আবদুল্লাহর দিকে। কখনো অবাক হয়, কখনো হয় মুগ্ধ। ফায়েয উপস্থিত সবাইকে তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। কখনো সে তার দুই কান স্পর্শ করছিলো, কখনো জিহ্বা, আবার কখনো চোখের ওপর দু' হাত

রাখছিলো। আবু আবদুল্লাহ বুঝিয়ে বলার পূর্বে ফায়েয কী বোঝাতে চাচ্ছে— আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবু আবদুল্লাহ আমাদেরকে জানালো, সে সবাইকে চোখ-কান ও জিহ্বাকে হারাম থেকে বিরত রাখতে বলেছে।

আমি উপস্থিত মানুষের দিকে তাকালাম। কেউ কেউ মৃদু স্বরে বলছিলো, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আবার কেউ পাশের জনকে কানে কানে কিছু বলছিলো। কেউ কেউ স্থির হয়ে শুনছিলো। কারো চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো।

আর আমি? ভাবতে ভাবতে আমি চলে গিয়েছিলাম বহু দূরে, অন্য এক জগতে। আমি ফায়েয ও আহমদের যোগ্যতা এবং সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর যোগ্যতার মাঝে তুলনা করছিলাম। তুলনা করছিলাম ফায়েয ও আহমদের দ্বীনী খেদমত আর সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দ্বীনী খেদমতের মাঝে। এরা দ্বীনের জন্য কী করে যাচ্ছে আর তারা কী করছে? এই ফায়েয একজন অন্ধ, মুক, বধির ব্যক্তি। সে তার জীবনে দুঃখ-বেদনার যে বোঝা বয়ে বেড়ায়, হয়তো তা এখানে উপস্থিত সকলের জীবনের দুঃখ-বেদনার সমান কিংবা বেশি হবে। কবির ভাষায়—

হাজার মিলেও কভু পারে না একজনেরই কাজ
কভু একাই গড়ে এক পৃথিবী, রাখে সবার লাজ।

সীমিত যোগ্যতার একজন লোক, কিন্তু দ্বীনের খেদমতের জন্য সবসময় ব্যতিব্যস্ত। নিজেকে সে ইসলামের একজন সৈনিক, একজন দায়ী ভাবে। সে মনে করে, প্রত্যেক গুনাহগার, দ্বীন পালনে উদাসীন প্রতিটি ব্যক্তির

ব্যাপারে সে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। সে তার অস্থির হাতকে নাড়িয়ে বোঝাতে চাচ্ছে অনেক কিছু। সে যেন বলছে, হে নামায পরিত্যাগকারী! আর কত দিন? হে হারাম দর্শনে লিপ্ত! আর কত দিন? হে পাপাচারে মগ্ন! আর কত দিন? হে হারাম ভক্ষণকারী! আর কত দিন? হে শিরক আর বিদআতে ব্যতিব্যস্ত! আর কত দিন? আর কত দিন? বলুন, সবাই বলুন, আর কত দিন? আর কত দিন এই নির্লিপ্ততা? আর কত দিন এই দ্বীনবিমুখতা? আর কত দিন এই অন্যায় আর অনাচারের জীবন? ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র আর স্নায়ু-মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধই কি যথেষ্ট নয়?! তদুপরি আপনারা মুসলমানরাও নেমেছেন ইসলাম ধ্বংসের যুদ্ধে?!

তাঁর অস্থির-অসহায় চেহারা বারবার বদলে যাচ্ছিলো। হৃদয় নিংড়ে সে মানুষকে বোঝাতে চাচ্ছিলো তার মনের ব্যথা। যদি সম্ভব হতো সে তার হৃদয়টাই খুলে রেখে দিতো সবার সামনে। উপস্থিত সকলে তার বয়ান শুনে খুব প্রভাবিত হলো। আমি মানুষের দিকে তাকাইনি। তবে তাদের কান্না ও তাসবীহ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। ফায়েয তার ভাব প্রকাশ শেষ করলো। আবু আবদুল্লাহ তার হাত ধরে দাঁড় করালো। মানুষ তার সঙ্গে সালাম-মোসাফাহা করতে ভিড় জমালো। আমি দেখলাম, সেও মানুষকে সালাম করে চলেছে। আমার মনে হলো, তার অনুভব ও উপলব্ধিতে সব মানুষ সমান। সকলকেই সে সালাম করছে। রাজা-প্রজা, নেতা-কর্মী, ধনী-গরীব সবাই তার কাছে সমান। সে তো জানে না, কে রাজা আর কে প্রজা, কে নেতা আর কে কর্মী, কে ধনী আর কে দরিদ্র।

আমি মনে মনে বলছিলাম, ‘ফায়েয! আমাদের সমাজের সুবিধাবাদী কিছু মানুষও যদি তোমার মতো হতো!’ আবু আবদুল্লাহ ফায়েযের হাত ধরে তাকে মসজিদের বাইরে নিয়ে চললো। আমি তাদের পাশে হাঁটতে লাগলাম। তারা গাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। আবু আবদুল্লাহ এবং ফায়েয পরস্পর আনন্দ বিনিময় করছিলো।

আহ! কত তুচ্ছ এই দুনিয়া! ফায়েয তার জীবনে যে পরিমাণ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে, পৃথিবীতে কত মানুষ তার চারভাগের একভাগেরও শিকার হয়নি। অথচ তারা কেউ পারেনি ফায়েযের মতো করে সংকীর্ণতা ও দুঃখ-বেদনাকে জয় করতে। কোথায় সেই সব অসুস্থ ব্যক্তিরা? কোথায় গ্যাস্ট্রিক-আলসার, কুষ্ঠ-ক্যান্সার বা ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্তরা? কেন তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারছে না? কেন তারা নিজেদের জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না? [কারণ, ফায়েযের মতো তারা নিজেদের অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। জীবনের অনিবার্য দুর্যোগকে স্বাভাবিকভাবে বরণ করে নিতে পারেনি। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে বিপদে-দুর্যোগে ফেলে পরীক্ষা করেন, আর সে বান্দার অন্তরজগতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পান সেখানে নেই কোনো অভিযোগ-অনুযোগ, বরং আছে শোকর ও কৃতজ্ঞতা, রেযা ও তুষ্টি এবং সওয়াব লাভের প্রত্যাশা; তখন আল্লাহ না জানি কত খুশি হন! কী চমৎকার সেই মুহূর্তটি!]

সে ঘটনার পর কত দিন কেটে গেছে। কিন্তু আজও আমার চোখে ভাসে ফায়েযের সেই অবয়ব, সেই আকুলতা। ফায়েয যদি দৃষ্টিহীন, শ্রবণ ও বাকশক্তিহীন হয়েও জীবনে সফল হতে পারে, মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে তাহলে আল্লাহ যাকে দিয়েছেন অফুরন্ত বাকশক্তি, দিগন্ত জোড়া দৃষ্টিশক্তি আর সুতীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, সে কি পারবে না জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে? সে কি পারবে না মানুষের হৃদয়জগত জয় করতে? প্রিয় পাঠক! কী বলেন আপনি?

তাই আসুন, আপনার রসনা ও উচ্চারণকে ব্যবহার করে অর্জন করুন মানুষের হৃদয়, মানুষের ভালোবাসা।

**বাস্তবতা...**

মানুষ এক টুকরো মাংসপিণ্ডের নাম নয় যে, খেয়ে ফেলা হবে! মানুষ নাম নয় ত্বক ও চামড়ার যে, কাপড়ের মতো গায়ে জড়ানো হবে! তাহলে মানুষ কিসের নাম? ভাষার মাধুর্য ছাড়া আর কিসের নাম মানুষ!

# ৭৭. বচনকে সংযত রাখুন

“মানুষ নির্দ্বিধায় অনেক কথা বলে ফেলে। কখনো কখনো তার অলক্ষেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় মারাত্মক ভুল কোনো কথা বা মন্তব্য। অথচ সে একে মনে করে ‘খুবই সাধারণ’, ‘অতি তুচ্ছ’। কিন্তু এই ‘অতি সাধারণ’ কথাই হতে পারে আল্লাহর চরম অসন্তুষ্টির কারণ। কখনো তো এই সাধারণ কথার কারণে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় ক্রোধকে অবধারিত করে দেন।”

পরিণাম চিন্তা না করে কথা বলা সম্পর্কে এভাবেই কঠিন ভাষায় সতর্ক করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিহ্বাকে সংযত না রাখলে কখনো তা মানুষকে চরম ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। জনৈক আরব কবির কাব্য চিত্রায়ণ দেখুন। জিহ্বাকে সাপের সঙ্গে তুলনা করে কত নির্মম একটি সত্যের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

বচন বড় সামলে রেখো, হে আদম সন্তান!
এই সর্পের মরণ-ছোবলে করো না গো ক্ষয় প্রাণ
যাদের নামেতে কাঁপতো একদা শত বীর-পালোয়ান,
বচন-ছোবলে তারা দেখো আজ শুয়ে আছে নিষ্প্রাণ।

স্ত্রীর অসংযত কথনের কারণে পৃথিবীর কত দেশে কত সংসার ভেঙেছে! স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সামান্য কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে, তো স্ত্রী বারবার বলতে থাকে, ‘দে! তালাক দে! বুকের পাটা

থাকলে তালাক দে! বাপের বেটা হয়ে থাকলে তালাক দে!’ স্বামী তাকে চুপ থাকতে বলে, কখনো উঁচু স্বরে, কখনো ধমকের সুরে। একপর্যায়ে বিষয়টি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে, স্বামী বেচারার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে তালাক দিয়ে বসে। আর পরে উভয়ে অনুতাপে ভোগে সারাজীবন। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগের সময় উম্মতকে চুপ থাকার আদেশ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকাই সমীচীন। কেননা জিহ্বাকে যে সংযত রাখতে পারে না, তার জীবন ধ্বংসের পথে সদা ধাবমান থাকে। কবি বলেন—

পা পিছলে পড়ে গিয়ে হয়নি কারো প্রাণহানি,
যবান হোঁচট খেলে কভু জীবন দিতে হয় জানি।

কিছুদিন পূর্বে আমি দু'টি পরিবারের মাঝে জমি-জমা নিয়ে সৃষ্ট একটি সমস্যা নিরসনের জন্য গিয়েছিলাম। বিষয়টি নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। সে ঘটনার মূল প্রেক্ষাপটই এখন আপনাদের শোনাচ্ছি।

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, জীবনের ষাটটি বসন্ত যিনি পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। একবার তিনি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শিকার-প্রমোদে বের হলেন। সবাই প্রায় সমবয়সী। তাদের মাঝে শুরু হলো বিভিন্ন কথাবার্তা ও শৈশবের স্মৃতিচারণ। একপর্যায়ে তারা পূর্বপুরুষদের জায়গা-জমি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা চলাকালে কোনো একটি জমি প্রসঙ্গে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে খুব মতানৈক্য দেখা দিলো। বয়োবৃদ্ধ

ব্যক্তিটি তা নিজের জমি বলে দাবি করছেন আর অন্যজনের আবদার, সেটা নাকি তার দাদার!

তাদের কথা কাটাকাটি তীব্র রূপ ধারণ করলো। একপর্যায়ে জমির মূল মালিক বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোকে যদি আমার জমির কাছে দেখি, তাহলে এটা দিয়ে [শিকারের বন্দুকের দিকে ইঙ্গিত করে] তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।' এরপর সে বন্দুকটি হাতে নিলো এবং তার সঙ্গীর মাথা থেকে দু'তিন মিটার ওপরে তাক করে একটি গুলি ছুঁড়লো। এরপর উভয়ে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লো এবং একে অন্যকে হত্যা করার উপক্রম হলো। কিন্তু তাদের অন্যান্য সঙ্গী কোনো মতে তাদেরকে শান্ত করলো এবং যে যার বাড়িতে চলে গেলো।

যার দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সে সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। 'কত বড় সাহস! আমার মাথার ওপর ও বন্দুক দাগালো। না, এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। আমি ওকে দেখে নেবো।' এসব কথা ভেবে ভেবে সারারাত সে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারলো না। তার চিন্তা জুড়ে এখন শুধুই প্রতিশোধ। সে ভাবলো, আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সকালে সে ক্লাসিনকোভের মতো মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তাকে খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরই সে তার কাঙ্ক্ষিত শিকার খুঁজে পেলো। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি এক বালিকা মাদরাসার কাছে গাড়িতে বসা ছিলো। কিছুদিন পূর্বে সে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। এখন সে মাদরাসার শিক্ষিকাদের যাতায়াতের

প্রাইভেট কার চালায়। প্রতিদিনের মতো মাদরাসার ফটকের সামনে গাড়ি থামিয়ে সে শিক্ষিকাদের বের হওয়ার অপেক্ষায় গাড়িতেই বসে ছিলো। তার পাশেই রয়েছে আরো অনেক গাড়ি। সবগুলোই শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য।

শিকারী বন্ধু দূরে একটি গাছের পেছনে লুকিয়ে রইলো, যাতে কেউ টের না পায়। তার দৃষ্টিশক্তি ছিলো দুর্বল। এবার সে চেহারা দেখে শিকারকে টার্গেট করলো। আপ্রাণ চেষ্টা করে ঠিক তার মাথা বরাবর অস্ত্র তাক করলো এবং বন্দুকের ট্রিগার চেপে ধরলো। ভীষণ শব্দে গুলির আওয়াজ শোনা গেলো। চালকের মাথায় পরপর তিনটি গুলি বিদ্ধ হলো। লোকদের মাঝে সাড়া পড়ে গেলো। ছাত্রীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করলো। চারদিকে শুধু ভীত-হতবিহ্বল মানুষের চিৎকার-ধ্বনি। পুলিশ এসে পুরো এলাকা ঘিরে ফেললো। গুলিতে লোকটির মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

এদিকে হত্যাকারী পূর্ণ শান্ত-সমাহিত। সে নিজেই থানায় চলে গেলো। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশ অফিসারকে সবকিছু জানালো। সে বললো, ‘আমিই অমুককে খুন করেছি এবং আমার অন্তর্জ্বালা মিটিয়েছি। এখন আপনারা আমাকে হত্যা করতে পারেন, পুড়িয়ে ফেলতে পারেন কিংবা চাইলে বন্দি করেও রাখতে পারেন। আপনাদের যা ইচ্ছা, করতে পারেন।’ অবস্থা দেখে পুলিশ কর্মকর্তারাও অবাক। এমন অভিজ্ঞতা তাদের কর্মজীবনে আর হয়নি। তারা তাকে ‘বিচার-অপেক্ষমাণ’ আসামিদের

কামরায় নিয়ে গেলো। তদন্ত অফিসার সরেজমিনে ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ করার জন্য বের হলেন। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো আরো বড় বিস্ময়! নিহত ব্যক্তির পরিচয়পত্র চেক করে জানা গেলো, নিহত ব্যক্তি তার ওই সঙ্গী নয় যাকে মেরে সে তার অন্তর্দহন নেভাতে চেয়েছিলো। সে ভিন্ন একজন চালক, ঘটনার সঙ্গে যার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

অফিসার দ্রুত থানায় দৌড়ে এলেন। হত্যার উদ্দিষ্ট বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হত্যাকারীর সেলের সামনে এসে বললেন, ‘এই যে! তুমি কি একে হত্যা করেছো বলে দাবি করছো? গুলি তো অন্য একজনের শরীরে বিদ্ধ হয়েছে।’ শিকারকে জীবিত দেখে শিকারী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। সে সজোরে চিৎকার করে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ছটফট করতে লাগলো। একটু পরে সে বেহুঁশ হয়ে গেলো। এভাবেই কেটে গেলো কয়েকদিন। এরপর তার হুঁশ ফিরে এলো এবং সে সুস্থ হলো। পরবর্তীতে তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিচারক তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন। আবু বকর রাযি. সত্যই বলেছেন, ‘জিহ্বার চেয়ে অধিক বন্দি থাকার প্রয়োজন কারো নেই।’

মদের নেশায় মাতাল হয়ে চরম নির্বুদ্ধিতার শিকার এক খলীফার ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। একদিন সে তার বন্ধুর সঙ্গে বসে ঠাট্টা-তামাশা করছিলো। সুযোগ পেয়ে চির অভিশপ্ত ‘শয়তান’ তার কাজ শুরু করে দিলো। গাফিলতের একপর্যায়ে তারা মদ পান করলো এবং আকণ্ঠ

পানে নিমজ্জিত হলো। অনেক অনিষ্টের মূল উৎস ‘শরাব’ও তার কাজ শুরু করলো। মদের নেশায় তারা মাতাল হয়ে গেলো।

শয়তান ও শরাবের যুগপৎ শিকার খলীফা যেন কিছুক্ষণের জন্য গাধার চেয়েও নিম্ন স্তরে উপনীত হলো। সে তার প্রহরীকে ডাকলো এবং বন্ধুর দিকে ইশারা করে বললো, ‘একে হত্যা করো!’

খলীফার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাই প্রহরী তার কাছে গিয়ে পা ধরে হেঁচড়ে টেনে নিতে লাগলো। বন্ধুটি চিৎকার করছিলো আর কাতর স্বরে খলীফার সাহায্য চাচ্ছিলো। মাতাল খলীফার না বোধ ছিলো, না বিবেক অবশিষ্ট ছিলো। সে শুধু উচ্চ স্বরে হাসছিলো আর বলছিলো, ‘একে হত্যা করো! হত্যা করো!’

প্রহরীগণ তাকে হত্যা করে ফেললো এবং মৃতদেহ একটি পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দিলো। পরদিন সকালে খলীফা তার প্রিয় বন্ধুর খোঁজ করলো। সে উপস্থিত প্রহরীদেরকে বললো, ‘আমার অমুক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসো।’

প্রহরীগণ বললো, ‘আমরা তো তাকে মেরে ফেলেছি।’

‘মেরে ফেলেছো?!’

‘কে হত্যা করলো?’

‘কেন?’

‘কার নির্দেশে?’

বন্ধুর বিয়োগ-বেদনায় খলীফার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। হতবিহ্বল হয়ে সে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। উত্তরে তারা বললো, 'গত রাতে আপনিই তো তাকে হত্যা করতে বলেছিলেন!'

তারা খলীফাকে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে সে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলো এবং অনুতাপে মাথা নিচু করে রইলো। কিছুক্ষণ পর সে বললো, কিছু শব্দ যেন প্রতিমুহূর্তে জনান্তিকে বলতে থাকে, 'তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাও। তুমি আমায় বর্জন করো'।

তাই প্রিয় পাঠক! আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কেবল বাক ও বাকযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে বহু মানুষের মনে ঘৃণাবোধ জন্মাতে পারে, অনেক সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে, নিজের ধ্বংস ও পতনের পথ উন্মুক্ত হতে পারে। ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, 'আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু মানুষ হারাম ভক্ষণ, চুরি-ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে পারে কিন্তু জিহ্বাকে অন্যায় উচ্চারণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। সে মানুষের সম্মানে আঘাত হানতে পারে অথচ জিহ্বাকে সংযত রেখে নিজের সম্মানকে রক্ষা করতে পারে না।'

**আশ্চর্য...**

সৃষ্টির সকল জীবের দীর্ঘ রসনা, তবু তারা কথা বলে না, বকতে পারে না। আর সৃষ্টির সেরা জীবের ছোট্ট একটি বাকযন্ত্র, তবুও বলা ও বকায় যেন নেই তার তুলনা! সৃষ্টি ও সৃষ্টি রহস্য বড় অদ্ভুত! বড় বিস্ময়কর!

# ৭৮. চাবিকাঠি

প্রশংসা হলো মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করার অন্যতম চাবিকাঠি। সুন্দরভাবে কথা বলতে পারার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম দক্ষতা হলো অন্যকে শোধরানোর আগে তার ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করা এবং তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে অভ্যস্ত হওয়া। তাই কাউকে তার ভুল ধরিয়ে দেবার ক্ষেত্রে প্রথমে লক্ষণীয় বিষয় হলো এটি।

ভুল অনেকেই শুধরে দেয়। কিন্তু অন্যের উপদেশ ও ভুল শোধরানোকে সবাই গ্রহণ করে না। অহঙ্কার কিংবা ভুলের ওপর অটল থাকার মানসিকতাই এর একমাত্র কারণ নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদান ও সংশোধনের পদ্ধতিগত ভুলই এর মূল কারণ হয়ে থাকে।

মনে করুন, চিকিৎসার জন্য আপনি কোনো সরকারি হাসপাতালে গিয়েছেন। ঢোকার মুখেই অভ্যর্থনাকক্ষে দেখতে পেলেন, কাঁচের অপর প্রান্তে দায়িত্বশীল যুবক বসে আছে। সে বসে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আশেপাশে কী হচ্ছে—সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

এদিকে দৃষ্টিশক্তিহীন এক বয়োবৃদ্ধ ক্লান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে ধরা ছোট্ট এক শিশু, আর বাম হাতে চিকিৎসাপত্র। সে অপেক্ষায় আছে, কখন রিসেপশনিস্ট তা ডাক্তারের কাছে হস্তান্তর করবে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ মহিলা। হাত ধরে আছে ছোট্ট একটি মেয়ের। মেয়েটি কাঁদছে, তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর। বৃদ্ধাও একই অপেক্ষায়, কখন যুবক

রিসেপশনিস্ট পত্রিকা পড়া শেষ করে তার মেয়েটিকে কোনো শিশু-বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবে।

এ দৃশ্য দেখে আপনার শরীরটা রাগে জ্বলে উঠলো। আর এমনটিই হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না। আপনি উত্তেজিত স্বরে তাকে বলতে লাগলেন, 'এই মিয়া! আপনি হাসপাতালে বসেছেন, নাকি...? আপনার মনে কি আল্লাহর ভয় নেই?'
'রোগীরা ব্যথায় কাতরাচ্ছে আর আপনি বসে বসে পত্রিকা পড়ছেন? আবার সিগারেটও টানছেন বড় আয়েশ করে!'
'মিয়া! আপনার ব্যাপারে তো এম.ডি. সাহেবের কাছে নালিশ জানানো দরকার। অভ্যাস ছাড়তে না পারলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যান।' এভাবে আপনি তাকে একের পর এক এ জাতীয় কথা বলেই চললেন।

মনে করুন, আপনি যদিও সকল মানুষের সামনে উচ্চ স্বরে তাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন কথা বলেছেন কিন্তু সে আপনার মত উত্তেজিতও হলো না, আপনার কথার কোনো উত্তরও দিলো না। কিংবা আপনার কথা শুনে সে পত্রিকা রেখে দিলো এবং রোগীদেরকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো শুরু করলো।

কিন্তু বলুন, এভাবে কি আপনি আসল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন? কক্ষনো না। বিদ্যমান পরিস্থিতিটুকু শোধরাতে পারলেও আপনি মূল সমস্যার কোনো সমাধানই করতে পারেননি। আজ যদিও সে আপনার কথা মেনে

নিয়েছে কিন্তু আগামীকাল ও পরশু তো সে আবার এ জাতীয় নিন্দনীয় আচরণ করবে। তখন আপনি তাকে কীভাবে বাধা দেবেন?

আপনি বরং কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আবেগের পরিবর্তে বিবেক দিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করুন। তার নির্লিপ্ত আচরণে আপনার মনে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, আপনার আচরণ ও উচ্চারণে তা যেন প্রকাশ না পায়।

প্রথমেই তার কাছে গিয়ে আপনি সুন্দর করে হাসুন। ভেতরে ভেতরে যদিও আপনি রাগে ফেটে যাচ্ছেন তবুও আপনি মুচকি হাসুন। আপনার হাসিটা যদি কিছুটা বিবর্ণও হয় তবুও আপনি হাসুন এবং বলুন, ‘আসসালামু আলাইকুম!’ একটু অপেক্ষা করুন। এরপর তাকে এমন কিছু বলুন যা তাকে আপনার প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য করবে। যেমন আপনি বলতে পারেন, ‘ভাই! কেমন আছেন? আল্লাহ আপনার জন্য আজকের সকালটি কল্যাণ ও শান্তির উপলক্ষ বানিয়ে দিন।’

এখন সে অবশ্যই মাথা ওঠাবে এবং বলবে, ‘আলহামদু লিল্লাহ! ভালো আছি।’ ইতোমধ্যে আপনি সমস্যার অর্ধেক সমাধান করে ফেলেছেন। এই ধাপে আপনি কোনো প্রশংসাসূচক বাক্য বলে তার মনোযোগ আরো কাছে টেনে নিন। আপনি বলতে পারেন, ‘সত্যি আপনার মত মানুষই হাসপাতালের অভ্যর্থনা-বিভাগে কাজ করার যোগ্য!’ দেখবেন, মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারা পাল্টে যাবে এবং সে বলে উঠবে, ‘কেন?’

আপনি বলুন, 'আপনার চমৎকার এই চেহারা দেখলে তো রোগী এমনিতেই সুস্থ হয়ে যাবে। তার আর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না!' আপনার সৎ সাহস দেখে সে অবশ্যই অবাক হবে। আর এখন সে আপনার উপদেশ শোনার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

সে বলবে, 'ভাই! আপনার কী সমস্যা?' তখন আপনি বলুন, 'ভাইজান! দেখুন এই বয়োবৃদ্ধ লোকটি এবং ওই অসহায় বৃদ্ধ মহিলাটি কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যদি তাদেরকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন?' এবার সে শীঘ্রই তাদের স্লিপ নেবে এবং তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। এরপর আপনার কাগজটাও নেবে।

যখন আপনার সিরিয়াল আসবে এবং সে আপনাকে আপনার স্লিপ দেবে তখন আপনি বলুন, 'সুবহানাল্লাহ! এটাই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আর প্রথম সাক্ষাতেই আপনি আমার মনে জায়গা করে নিয়েছেন। বুঝতে পারছি না, কীভাবে এমন হলো?' 'আল্লাহর শপথ, আপনি আমার কাছে হাজারও মানুষের চেয়ে প্রিয়।' [আর বাস্তবে আপনি সত্যই বলেছেন। কেননা সে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমান তো নিঃসন্দেহে আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ কাফিরের চেয়ে প্রিয়।]

এ কথায় সে অনেক খুশি হবে এবং আপনার নমনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। এরপর আপনি বলুন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিলো। মন চাচ্ছে বলি, কিন্তু আপনি যদি রাগ করেন...।' তখন সে অবশ্যই বলে উঠবে, 'না, না, আমি রাগ হবো কেন? আপনি দয়া করে বলুন।'

এবার আপনি তাকে উপদেশ দিন। ‘এ চাকুরির ব্যবস্থা করে আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। হাসপাতালের প্রবেশদ্বারেই আপনি আছেন। আপনি তো অন্যদের জন্য আদর্শ। আপনি যদি রোগীদের সঙ্গে একটু নমনীয় আচরণ করতেন, গুরুত্ব দিয়ে তাদের সহায়তা করতেন তাহলে বেশ ভালো হতো। হতে পারে আপনার ছোট্ট এই অনুগ্রহে সিক্ত হয়ে কোনো বৃদ্ধ সাধক বা বৃদ্ধা আবিদা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে আপনার নাম নিয়ে দোয়া করবে আর তার দোয়ায় আপনার জীবন সুখের হবে।’

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, অবনত মস্তকে সে আপনার কথা শুনতে থাকবে আর বারবার বলতে থাকবে, ‘শুকরিয়া! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।’ আপনি যাকেই সংশোধন করতে চান এ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করুন। কেউ নামাযে অবহেলা করে, কোনো পিতা তার কন্যাদের পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করে আর তার মেয়েরা অবাধে খোলামেলা চলাফেরা করে কিংবা কোনো যুবক পিতামাতার সঙ্গে অবাধ্য আচরণ করে—এদের সংশোধনের জন্য আপনাকে যথোপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের অনুশীলন করতে হবে।

অন্যের সংশোধনের ক্ষেত্রে আপনি কোমল ও মন নরম করা কথা বলুন, শালীন আচরণ করুন এবং তার মতামতকে সম্মান করুন। আপনি তাকে বলুন, ‘ভাইয়া! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি না। তবে আমি জানি, আপনি সদুপদেশ গ্রহণ করেন।’ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

আয়ে ۝১২ [সূরা মুজাদালাহ]

অর্থ: তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সংশোধনের লক্ষ্যে এমন সব পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করতেন, যার ফলে তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাসূলের উপদেশ গ্রহণ করতো। একবার তিনি মুআয বিন জাবালকে নামাযের পর পঠিতব্য একটি যিকির শেখাতে চাইলেন। তিনি মুআযকে বললেন, « يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ» 'মুআয! শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে মুহাব্বত করি। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর কিছুতেই এ দোয়া পড়তে ভুলো না:

اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ: আয় আল্লাহ! আমায় তাওফীক দিন আপনার যিকর ও স্মরণের, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকরের এবং যথাযথভাবে আপনার ইবাদত আদায়ের।' ^১[সুনানে আবু দাউদ: ১৩০১]

আমি আপনাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, বলুন দেখি, হাদীসের শেষ অংশ 'তুমি প্রত্যেক নামাযের পর কিছুতেই এ দোয়া পড়তে ভুলো না'—এর সঙ্গে কথার প্রথম অংশ 'শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে মুহাব্বত করি'—এর কী সম্পর্ক? 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'—এ কথা বলার পর তো যথাযথ ছিলো এ জাতীয় কথা বলা যে, 'আমি তোমার কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে চাই' কিংবা 'তোমাকে কিছু অর্থ দিতে চাচ্ছি' অথবা 'আগামীকাল আমার বাড়িতে তোমার খাবারের দাওয়াত'। কিন্তু এসব কিছু না বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলার পর যিকিরের প্রসঙ্গ কেন?

এটা খুব ভাবার বিষয়। আপনি কি জানেন, নবীজীর কথা 'শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে মুহাব্বত করি' বলার যথার্থতা কী? এর মাধ্যমে মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রোতাকে জাগ্রত চেতনার সঙ্গে উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করলেন। যখন তার মন খুশিতে ভরে গেলো, আনন্দে আপ্লুত হলো তখন তিনি তাকে উপদেশ প্রদান করলেন।

আরেকবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ডান হাত ধরলেন। এরপর একান্ত আপনের মত তার ডান হাতের ওপর নিজের বাম হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'আবদুল্লাহ, তাশাহহুদের বৈঠকে এই দোয়া পড়বে:
اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ...
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তা মুখস্থ করলেন, আত্মস্থ রাখলেন। এর কয়েক বছর পর নবীজী ﷺ ইন্তেকাল করেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ সবসময় গর্ব করে বলতেন, 'আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তাশাহহুদ শিখিয়েছিলেন তখন আমার হাতের তালু তাঁর দু'হাতের তালুর মাঝে ছিলো।'

আরেকদিন নবীজী ﷺ লক্ষ্য করলেন যে, ওমর রাযি. যখন ভিড়ের মধ্যে কাবা তাওয়াফ করেন, কখনো কখনো হাজরে আসওয়াদের কাছে চুমু খাওয়ার জন্য দ্রুত এগোতে গিয়ে অন্যদের ধাক্কা দেন। ওমর রাযি. ছিলেন শক্ত-সামর্থ্যবান শরীরের অধিকারী, অনেক সময় দুর্বলদের শরীরেও তাঁর ধাক্কা লাগতো। হুজুর ﷺ তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে চাইলেন। প্রথমে তিনি ওমরের মনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বললেন,

«يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ» 'ওমর! আপনি দেখি অনেক শক্তিশালী পুরুষ।' নবীজীর প্রশংসা শুনে ওমর রাযি. অত্যন্ত খুশি হলেন। এরপর নবীজী ﷺ বললেন, 'আপনি হাজরে আসওয়াদের কাছে ধাক্কাধাক্কি করবেন না।'

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি.কে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের উপদেশ দিতে চাইলেন। তাই তিনি বললেন, « نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» 'আবদুল্লাহ বড় ভালো মানুষ। সে যদি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতো!' ^১[সহীহ বুখারী: ১০৫৪] আরেক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, « يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» 'আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না। সে পূর্বে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতো আর এখন তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিয়েছে।' ^১[সহীহ বুখারী: ১০৮৪]

হুজুর ﷺ সকল মানুষের সঙ্গে—বিশেষ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে—এ চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। নবুয়তের শুরু যুগের ঘটনা। কেউ কেউ রাসূলের দাওয়াত কবুল করে ঈমানের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন, আবার কিছু মানুষ ঈমানের দৌলত অর্জন না করেই ফিরে যাচ্ছে। মদীনায় সুআইদ বিন সামিত নামে একজন ব্যক্তি ছিলো। সে ছিলো একাধারে জ্ঞানী, কবি এবং নিজ গোত্রের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জ্ঞানীজনদের অনেক বাণী ও উক্তি তার মুখস্থ ছিলো। কথিত আছে, সে দার্শনিক লোকমান হাকিমের সকল উক্তি মুখস্থ বলতে পারতো। লোকেরা তার জ্ঞান-গরিমা,

কাব্য-প্রতিভা, মেধা ও বংশ-মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 'কামিল' বা 'পরিপূর্ণ মানব' বলে ডাকতো। নিচের প্রজ্ঞাপূর্ণ পংক্তিমালা তারই রচিত:

যাকে তুমি আপন ভাবো, বন্ধু বলে ডাকো
পশ্চাতে সে বলছে কী—তার খবরটা কি রাখো?
সামনে এলে মিষ্টি কথা, অতি আপনজন
আস্তিনে তার বিষের ছুরি, মারতে কতক্ষণ?
ভুবনজয়ী হাসি মুখে, অতি আপন ভাব
বক্ষজুড়ে অবিশ্বাস আর কুটিলতার ছাপ
বক্র চোখের দৃষ্টিতে তার লুকিয়ে আছে দেখো
প্রতিহিংসা, প্রবঞ্চনা—সাবধানেতে থেকো।

একবার সে হজ কিংবা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলো। মক্কার লোকেরা তার আগমন সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে এলো। হুজুর ﷺ-ও সংবাদ পেয়ে তার কাছে এলেন এবং তাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন। তাকে তাওহীদ-রিসালাতের কথা বললেন এবং এ কথাও জানালেন যে, তিনিই সে নবী যার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ কোরআন মহান আল্লাহর বাণী আর এতে রয়েছে অনেক সদুপদেশ ও জীবনপথের নানা বিধি-বিধান, দিকনির্দেশনা।

সুআইদ বললো, 'আপনার কাছে যা আছে, তার মত জ্ঞানগর্ভ কথামালা আমার কাছেও আছে।' হুজুর ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাছে কী আছে?' সে বললো, 'হাকীম লোকমানের সারগর্ভ উক্তিমালা!' যদিও সে

মানব-উক্তিকে কালামে ইলাহীর সঙ্গে তুলনা করেছে তবুও হুজুর ﷺ তাকে ভর্ৎসনা কিংবা তাচ্ছিল্য করলেন না। তিনি তার প্রতি কোমল আচরণ করলেন এবং বললেন, 'আমাকে তা শোনান তো।'

সুআইদ লোকমানী হিকমত ও বাণীসমষ্টি শোনাতে শুরু করলো, আর হুজুর ﷺ মনোযোগসহ শান্তভাবে শুনতে লাগলেন। যখন তার বলা শেষ হলো, হুজুর ﷺ তাকে বললেন, 'নিঃসন্দেহে এ বড় সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা।' এরপর রাসূল তাঁর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বললেন, 'আমার কাছে যা আছে তা এর চেয়েও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মূল্যবান। আর তা হলো কোরআন, যা আল্লাহ তাআলা আমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন। কোরআন মানবজীবনের পথনির্দেশক ও পথচলার আলোকবর্তিকা।' এরপর তিনি তাকে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সুআইদ মন দিয়ে চুপচাপ শুনলো।

হুজুরের আচরণ ও উচ্চারণ এবং কোরআনী ঐশী আকর্ষণে সুআইদ অত্যন্ত প্রভাবিত হলো। সে বললো, 'নিঃসন্দেহে এটি অতি উত্তম বাণী।' এরপর সে মদীনায় চলে গেলেও শ্রুতবাণীর প্রভাব তার মাঝে রয়ে গেলো। কিন্তু তার মদীনায় ফেরার কিছুদিন পরেই আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে ছিলো আওস গোত্রের। খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে মেরে ফেললো। এসব কিছু হুজুরের মদীনা হিজরতের পূর্বের ঘটনা। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিনা, তা জানা যায় না। অবশ্য তার গোত্রের লোকেরা বলতো, 'আমাদের ধারণা সে মুসলমান অবস্থায়ই মারা গেছে।'

তার সঙ্গে রাসূলের আচরণ ও ব্যবহার নিয়ে একটু ভাবুন। দেখুন, কোনোরূপ ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের পরিবর্তে চরিত্র মাধুর্য দিয়ে কীভাবে রাসূল তাঁর হৃদয়রাজ্য জয় করলেন।

**এককথায়...**

অন্যের প্রশংসায় হোন উদার আর সমালোচনায় অতি সংযত।

# ৭৯. হৃদয়-অ্যাকাউন্টে ভালো লাগার অ্যামাউন্ট!

আমরা যখন কোনো মানুষের কথা ভাবি তখন তার কোনো ছবি আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে? মনে করুন, বাজারে কারো সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো আর সে ভ্রু কুঁচকে আপনার দিকে তাকালো। পরে তার সঙ্গে সবজির দোকানে দেখা হলো। সেখানেও সে ভ্রু কুঁচকে আপনার দিকে তাকালো। এরপর সাক্ষাৎ হলো বিয়ের অনুষ্ঠানে। সেখানেও সে চেহারা মলিন করে আপনার দিকে তাকালো। আপনি নিশ্চয়ই মনের পর্দায় তার একটি ছবি এঁকে রাখবেন। পরবর্তীতে যখনই তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে কিংবা কখনো তার নাম শুনবেন, আপনার স্মৃতিতে ভেসে উঠবে তার সেই ভ্রু-কুঞ্চিত মলিন চেহারা। বলুন, তাই নয় কি?

এবার আসুন, বিপরীত একটি চিত্র কল্পনা করি। জনৈক ব্যক্তি প্রথম দেখাতেই আপনার সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করলো। পরের সাক্ষাতেও সে আপনাকে দেখে মুচকি হাসলো। এরপর আরেকদিন দেখা হওয়া মাত্রই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় এগিয়ে এলো। তখন নিশ্চয়ই আপনার স্মৃতিতে তার উজ্জ্বল একটি ছবি অঙ্কিত হবে। পরবর্তীতে যখনই আপনার তার কথা স্মরণ হবে, তার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি আপনার স্মৃতিতে ভেসে উঠবে। এভাবে একজন মানুষের আচরণ ও উচ্চারণের কারণে তার যে ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, পরবর্তীতে তার সেই ছবিই আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ক্ষণিকের, সাক্ষাৎ অল্পক্ষণের—তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন। পক্ষান্তরে যাদের সঙ্গে আমাদের সর্বদা সাক্ষাৎ হয়; যেমন স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, অফিসের সহকর্মী, এলাকার প্রতিবেশী—তাদের সঙ্গে আচরণ-উচ্চারণ নিশ্চয়ই সবসময় একরকম হয় না। কখনো তাদের দেখে আমরা মুচকি হাসি। আবার কখনো তারা রাগান্বিত অবস্থায়, কখনো ভ্রুকুঞ্চিত অবস্থায়ও আমাদেরকে দেখে। এমনকি কখনো কখনো তারা আমাদেরকে ঝগড়া করতে কিংবা গালি দিতেও দেখে। কেননা, আমরা তো মানুষ। মানবিক আচরণ চাইলেও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। পরবর্তীতে আমার আচরণের ভালো-মন্দের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের অন্তরে আমার স্থান নির্ধারিত হবে। আমার আচরণ ও উচ্চারণে ভালোর প্রকাশ যত বেশি হবে, আমার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ততই সুন্দর হবে।

বিষয়টিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আপনি তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন আর সেখানে প্রতিনিয়ত সঞ্চয় করছেন শ্রদ্ধা, আবেগ ও ভালোবাসা। তাদের সঙ্গে আপনার প্রতিটি হাসিমুখের সাক্ষাৎ তাদের হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি তার ভালোলাগার অ্যামাউন্ট বৃদ্ধি করছে। প্রতিটি উপহার তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি তার ভালোলাগার অ্যামাউন্ট বৃদ্ধি করছে এবং প্রতিটি সৌজন্যমূলক আচরণ তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি তার ভালোলাগার অ্যামাউন্ট বৃদ্ধি করছে।

তেমনই তার সঙ্গে আপনার অপমানকর, বিব্রতকর প্রতিটি আচরণ কিংবা গালমন্দ তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি তার ভালোলাগার অ্যামাউন্ট কমিয়ে দিচ্ছে। যদি তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি ভালোলাগার অ্যামাউন্ট অধিক হয় এবং ঘটনাক্রমে কোনো দিন আপনার থেকে অশোভনীয় কোনো আচরণ প্রকাশ পেয়ে যায়, তবুও তা তেমন প্রভাব ফেলবে না। কারণ তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আপনার প্রতি ভালোলাগার অ্যামাউন্ট অনেক বেশি পরিমাণে সঞ্চিত আছে। কবির ভাষায়:

তব প্রিয়জন হঠাৎ কখনো একটুখানি ভুল
করলেই কি হয়ে যাবে বলো চক্ষুদ্বয়ের শূল?
শত উপকার, প্রীতি-ব্যবহার, গুণের কথা ভুলে
একটি ভুলের জেদ ধরে ভাই যেয়ো না তাকে ভুলে।

বিপরীতে তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে যদি আপনার প্রতি ভালোলাগার অ্যামাউন্ট থাকে অল্প, আর মাঝে মধ্যেই অশোভনীয় আচরণের কারণে তা হ্রাস পেতে থাকে, তবে তা বড় প্রভাব ফেলবে। আপনার প্রতি তার হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হবে কিংবা আপনাকে তার মনে হবে ভারী বোঝা। কারণ দিনে দিনে আপনার সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যালেন্স কমছে, নতুন করে কিছুই যোগ হচ্ছে না।

স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা কোনো মহিলাকে তালাকের কারণ জিজ্ঞেস করুন। সে বলবে, ‘একেবারেই তুচ্ছ কারণে। সে আমাকে তার সঙ্গে তার বোনের বাড়িতে যেতে বলেছিলো। আমি না করতেই সে রেগে ওঠে এবং গালমন্দ করতে করতে একপর্যায়ে আমাকে তালাক দিয়ে বসে।’

আপনি যদি একটু বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাবেন তবে বুঝতে পারবেন, এই তুচ্ছ বিষয়টি কিছুতেই তালাকের কারণ হতে পারে না। এ তো সেই দিয়াশলাইয়ের কাঠির ভারে উটের কোমর ভেঙে যাওয়ার গল্পের মতো তুচ্ছ অজুহাত। কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তির হৃষ্টপুষ্ট একটি উট ছিলো। একবার সে সফরের মনস্থ করলো। সে তার সফরের সামানা উটের পিঠে উঠিয়ে বাঁধতে লাগলো। উটটি স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে তার পিঠে প্রায় চারটি উটের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো। বোঝার ভারে উটটি বারবার কেঁপে উঠছিলো। উপস্থিত লোকেরা বারবার তাকে সতর্ক করে বলতে লাগলো, 'যা উঠিয়েছো, তাই অনেক। উটটি এর বেশি একটুও বহন করতে পারবে না।'

কিন্তু সে এতটুকুতে তুষ্ট ছিলো না। এরপরও সে খড়ের একটি আঁটি উটের পিঠে রাখলো এবং বললো, 'এটিই শেষ, এটা বেশ হালকা'! খড়ের আঁটিটি রাখতে না রাখতেই উটটি ধপাস করে মাটির ওপর পড়ে গেলো। এই ঘটনা পরবর্তীতে প্রবাদ-গল্পে পরিণত হয় এবং এ দিকে ইঙ্গিত করেই তৈরি হয় প্রবাদ বাক্য—'দিয়াশলাইয়ের কাঠি উটের কোমর ভেঙে ফেলেছে!'

ঘটনাটা নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, খড়ের আঁটিটি এখানে উপলক্ষ মাত্র। সে যেন বিনা অপরাধে অভিযুক্ত মজলুম! খড়ের আঁটিটি মূলত উটের কোমর ভাঙ্গেনি, বরং বড় বড় বোঝার ভারই তার কোমর ভেঙে দিয়েছে। বোঝা ওঠানোর শুরু থেকেই উটটি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে।

একসময় যখন তার সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে তখন সামান্য জিনিসের ভারেই তার কোমর ভেঙে গেছে।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটির অবস্থাও অনুরূপ। আমি তো পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে, শুধু স্বামীর সঙ্গে বোনের বাড়িতে যেতে অস্বীকার করাটাই তার তালাকের কারণ নয়। বরং পূর্বের কৃত আরো অনেক অন্যায় ও অপরাধ ছিলো এর মূল কারণ। যেমন এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে:

১. স্বামীর আদেশ অমান্য করা...

২. তার চাওয়া পূর্ণ না করা...

৩. তার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ না করা...

৪. কারণে-অকারণে জেদ ধরা...

৫. তার মত ও সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন না করা ইত্যাদি।

পদে পদে তার এ জাতীয় আচরণের কারণে স্বামীর হৃদয়-অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত ভালোবাসার অ্যামাউন্ট হ্রাস পেয়েছে, নতুন করে কিছুই যোগ হয়নি। হৃদয়ে ব্যথার জখম হয়েছে, সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়া হয়নি। এতদিন স্বামী বেচারা ধৈর্য ধরেছিলো, সব কিছু সহ্য করছিলো। অবশেষে যখন সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে তখন এ সামান্য বিষয়ই তালাকের কারণ হয়ে গেছে এবং ‘উটের কোমর’ ভেঙে গেছে।

এর বিপরীতে স্ত্রী যদি স্বামীর সব বিষয়ে যত্নবান হতো, তার সঙ্গে সদাচরণ করতো, প্রেমপূর্ণ ভাব প্রকাশ করতো, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বিনিময়

করতো, হাসি-ঠাট্টা গল্প করতো, স্বামীর পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যত্নবান হতো এবং তার প্রতিটি মত ও সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করতো তবে তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে স্ত্রীর প্রতি ভালোলাগার অ্যামাউন্ট অনেক বেশি হতো। তার হৃদয়ে স্ত্রীর জন্য শত-কোটি ভালোবাসা জমা হতো। পরবর্তীতে ঘটনাক্রমে যদি সে স্বামীর বোনের বাড়িতে যেতে অস্বীকারও করতো, তাতে তেমন কিছু ঘটতো না। তার এই একটি দোষ বহু গুণের সাগরে হারিয়ে যেতো।

একই কথা ওই দুষ্ট ছাত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার সামান্য কোনো অপরাধে শিক্ষক অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন এবং তাকে পিটিয়ে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের করে দিয়েছেন আর সে অভিযোগের সুরে বলছে, 'আমার অমুক সহপাঠী তো আমার চেয়েও বড় অপরাধ করে। কিন্তু শিক্ষকগণ তাকে কিছুই বলেন না। আর আমি তেমন কিছুই করলাম না। বিনা অনুমতিতে একটু দুষ্টামি করলাম! অতি সামান্য এই অপরাধে তিনি আমার সঙ্গে এমন আচরণ করলেন!'

তার তো এই অনুভুতি নেই যে, তার 'অতি সামান্য' এই অপরাধ তো ওই দিয়াশলাইয়ের কাঠির মতো যা উটের কোমর ভেঙে দিয়েছে। এতদিন সে কেবল ক্ষতই তৈরি করেছে, সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়নি। পরস্পর ঝগড়ারত সহপাঠীদ্বয় কিংবা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাই আমাদের সকলের উচিত—যার সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হয়, তার হৃদয়-অ্যাকাউন্টে আমার প্রতি তার ভালোলাগার অ্যামাউন্ট সঞ্চয় ও বৃদ্ধির চেষ্টা করা। স্বামীকে স্ত্রীর অন্তরে তা সঞ্চয় করার সুযোগ খুঁজতে হবে আর স্ত্রীকেও স্বামীর অন্তরে তা জমা করার চেষ্টায় থাকতে হবে। সন্তানকে পিতার হৃদয়ে তা গচ্ছিত রাখার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষক-ছাত্র, ভাই-ভাই এমনকি পরিচালক ও অধীনস্থ কর্মচারী—সবারই এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

**সংক্ষেপে...**

তব প্রিয়জন হঠাৎ কখনো একটুখানি ভুল
করলেই কি হয়ে যাবে বলো চক্ষুদ্বয়ের শূল?
শত উপকার, প্রীতি-ব্যবহার, গুণের কথা ভুলে
একটি ফুলের জেদ ধরে ভাই যেয়ো না তাকে ভুলে।

# ৮০. সম্মোহনী কথা বলুন

‘ভাই! মিষ্টি কথা বলতে তো কোনো পয়সা লাগে না। তাই মিষ্টি মিষ্টি কিছু কথা বলুন। ওর মুখে তো তিতা কথা ছাড়া কোনো কথাই নেই।’ এমন শব্দেই বেচারী স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার করছিলো। সত্যিই! সে তার স্ত্রীর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহে কোনো ত্রুটি করেনি ঠিক; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সে স্ত্রীকে মিষ্টি কথায় মুগ্ধ করতেও পারেনি।

অভিজ্ঞজনদের মতে একজন দক্ষ সেলসম্যান ও বিক্রেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে তার কথা দিয়ে ক্রেতাকে মুগ্ধ করবে। সে বারবার বলবে, ‘ভাই, আসুন, আসুন। কোনো সমস্যা নেই, সবকিছু ঠিকঠাক মত দেবো।’ বিক্রেতার কথা যত সুন্দর হবে তার মূল্যায়ন ততই বাড়বে। আর সুন্দর ব্যবহারের সঙ্গে যদি পণ্যের গুণগত মানও ভালো হয় এবং ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করার পারদর্শিতাও থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই। বলা যায়, ‘সোনায় সোহাগা’।

এ বিষয়ে অভিজ্ঞজনদের সম্মিলিত মত হলো, একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির যেসব গুণ থাকা উচিত তার অন্যতম হচ্ছে—মনকাড়া বাচনভঙ্গি ও সুমিষ্ট ভাষা; মানুষ যেন তার কথা শুনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী যতোধিক কৃপণ, ততোধিক অসুন্দর; তারপরও স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট, বরং আকৃষ্ট। কারণ, স্বামী কথার জাদুতে তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে।

সদ্য কৈশোর পেরোনো জনৈক যুবকের কথা জানি, সে তরুণীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করতো। মেয়েদের আকৃষ্ট করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো ছেলেটির। কত তরুণী যে তার প্রেমে আবিষ্ট হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ছেলেটির না আছে লেটেস্ট মডেলের কোনো গাড়ি, যে মেয়েদেরকে তাতে চড়ার প্রলোভন দেখাবে। না আছে মানিব্যাগ ভর্তি টাকা, যে ইচ্ছেমতো উপহার-গিফট দিয়ে তাদেরকে আসক্ত করবে। এমনও নয় যে, তার চেহারায় আকর্ষণীয় কিছু আছে। বরং চেহারার অবস্থা তো এই যে, আমার সব সময়ের কামনা, আল্লাহ যেন আপনাকে তাঁর দর্শন সৌভাগ্য(!) দান না করেন!

কিন্তু তাঁর ছিলো বলার এক আশ্চর্য শক্তি। এমন মধুর বুলি, পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হবে আর আসক্ত হৃদয় তো সংজ্ঞা হারাবে! তাঁর কথার জাদুতে মুগ্ধ শ্রোতা অতি যত্নের চুল কেটে ফেলতেও দ্বিধা করবে না, উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিতীয় বার ভাববে না। কথার যাদুতেই সে তরুণীদের শিকার করে, বরং বলা ভালো—সম্মোহিত করে ফেলে। কবিতার ছন্দে যেন কবি এ ধরণের সম্মোহনী কথনশক্তির কথাই বুঝিয়েছেন—

মুখনিসৃত বাণী তব জানি জাদুর আকর্ষণ
কতো ভালো হতো যদি নাহি হতো হাজারো প্রাণ নিধন!
যত বলো তুমি ততো শুনি আমি মধুর আকর্ষণ
বারবারই তাই শুনিতে যে চাই, আরো হোক কিছুক্ষণ!

ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনুন। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে তিনজন ব্যক্তি উপস্থিত হলো। কায়েস বিন আসেম, যবরকন বিন বদর ও আমর বিন আহতাম। তিনজনই বনু তামীম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তারা প্রত্যেকেই নবীজীর সামনে আত্মপ্রশংসায় ব্যস্ত হলো।

প্রথমে যবরকন বললো, 'আল্লাহর রাসূল! আমি বনু তামীম গোত্রের সরদার। তারা আমাকে যথেষ্ট মান্য করে, আমার ডাকে সাড়া দেয়। আমি তাদেরকে অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত রাখি। তাদের অধিকার রক্ষায় সচেতন থাকি।' এটুকু বলে সে আমর বিন আহতামের দিকে ইশারা করে বললো, 'এই আমর আমার সম্পর্কে সব জানে।'

আমরও তার কথার সমর্থন করে বললো, 'সত্যিই হে আল্লাহর রাসূল! ইনি বাধা ডিঙিয়ে যে কোনো কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। পক্ষপাতিত্ব হতে শত ক্রোশ দূরে থাকেন। বিচার-মজলিসে তাঁর উপস্থিতি ও মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়।' আমর এটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হলো। প্রশংসা করতে গিয়ে সে অতি প্রশংসায় রত হলো না।

যবরকন আমরের মুখ থেকে আরো কিছু স্তুতি শোনার আশা করছিলো। আমরের সুসংক্ষিপ্ত মন্তব্য তাকে মুগ্ধ করতে পারলো না। তার মনে হলো, আমর বোধহয় তার নেতৃত্ব সহ্য করতে পারছে না বলেই প্রশংসায় এত কৃপণতা করেছে! তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমর আমার ব্যাপারে যা কিছু জানে, সব বলেনি। হিংসার বশবর্তী হয়ে সে অনেক কিছু গোপন করেছে।'

এ কথা শুনে আমরও খুব চটে গেলো। সে বললো, ‘আমি আপনাকে হিংসা করি?! আল্লাহর শপথ! আপনি তো বড় উদ্ভট অনুমানকারী, হঠাৎ প্রাচুর্যের মোহে শেকড় ভুলে যাওয়া এক নির্বোধ অহঙ্কারী, তুচ্ছ কারণে পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্টকারী।’

এরপর আমর নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বললো, ‘আল্লাহর রাসূল! আমি শুরুতে যা বলেছি, তাও সত্য; এখন যা বলেছি, তাও নয় অসত্য। তবে আমার স্বভাব হলো—কারো প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তার গুণগাথা গেয়ে বেড়াই। আর কারো প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিই।’ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বর্ণনামূলক প্রতিঘাত ও প্রমিত উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, «إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْرًا» ‘নিশ্চয়ই কিছু কথা জাদুর মত প্রভাব বিস্তারকারী।’ ^১[মুসতাদরাকে হাকিম: ৬৬৪৫]

তাই প্রিয় পাঠক! আপনিও হোন সুভাষী, স্নিগ্ধভাষী, প্রিয়ভাষী। কেউ এসে যদি আপনাকে বলে, ‘ভাই! আমাকে একটা কলম দিন তো।’ আপনি তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বলুন, ‘জ্বী ভাই! নিন।’ কেউ যদি আপনাকে বলে, ‘ভাই, আমার একটা কথা আছে।’ আপনি বলুন, ‘অবশ্যই, অবশ্যই! বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি। আমি প্রস্তুত...।’ মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী কোমল ভাষায় কথা বলুন। এতে আপনার কোনো ক্ষতি তো হবেই না, বরং মানুষ মুগ্ধ হবে, মনে দ্বিধা বা সংশয় থাকলে তা দূর হবে।

হুনাইন যুদ্ধের পর আনসারদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। আনসারগণ নবীজীর সঙ্গে থেকে প্রতিটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। জিহাদের প্রতিটি আহ্বানে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, জিন্দেগি কোরবানি করেছেন। বদরপ্রান্তরে জানতোড় লড়াই করেছেন। ওহুদ প্রান্তরে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন। খন্দক যুদ্ধে প্রবল শত্রু-বেষ্টনীতেও অটল থেকেছেন। মক্কাবিজয়ের ঐতিহাসিক অভিযানেও তারা অংশগ্রহণ করেছেন।

মক্কাবিজয়ের পর মুসলমানগণ হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আসুন, শায়খাইন বুখারী-মুসলিমের বর্ণনার আলোকে শুনি সেই যুদ্ধের একটি ঘটনা। প্রতিপক্ষ তায়েফ বাহিনী সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো। শুরুতেই যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো। শত্রুবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিঃসঙ্গ রেখে পশ্চাদপদ হলো। মুসলমানদের পরাজয় যেন সময়ের ব্যাপার।

নবীজী সাহাবীদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়েই সকলে দৌড়ে পালাচ্ছে! নবীজী উচ্চ স্বরে আওয়াজ দিলেন, «يَا مَعْشَرَ اَلْأَنْصَارِ!» ‘হে আনসারগণ!’ রাসূলের আহ্বানে সকলে সমস্বরে ‘লাব্বাইক’ বলে সাড়া দিলেন। ফিরে এলেন ঝড়ের বেগে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে গেলেন নবীজীর সামনে। শত্রুবাহিনীর প্রতিটি আঘাত ফিরিয়ে দিলেন তরবারির আঘাতে। নবীজীর জন্য নিজেদের জান কোরবানি

করলেন। এবার কাফির বাহিনী পালাতে শুরু করলো। মুসলমানগণ বিজয়ী হলেন।

যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করা হলো। আনসাররা নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো মদীনায় রেখে আসা ক্ষুধার্ত সন্তানদের স্মৃতি, অনাহারী-উপবাসী পরিবারের স্মৃতি। সবাই এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসার মত একটা বিশেষ অংশ পাওয়ার আশায় ছিলেন।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আকরা বিন হাবিস রাযি.কে ডেকে পাঠালেন। তিনি নওমুসলিম। মক্কাবিজয়ের কয়েক দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবীজী তাকে একশত উট প্রদান করলেন। এরপর হযরত আবু সুফিয়ান রাযি.কে ডেকে তাকেও একশত উট দিয়ে দিলেন। এভাবে নবীজী মক্কাবাসীদের মাঝে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে লাগলেন। অথচ তারা ইসলামের জন্য আনসারদের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করেননি। আনসারদের ন্যায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। ইসলামের জন্য নির্দ্বিধায় প্রাণ উৎসর্গ করেননি।

আনসারগণ সম্পদবণ্টনে এমন রীতি দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ক্ষমা করুন! তিনি আমাদের রেখে কোরাইশদেরকেই শুধু গনীমতের মাল দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি এখনো তাদের রক্তে রঞ্জিত!' এ অবস্থা দেখে আনসার-সরদার সা'দ বিন উবাদা রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল!

আপনার কিছু আনসারী সাহাবী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে আপনার নীতিতে মনে কষ্ট পেয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন?! তারা কেন কষ্ট পেয়েছে?!' সা'দ রাযি. বললেন, 'আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আপন সম্প্রদায়ের মাঝে বণ্টন করেছেন। আরব গোত্রগুলোকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। অথচ আনসারগণ তা হতে সামান্য অংশও পায়নি। এ বিষয়টাই তাদের মনে পীড়া দিয়েছে।'

নবীজী বললেন, 'সা'দ! এ বিষয়ে তোমার অবস্থান কী?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার গোত্রেরই একজন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুভব করলেন, বিষয়টির সমাধানে এমন একটি সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োজন, যাতে আনসারী সাহাবীদের অর্থ সমস্যার সমাধান না হলেও মনের সমস্যার সমাধান হবে। তাদের বিত্তের অভাব দূর না হলেও চিত্তের সংশয় দূর হবে।

নবীজী সা'দকে বললেন, 'তোমার গোত্রের লোকদের সমবেত হতে বলো। আমি আসছি।' সকলে সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তাআলার শানে হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, 'হে আনসারগণ! আমি জানতে পারলাম তোমরা নাকি নিজেদের মধ্যে কিছু অনুযোগ করছো?'

উপস্থিত আনসারী সাহাবীগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কিছুই বলেননি। উঠতি বয়সের কয়েকজন যুবক বলে ফেলেছে, "আল্লাহ ক্ষমা করুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের রেখে

কোরাইশদেরকেই শুধু গনীমতের মাল দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি এখনো তাদের রক্তে রঞ্জিত!'''

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি পথহারা ছিলে না? তারপর আল্লাহ কি আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেননি?'

'অবশ্যই! আমাদের ওপর সকল অনুগ্রহ-অনুদান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।'

'তোমরা কি নিঃস্ব ছিলে না? এরপর আল্লাহ কি তোমাদের সচ্ছল জীবন দান করেননি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবারিত করুণা।'

'তোমরা কি পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করতে না? অনন্তর আল্লাহ কি তোমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেননি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপার দয়া, অগণিত অনুগ্রহ।'

এরপর নবীজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পুরো মজলিস জুড়ে সবাই নীরব। রাসূল অপেক্ষা করছেন। সকলে অপেক্ষমাণ। নীরবতা ভেদ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলে উঠলেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি আমাকে উত্তর দেবে না?'

আনসারী সাহাবীগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা কী উত্তর দেবো? যাবতীয় করুণা ও দান তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই।'

নবীজী বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত কিছু বলতে পারতে। যা বলতে, সত্যই বলতে এবং সবাই তা সত্য বলে মেনে নিতো। তোমরা বলতে পারতে, "মক্কাবাসী আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পর আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরাই তখন আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আপনি উদ্বাস্তু অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনার প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আপনি বিতাড়িত ছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি নিঃস্ব ছিলেন, আমরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছি।"'

এরপর নবীজী তাদের হৃদয়-সাগরে আবেগের ঢেউ ও আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। তাদের অনুভূতিকে আন্দোলিত করে তুললেন। তিনি বললেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা পার্থিব তুচ্ছ সম্পদের জন্য আল্লাহর রাসূলের ওপর মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছো? আমি তো এ সম্পদ দিয়ে একটি কওমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছি। আর তোমাদেরকে তোমাদের [মহা সম্পদ] ইসলামের ওপর সোপর্দ করেছি। তোমরা জানো, কোরাইশরা কিছুদিন পূর্বেও ছিলো মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, কিছুদিন পূর্বেই তাদের জীবনে এসেছিলো দুর্যোগের ঘনঘটা। [মক্কাবিজয়কালীন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।] আমি শুধু চেয়েছি তাদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের অন্তঃকরণে ইসলামের প্রতি হৃদ্যতা সৃষ্টি করতে।'

'হে আনসারগণ! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা উট-বকরি নিয়ে ফিরবে, আর তোমরা বাড়ি ফিরবে আল্লাহর রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে?!'

'মনে রেখো, যদি সকল মানুষ এক গিরিপথ বা উপত্যকায় চলে আর

আনসারগণ চলে অন্য গিরিপথ বা উপত্যকায়, তবে আমি অবশ্যই আনসারদের গিরিপথ বা উপত্যকায় চলবো।'

'সেই সত্তার শপথ, যার কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের জান! হিজরতের ফয়সালা না হয়ে থাকলে আমার জন্ম হতো আনসারদের মাঝেই।'

'হে আল্লাহ! আপনি আনসারদের রহম করুন। আনসার সন্তানদের প্রতি দয়ার আচরণ করুন। তাদের দৌহিত্রদেরও প্রতিও দয়া ও করুণা করুন।'

রাসূলের মর্মস্পর্শী বয়ানে সকলের হৃদয় বিগলিত হলো, নয়ন অশ্রুসজল হলো। আবেগজড়িত কান্নায় তাদের শ্মশ্রুমণ্ডিত অবয়ব সিক্ত হলো। আনসারী সাহাবীগণ বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর রাসূলকে বণ্টনে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট, আমরা আনন্দিত।'

আল্লাহু আকবার! সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো কথা! কী চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা! ভাষার মাধুর্য দিয়ে কখনো কখনো মানুষকে সম্মোহিত ও অনুভূতিশূন্যও করে ফেলা যায়।

বরং কথিত আছে, অনেক দিন পূর্বে মিশরভূমিতে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করতো। প্রভাবশালী এ ব্যক্তিটি 'আল পাশা' নামে মানুষের কাছে পরিচিত ছিলো। সে অনেক ফসলি জমির মালিক ছিলো। এ কারণে সে বেশ অহঙ্কার করতো। গরিব চাষীদেরকে সে তুচ্ছজ্ঞান করতো এবং নানাভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করতো।

কালের পরিক্রমায় একসময় সে দুর্যোগের শিকার হলো এবং জমি-জমা সব হারিয়ে নিঃস্ব-হতদরিদ্র হয়ে গেলো। তার সন্তানরা ভুখা ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করতে লাগলো। ফসলি ভূমিগুলো ছাড়া তার আয়ের অন্য কোনো উৎসও ছিলো না। সে নিজেও চাষাবাদ ছাড়া অন্য কোনো কাজ-কর্ম জানতো না। কিন্তু তার সমস্ত জমি তো হাতছাড়া হয়ে গেছে! নিরুপায় হয়ে সে কাজের তালাশে বের হলো। সন্তানদের মুখে একমুঠো খাবার তুলে দিতে সে আজ যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত!

এতদিন যে চাষীদেরকে সে তুচ্ছজ্ঞান করতো, আজ সে তাদের দ্বারে-দ্বারে ঘুরতে লাগলো। তাদের কাছে অত্যন্ত দীনতা ও হীনতার সঙ্গে কাজ খুঁজতে লাগলো। প্রথম একজনের কাছে গিয়ে সে বললো, 'আপনার কাছে কোনো কাজ আছে? গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা, শস্যদানা মাড়াই ও পরিষ্কার করা, আগাছা সাফ করা, অথবা অন্য যে কোনো কাজের কথা বলুন, আমি করতে প্রস্তুত।'

এ বেচারা একসময় পাশার লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলো। তাই সে পাশার কথায় উত্তেজিত হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, 'আমার কাজ করাবো তোমাকে দিয়ে! তুমিই তো সেই দাম্ভিক-অহঙ্কারী! আল্লাহর লাখো শোকর! তিনি আমাদের দোয়া কবুল করে তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।' এসব বলে সে তাকে বাগান হতে তাড়িয়ে দিলো।

হতাশ মনে পদযুগল টানতে টানতে সে আরেকটি বাগানে প্রবেশ করলো। এ বাগানের মালিকেরও আছে কষ্টদায়ক স্মৃতি। তাই সেও প্রথম চাষীর মত

তাকে তাড়িয়ে দিলো। বেচারা পাশা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলো। কিন্তু সে শূন্য হাতে সন্তানদের কাছে ফিরে যেতেও প্রস্তুত নয়। তাই সে নিজের ভাগ্যকে আরেকবার যাচাই করতে অনেক আশা নিয়ে তৃতীয় আরেক চাষীর বাগানে গেলো। চাষী তাকে দেখে যারপরনাই অবাক হলো। এই চাষীও ইতিপূর্বে একসময় পাশার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলো।

পাশা চাষীকে খুব মিনতি করে বললো, 'আমি একটি কাজ খুঁজছি। আমার সন্তানরা খুবই ক্ষুধার্ত।' চাষী তাকে কৌশলে লাঞ্ছিত করতে এবং আপন প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করলো। চাষী তাকে সম্বোধন করে বললো, 'আসুন আসুন পাশা! স্বাগতম আপনাকে। আপনার আগমনে আমার বাগান আজ উজ্জ্বল, আলোকিত! আজ আমার চেয়ে বড় সৌভাগ্যবান আর কে আছে! মহান পাশা আমার বাগানে তাশরীফ এনেছেন! সত্যিই আপনি বড় মহান! আপনিই সম্মানিত, মর্যাদার পাত্র!'

এভাবে চাষী কথার জাদুতে পাশাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। পাশাও চাষীর কথায় সম্মোহিত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর চাষী বললো, 'আপনাকে স্বাগতম পাশা! আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন। আমার কাছে একটা কাজ আছে। কিন্তু কাজটা আপনার উপযোগী হয় কিনা...?'

পাশা জিজ্ঞেস করলো, 'কী কাজ?'

চাষী বললো, 'আজ আমি জমিতে হালচাষ করবো। আমার যে লাঙল আছে তা টানতে দু'টি ষাঁড় লাগে। আমার দু'টি ষাঁড়ও আছে, একটা সাদা, আরেকটা কালো বর্ণের। ঘটনাক্রমে কালো ষাঁড়টা আজ অসুস্থ হয়ে

পড়েছে। আজ ওটা দিয়ে কাজ করানো যাবে না। আর সাদা ষাঁড়টাও তো একা একা লাঙল টানতে পারবে না। আমি চাচ্ছিলাম, আপনি যদি কালো ষাঁড়টার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন! পাশা! আপনি তো শক্তিশালী পুরুষ। তদুপরি আপনি নেতা মানুষ, সবসময় সামনে থাকার লোক। সামনেই কেবল আপনাকে মানায়!’

পাশা পূর্ণ অহমিকার সঙ্গে হালচাষের জন্য সাদা ষাঁড়টার পাশে দাঁড়িয়ে গেলো! চাষী এসে সর্বপ্রথম সাদা ষাঁড়টাকে লাঙল টানার জন্য রশি দিয়ে বাঁধলো। এরপর পাশার পালা। চাষী তাকেও লাঙলের সঙ্গে বাঁধতে লাগলো। এ সময় চাষী বারবার বলতে লাগলো, ‘বাহ! চমৎকার পাশা! আপনার তুলনা আপনিই পাশা! শক্তিতে-বীরত্বে, সৌন্দর্যে-সৌকর্যে কে আপনার তুলনা!’ পাশাও কৃত্রিম অহঙ্কারে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো!

অবশেষে তাঁর কাঁধে রশি বাঁধা হলো। চাষীও মইয়ের ওপর চড়ে বসলো। তার হাতে ছিলো একটি চাবুক। সে হাল চালনাতে আওয়াজ দিতে শুরু করলো, ‘চল, চল।’ চাষী মাঝে মাঝে ষাঁড়ের পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশাও চলতে শুরু করলো। চাষী বারবার বলতে লাগলো, ‘বাহ পাশা! চমৎকার পাশা! সাবাশ পাশা!’ এভাবে সে ষাঁড়ের পিঠে আঘাত করে চললো, আর বলে চললো, ‘আপনি তো বেশ শক্তিশালী পাশা! আপনি তো দারুণ দক্ষ!’

বেচারা পাশা এসব কাজে কখনো অভ্যস্ত ছিলো না। তবু সে যথাসাধ্য শক্তি খাটিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাল টানতে লাগলো। যেন তার চিন্তাশক্তি

লোপ পেয়ে গেছে। কাজ শেষে চাষী তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে বললো, ‘আল্লাহর শপথ! আপনার কাজ বড় চমৎকার! জানেন পাশা! আমার জীবনে এত সুন্দর দিন আর আসেনি।’ এরপর চাষী তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দিলো। পাশাও বাড়ির পথ ধরলো।

পাশা বাড়িতে সন্তানদের কাছে ফিরে এলো। তার উভয় কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। পায়ের তালু ফেটে রক্ত ঝরছিলো। ঘামে ভিজতে ভিজতে কাপড়-চোপড় বর্ণহীন হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তখনও সে সম্মোহিত, চাষীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ! তার সন্তানরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘বাবা! কোনো কাজ পেয়েছো?’ সে গর্বভরে উত্তর দিলো, ‘আরে আমি পাশা! আমি কোনো কাজ পাবো না!’

‘কী কাজ বাবা?’

‘কী কাজ করেছো?’

‘কী কাজ করেছি? কী কাজ করেছি?’

এতক্ষণে তার চেতনা ফিরতে লাগলো। অবশেষে সে অনুভব করতে পারলো, সারাদিন সে কী কাজ করেছে! কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বললো, ‘আমি ষাঁড়ের খাটুনি দিয়েছি!’

**সিদ্ধান্ত...**

ফল কিনতে গেলে যেমন সবচে ভালোটি চান, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিতে হোন তেমনই সবার সেরা, সবচে প্রিয়ভাষী।

# ৮১. প্রয়োজন পূরণ করতে না পারুন, বচনগুণে মুগ্ধ করুন

কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার কাছে সাহায্যের আশায় এলো আর কোনো সহায়তা না পেয়ে বিষণ্ণ মনে ফিরে গেলো—আপনার জন্য এর চেয়ে কষ্টের মুহূর্ত বোধকরি আর কিছু নেই। মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারা অনেক বড় নেক কাজ। এ বিষয়ে যদি আর কোনো ফযীলতের ঘোষণা নাও থাকতো, তবু বোধকরি নিচের হাদীসটিই ফযীলত হিসেবে যথেষ্ট হতো। নবী কারীম ﷺ বলেছেন, 'আমার এই মসজিদে বসে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়ে আমার কাছে কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে যাওয়াটা অধিক প্রিয়।'

কিন্তু মানুষের এমন কিছু প্রয়োজনও থাকে, যা পূরণ করা বেশ কঠিন। যারা আপনার কাছে ঋণ চায়, তাদের সবাইকে ঋণ দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। যারা সফরে বের হওয়ার সময় আপনাকে সফরসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়, তাদের সবার ডাকেও আপনি সাড়া দিতে পারবেন না। কেউ কোনো প্রয়োজনে আপনার কাছে কিছু চাইতে পারে, যেমন আপনার কলম, ঘড়ি অথবা অন্য কিছু; আপনি সবার প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হচ্ছে—যদি আপনি তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতে না পারেন তাহলে তারা আপনার

ওপর মনোক্ষুণ্ণ হবে, মানুষের কাছে আপনার সমালোচনা করবে, কখনো কৃপণ বলে অপবাদ দেবে, কখনো স্বার্থপর বলে মন্তব্য করবে।

তাহলে এ জটিলতার সমাধান কী? আমাদের করণীয়ই বা কী? সমাধান হলো, এ জাতীয় পরিস্থিতি থেকে আপনাকে দক্ষতার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে। কেউ যদি কখনো আপনার কাছে কিছু চায় আর আপনি তার প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম না হন তাহলে কমপক্ষে কোমল ভাষায় নিজের অপারগতার কথা তাকে জানান। কবি যেমন বলেছেন:

নাইবা আছে অর্থ-কড়ি, কিংবা দেয়ার মত বাহন
বচনগুণে মুগ্ধ করো, নাই বা হোক হাজতপূরণ।

যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি জানতে পারলো, আপনি নির্দিষ্ট এক শহরে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অমনি সে এসে বললো, 'আপনি যে শহরে যাচ্ছেন সেখান থেকে এ জিনিসটা আমার জন্য কিনে আনবেন।' যে কোনো কারণে আপনি তার কাজটি করতে ইচ্ছুক নন। তখন আপনি নিজের অপারগতার কথা তাকে কীভাবে জানাবেন? আপনি তাকে সাহায্য করতে না পারেন, কমপক্ষে বচনগুণে তাকে সন্তুষ্ট করুন। তাকে বলুন, 'ভাই আমার! আমি আপনার কোনো সেবা করতে পারলে আন্তরিকভাবে খুশি হবো। কারণ আপনি আমার কাছে বহু মানুষের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কাজের চাপ ও সময়ের সংকীর্ণতার কারণে আপনার জিনিসটা আনা একেবারেই সম্ভব হবে না।'

অথবা ধরুন, কেউ আপনাকে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দাওয়াত করলো, আর আপনি তার কাছে অপারগতা পেশ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার ভয় হচ্ছে, ওযর পেশ করলে তিনি মনোক্ষুণ্ণ হবেন। আপনি অপারগতা পেশ করার পূর্বে কিছু ভূমিকা টেনে নিন। বলুন, 'ভাই! আমি তোমাকে নিজের ভাইয়ের মত মনে করি। আর আমার হৃদয়ে তোমার মূল্য অনেক বেশি। কিন্তু কী করবো, আমি তো অনুষ্ঠানের রাতে জরুরি এক কাজে ব্যস্ত থাকবো।' বাস্তবেও আপনি মিথ্যা বলেননি, সে রাতে তো আপনি ব্যস্তই থাকবেন। হয়তো সে ব্যস্ততা হতে পারে বাচ্চাদেরকে সময় দেয়া, অথবা কোনো বই পড়া কিংবা নাক ডেকে ঘুমানো! কারণ এর সবগুলোই তো কাজের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের প্রিয়নবী ﷺ মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করে নিতেন উত্তম চরিত্র মাধুর্য দিয়ে। নিচের ঘটনাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে বসে কাবাঘর সম্পর্কে কথা বলছিলেন। ওমরাহ এবং ইহরামের ফযীলত বর্ণনা করছিলেন। নবীজীর আলোচনা শুনে বাইতুল্লাহ যিয়ারতের তামান্নায় সকলের দেহ-মনে আবেগ উথলে উঠলো। নবীজী সবাইকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বললেন। সফরে অগ্রগামিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অল্প সময়ে সকলে আপন আপন প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। সঙ্গে রসদ, আত্মরক্ষার অস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে নিলো।

নবীজী চৌদ্দশ সাহাবীর এক কাফেলা নিয়ে ওমরাহর ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মক্কার পর্বতসমূহের

নিকটবর্তী একটি উপত্যকায় পৌঁছার পর নবীজীর উটনী ‘কাসওয়া’ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উঠাতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু উট সামনে চললো না। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, ‘কাসওয়া অবাধ্যতা শুরু করেছে!’ নবীজী বললেন, ‘না, সে অবাধ্য হয়নি। অবাধ্যতা তার স্বভাবও নয়। তবে হাতির নিয়ন্ত্রণকারী তাকে আটকে রেখেছেন।’১sup>[অর্থাৎ বাদশাহ আবরাহার হাতি। সে যখন ইয়ামেনী বাহিনী নিয়ে বাইতুল্লাহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এসেছিলো, আল্লাহ পাক তাকে আটকে দিয়েছিলেন।]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘কসম সেই সত্তার যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যদি তারা আমার কাছে এমন কোনো ভূখণ্ড চায় যেখানে তারা আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত করবে, যেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে তাহলে তাদের এমন ভূখণ্ড দিয়ে দিতে একটুও দেরি করবো না। এর বিপরীতে কেউ যদি কোনো ভূখণ্ডে আল্লাহর নাফরমানি করে, তাহলে আমি কিছুতেই তাদের হাতে সেটা ছেড়ে দিতে পারি না।’ এরপর নবীজী হাঁক দিতেই উটনীটি লাফিয়ে উঠলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

মক্কার কাছাকাছি হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানগণ তাঁবু ফেললেন। অন্যদিকে মক্কার কাফিরদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছাতেই তাদের গোত্রপ্রধানরা রাসূলের কাফেলাকে বাধা দেয়ার জন্য বের হলো। মুসলমানদের পক্ষ থেকে জানানো হলো, আমরা শুধু ওমরাহর জন্যই মক্কাতে প্রবেশ করবো। উভয় দলের মাঝে সংলাপ-আলোচনা চলতে

লাগলো। সবশেষে কোরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমর এসে নবীজীর সঙ্গে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি করলো যে, মুসলমানগণ এ বছর মদীনায় ফিরে যাবে এবং আগামী বছর ওমরাহ করবে। এরপর সন্ধির ধারাসমূহ লেখা শুরু হলো।

সুহাইল শর্তারোপ করলো, মক্কার কোনো দুর্বল মুসলমান যদি মদীনায় চলে যায়, তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি কোনো মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কায় চলে আসে, তাকে মক্কায় স্বাগত জানানো হবে! মুসলমানগণ বলতে লাগলো, 'সুবহানাল্লাহ! এ কেমন শর্ত! কোনো মুসলমান আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেবো! কীভাবে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেবো, অথচ সে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে!'

এ আলোচনার মাঝেই শৃঙ্খলাবদ্ধ জনৈক যুবক উত্তপ্ত বালুর ওপর পা টেনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলেন। তিনি চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'আল্লাহর রাসূল! ইয়া রাসূলাল্লাহ!' সাহাবীগণ তাকিয়ে দেখলেন এ যে সুহাইলের পুত্র আবু জানদাল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ অপরাধে তার পিতা তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। মুসলমানদের আগমনবার্তা শুনে তিনি বন্দীশালা থেকে পালিয়ে শিকল টেনে টেনে চলে এসেছেন। তার শরীরের বিভিন্ন ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিলো আর চোখ বেয়ে পড়ছিলো বেদনাশ্রু। আবু জানদাল তার

ভেঙে পড়া শরীর নিয়ে নবীজীর সামনে পড়ে গেলেন। মুসলমানগণ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সুহাইল তাকে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগলো, ‘এই ছেলে কীভাবে বন্দীশালা থেকে ছুটে এলো!’ এরপর সে চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘মুহাম্মাদ! এই যুবক প্রথম বন্দী, যাকে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে।’

নবীজী বললেন, ‘আমরা তো এখনো সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করিনি...।’

সুহাইল বললো, ‘আল্লাহর কসম! তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে কোনো চুক্তিই করবো না।’

নবীজী বললেন, ‘অন্তত আবু জানদালের ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দাও।’

সুহাইল উত্তর দিলো, ‘না, আমি অনুমতি দিতে পারি না।’

নবীজী বললেন, ‘অবশ্যই তুমি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারো।’

সে উত্তর দিলো, ‘না, আমি কিছুই করতে পারবো না।’

নবীজী তার এ উত্তর শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক নবীজীর তরে—তিনি কোরাইশদের ইসলামমুখী করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করছিলেন। একজন মুসলমানের কষ্টের কারণে তিনি পুরো সন্ধিচুক্তিকে ভেঙে দিতে চাচ্ছিলেন না। সুহাইল দ্রুত তার ছেলের দিকে এগিয়ে গেলো এবং তার শিকল ধরে তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। আর আবু জানদাল চিৎকার করে মুসলমানদের সাহায্য কামনা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, ‘হে মুসলিম ভাইয়েরা!

মুসলমান হওয়ার পরও আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে! তোমরা কি আমার কষ্ট উপলব্ধি করতে পারছো না? তোমরা কি আমার শরীরে অত্যাচারের নির্মম চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো না?' এভাবে সাহায্য চাইতে চাইতে একসময় তিনি দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। দহনযন্ত্রণায় সাহাবীদের অন্তর গলে যাচ্ছিলো।

টগবগে এক যুবক, সবে যৌবনে পা দিয়েছে। এ সময় তাকে ভোগ করতে হচ্ছে কী নিষ্ঠুর-বর্বরতম শাস্তি! আনন্দঘন সুখময় জীবনের বদলে তার সামনে এখন কঠিন যন্ত্রণা! সে তো মক্কার এক সম্ভ্রান্ত সর্দারের ছেলে। কত সুখেই না সে জীবন কাটিয়েছে। ফেলে আসা দিনগুলোতে কত আনন্দ সে উপভোগ করেছে। কিন্তু আজ... আজ মুসলমানদের সামনে থেকে তাকে শিকল ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্দিত্ব ও নির্মম শাস্তির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কিন্তু মুসলমানগণ কিছুই করতে পারছেন না। আবু জানদাল একা মক্কায় রয়ে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকার শক্তি প্রার্থনা করতে লাগলেন।১sup>[(অসহায় আবু জানদালকে নবীজী ও সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, লেখকের বর্ণনায় তা উল্লেখ নেই। কিন্তু তা হতে পারে আলোচ্য অধ্যায়ের সবচে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাই মুসনাদে আহমদ কিতাবের বরাতে আমরা তা উল্লেখ করে দিচ্ছি।—সম্পাদক) আবু জানদালের অসহায় আর্তনাদ শুনে নবীজী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, « يَا أَبَا جَنْدَلٍ اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ

وَأَعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا، وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ». অর্থ: আবু জানদাল! ধৈর্যধারণ করো এবং এ বিপদকে সওয়াব লাভের উপায় মনে করো। আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার মতো দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য প্রশস্ত আশ্রয়স্থান করে রেখেছেন। দেখো, আমরা কোরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করেছি। তাই পরস্পরের এ অঙ্গীকার আমরা ভঙ্গ করতে পারছি না। আর হযরত ওমর রাযি. ছুটে এসে আবু জানদালের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বললেন, 'ভাই আবু জানদাল! ধৈর্য ধরো। ওরা তো মুশরিক। ওদের রক্ত তো কুকুরের রক্ত!' (মুসনাদে আহমদ: ১৮১৫২)]

মুসলমানগণ নবীজীর সঙ্গে মদীনায় ফিরে এলেন। অন্তরে তাদের অত্যাচারী কাফিরদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা-ক্রোধ আর দুর্বল-অসহায় মুসলমানদের জন্য একবুক কান্না। আবু জানদাল, তার সঙ্গী আবু বাসীর ও মক্কায় অবস্থানরত অসহায় মুসলমানগণ মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। মক্কায় দুর্বলদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেলো। এক সময় তা চলে গেলো সহ্যক্ষমতার বাইরে।

আবু বাসীর বন্দিদশা থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হলেন। বিলম্ব না করে তিনি মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। বুকভরা তার একটাই আশা, অন্তরজুড়ে তার একটাই আকাঙ্ক্ষা—নবীজীর সোহবত-সান্নিধ্য আর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গিত্ব। বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করে তিনি চলছেন। ধূ-ধূ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশিতে তার পা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বহু কষ্টের পর অবশেষে তিনি মদীনায় পৌঁছালেন। মদীনাতুন্নবীর স্পর্শ লাভ করে,

মসজিদুন নববীর দর্শন লাভ করে তিনি ভুলে গেলেন সব কষ্ট, সব বেদনা; নিমিষেই যেন হারিয়ে গেলো সফরের ক্লান্তি ও যন্ত্রণা। দ্রুত তিনি ছুটে চললেন মসজিদে নববীর উদ্দেশে।

সাহাবীদের নিয়ে নবীজী তখন মসজিদে বসে ছিলেন। আবু বাসীর মসজিদে প্রবেশ করলেন। শরীরজুড়ে শত আঘাতের চিহ্ন, দীর্ঘ সফরের ছাপ; ছিন্ন বসন, ধূলোমলিন অবয়ব আর বিক্ষিপ্ত কেশ। আবু বাসীর এখনো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেননি, এরই মধ্যে কোরাইশ কাফিরদের দু'জন এসে উপস্থিত। তারাও এসে মসজিদে ঢুকলো। আবু বাসীর তাদের দেখে ভীত-শঙ্কিত হয়ে কেঁপে উঠলেন। মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো অমানুষিক শাস্তির সেই কঠিন দৃশ্য।

মসজিদে ঢুকেই লোকদু'টি চিৎকার করে বলতে লাগলো, ‘মুহাম্মাদ! কৃত সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।’ নবীজীর স্মরণ হলো কাফিরদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত—‘মক্কা থেকে কোনো মুসলমান মদীনায় এলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে’। তিনি আবু বাসীরকে ইশারা করে মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আবু বাসীর তাদের সঙ্গে বের হয়ে এলেন।

মদীনার সীমানা অতিক্রম করে বাইরে এসে এক জায়গায় তারা পানাহারের জন্য কিছুক্ষণ থামলো। একজন আবু বাসীরের কাছে থাকলো, আর অন্যজন একটু দূরে প্রয়োজন সারতে গেলো। আবু বাসীরের কাছের লোকটি তার তরবারি বের করে নাড়াচাড়া করছিলো, আর হযরত আবু

বাসীরকে বিদ্রূপ করে বলছিলো, 'আমি এই তরবারি দিয়ে আওস-খাযরাজের বিরুদ্ধে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ করবো।'
আবু বাসীর রাযি. তাকে বললেন, 'বাহ! তোমার তরবারিটা তো দারুণ!'
সে বললো, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমার তরবারিটা আসলেই দারুণ। আমি অনেক জায়গায় পরীক্ষা করে দেখেছি।'
আবু বাসীর বললেন, 'আমাকে তরবারিটা একটু দেখতে দেবে? ভালো করে একটু দেখি তোমার এই পরীক্ষিত তরবারিটা।'
প্রশংসায় গদগদ হয়ে সে আবু বাসীরের হাতে তরবারিটি তুলে দিলো। তরবারি হাতে নিয়ে তিনি প্রথমে মালিকের ঘাড়েই ধার পরীক্ষা করলেন! সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। অপর লোকটি প্রয়োজন সেরে এসে দেখলো তার সঙ্গীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় পালিয়ে সে পুনরায় মদীনায় ফিরে এলো এবং দৌড়ে মসজিদে প্রবেশ করলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ভীত-প্রকম্পিত অবস্থায় দৌড়ে আসতে দেখে বললেন, 'নিশ্চয় সে ভীতিকর কিছু দেখেছে।' নবীজীর সামনে এসে সে ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গী ইতোমধ্যেই নিহত হয়েছে, আমিও মরার পথে!' ইতোমধ্যে হযরত আবু বাসীরও এসে উপস্থিত। তার চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিলো, হাতের তরবারি থেকে ঝরে পড়ছিলো ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আপনি আপনার যিম্মাদারী পূর্ণ করেছেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

সুতরাং আমাকে আপনাদের সঙ্গে রেখে দিন।'

নবীজী বললেন, 'না, আবু বাসীর! তা কী করে হয়?'

এ কথা শুনে হযরত আবু বাসীর উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমার সঙ্গে কয়েকজন লোক দিন। আমি আপনার জন্য মক্কা জয় করে আনবো।'

নবীজী তার বীরত্বে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি তো তার আবদার পূর্ণ করতে পারছেন না। মক্কাবাসীর সঙ্গে যে তার সন্ধিচুক্তি আছে। কিন্তু নবীজী তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না। তিনি চাইলেন তাকে কোমল ভাষায় ফিরিয়ে দিতে। কাউকে সাহায্য করতে না পারলেও কমপক্ষে বচনগুণে তাকে সন্তুষ্ট করা উচিত। নবীজী সাহাবীদের দিকে তাকালেন। তারপর আবু বাসীরের প্রশংসা করে বললেন, 'যদি আরো কয়েকজন লোক সঙ্গে থাকতো তাহলে তো আবু বাসীর মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই শুরু করে দিতে পারতো। তাহলে হয়তো তার মুক্তিরও একটা পথ খুলে যেতো।' নবীজী এ কথা বললেন আবু বাসীরের কষ্ট হালকা করার জন্য, পাশাপাশি তার অনুরোধ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করার জন্য।

হযরত আবু বাসীর রাযি. মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন, কখন নবীজী তাকে অনুমতি দেবেন মদীনায় অবস্থানের। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের সঙ্গে কৃত সন্ধির কথা স্মরণ করে আবু বাসীরকে মদীনা হতে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। আবু বাসীর অবনত মস্তকে নবীজীর হুকুম মেনে নিলেন। তিনি বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন। তাই অবনত মস্তকে তিনি মেনে নিয়েছেন নবীজীর নির্দেশ। রাসূলের এ আদেশের কারণে তার অন্তরে ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি কোনো বদ ধারণাও সৃষ্টি হয়নি, মুসলমানদের প্রতি শত্রুতাও সৃষ্টি হয়নি।

তিনি তো কেবল কামনা করেন পরম দয়াময় ও মহা ধৈর্যশীল সত্তা আল্লাহ তাআলার আজর ও প্রতিদান, আজরে আযীম, মহা প্রতিদান। আল্লাহর আজর লাভের প্রত্যাশায়ই তো তিনি ত্যাগ করেছেন পরিবারের মায়া, সইছেন সন্তানের বিচ্ছেদ, বরণ করে নিয়েছেন সব ধরণের কষ্ট-ক্লেশ। আবু বাসীর মদীনা হতে বের হয়ে গেলেন। তিনি এখন দিশেহারা। তিনি জানেন না কোথায় যাবেন, কার কাছে আশ্রয় নেবেন। মক্কায় অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন আর অন্ধকার বন্দীশালা, আর মদীনায় সন্ধিচুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার অদৃশ্য বাধা।

অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি ভিন্ন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে তিনি চলতে লাগলেন এবং আশ্রয় নিলেন সমুদ্রতীরবর্তী জঙ্গলভূমি 'সাইফুল বাহরে'। সেখানে তিনি একা, সঙ্গীহীন, সাথীবিহীন। এ সংবাদ পৌঁছে গেলো মক্কার অসহায়-নির্যাতিত মুসলমানদের কাছেও। মদীনায় নবীজী তাদের গ্রহণ করতে পারছেন না, আর মক্কাতেও তারা সীমাহীন নির্যাতনের শিকার। তারা বুঝে নিলেন, এটাই তাদের মুক্তির পথ। আবু বাসীর তাদের সামনে মুক্তির দুয়ার খুলে দিয়েছেন।

কিছুদিন পর আবু জানদাল বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসে হযরত আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য মুসলমানগণ সেখানে

আসতে লাগলেন। একসময় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, শক্তিও বেড়ে গেলো। এরপর যখনই কোনো কোরাইশ বণিক কাফেলা সমুদ্রতীর ঘেঁষে অতিক্রম করতো, তারা তাদের বাধা দিতেন এবং কাফেলার ক্ষতিসাধন করতেন। কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যখন বারবার এ ধরণের বাধার সম্মুখীন হলো তখন নিরুপায় হয়ে তারা নবী কারীম ﷺ-এর কাছে দূত প্রেরণ করলো। তারা অনুরোধ জানালো, নবীজী যেন আবু বাসীরের বাহিনীকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

নবী কারীম ﷺ তাদের মদীনায় আসার জন্য বার্তা পাঠালেন। নবীজীর বার্তা পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত আবু বাসীর রাযি.? আবু বাসীর রাযি. তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অস্ফুট স্বরে তিনি বারবার আওড়াচ্ছিলেন, 'আমার মহান-মহিয়ান প্রতিপালক আল্লাহ। যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী হবে, অতি সত্তুর সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে।'

নবীজীর বার্তা নিয়ে সবাই তার শিয়রের কাছে এলেন এবং তাকে জানালেন যে, নবীজী তাদেরকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের নির্বাসন ও কষ্টের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। হযরত আবু বাসীর রাযি. সুসংবাদ গ্রহণ করলেন। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে নবীজীর বার্তাটি দেখাও।' নবীজীর চিঠি তার কাছে দেয়া হলো। তিনি প্রিয়নবীর চিঠিটি হাতে নিয়ে চুমু খেলেন। এরপর তা বুকের ওপর রেখে বলতে লাগলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার রাসূল।' এভাবে কালিমা পাঠ করতে করতেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা আবু বাসীর রাযি.কে রহম করুন, তার প্রতি দয়ার আচরণ করুন এবং নবীয়ে রহমত হুজুর ﷺ-এর ওপর সীমাহীন দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।

বচনগুণে মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং মুখের ভাষায় মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন, তার সৌজন্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাহলেই আপনি অবস্থাভেদে উপযুক্ত কথা বলতে পারবেন। কেউ যখন আপনার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে, তার সঙ্গে আপনিও কোমল ও সর্বোত্তম আখলাক প্রদর্শন করুন।

কথিত আছে, জনৈক দরিদ্র মহিলা পুরনো এক কুঁড়েঘরে তার স্বামীর পাশে পুরনো একটি বিছানায় শুয়ে ছিলো। ঘরের দেয়ালগুলো জরাজীর্ণ, ছাদ ছিলো খেজুর কাণ্ডের। মহিলা শুয়ে শুয়ে ঘরের দেয়ালে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। একপর্যায়ে তার দৃষ্টি আটকে গেলো ঘরের ছাদে। ছাদের দিকে তাকিয়ে সে ডুবে গেলো ভাবনার সাগরে। স্বামীকে সে বললো, 'আপনি বলতে পারবেন, আমি কী স্বপ্ন দেখছি?'

স্বামী বললো, 'না। তা কী স্বপ্ন দেখছো?'

স্ত্রী বললো, 'আমি স্বপ্ন দেখছি—আমরা বিশাল এক অট্টালিকার মালিক হবো। সন্তান-সন্ততি নিয়ে সেখানে সুখে জীবন যাপন করবো। আপনি

আপনার বন্ধুদেরকে সেই অট্টালিকায় নিমন্ত্রণ করবেন। আমরা বিলাসবহুল একটি গাড়ির মালিক হবো। আপনি মনের আনন্দে গাড়ি ড্রাইভ করবেন। আপনার বেতন তখন বেড়ে দ্বিগুণ হবে। আমাদের সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে...।'

বেচারী মহিলা এভাবে তার স্বপ্নের কথা বলে যাচ্ছিলো এবং স্বামীর মাঝে সৌভাগ্যশীল হওয়ার চেতনা জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছিলো। এদিকে স্বামী বেচারা ডুবে আছে নিরাশার সাগরে। তার মনে কোনো আশা নেই, নেই উন্নতির প্রত্যাশা। তার নেই কোনো আচরণদক্ষতা কিংবা বচনগুণে মুগ্ধ করার যোগ্যতা। মহিলা নিজের স্বপ্নের কথা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! আপনি কী স্বপ্ন দেখেন?' লোকটা দীর্ঘক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'আমি স্বপ্ন দেখি, ছাদ থেকে যদি একটা খেজুরকাণ্ড ভেঙে তোমার মাথায় পড়তো আর তোমার মাথাটা ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতো!'

**নবীর বাণী...**

সাহাবীগণ নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস মানুষকে জাহান্নামে অধিক প্রবেশ করাবে? নবীজী উত্তর দিলেন, 'এটি এবং এটি'। অর্থাৎ বচন ও লজ্জাস্থান। [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৩৬]

# ৮২. দোয়ার বিস্ময়কর প্রভাব

দোয়ার ফযীলত বা আদাব কী কী, দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত কী কী—এসব শিরোনামের আলোচনা করা এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয়। কারণ আমাদের এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় 'মানুষের সঙ্গে আচরণ ও উচ্চারণ দক্ষতা'—এর সঙ্গে উক্ত শিরোনামের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। এ অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, দোয়ার মাধ্যমে কীভাবে আপনি মানুষের মন জয় করতে পারেন, তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারেন। এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, যেন তিনি আপনাকে উত্তম আখলাক দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ দোয়া করতেন। তিনি বলতেন:

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ».

অর্থ: হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তো আপনারই শানে। নেই কোনো ইলাহ আপনি বাদে। আমি আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর বহু জুলুম করেছি। আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি আমার পাপ মার্জনা করে দিন। আপনি ছাড়া তো কেউ আমার পাপ ক্ষমা করতে পারবে না। আয় আল্লাহ! আমাকে সচ্চরিত্রের দিশা দিন। আপনি ছাড়া কেউ সচ্চরিত্র দান করতে

পারবে না। আমার থেকে অসচ্চরিত্র দূর করে দিন। আপনি ছাড়া কেউ আমার থেকে অসচ্চরিত্র দূর করতে পারবে না। হে প্রভু! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আপনার কাছেই আমি সুখ-শান্তি কামনা করি। সমস্ত কল্যাণ তো আপনারই হাতে।

মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। আমরা জানবো, দোয়া কীভাবে মানুষের মন জয় করার কৌশল হতে পারে? মানুষ সাধারণত তার জন্য অন্য কেউ দোয়া করুক, এটা খুব পছন্দ করে। এমনকি সালাম দেয়ার সময় বা সাক্ষাৎকালে যদি কেউ তার জন্য দোয়া করে তাহলে সে আনন্দিত হয়। তাই 'কেমন আছেন ভাই? আপনার খবর কী?' এ জাতীয় সৌজন্যমূলক কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও যোগ করুন, 'আল্লাহ আপনার তত্ত্বাবধান করুন। আল্লাহ আপনার সব কিছুতে বরকত দান করুন। আল্লাহ আপনাকে সব কাজে দৃঢ়তা দান করুন।'

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আপনার দোয়ার বাক্যগুলো যেন সাধারণ ও বহুল প্রচলিত না হয়। যেমন, 'আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন। আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন।' ইত্যাদি। এগুলো অবশ্যই উত্তম দোয়া। তবে শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এগুলো শ্রোতার কানে নতুন কোনো আবেদন তৈরি করে না এবং তার মনে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলে না।

তাই আপনি একটু ব্যতিক্রমী দোয়া করুন। যখন আপনার এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যার সঙ্গে তার ছেলে-মেয়েরাও আছে, তাকে শুনিয়ে দোয়া করুন, 'আল্লাহ সন্তানের সৎকর্মে আপনার চোখকে শীতল করুন। আল্লাহ

আপনাদের ভালোবাসার বন্ধনকে অটুট রাখুন। আল্লাহ তাদেরকে আপনার অনুগত বানিয়ে দিন।' ইত্যাদি।

আমি এ কথাগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। আমি অনেক সময় দোয়াকে এভাবে ব্যবহার করে দেখেছি। বাস্তবে এটি মানুষের মন জয় করার এবং তাদের মাঝে ভালো প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে সীমাহীন কার্যকর।

দু' বছর আগে রমযানের এক রাতে একটি চ্যানেলে সরাসরি সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। সাক্ষাৎকারটি ছিলো রমযানের ইবাদত সম্পর্কে। মক্কার হারাম শরীফের একেবারে পাশে একটি হোটেলের কামরায় সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিলো। আমরা রমযান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ পেছনের জানালা দিয়ে ওমরাহ আদায়কারী তাওয়াফকারীদের সরাসরি অবলোকন করছিলেন। তাই পরিবেশটি খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলো। ফলে তাদের মন নরম হতে লাগলো। এমনকি একপর্যায়ে সাক্ষাৎকারের সঞ্চালক আবেগে কেঁদে ফেললেন। সবমিলিয়ে এটি ছিলো ঈমানী পরিবেশ। কিন্তু একজন ক্যামেরাম্যান আমাদের এই অনুভূতিকে নষ্ট করে দিলো।

তার এক হাতে ক্যামেরা, অপর হাতে সিগারেট। মনে হচ্ছিলো, রমযানের পবিত্র রজনীর একটি মুহূর্তও সে নিজের ফুসফুসকে সিগারেটের ধোঁয়া হতে বঞ্চিত রাখতে চায় না! তার এই আচরণে আমি খুব বিরক্তবোধ করছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার ও সঞ্চালকের দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। কিন্তু ধৈর্য ধরা ছাড়া তখন আমার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিলো না।

কারণ সাক্ষাৎকারটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিলো। এভাবে পূর্ণ একটি ঘণ্টা শেষ হলো এবং সালামের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো।

সিগারেট হাতে ক্যামেরাম্যান আমার কাছে এলো। আমাকে ধন্যবাদ জানালো এবং আমার প্রশংসা করলো। আমি তার হাত ধরে বললাম, 'দ্বীনি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার কাজে শরিক হওয়ায় আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিলো। আশা করি, আপনি তা গ্রহণ করবেন।'

সে বললো, 'অবশ্যই, বলুন।'

আমি বললাম, 'ধোঁয়া, সিগা...।' আমি কথা শেষ করার পূর্বেই সে বলে উঠলো, 'জনাব! আমাকে এ ব্যাপারে উপদেশ দেবেন না। এতে কোনো লাভ হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তারপরও শুধু আমার কথা শুনুন। আপনি জানেন, সিগারেট খাওয়া হারাম। আর আল্লাহ বলেছেন...'

সে আবারও আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'জনাব! আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। আমি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ধুমপান করে আসছি। ধুমপান আমার রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। আমাকে বলে কোনো লাভ নেই। আপনি অন্য কথা বলুন।'

আমি বললাম, 'কোনো লাভ নেই!'

সে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললো, 'ভাই! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।'

আমি তার হাত ধরে বললাম, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

সে বললো, 'কোথায়?'

আমি বললাম, 'আসুন, একটু সময় কাবা শরীফের দিকে মনোনিবেশ করি।'

যে জানালা দিয়ে হারাম শরীফ দেখা যায়, আমরা তার সামনে দাঁড়ালাম। মানুষের ভিড়ে এক চিলতে জায়গাও খালি নেই। কেউ রুকূ করছে, কেউ সেজদায় নিমগ্ন। কেউ ওমরার তাওয়াফ করছে। কেউ দোয়া ও কান্নায় আচ্ছন্ন। বাস্তবে দৃশ্যটি ছিলো হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলার মত। আমি বললাম, 'এদেরকে দেখছেন?'

সে বললো, 'হ্যাঁ'।

আমি বললাম, 'এরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছে। সাদা-কালো, আরব-অনারব, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলে। সবার একই দোয়া, একই চাওয়া; আল্লাহ যেন তাদের কবুল করে নেন, তাদের পাপ মার্জনা করে দেন।'

সে বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক।'

আমি বললাম, 'আপনি কি চান না, আল্লাহ তাদের যা দান করবেন, তা আপনাকেও দান করুন?'

সে বললো, 'অবশ্যই'।

আমি বললাম, 'তাহলে হাত তুলুন। আমি আপনার জন্য দোয়া করবো। আমার দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলবেন।'

আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন।’

সে বললো, ‘আমীন’।

‘হে আল্লাহ! তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন। জান্নাতে তাকে তার প্রিয়জনদের সঙ্গ নসীব করুন। হে আল্লাহ!... হে আল্লাহ!...।’ আমি দোয়া করতে লাগলাম। তার মনও নরম হতে লাগলো। সে কাঁদতে লাগলো। বারবার বলতে লাগলো, ‘আমীন। আমীন।’

দোয়ার একেবারে শেষে আমি বললাম, ‘আল্লাহ! তার জন্য এই সব দোয়া কবুল করুন, যদি সে ধুমপান করা ছেড়ে দেয়। অন্যথায় এই দোয়া থেকে তাকে মাহরুম করুন।’ এ কথা শুনতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। দু' হাতে মুখ ঢেকে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো।

অনেক দিন পর ওই চ্যানেলেরই কার্যালয়ে একটি সরাসরি সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমি চ্যানেলটির ভবনে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ স্বাস্থ্যবান একজন লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সালাম দিয়ে আমার কপালে চুমু খেলো। হাতেও চুমু দেয়ার জন্য মাথা ঝোঁকালো। আমার কোনো আচরণে সে খুব প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছিলো। আমি বললাম, ‘আল্লাহ আপনার ভালোবাসা ও উত্তম আচরণের প্রতিদান দিন। আমি আপনার এই ভালোবাসার মূল্যায়ন করছি। তবে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।’

সে বললো, ‘আপনার কি সেই ক্যামেরাম্যানের কথা মনে আছে যাকে আপনি বছর দুয়েক আগে ধুমপান ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তার

জন্য দোয়া করেছিলেন?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ।’

সে বললো, ‘আমিই সেই ব্যক্তি। ওই দিনের পর আমি আর সিগারেট মুখে নিইনি।’

প্রিয় পাঠক! স্মৃতির ঝাঁপিটা হাতড়াতে থাকলে এমন অনেক স্মৃতিই আমি উপহার দিতে পারবো আপনাকে। অতীতের আনন্দের স্মৃতিগুলো কতই না মধুর!

তিন বছর আগে হজের মৌসুমের কথা। আসর নামাযের পর আলোচনার জন্য এক বড় সমাবেশে গেলাম। আলোচনা শেষে লোকজন ভিড় করলো। বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। আমার তখন অন্য একটি মাহফিলে যোগ দেওয়ার তাড়া ছিলো। তাই দ্রুত সেখান থেকে বের হতে চেষ্টা করছিলাম। ভিড়ের মাঝে এক যুবকের ওপর আমার চোখ পড়লো। সে মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে আসতে দ্বিধা করছিলো। তাই এক পা সামনে এগুচ্ছিলো, আবার পিছিয়ে যাচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করলো। প্রচণ্ড ভিড় এবং তাগাদা থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার কি কিছু জানার আছে?’

সে বললো, ‘জ্বী, হ্যাঁ।’

আমি তাকে টেনে কাছে নিয়ে এসে বললাম, ‘বলুন’।

সে দ্রুত বললো, ‘আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে

আমার দাদী ও বোন ছিলো। ভিড় ছিলো প্রচণ্ড। এবং...।' সে প্রশ্ন শেষ করলো। আমি তার উত্তর দিলাম।

কথা বলার সময় আমি তার মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ পেলাম। তাই মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ধুমপান করেন?' সে বললো, 'হ্যাঁ'। আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার হজ কবুল করুন যদি এখন থেকেই আপনি ধুমপান ছেড়ে দেন।' যুবকটি চুপ হয়ে গেলো। তার চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে, সে এ কথায় বেশ প্রভাবিত হয়েছে।

আট মাস পর। আমি বয়ান করতে একটি শহরে গেলাম। মসজিদের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম, গম্ভীর এক যুবক মসজিদের দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাকে দেখতেই ভাবাবেগে ছুটে এলো এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সালাম দিলো। আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। তাকে চিনতে পারলাম না। তবে সালামের জবাব দিলাম এবং কুশল বিনিময় করলাম।

সে বললো, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

আমি বললাম, 'আপনার আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় আমি কৃতজ্ঞ। তবে মাফ করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।'

সে বললো, 'আপনার কি ধুমপানকারী সেই যুবকের কথা মনে আছে, যার সঙ্গে আপনার হজের সময় এক মাহফিল শেষে দেখা হয়েছিলো? আর আপনি তখন তাকে ধুমপান ছেড়ে দেয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই।'

সে বললো, 'আমিই সেই যুবক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সুসংবাদ হলো, ওই দিনের পর থেকে আমি আর মুখে সিগারেট তুলিনি। আমি ধুমপান ছেড়ে দিয়েছি। ফলে আমার জীবনের অনেক কিছুই সহজ ও সুন্দর হয়ে গেছে।'

আমি উৎসাহ দেয়ার জন্য তার হাত নাড়িয়ে চলে এলাম। তখন আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, মানুষের সামনে তাদেরকে শুনিয়ে দোয়া করা কখনো কখনো প্রত্যক্ষ উপদেশ থেকে অনেক বেশি কার্যকর ও ক্রিয়াশীল হয়। আপনি যদি পিতার অনুগত কোনো যুবককে দেখতে পান তাহলে দোয়া করুন, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনার সন্তানদেরকেও আপনার অনুগত বানিয়ে দিন।' নিঃসন্দেহে এই দোয়া তার জন্য অত্যন্ত কার্যকর হবে এবং সে আপন পিতা-মাতার আরো বেশি অনুগত হবে।

নবী কারীম ﷺ মানুষকে দ্বীনমুখী করার জন্য তাদের মন জয় করতে এবং তাদের মাঝে প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করতেন। আর এ জন্য দোয়ার হাতিয়ারকে তিনি খুব চমৎকারভাবে প্রয়োগ করতেন।

তুফাইল বিন আমর ছিলেন দাওস গোত্রের একজন গণ্যমান্য সরদার। কোনো এক প্রয়োজনে একবার তিনি মক্কায় এলেন। কোরাইশ নেতারা তাকে মক্কায় ঢুকতে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'তোফাইল বিন আমর, দাওস গোত্রের সরদার।'

কুরাইশের লোকদের আশঙ্কা হলো, তোফাইলের যদি নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলতে পারে। তাই তারা বললো, 'মক্কায় একজন লোক আছে, যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। সাবধান! ভুলেও তার কাছে বসবেন না এবং তার কথা শুনবেন না। তার কথায় যাদু রয়েছে। যদি আপনি শোনেন, নিশ্চিত বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবেন।' তোফাইল বলেন, তারা আমাকে বারবার ভয় দেখাতে লাগলো। একপর্যায়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, তার কথা শুনবো না, তার সঙ্গে কথাও বলবো না। কিন্তু চলার পথে কোনোভাবে তার কোনো কথা শুনে ফেলি কিনা—এই ভয়ে কানে তুলো ভরে রাখলাম।

আমি মসজিদে গেলাম। দেখলাম, নবীজী কাবার কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমি তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো, আমি তার কিছু কথা শুনবোই। তাই তার সুন্দর ও চমৎকার কথা শুনলাম। মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই আমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, তা আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। তাহলে এই ব্যক্তির কথা শুনতে কিসের বাধা? যদি সে ভালো কথা বলে তাহলে গ্রহণ করবো। মন্দ হলে বর্জন করবো।

নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি সেখানেই অবস্থান করলাম। তিনি যখন বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, আমি তার পিছু নিলাম। অবশেষে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করলাম। এরপর বললাম, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার গোত্রের লোকেরা তো এমন এমন বলছে। তারা আপনার

ব্যাপারে আমাকে বারবার সতর্ক করেছে। আপনার কথা শুনলে নাকি আমার বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যেন আপনার কথা না শুনি সে জন্য তারা বারবার আমাকে তাগিদ দিয়েছে। আর তাই আমি কানে তুলো দিয়ে রেখেছি। কিন্তু আমি আপনার কাছে বেশ কিছু সুন্দর কথা শুনেছি। তাই আমার কাছে আপনার ব্যাপারটি খুলে বলুন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তোফাইলের সামনে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরলেন। তাকে কোরআন পাঠ করে শোনালেন। তোফাইল নিজের অবস্থা নিয়ে ভাবলেন। অনুভব করলেন, প্রতিদিনই তিনি আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। মনে মনে ভাবলাম, আমি পাথরের পূজা করি যা কখনো শুনতে পায় না। আমার কাকুতি মিনতিতে সাড়া দিতে পারে না।

তোফাইলের সামনে আজ সত্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরিণাম নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। কীভাবে তিনি বাপ-দাদার-চৌদ্দপুরুষের ধর্ম পরিবর্তন করবেন? মানুষ তাকে কী বলবে? কী হবে তার অতীত জীবনের? সঞ্চিত সম্পদের কী হবে? তার পরিবার? সন্তান-সন্তুতি? প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব? সবাই হয়তো অস্থির হয়ে উঠবে। হয়তো পরিণত হবে তার শত্রুতে। তিনি চুপ করে ভাবতে লাগলেন। ভাবনার সাগরে ডুব খেতে লাগলেন। বিভিন্ন রকম ভাবনা তার মনে উদয় হতে লাগলো। চিন্তার জগতে শুরু হলো পার্থিব-অপার্থিব স্বার্থের চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

হঠাৎ তিনি পার্থিব স্বার্থের সকল প্রলোভনকে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। চিন্তার সব দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করে তিনি সত্যকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে আখিরাতের নিশ্চিত লাভকে বিসর্জন দেয়া তার কাছে বুদ্ধি-বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত মনে হলো। তিনি আখিরাতকে প্রাধান্য দিলেন। দুনিয়াকে বর্জন করে আখিরাতকেই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সংকল্প করলেন, অবশ্যই তিনি সত্যকে গ্রহণ করবেন এবং এর ওপর অটল থাকবেন। এতে কেউ সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট হোক, কিছু যায় আসে না। যদি আসমানওয়ালা তার প্রতি রাজি থাকেন তাহলে তাদের অসন্তুষ্টিতে কিছুই আসে যায় না। ধন-সম্পদ তো আসমানওয়ালারই দান। সুস্থতা-অসুস্থতাও তারই হাতে। প্রভাব-প্রতিপত্তি তিনিই দান করেন। এমনকি জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালাও তিনিই করেন। সেই আসমানওয়ালা যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে যমীনের অন্য সব বস্তু তুচ্ছ। যদি আল্লাহর ভালোবাসা তিনি পেয়ে যান তাহলে যার ইচ্ছা সে তাকে ঘৃণা করুক, যার ইচ্ছা অবজ্ঞা বা উপহাস করুক—এটা কোনো ভাবারই বিষয় নয়। কবি বলেন:

তুমি যদি মধুর হতে, হোক পৃথিবী তিতায় ভরা
তুমি যদি হও গো রাজি, হোক না নারাজ জগৎ সারা।
তোমার আমার হৃদয়-বাঁধন হয় গো যদি অটুট কভু
যাক ছুটে যাক জগৎ-মায়া, হারাবো না কিছু তবু।
সত্যি যদি হয় গো প্রিয় তোমার প্রীতি-ভালোবাসা
তুচ্ছ সবই, চাই না কিছু, জগৎ তো এক মিছে আশা।

তোফাইল ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কালিমা পাঠ করলেন। তার মধ্যে হিম্মত ও সাহস জেগে উঠলো। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমার

গোত্রের লোকেরা আমাকে মান্য করে। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবো।' তোফাইল মক্কা ছেড়ে দ্রুত তার গোত্রের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। দ্বীন পৌঁছানোর বিপুল চেতনা নিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে মরুভূমির উপত্যকা অতিক্রম করে অবশেষে নিজ এলাকায় পৌঁছলেন।

এলাকায় প্রবেশ করতেই তার বয়োবৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী পিতা তার কাছে ছুটে এলেন। তিনি মূর্তি পূজা করতেন। তুফাইল রাযি. তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য কঠিন নীতি গ্রহণ করলেন। বললেন, 'বাবা! আপনি আমার কাছে আসবেন না। আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

তিনি বললেন, 'কেন? কী হয়েছে বাবা তোমার?!'

'আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হয়েছি।'

'তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।' পিতা বললেন।

'ঠিক আছে। তাহলে গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে আসুন। আমি যা শিখেছি, তা আপনাকে শেখাবো।' তার পিতা গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এলেন এবং ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

এরপর তুফাইল তার বাড়িতে গেলেন। তার স্ত্রী তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'আমার কাছে এসো না। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

স্ত্রী বললেন, 'কেন? আপনার জন্য আমার বাবা-মা কোরবান হোক।'

'ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি

মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হয়েছি।'

'আপনার ধর্মই আমার ধর্ম।'

'তাহলে পবিত্র হয়ে আমার কাছে আসো।'

তুফাইলের কাছ থেকে এসে সে চিন্তায় পড়ে গেলো। ভয় করতে লাগলো, পূজা ছেড়ে দিলে এই মূর্তিগুলো না জানি তার সন্তানদের কোনো ক্ষতি করে বসে। সে আবার স্বামীর কাছে এসে বললো, 'আমার বাবা-মা আপনার ওপর কোরবান হোক। আপনার কি এই সন্তানদের ব্যাপারে যুশশিরার অনিষ্টের আশঙ্কা হয় না?' 'যুশশিরা' হলো একটি প্রতিমার নাম। তারা এর পূজা করতো এবং বিশ্বাস করতো, যে ব্যক্তি যুশশিরার উপাসনা ছেড়ে দেবে, যুশশিরা তার বা তার সন্তানদের ক্ষতি করবে। তুফাইল বললেন, 'তুমি যাও। যুশশিরা ওদের কোনো ক্ষতি করে কিনা, সেটা আমি দেখবো।' স্ত্রী গোসল সেরে এলো। তুফাইল তার সামনে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরলেন। তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং পাঠ করলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

এরপর তুফাইল কওমের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই ইসলামের দাওয়াত। মজলিসে যার সঙ্গে কথা হয়, তাকেই ইসলামের দাওয়াত। কিন্তু তারা মূর্তিপূজা ছাড়তে কিছুতেই রাজি হলো না। তোফাইল রাগান্বিত হয়ে মক্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল!

দাওস গোত্র অন্যায় করেছে। তারা ইসলামকে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের জন্য বদ দোয়া করুন।’

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রঙ বদলে গেলো। তিনি দোয়া করার জন্য আকাশ পানে দু' হাত তুললেন। তুফাইল মনে মনে বলতে লাগলেন, ‘দাওস গোত্র এবার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!’ দয়া ও মমতার আধার রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, ‘হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন। হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।’ এরপর নবীজী তোফায়েলের দিকে ফিরে বললেন, ‘তুফাইল! এবার তোমার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যাও। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। আর তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে।’ হযরত তুফাইল রাযি. ফিরে গেলেন। আবার দাওয়াত দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।

আসমানওয়ালার দ্বারে কী চমৎকার প্রার্থনা! উম্মাহর জন্য কী অপরিসীম দরদ! নবীজীর এই হিদায়াতের দোয়া কেবল তুফাইল ও তার কওমের জন্যই নয়, আরো অনেক, অনেকের জন্যই ছিলো।

নবুয়তী দাওয়াতের শুরুর দিকের ঘটনা। মুসলমানদের সংখ্যা তখন অতি নগণ্য। সবেমাত্র আটত্রিশ জন। হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিন।’ তিনি বারবার রাসূলের কাছে অনুমতি চাইতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আবু বকর! আমরা সংখ্যায় অতি অল্প।’ আবু বকর রাযি.

নাছোড়বান্দা। তিনি বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইতে লাগলেন। তার বারবার পীড়াপীড়ির কারণে অবশেষে একদিন সকলে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার সামনে সামনে চললেন। সবাই মসজিদে হারামে রওয়ানা হলেন। মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে আপন আপন বংশের লোকজনের মাঝে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর রাযি. মানুষের সামনে ভাষণ দিতে লাগলেন। তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করলেন। মূর্তিপূজার নিন্দা করলেন।

মুশরিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মসজিদের স্থানে স্থানে মুসলমানদের প্রচণ্ড মারপিট করতে লাগলো। কাফিররা সংখ্যায় ছিলো অনেক। তাই মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। এবার কাফিররা একত্রে হযরত আবু বকর রাযি.-এর ওপর চড়াও হলো। অসহনীয় নির্যাতন করতে লাগলো। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পাপিষ্ঠ ওতবা বিন রাবীয়া এসে জুতা খুলে হযরত আবু বকর রাযি.-এর গালে জুতা মারতে লাগলো। এরপর সেই পাষণ্ড আবু বকর রাযি.-এর পেটের ওপর উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগলো। তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেলো। রক্তে রঞ্জিত নাক-মুখ দেখে চেনাই যাচ্ছিলো না যে, ইনি আবু বকর রাযি.।

আবু বকর রাযি.-এর বংশ বনু তামীমের লোকেরা তাড়াতাড়ি এসে ওদেরকে গালাগালি করে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলো। এরপর তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে সবাই মিলে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে গেলো। অনেকেই নিশ্চিত

ধরে নিয়েছিলো যে, তিনি মারা গেছেন। এরপর বনু তামীমের লোকেরা দৌড়ে মসজিদে এসে মুশরিকদের মাঝে চিৎকার করে ঘোষণা দিলো, ‘খোদার কসম! আবু বকর রাযি. যদি মারা যায়, অবশ্যই ওতবাকে আমরা কতল করে ফেলবো।’ এই বলে তারা আবার আবু বকর রাযি.-এর কাছে ফিরে এলো। তিনি নিশ্চল পড়ে আছেন। কেউ জানে না, তিনি জীবিত না মৃত।

আবু বকর রাযি.-এর পিতা আবু কোহাফা কওমের লোকজনসহ বসে আছেন। আবু বকরের চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। তার মা শিয়রে বসে কাঁদছেন। সারাদিন পর সন্ধ্যায় আবু বকর রাযি. একটু চোখ মেলে তাকালেন। চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তার প্রথম উচ্চারণ ছিলো, ‘আল্লাহর রাসূলের কী অবস্থা?’ আল্লাহ তাআলা আবু বকর রাযি.-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি এত ভালোবাসতেন যে, নিজের প্রাণের চেয়েও নবীজীর অকল্যাণ চিন্তায় বেশি উদ্বিগ্ন থাকতেন।

তার মা-বাবাসহ আত্মীয়-স্বজন যারা ছিলো, আবু বকরের কথা শুনে সকলেই প্রচণ্ড রেগে গেলো এবং ক্ষুব্ধ হলো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করতে লাগলো। এরপর সবাই চলে গেলো এবং যাওয়ার সময় তার মাকে বলে গেলো, ‘ওকে পানাহার করাও।’ হযরত আবু বকর রাযি.-এর মা তাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু তিনি বারবার একই কথা

বলছিলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কী অবস্থা?' মা বললেন, 'খোদার কসম! আমি তাঁর অবস্থা কিছুই জানি না।'

আবু বকর বললেন, 'খাত্তাবের বেটি উম্মে জামীলের ঘরে গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ জিজ্ঞেস করুন।' উম্মে জামীল রাযি. তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। আবু বকর রাযি.-এর মা তাড়াতাড়ি উম্মে জামীলের বাড়িতে গিয়ে তাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। উম্মে জামীল বললেন, 'আমি কী জানি? আমি আবু বকর, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ কাউকেই চিনি না। তবে আপনার ছেলের অবস্থা শুনে খুব দুঃখ লাগছে। চাইলে তাকে দেখে আসতে পারি।' আবু বকর রাযি.-এর মা বললেন, 'ঠিক আছে। চলো তাহলে।'

উভয়ে এসে আবু বকর রাযি.-এর শিয়রে বসলেন। দেখলেন, আবু বকর নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন। ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আঘাতে বিকৃত চেহারা। উম্মে জামীল রাযি. অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'কাফের, বেঈমানেরা আপনার ওপর এতটাই পাষণ্ডের মতো নির্যাতন করেছে! আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এর বিচার করবেন।' হযরত আবু বকর রাযি. অতি কষ্টে নিশ্চল চোখ দু'টি মেলে তাকালেন। দেহ-শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও হৃদয়ে তার নবীজীর ভালোবাসা উপচে পড়ছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কী অবস্থা?' আবু বকর রাযি.-এর মা উম্মে জামীলের রাযি. পাশেই বসা ছিলেন। উম্মে জামীল ভয় পাচ্ছিলেন, পাছে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায় কিনা? তাহলে তো তার ওপরও নির্যাতন নেমে আসবে।

তাই বললেন, ‘আবু বকর! আপনার মা শুনছেন।’ আবু বকর রাযি. বললেন, ‘কোনো সমস্যা নেই। নির্ভয়ে বলো।’

উম্মে জামীল বললেন, ‘আপনার জন্য সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালো আছেন, সুস্থ আছেন।’

‘কোথায় আছেন?’

‘আবু আরকামের বাড়িতে।’

আবু বকর রাযি.-এর মা বললেন, ‘হলো তো দোস্তের খবর জানা। এবার ওঠো। কিছু খাও, পান করো।’ আবু বকর রাযি. বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! নিজ চোখে আল্লাহর রাসূলকে দেখার আগ পর্যন্ত আমি কিছু মুখে দেবো না।’

অগত্যা তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাতে যখন লোকজনের কোলাহল নীরব হয়ে এলো, তারা দু'জন মিলে আবু বকরকে ধরে আবু আরকামের বাড়িতে নিয়ে চললেন। অত্যাধিক দুর্বলতার কারণে তিনি মাটিতে পা টেনে টেনে চলছিলেন। আবু আরকামের বাড়িতে পৌঁছে তারা আবু বকর রাযি.কে হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত করলেন। আবু বকর রাযি. দরবারে প্রবেশ করলেন। চেহারা ক্ষত-বিক্ষত। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরছে। শতধা ছিন্ন বস্ত্র। প্রিয় বন্ধুকে দেখে নবীজী ছুটে এসে তার ললাটে চুমু দিলেন। উপস্থিত সকলেও এগিয়ে এসে তার ললাটে চুমু দিলেন। আবু বকরের অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ যারপরনাই ব্যথিত হলেন। তাঁর চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেলো।

হযরত আবু বকর রাযি. রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। আমার কিছুই হয়নি। শুধু আমার চেহারায় একটু বেশি আঘাত করেছে।’ এরপর আবু বকর রাযি. বললেন, ‘বীরপুরুষ তো সে-ই, যে দাওয়াত নিয়ে চলতে থাকে আর এর ওপর অবিচল থাকে। যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে।’ সারা শরীরে জখম, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। কিন্তু আবু বকর রাযি. নিজের জন্য উদ্বিগ্ন নন। তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার মা। তিনি মাতা-পিতার সঙ্গে খুবই সদাচরণকারী। আপনি তো মোবারক ব্যক্তি। তাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করুন। তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আল্লাহর নিকট আমি দৃঢ় আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করলেন। দোয়া ছিলো তাদের পারস্পরিক আচরণের অন্যতম মূলনীতি।

আবু হোরায়রা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার মা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবু হোরাইরা রাযি. তার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তার মা প্রত্যাখ্যান করতেন। একদিন আবু হোরায়রা মাকে খুব কাকুতি মিনতি করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার মা দাওয়াত তো কবুল করলেনই না, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করতে লাগলেন। মার এরূপ আচরণে তিনি বড় আঘাত পেলেন। রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের

প্রতি দাওয়াত দিতাম। তিনি আমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন। তবে ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। কিন্তু আজ দাওয়াত দেয়ার পর তিনি দাওয়াত তো কবুল করেননি, উল্টো আপনাকে গালমন্দ করেছেন। আল্লাহর রাসূল! আপনি তার হিদায়াতের জন্য দোয়া করুন।'

আল্লাহর রাসূল তার মায়ের হিদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। আবু হোরায়রা বাড়ি ফিরলেন। ঘরের দরজা বন্ধ পেয়ে কড়া নাড়লেন। তার মা এসে দরজা খুলে দিলেন আর পাঠ করলেন, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।' আনন্দের অতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে আবু হোরায়রা আল্লাহর রাসূলের কাছে ছুটে এলেন। বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার মাকে হিদায়েত দিয়েছেন।' এরপর আবু হোরায়রা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য এবং আমার মার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে মুসলমানদের ভালোবাসার পাত্র বানান এবং মুসলমানদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের অন্তরে আপনার এ বান্দা (অর্থাৎ আবু হোরায়রা) ও তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা দান করুন এবং তাদের অন্তরেও মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিন।' আবু হোরায়রা রাযি. বলেন, 'এরপর হতে ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মুসলিম নর-নারী আমাকে ভালোবাসে। আমিও প্রত্যেককে ভালোবাসি।' [সহীহ মুসলিম: ৪৫৪৬]

**আলোর দিশা...**

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, ‘তোমরা আমার নিকট দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।’

# ৮৩. সান্ত্বনার প্রলেপ!!

মানুষের সঙ্গে আচরণ-দক্ষতার প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা উপলব্ধি করি, ব্যক্তিউপযোগী পদ্ধতি নির্ণয়ে আমাদের ভুল হয়ে গেছে কিংবা পদ্ধতিটি আমরা ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি সুদর্শন একজন যুবককে দেখে তার সঙ্গে কথাবার্তায় ‘প্রশংসাকারী হোন’ শিরোনামে উল্লিখিত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করার ইচ্ছায় তাকে বললো, ‘মাশাআল্লাহ! কী চমৎকার তোমার পোশাক! কী উজ্জ্বল ও ফর্সা তোমার মুখাবয়ব! এরপর সে কথার ভঙ্গি পাল্টিয়ে বললো, ‘তোমার স্ত্রী তোমায় পেয়ে কতই না ভাগ্যবান! ইস! তুমি যদি মেয়ে হতে, আমি তোমাকে বিয়ে করতাম!’ এ ধরণের অহেতুক ও বিরক্তিকর রসিকতা খুবই দুঃখজনক। এমন করা কখনোই উচিত নয়। এসব পরিহারযোগ্য।

সহকর্মীদের একজন বললো, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বোকা ছাত্র ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাকে তার বুদ্ধির পরিবর্তে চেহারার লাবণ্য ও কমনীয়তার দৌলত দিয়েছেন। সে সবসময় ক্লাসরুমে এক কোণে বসে থাকতো এবং অভাবনীয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকতো। আমি সবসময় তাকে ক্লাসের সম্মুখ সারিতে বসতে বলতাম, যেন সে অনুসৃত ছাত্র হয়। কিন্তু সে আমার কথা কানে নিতো না। অবশ্য আমি তাকে, তদ্রূপ অন্যান্যদেরকেও বিরক্তিকর কিছু বলতাম না। কারণ আমরা সকলে এখন ইউনিভার্সিটি স্তরে পড়াশোনা করি, সকলেই বড় হয়েছি।

একদিনের ঘটনা। আমি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে তাকে অভ্যাস অনুযায়ী এক কোণে বসা দেখলাম। আমি আমার আসনে বসে তাকে বললাম, 'আরে আল্লাহর বান্দা! সামনে এসে বসো।' সে বললো, 'ডাক্তার সাহেব! আমার জন্য উপযুক্ত স্থান এটিই। এর রহস্য আপনাকে সত্বর অবহিত করবো।' আমি বললাম, 'আরে ভাই! একটু কাছে এসো। আমাদেরকেও একটু তোমার চেহারা দেখতে দাও!' এ কথার পর লক্ষ্য করলাম, কয়েকজন ছাত্র তার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে আর তার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিলো, কোনো গর্তে পড়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে বললাম, 'আল্লাহ! কত সৌভাগ্যবান সেই নারী, যে হবে তোমার জীবনসঙ্গিনী!' এরপর আমি কাউকে চিন্তা-ভাবনার কোনো সুযোগ না দিয়ে তড়িৎ ক্লাসের পড়া শুরু করে দিলাম। ছাত্রটি মুচকি হাসলো এবং তার পুরো অবয়ব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। এরপর সে ক্লাসের সম্মুখ সারিতে এসে বসলো।

আচরণদক্ষতার অনুশীলনের শুরুতে এ জাতীয় ভুল হলেও অতি দ্রুতই তা কেটে যায়। আবার কখনো কখনো অন্যের সঙ্গে আমাদের আচরণ ভুল না হলেও তাতে সে কষ্ট পায়, বিরক্ত হয়। দু'জন সহকর্মীর মাঝে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলো। একজনকে ন্যায়ের ওপর দেখে আমি তার পক্ষাবলম্বন করলাম, অন্যজনকে তিরস্কার করলাম। পরিস্থিতিই আমাকে একজনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলো। তদ্রূপ দু সন্তান, দু'জন ছাত্র বা দু'জন প্রতিবেশীর মধ্যে মতপার্থক্য হলে আমার করণীয় কী? যদি এসব ক্ষেত্রে আমি এভাবেই এক পক্ষ গ্রহণ করি, তাহলে তো ধীরে ধীরে আমার

শত্রুর সংখ্যা বাড়বে, ধীরে ধীরে সকল বন্ধুদের হারাতে থাকবো। একে একে সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকবে। অথচ আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে, তাদের মনোরঞ্জন ও মনাকর্ষণের চেষ্টা করতে! তো এই বিপরীতমুখী বিষয় দু'টির সমন্বয় সাধন কীভাবে করা সম্ভব? আর এ জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক ও সুন্দর আচরণ কী হবে?

উত্তর হলো, আপনি যখনই উপলব্ধি করবেন, আচরণ-দক্ষতার কোনো একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে আপনার কোনো কথা বা কাজে কারো অন্তরে আঘাত লেগেছে, দ্রুত কার্যকরী ও উপযোগী অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করে তার ব্যথিত হৃদয়কে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত করে তুলবেন। খুব দ্রুতই তা করবেন। কীভাবে করবেন, একটি উদাহরণ নিন।

মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে মক্কা কোরাইশ-কাফিরদের অধীন ছিলো। তারা সেখানকার দুর্বল ঈমানদারদের কষ্ট দিতো। যেসব মুহাজির মুসলমান আপন সন্তানদের মদীনায় নিয়ে যেতে পারেননি, তাদের সন্তানগণ ছিলো কোরাইশ-কাফিরদের কঠোরতার অন্যতম শিকার। তখন মুসলমানদের অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। খুবই কঠিন। ওমরাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলে কোরাইশরা তাকে ওমরাহ করতে দেয়নি। এর সূত্র ধরেই হুদাইবিয়ার ঘটনা ঘটলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোরাইশদের সন্ধিচুক্তি হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগামী বছর এসে ওমরাহ করার সিদ্ধান্তে

এ বছর ওমরাহ না করেই সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তনে সম্মত হলেন।

এক বছর পর সাহাবীদের নিয়ে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে চারদিন অবস্থান করে ওমরাহ পালন করলেন। ওহুদ যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী রাসূলের চাচা হযরত হামযা রাযি.-এর ছোট এতিম একটি কন্যা এতদিন মক্কায়ই ছিলো। ওমরাহ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করলেন তখন সেই এতিম মেয়েটি এসে রাসূলকে জড়িয়ে ধরে 'চাচা, চাচা' বলে ডাকতে লাগলো (হামযা রাযি. রাসূলের দুধভাইও ছিলেন)।

রাসূলের পাশে ছিলেন হযরত আলী রাযি. এবং তার সহধর্মিণী নবীতনয়া হযরত ফাতেমা রাযি.। হযরত আলী মেয়েটির হাত ধরে ফাতেমাকে দিলেন এবং বললেন, 'নাও, তোমার চাচাতো বোন।' হযরত ফাতেমা তাকে কোলে তুলে নিলেন। এদিকে মেয়েটিকে দেখেই হযরত যায়দ রাযি.-এর স্মরণ হলো, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে হযরত হামযার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই তিনিও এই বলে এগিয়ে এলেন যে, 'এ তো আমার ভাতিজী! আমিই এর দেখাশোনার অধিক হকদার।'

হযরত জাফর রাযি.-ও এগিয়ে এসে বললেন, 'সে তো আমার চাচাতো বোন। আবার তার খালা আসমা বিনতে উমাইস আমার সহধর্মিণী। তাই তার লালন-পালন আমার দায়িত্ব। আমিই এর উপযুক্ত।' হযরত আলী রাযি. বলে উঠলেন, 'আরে! আমিই তো তাকে নিয়েছি। সে আমার চাচাতো বোন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই অম্ল-মধুর মতবিরোধ দেখে বললেন, ‘এই মেয়ে তার খালার কাছে থাকবে। কেননা, খালা মায়ের মতো।’ ফলে জাফর রাযি. তার দেখাশোনার দায়িত্ব পেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ও যায়দের মনের ব্যথা উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সান্ত্বনা দানে সচেষ্ট হলেন। তাদেরকে খুশি করলেন। রাসূল হযরত আলীকে বললেন, ‘তুমি তো আমার অংশ আর আমিও তোমার অংশ।’ হযরত যায়দকে বললেন, ‘তুমি আমাদের ভাই, আমাদের অতি আপনজন।’ এরপর হযরত জাফরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘গঠনে ও আচরণে তুমি আমার সবচে সদৃশ।’ দেখুন, কী হেকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় কুশলতার মাধ্যমে নবীজী তাদের হৃদয় জয় করলেন এবং সেখানে ভালোবাসার বীজ বপণ করলেন।

আসুন আবার ফিরে যাই আমাদের সেই বন্ধুর ঘটনায়; যে এক সুদর্শন যুবককে বলেছিল, ‘ইস! তুমি যদি মেয়ে হতে, আমি তোমাকে বিয়ে করতাম’! এ অবস্থায় তার করণীয় কী? কীভাবে সে এই ভুলকে সংশোধন করতে পারে? কীভাবে ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগাতে পারে? এই বিব্রতকর পরিস্থিতি হতে মুক্ত হতে তার সামনে অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন তৎক্ষণাৎ সে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথায় চলে যেতে পারে, ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারে। এর ফলে শ্রোতারা মাঝখানের সেই বিব্রতকর মন্তব্যটি নিয়ে চিন্তা করার বা নতুন কোনো মন্তব্য করার সুযোগ পাবে না।

সে বলতে পারে, 'আল্লাহ তোমাকে তোমার চেয়েও সুন্দরী রূপসী একজন হুর দান করুন। বলো, আমীন!'

অথবা একেবারেই বহু দূরের ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গ টানতে পারে। যেমন, 'তোমার প্রবাসী ভাইটির কী খবর?' 'তোমার নতুন গাড়িটি কেমন চলছে?' এর ফলে শ্রোতারা কেউ বিব্রতকর মন্তব্যটি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাবে না।

**অর্জিত অভিজ্ঞতা**

ভুল করা দোষ নয়; ভুলের ওপর অটল-অবিচল থাকাটা দোষণীয়।

# ৮৪. একচোখা নীতি পরিহার করুন

মানুষের ভুলত্রুটি লক্ষ্য করা, ভুলের জন্য সতর্ক করার ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু তাদের ভালো ও সঠিক কাজগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা এবং তাদের বিভিন্ন কাজের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি কম। উদাহরণস্বরূপ ধরুন শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের কথা। যে ছাত্র নির্বোধ, অলস, সবসময় দায়িত্বে উদাসীন, ক্লাসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিলম্ব করা যার নিত্যদিনের অভ্যাস, সকল শিক্ষক তাকে ভর্ৎসনা করে থাকেন। কিন্তু যে ছাত্র মেহনতি ও পরিশ্রমী, ক্লাসে সবসময় তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়, লেখাও সুন্দর, কথাবার্তায়ও ভালো, খুব কম শিক্ষকই তার প্রশংসা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সন্তানদের ভুল ধরিয়ে দিই। কিন্তু তারা যেসব ভালো কাজ করে, সেগুলোর প্রতি খেয়াল করি খুব কমই। এ জাতীয় আচরণের ফলে আমরা এমন অনেক সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলছি, যা কাজে লাগিয়ে আমরা অন্যের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছাতে পারতাম।

কথন ও আচরণদক্ষতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হলো, আপনি মানুষের ভালো গুণগুলোর প্রশংসা করবেন। আবু মুসা আশআরী রাযি.-এর কওমের লোকদের মাঝে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও মুখস্থের বিশেষ আগ্রহ ও গুরুত্ব ছিলো। অধিক ও সুন্দর তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা অনেক সাহাবীকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কোনো এক সফরে তারা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হলেন। সকালে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে নবীজী বললেন, ‘আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায়

এলেও আমি তাদেরকে তাদের কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি এবং রাতের বেলায় তাদের কোরআন তেলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি।' [সহীহ বুখারী: ৩৯০৬, সহীহ মুসলিম: ৪৫৫৫]

ভেবে দেখুন আশআরীদের অবস্থা। সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনছেন। এরপর তো তারা ভালো কাজের প্রতি আরো অধিক আগ্রহী হবেনই। একদা ভোরে প্রিয় নবীজী ﷺ আবু মুসা আশআরীকে সামনে পেলেন। নবীজী তাকে বললেন, 'গত রাতে যদি তুমি আমাকে দেখতে! আমি কান পেতে তোমার তেলাওয়াত শুনছিলাম। তোমাকে তো দাউদ আ.-এর বংশধরদের ন্যায় অপূর্ব সুরতন্ত্র দান করা হয়েছে।' নবীজীর মুখে প্রশংসা শুনে আবু মুসা আশআরী অত্যন্ত খুশি হলেন। আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি বললেন, 'আমি যদি জানতাম আপনি আমার তেলাওয়াত শুনছেন তাহলে তো আরো সুন্দর করে পড়তাম।'

নবীজী আপন অনুভূতিকে গোপন রাখতেন না বরং তা প্রকাশ করে দিতেন। অসৎকর্মকারীকে যেমন বলতেন, 'কাজটা খুব খারাপ করেছো', সৎকর্মকারীকেও তেমনই বলতেন, 'বেশ ভালো করেছো'।

আমর বিন তাগলিব রাযি. ছিলেন একজন সাধারণ সাহাবী। ইলম ও জ্ঞানে আবু বকরের ন্যায়, হিম্মত ও সাহসিকতায় ওমর রাযি.-এর ন্যায়, মেধা ও স্মৃতিশক্তিতে আবু হোরায়রার ন্যায় স্বাতন্ত্র্য যদিও তার ছিলো না, তবে তার

হৃদয় ও মন ছিলো ঈমানী চেতনায় পূর্ণ। নবীজী তার এ গুণটি লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন। তাঁর কাছে কিছু হাদিয়া এলো। তিনি সেগুলো সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করতে লাগলেন। হাদিয়া, সদকা, গনীমত ইত্যাদি সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে নবীজীর একটি সুস্পষ্ট নীতি ছিলো। বিষয়টি নিছক অনুমান নির্ভর ছিলো না। তিনি কয়েকজনকে হাদিয়ার অংশ প্রদান করলেন, কয়েকজনকে করলেন না। যাদেরকে দিলেন না, তাদের অনেকের মনে কিছুটা ক্ষোভ সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, 'আমাদের দিলেন না কেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি জানলেন। এসব চিন্তা তাদের মনে বদ্ধমূল হওয়ার পূর্বেই তিনি তা দূর করতে চাইলেন। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! অনেক সময় এমন হয়, আমি কোনো লোককে দিই, আবার কোনো লোককে দিই না। অথচ যাকে দিই না, সে-ই আমার কাছে অধিক প্রিয়। অনেককে আমি দিয়ে থাকি তাদের অন্তরের অস্থিরতা ও অধৈর্যের কারণে। আর অনেককে আমি সোপর্দ করি তাদের অন্তরে গচ্ছিত আল্লাহপ্রদত্ত কল্যাণ (তাকওয়া)-এর প্রতি, তাদেরই একজন আমর ইবনে তাগলিব।' সকলের সামনে নবীজীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে পেয়ে আমর ইবনে তাগলিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। [সহীহ বুখারী: ৮৭১] পরবর্তীতে যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোবারক জবান নিঃসৃত এ প্রশংসাবাক্যের বিনিময়ে লাল বর্ণের (অতি মূল্যবান) উটও আমার পছন্দ নয়।'

আরেকদিনের ঘটনা। আবু হোরায়রা রাযি. অগ্রসর হয়ে নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, 'কিয়ামতের দিন কে আপনার সুপারিশ লাভে সবচে বেশি ধন্য হবে?' নিঃসন্দেহে এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন। 'কিয়ামত কবে হবে'— জাতীয় প্রশ্ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরক্ত করার চেয়ে এ প্রশ্ন অনেক সুন্দর। নবী কারীম ﷺ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'ইলম অর্জনের প্রতি তোমার যে অনুরাগ আমি লক্ষ্য করেছি তাতে আমার ধারণা ছিলো যে, তোমার পূর্বে কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। আজ সে ধারণাই বাস্তব হলো। তাহলে শোনো, কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ লাভে সবচে বেশি সৌভাগ্যশীল হবে সেই ব্যক্তি, যে নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

হযরত সালমান ফারসী রাযি. ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সাহাবীদের একজন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তার পিতা ছিলেন পারস্যের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং সবসময় কাছে কাছে রাখতেন। কোনো ধরণের ক্ষতির আশঙ্কায় তিনি তাকে গৃহে আটকে রাখতেন। আল্লাহ পাক হযরত সালমানের হৃদয়ে ঈমানী জ্যোতির উদ্ভাস ঘটালেন। সালমান বের হয়ে পড়লেন সত্যের সন্ধানে। শামের পথে যাত্রা করলেন। কিছু লোক প্রতারণায় ফেলে তাকে এক ইহুদীর কাছে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দিলো। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। বহু দ্বার ঘুরে সত্যের সন্ধানে অবশেষে সালমান পৌঁছালেন আল্লাহর রাসূলের দরবারে। নবীজী তার এ ত্যাগ ও কোরবানিকে মূল্যায়ন করতেন।

একদিন নবীজী ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে সূরা জুমুআ নাযিল হলো। নবীজী সাহাবীদের সামনে সূরাটি পাঠ করছেন, তারা শুনছেন। তিনি পড়লেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

আয়ে ۝২ [সূরা জুমুআ]

অর্থ: তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন, যদিও তারা এর পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত ছিলো।

এরপর নবীজী পড়লেন:

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আয়ে ۝৩ [সূরা জুমুআ]

অর্থ: এবং (এ রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্যে আরো কিছু লোক আছে, যারা এখনও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়নি। আর তিনি (আল্লাহ) মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।

নবীজী যখন তেলাওয়াত শেষ করলেন, জনৈক সাহাবী বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর রাসূল! এ আয়াতে উল্লিখিত লোকগুলো কারা?’ নবীজী চুপ রইলেন। সাহাবী আবারও প্রশ্ন করলেন, ‘আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল?’ নবীজী উত্তর দিলেন না। সাহাবী আবারও প্রশ্ন করলেন, ‘তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল?’ এবার নবীজী

হযরত সালমানের দিকে মুখ ফেরালেন এবং তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ঈমান ও দ্বীন যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকে তবু তাকে অর্জন করে নেবে এ বংশের কিছু লোক।' [সহীহ বুখারী: ৪৫১৮, সহীহ মুসলিম: ৪৬১৮]

**দৃষ্টিভঙ্গি...**

সবসময় অন্যের শুভ কামনা করুন। সকলের প্রতি সুধারণা রাখুন। তাদেরকে উৎসাহ দিন। তারা হবে গতিশীল, কর্মোদ্যম।

# ৮৫. শ্রবণদক্ষতা

মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের মনজয় করার দক্ষতা ও যোগ্যতা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। কখনো কখনো কোনো কাজ করা বা কোনো অবস্থা সৃষ্টি করাই হলো আচরণদক্ষতা। আবার কখনো কখনো কোনো কাজ না করাই হলো আচরণদক্ষতা। মুচকি হাসি যেমন মানবহৃদয়কে মুগ্ধ করে, গোমড়া মুখ না থাকাও তেমনই আকৃষ্ট করে মানুষকে। সুন্দর সুন্দর কথা, জ্ঞানসমৃদ্ধ উক্তি যেমন মানুষকে আনন্দিত করে, তেমনই কিছু না বলে নীরব থেকে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেও মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। বলতে পারেন, কেন? কেন নীরবতা মানুষকে কাছে টানে?

কিছু কিছু মানুষ বেশি কথা বলেন না। সভা-সমিতিতে, আলোচনার টেবিলে তাদের আওয়াজ শোনা যায় না বললেই চলে। বরং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, মাঝে মাঝে তিনি সামান্য মাথা নাড়াচ্ছেন, দু'চোখের পাতাও হয়তো নড়ছে। মুখ একবারেই নাড়ছেন না। একান্ত প্রয়োজনে মুচকি হেসে সায় দিচ্ছেন, মুখে কিছু বলছেন না। তবুও মানুষ তাকে ভালোবাসে। তাঁর সঙ্গ পেতে, কাছে বসতে আকর্ষণ বোধ করে। কিছু না বলেও কীভাবে তিনি সকলের প্রিয়? নিশ্চুপ থেকেও কীভাবে তিনি জয় করেছেন সকলের হৃদয়? কারণ, তিনি মানুষের মনকাড়া নীরবতার চর্চা করেন। চুপ থেকেও তিনি কাছে টানতে জানেন।

শ্রবণদক্ষতার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। বরং এ বিষয়ে যত্নবান এক ব্যক্তি তো আমাকে বলেছেন, তিনি শ্রবণদক্ষতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ে পনেরোটির অধিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনজন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা তুলনা করে দেখুন:

১. কাউকে আপনি আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা শোনাচ্ছেন। ঘটনাটি বলা শুরু করতেই সে বলে উঠলো, 'ভাই! আমার জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো।' আপনি তাকে সবিনয়ে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরে ঘটনাটি শুনুন। আমাকে ঘটনাটি শেষ করতে দিন।' আপনি বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ না যেতেই আবার আপনার কথা বন্ধ করে দিয়ে সে বললো, 'ঠিক, ঠিক। আমারও তো একবার এমন হলো। আমি যাচ্ছিলাম...।' অনন্তর আপনি তাকে বললেন, 'আরে ভাই! একটু অপেক্ষা করুন।' ফলে সে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো। কিছুক্ষণ পরই সে ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলো, 'ভাই! আপনার কথা কখন শেষ হবে? একটু দ্রুত করুন। একটু দ্রুত করুন।' এই হলো প্রথমজনের অবস্থা।

২. এবার দ্বিতীয়জন। আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন। সে একবার ডানে তাকাচ্ছে, একবার বামে। কখনো পকেট থেকে মোবাইল বের করে ক্ষুদেবার্তা পড়ছে, লিখছে। কিংবা কে জানে, হয়তো মোবাইলের গেমস খেলছে।

৩. সবশেষে তৃতীয়জন। সে শ্রবণদক্ষতার ব্যবহারে দক্ষ। তার সঙ্গে কথা বললে দেখবেন, তার মনোযোগী দৃষ্টি আপনার প্রতি স্থির নিবদ্ধ। উপযোগী স্থানে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাচ্ছে, কখনো মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠছে,

কখনো বিস্ময়ে দু' ঠোঁট এক হয়ে যাচ্ছে। কখনো আশ্চর্য হয়ে বলছে, 'তা-ই! সুবহানাল্লাহ!' নীরব থাকলেও তার অঙ্গভঙ্গিতে আপনি অনুভব করছেন যে, সে আপনার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী।

আপনি এই তিনজনের মধ্যে কার সার্বক্ষণিক সঙ্গ কামনা করবেন? কার সাক্ষাতে আনন্দিত হবেন? এবং কার সঙ্গে কথা বললে আপনার মন প্রশান্ত হবে? অবশ্যই আপনি শেষ ব্যক্তির কথা বলবেন। তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, মানুষকে তার পছন্দের কথা বললেই মন জয় করা যায় না; মন জয় করতে তার পছন্দের কথা শুনতেও হয়।

বাকশক্তি ও বাগ্মিতায় পারদর্শী বিখ্যাত এক দায়ীর কথা মনে পড়ে। তিনি সর্বদা বক্তৃতা করতেন। জুমার মিম্বরে, ফাতওয়ার চেয়ারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার বা বক্তৃতা অনুষ্ঠানে। এক কথায় তিনি সবখানে শুধু বলতেন। মানুষ তাকে মিম্বরে, বক্তৃতা মঞ্চে, বিভিন্ন চ্যানেলে কথা বলতে দেখতো, আগ্রহভরে তার আলোচনা শুনতো, তাকে পছন্দ করতো। একজন ছিলো ব্যতিক্রম। তার জীবনসঙ্গিনী স্ত্রী। তিনি বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতেন। কিন্তু কখনো স্ত্রীর কোনো কথা শুনতেন না, শুনতে চাইতেনও না। অভ্যাস অনুযায়ী ঘরেও কেবল বলতেন, বরং বলা ভালো, বকবক করতেন।

তার স্ত্রী তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট ছিলো। কিন্তু তিনি এর কারণ বুঝতে পারতেন না। সবাই তাকে সম্মান করে, তার প্রশংসায় ব্যস্ত থাকে; কিন্তু স্ত্রী কেন ব্যতিক্রম? একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, স্ত্রীকে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন। যাতে সে বুঝতে পারে, মানুষ তার স্বামীকে কী

পরিমাণ সম্মান করে। একদিন তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'আজ যাবে আমার সঙ্গে?'

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়?'

'একজন বিখ্যাত দায়ীর লেকচার শুনতে। আমাদের অনেক কিছু জানা হবে।'

স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর গাড়ি একটি মসজিদের কাছে এসে থামলো। সেখানে লোকে লোকারণ্য। মানুষ আর মানুষ। সকলে এসেছে এই বিখ্যাত বক্তার বক্তৃতা শুনতে। স্ত্রী মহিলা শ্রোতাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে গিয়ে বসলো, আর তিনি লোক সমাগমের মধ্য দিয়ে পৌঁছালেন বক্তৃতার আসনে। বক্তার আসন অলঙ্কৃত করে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর মনকাড়া আলোচনা। উপস্থিত সবাই এমনকি তার স্ত্রীও মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে নীরবে আলোচনা শুনছেন। তার মনে হলো, আলোচনায় মুগ্ধ তার স্ত্রীও।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হলো। সফলতার সুখানুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং গাড়িতে বসলেন। স্ত্রীও পাশে এসে বসলো। স্ত্রীকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি নিজেই বলতে লাগলেন মানুষের ভিড়ের কথা, মসজিদটির সৌন্দর্যের কথা। এরপর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকের বক্তৃতা তোমার কেমন লাগলো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো, মনকাড়া ও যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। কিন্তু... আচ্ছা, আলোচক কে ছিলেন?'

'আশ্চর্য! তুমি তার আওয়াজ চেনোনি??'

'আসলে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় আর আওয়াজ ক্ষীণ হওয়ার কারণে খুব বেশি লক্ষ্য করতে পারিনি।'

'আরে! আমি, আমিই তো বক্তৃতা করলাম।' স্বামী ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন। স্ত্রী বললো, 'ও! তাই তো এত দীর্ঘ সময় বসে থাকার সময় বারবার আমার মনে হচ্ছিলো, "এত লম্বা কথা বলে লোকটা"!'

তাহলে...?! মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও আচারদক্ষতা। কিছু কিছু মানুষ ভুলেই যায় যে, আল্লাহ তাকে জিহ্বা দিয়েছেন একটি আর কান দিয়েছেন দু'টি; যেন সে শোনে বেশি, আর বলে কম। আমার তো মনে হয়, পারলে এরা নিজেদের জন্য সমীকরণটি বদলে নিতো; কান রাখতো একটি, আর জিহ্বা দু'টি! কারণ বলার প্রতি এদের আগ্রহ সীমাহীন! সুতরাং অন্যের কথার সময় নিশ্চুপ থাকতে অভ্যস্ত হোন। আপনার যদি কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজনও হয়, তবুও তাড়াহুড়া না করে অপেক্ষা করুন।

নবী কারীম ﷺ-এর নবুওত প্রাপ্তির কিছুদিন পরের কথা। মুসলমানরা তখন সংখ্যায় অল্প, হাতে গোণা কয়েকজন। কাফির-মুশরিকরা রাসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালাতো, মানুষকে কাছে ভিড়তে দিতো না। রাসূলকে গণক, মিথ্যুক, পাগল, যাদুকর ইত্যাদি বলে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতো।

একদিনের ঘটনা। যিমাদ নামে এক লোক মক্কায় এলেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি মানসিক রোগী ও যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করতেন। মক্কায় এসে তিনি শুনতে পেলেন, নির্বোধ কাফিররা প্রায়ই ‘পাগলটা এসেছিলো... পাগলটাকে আজ দেখেছি।’ এ জাতীয় কথা বলাবলি করছে। তিনি বললেন, ‘লোকটা কোথায়? আশা করি, আল্লাহ তাকে আমার চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য দান করবেন।’ লোকেরা তাকে দূর থেকে আল্লাহর রাসূলকে দেখিয়ে দিলো।

যিমাদ আল্লাহর রাসূলের প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। এত উজ্জ্বল অবয়ব! এ তো সুস্থ-ভারসাম্যপূর্ণ এক ব্যক্তির চেহারা! কিন্তু মনের অনুভূতিটুকু গোপন রেখে যিমাদ তার আসার কারণ উল্লেখ করে বললেন, ‘মুহাম্মাদ! আমি ঝাড়-ফুঁক করি। খারাপ বাতাসের আছর থাকলে তা দূর করি। আল্লাহ যাকে চান, আমার মাধ্যমে আরোগ্য দান করেন। তাই আসুন, আপনার চিকিৎসা করি।’ যিমাদ তার চিকিৎসা পদ্ধতি ও দক্ষতার কথা বলে যাচ্ছেন। আল্লাহর রাসূল চুপ করে শুনছেন। যিমাদ বলেই চলছেন। আল্লাহর রাসূল নীরবে শুনছেন। এত মনোযোগ দিয়ে কী শুনছেন তিনি? শুনছেন একজন কাফিরের কথা! যে এসেছে তার পাগলামি রোগের ‘চিকিৎসা’ করতে। আহ! কত প্রজ্ঞাবান আমাদের নবী! কত ধৈর্যশীল তিনি!

এক সময় যিমাদ তার কথা শেষ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমল ও শান্ত স্বরে বললেন:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

রাসূলের মোবারক জবান হতে নিঃসৃত পবিত্র কালাম যিমাদকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলো। দীর্ঘদিনের পর্দা যেন চোখের সামনে থেকে সরে গেলো। নম্রভাবে তিনি রাসূলকে বললেন, ‘কথাগুলো আবার বলুন তো।’ রাসূল আবার বললেন। যিমাদ বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! আমি গণকদের কথা শুনেছি, শুনেছি যাদুকরদের তন্ত্রমন্ত্র। বড় বড় কবিদের রচিত পঙ্ক্তিমালাও শুনেছি। কিন্তু এমন বাক্য কখনো শুনিনি। এ কথাগুলো তো মানুষের হৃদয় সাগরের অতল গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করবো।’

রাসূল নিজ হাত প্রসারিত করলেন। যিমাদ তার হৃদয় হতে অবিশ্বাসের কৃত্রিম পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর বারবার পড়তে লাগলেন, ‘আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।’ আল্লাহর রাসূল জানতে পারলেন, তিনি তার সম্প্রদায়ের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। গোত্রের লোকদের ওপর তার বেশ প্রভাব আছে। তাই তিনি তাকে বললেন, ‘আপনি আপনার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেবেন।’ প্রত্যুত্তরে যিমাদ বললেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তাদেরকেও দাওয়াত দেবো।’ অনন্তর তিনি তার গোত্রের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ও দায়ী হয়ে ফিরে গেলেন। [সহীহ মুসলিম: ১৪৩৬, মুসনাদে আহমদ: ২৬১৩]

তাই আপনিও একজন দক্ষ শ্রোতা হোন। অন্যের কথার সময় নীরব থাকুন। তার কথা সমর্থনে মাথা নাড়ুন। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অনুভূতি প্রকাশ করুন। কখনো কপাল ভাঁজ করে, কখনো ভ্রুজোড়া সামান্য উঁচু করে,

কখনো মুচকি হেসে, আবার কখনো বিস্ময়ে দু' ঠোঁট হালকা নাড়িয়ে আপনার মনোযোগের বিষয়টি তাকে অবহিত করুন। আপনি দেখবেন, শিশু-বৃদ্ধ যারাই আপনার সঙ্গে কথা বলে, সবাই এতে প্রভাবিত হচ্ছে। দেখবেন, তাদের দৃষ্টি আপনারই প্রতি আকৃষ্ট, তাদের হৃদয় আপনাতেই আবিষ্ট।

**ফলাফল...**

মনোযোগের সঙ্গে অন্যের কথা শ্রবণে অভ্যস্ত হোন। তারা আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে। আপনার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠবে।

# ৮৬. বিতর্কদক্ষতা

আপনার কি এমন কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে যে, কোনো মজলিসে কারো সঙ্গে আপনার প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়েছিলো আর এ কারণে দীর্ঘদিন আপনার অন্তরে সেই লোকটির প্রতি ক্ষোভ-ক্রোধ জমে ছিলো? কিংবা আপনি কোথাও দেখেছেন যে, দু'জন লোক তুচ্ছ কোনো বিষয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েছে। আপনি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তাদের দিকে। তুচ্ছ বিষয়ের সেই তর্ক এক সময় প্রচণ্ড বিতর্কে রূপ নিয়েছিলো আর ধীরে ধীরে তাদের স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো, চোখ-মুখ লাল করে তারা ঝগড়া করেই চলছিলো। শেষে একে অপরের প্রতি ক্ষোভ-বিদ্বেষ আর ভীষণ মনোকষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলো। মনে পড়ে এমন কোনো ঘটনা?

আমরা নানামুখী দক্ষতা প্রয়োগ করে মানুষের মন আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে আমরা বিচ্ছিন্ন হই, যখন আমরা আচরণে অশোভনীয় কোনো ভুল করে বসি। ফলে পূর্বে প্রয়োগ করা সব দক্ষতা অকার্যকর হয়ে যায় এবং তারা আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। বিতর্কদক্ষতায় অপরিপক্কতা এ ধরণেরই একটি অশোভনীয় ভুল।

একজন তর্ককারীকে তুলনা করা যেতে পারে দুর্গম পর্বত আরোহণকারীর সঙ্গে। পর্বতারোহীকে একই সঙ্গে তার হাত ও পায়ের অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। আপনি দেখবেন, পর্বতারোহী যে পাথরটি ধরতে চাচ্ছে, সতর্ক দৃষ্টিতে সেটাকে যাচাই করে। পাথরটিতে হাত রাখার পূর্বে সেটি কতটুকু

মজবুত, কতটা ভর বহন করতে পারবে, তা বুঝে নিতে চেষ্টা করে। তদ্রূপ পরবর্তীতে যে পাথরে পা রাখবে সেটিও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে। পা উঠিয়ে অন্য পাথরে রাখার পূর্বে যে পাথরে পা আছে সেটিও ভালোভাবে দেখে নেয়। ঠিকভাবে পা উঠাতে না পারলে পাথরসহ নিচে পড়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। এভাবে তার প্রতিটি পদক্ষেপ বরং প্রতিটি নড়াচড়া হয় যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর।

আমি আলোচনা দীর্ঘ করবো না। যে আলোচনা সুসংক্ষিপ্ত অথচ সুসমৃদ্ধ তাই উত্তম। প্রথম কথা হলো, তর্ক-বিবাদে জড়িয়ে পড়াই একটি অপছন্দনীয় বিষয়। আপনি বোধকরি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমাদের ৯০% এর বেশি তর্ক-বিতর্ক হয় অযথা-অপ্রয়োজনীয়। এসব তর্কের নেই কোনো সমাধান, নেই কোনো অবদান। সুতরাং সর্বপ্রথম চেষ্টা করুন যথাসম্ভব তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে। কেউ আপনার কোনো কথায় আপত্তি করে বসলো কিংবা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইলো, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনি বিষয়টি যথাসম্ভব সহজভাবে নিন। আপত্তিকারীর উদ্দেশ্য নিয়ে ভেবে অযথা নিজেকে কষ্ট দেবেন না। সে কেন আমাকে এই কথাটি বললো? কেন জনসম্মুখে আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেললো? শুধু শুধু এসব চিন্তা করে নিজেকে শেষ করে দেবেন না। শান্তভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন। বাতাসের ঝড়-ঝাপটায় তো ছোট ছোট পাথরকণা আর প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হবে; আপনি তো অটল-অবিচল পাহাড়। বাতাসে আপনি কেন স্থানচ্যুত হবেন?

কোরাইশরা হুদাইবিয়া সন্ধির চুক্তি ভঙ্গের পর নবীজী মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যেন কোরাইশদের অগোচরে, তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্বেই মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে পারেন। নবীজী মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে এক স্থানে সাময়িক অবস্থান করলেন। কোরাইশরা এর কিছুই জানতে পারলো না। তারা অবশ্য প্রতিদিন গোপনে খোঁজ-খবর নিতো এবং নিয়মিত পাহারা দিতো। নবীজী যে রাতে অবতরণ করলেন সে রাতেও আবু সুফিয়ান কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হলো। সে অপেক্ষা করতে লাগলো কোনো সংবাদ আসে কিনা, কোনো কিছু শোনা যায় কিনা।

এদিকে নবীজী প্রভাতের অপেক্ষায় আছেন। প্রভাত হলেই তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন, কোরাইশদের ওপর আক্রমণ করবেন। এ অবস্থা দেখে হযরত আব্বাস রাযি. অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, ‘আহ! প্রভাতে না জানি কী অপেক্ষা করছে কোরাইশদের জন্য! আল্লাহর শপথ! নবীজী যদি শক্তিবলে মক্কায় প্রবেশ করেন, আগেভাগেই যদি কোরাইশ সম্প্রদায় নবীজীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে কাল সকালে কোরাইশ সম্প্রদায় চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।’ আব্বাস রাযি. নবীজীর কাছে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি চাইলে নবীজী অনুমতি দিলেন। তিনি রাসূলের সাদা খচ্চরের ওপর আরোহণ করে চলতে লাগলেন।

আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের নিয়ে খোঁজ-খবর নিতে নিতে মুসলিম বাহিনীর অতি কাছে চলে এলো। হঠাৎ মুসলিম বাহিনীর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তাদের

দৃষ্টিগোচর হলো। সে বলতে লাগালো, ‘আজকের রাতের মত এত আগুন, এত বড় সেনাবাহিনী তো আর কখনো দেখিনি! কত বড় এই দল! কারা এরা?’ আবু সুফিয়ানের এক সঙ্গী বললো, ‘শপথ আল্লাহর! মনে হচ্ছে এরা খোযাআ গোত্রের। যুদ্ধের জন্য তো ওরা উত্তেজিত হয়ে আছে।’ আবু সুফিয়ান বললো, ‘না, খোযাআ গোত্র তো আরো ছোট। তাদের লোকসংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক মশাল! অনেক সেনাছাউনি!’ আবু সুফিয়ান ধীরে ধীরে আরো কাছে চলে এলো। একপর্যায়ে সে মুসলিম প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লো। তারা তাকে নবীজীর কাছে নিয়ে চললো।

এদিকে হযরত আব্বাস রাযি. নবীজীর খচ্চরে চড়ে চলতে চলতে ঠিক সেখানেই পৌঁছালেন, যেখানে মুসলিম প্রহরীরা আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে বন্দী করেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত আবু সুফিয়ান আব্বাস রাযি.কে দেখে তার কাছে ছুটে এলো এবং তার খচ্চরের পেছনে চড়ে বসলো। পেছনে পেছনে তার সঙ্গীরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে লাগলো। মুসলিম প্রহরীগণ পশ্চাতে থেকে তাদের অনুসরণ করলেন।

হযরত আব্বাস রাযি. আবু সুফিয়ানকে নিয়ে দ্রুত নবীজীর কাছে ছুটে চললেন। যখনই তারা মুসলমানদের কোনো ছাউনি অতিক্রম করছিলেন, মুসলমানগণ জিজ্ঞেস করছিলেন, ‘কে এই ব্যক্তি?’ কিন্তু নবীজীর খচ্চর ও হযরত আব্বাসকে দেখে তারা বলছিলেন, ‘ও! রাসূলের চাচা, রাসূলের খচ্চরে চড়ে যাচ্ছেন।’ কেউ যেন আবু সুফিয়ানের কোনো ক্ষতি করতে না

পারে, এজন্য হযরত আব্বাস তাকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চললেন। একসময় তারা হযরত ওমর রাযি.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। ওমর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে যায়?' কাছে এসে যখন তিনি খচ্চরের পেছনে বসা আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'আল্লাহর দুশমন আবু সুফিয়ান! আলহামদু লিল্লাহ! প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনো চুক্তি-অঙ্গীকার ছাড়াই তোকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।'

আব্বাস তাকে কিছু করতে নিষেধ করলেন। ওমর দ্রুত তাদের পিছু নিলেন। ছুটে চললেন রাসূলের দরবারে। হযরত আব্বাস খচ্চরে চড়ে চলছেন আরো দ্রুত। তাই তিনি ওমরের পূর্বেই পৌঁছে গেলেন নবীজীর কাছে। তিনি বাহন থেকে নেমে রাসূলের কাছে উপস্থিত হতে না হতেই হযরত ওমরও পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছেই হযরত ওমর নবীজীকে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর রাসূল! এই যে আবু সুফিয়ান, মহান আল্লাহ একে কোনো চুক্তি-অঙ্গীকার ছাড়াই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই।'

এই সেই আবু সুফিয়ান! সে মুসলমানদের কত ক্ষতি করেছে! ওহুদ যুদ্ধে সে-ই মুশরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে। খন্দক অভিযানে বহুজাতিক কাফির বাহিনীকে পরিচালনা করেছে। বহুবার সে মুসলমানদের সংকটে ফেলেছে। হত্যা করেছে, নির্যাতন করেছে। আজ সে মুসলমানদের হাতের নাগালে, বন্দী অবস্থায়! হযরত আব্বাস বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি।' এরপর হযরত আব্বাস রাযি. নবীজীর কাছে বসে কানে

কানে কিছু বলতে লাগলেন। ওদিকে হযরত ওমর বারবার বলছিলেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই।’

হযরত ওমর রাযি. যখন বারবার একই কথা বলে যাচ্ছিলেন, হযরত আব্বাস রাযি. তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ‘ওমর! থামো। আল্লাহর শপথ! সে যদি আদি বিন কা’বের বংশের হতো তাহলে আজ তুমি এ কথা বলতে না।’ অর্থাৎ সে যদি তোমার বংশের হতো তাহলে তুমি কিছুতেই এ কথা বলতে না। যেহেতু সে আবদে মানাফের বংশের, তাই এভাবে বলছো। হযরত ওমর রাযি. হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এমন এক বিতর্কে তারা জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যা তাদের জন্য মোটেও সমীচীন নয়। তাছাড়া বনু কা'বের লোক হলে তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হতেন, অন্য বংশের বলে গুরুত্ব দিচ্ছেন না—এমন একটি বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে কী লাভই বা হবে?

হযরত ওমর একেবারে শান্ত স্বরে বললেন, ‘থামুন, আব্বাস! থামুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেদিন আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় ছিলো। কারণ আমি জানতাম, নবীজীর কাছে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনার ইসলাম গ্রহণ অধিক পছন্দের ছিলো।’ এ কথা শুনে হযরত আব্বাস একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। সম্ভাব্য বিতর্কও এখানেই শেষ হয়ে গেলো। অথচ হযরত ওমর চাইলে কথা দীর্ঘ করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন, ‘কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?! আপনি

আমার পবিত্র নিয়তকে কলুষিত করতে চাচ্ছেন?! আপনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে?! আপনি সাম্প্রদায়িক আওয়াজ উসকে দিতে চাচ্ছেন কেন?!' কিন্তু তিনি এসব কিছুই বললেন না। সাহাবায়ে কেরাম এ জাতীয় শয়তানী প্ররোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন।

হযরত ওমর ও হযরত আব্বাস উভয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আর আবু সুফিয়ান? সে দাঁড়িয়ে আছে নবীজীর সামনে। নবীজী তার ব্যাপারে কী নির্দেশ দেন, তা শোনার অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে। নবীজী হযরত আব্বাস রাযি.কে বললেন, 'আব্বাস! একে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান। সকালে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।' হযরত আব্বাস তাকে নিজ তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। সেখানেই সে রাত যাপন করলো। সেই রাতে আবু সুফিয়ান ফজরের সময়ই জেগে উঠলো। সে দেখলো, সকলে নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পবিত্রতা অর্জনের জন্য এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ছে। সে হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার? এরা কী করছে? এরা এভাবে ছোটাছুটি করছে কেন?' 'মুআযযিনের আহ্বান শুনে এরা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' হযরত আব্বাস রাযি. উত্তর দিলেন।

নামাযের সময় হলে সাহাবীগণ কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নবীজী সামনে অগ্রসর হয়ে সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। আবু সুফিয়ান অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, দশ হাজার সাহাবী নবীজীকে অনুসরণ করে একসঙ্গে নবীজীর রুকুর সঙ্গে রুকু করছে, নবীজীর সেজদার সঙ্গে সেজদা করছে। নবীজীর প্রতি সাহাবীদের এই একনিষ্ঠ আনুগত্য তাকে মুগ্ধ

করলো। নামায শেষে হযরত আব্বাস রাযি. তাকে নবীজীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলেন।

আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'আব্বাস! মুহাম্মাদ তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়, তারা কি তাই পালন করে?' হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! নবীজী যদি তাদেরকে পানাহার ত্যাগ করতেও বলেন, তারা তাই করবে।' 'আব্বাস! আজ রাতে আমি মুহাম্মাদের অনুসারীদের মাঝে যেমন আনুগত্য দেখলাম, জীবনে কোথাও এরূপ দেখিনি। রোম ও পারস্যবাসীকেও তাদের সম্রাটদের এরূপ আনুগত্য করতে দেখিনি।' আবু সুফিয়ান বললো।

আব্বাস রাযি. তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু সুফিয়ানকে বললেন, 'ধিক হে আবু সুফিয়ান! এখনো কি তোমার সময় হয়নি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করার?' এক রাত মুসলমানদের সঙ্গে অবস্থান করায় আবু সুফিয়ানের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব অনেকটা কমে এসেছিলো। তাই সে বললো, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনার সহনশীলতা, আপনার মর্যাদাবোধ, আপনার আত্মীয়তা সম্পর্কের মূল্যায়ন—সবই অতুলনীয়। আল্লাহর শপথ! আমি তো মনে করি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য যদি থাকতো তাহলে আজ আমাকে অবশ্যই সাহায্য করতো।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘ধিক হে আবু সুফিয়ান! এখনো কি তোমার সময় আসেনি আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করার?’

আবু সুফিয়ান স্পষ্ট ভাষায় বললো, ‘আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি অনেক ধৈর্যশীল, অনেক মর্যাদাশীল, আত্মীয়তার সম্পর্কের মূল্যায়নকারী। তবে এ বিষয়ে এখনো আমার মনে কিছুটা খটকা আছে।’

হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, ‘ধিক হে আবু সুফিয়ান! তুমি কল্যাণের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে নাও। তুমি সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।’

আবু সুফিয়ান চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো। এরপর বললো, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।’ আবু সুফিয়ান রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণে নবীজী অত্যন্ত খুশি হলেন।

এরপর হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান মর্যাদা পছন্দ করে। তাই তাকে মর্যাদা প্রকাশের মতো কোনো সুযোগ করে দিন।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হ্যাঁ, আবু সুফিয়ানের গৃহে যে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে।’

এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান নবীজীর সামনে কয়েকটি কবিতাপংক্তি আবৃত্তি করলেন এবং এর মাধ্যমে বিগত দিনের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি আবৃত্তি করলেন:

শপথ তোমার! একদিন হাতে তুলেছিলাম যে রণনিশান
লাত-মানাতের জয় হবে ভেবে, মুহাম্মাদ যে হবে বিরান।
নিকশ আঁধারে ঘেরা রজনীতে দিশেহারা এক পথিক আমি
এসেছে এখন জীবনের তরে হিদায়াতের যে দীপ্ত বাণী।
প্রতি মুহূর্তে উপেক্ষা করে সরে গিয়েছিলাম অনেক দূরে
তবুও তো তিনি করলেন ক্ষমা, পথ দেখালেন প্রভুর তরে।
মহান প্রভুর প্রেম শেখালেন; আত্মা-গোলামী দিতে ছেড়ে
শেষবেলাতে অনুতাপী হয়ে গান গাই তাই তারই সুরে।

বর্ণিত আছে, আবু সুফিয়ান যখন কবিতার ‘প্রতি মুহূর্তে উপেক্ষা করে সরে গিয়েছিলাম অনেক দূরে/ তবুও তো তিনি করলেন ক্ষমা, পথ দেখালেন প্রভুর তরে’—এই অংশটুকু আবৃত্তি করছিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বক্ষে মৃদু আঘাত করে বলেছিলেন, ‘তুমি তো আমাকে প্রতি মুহূর্তেই উপেক্ষা করেছিলে!’

**অর্জিত ভাবনা...**

বিতর্কে জয়লাভ করা বিচক্ষণতা নয়... বিচক্ষণতা হলো বিতর্কে একেবারেই না জড়ানো।

# ৮৭. শুরুতেই বন্ধ করে দিন বিতর্কের পথ

কিছু কিছু কারণে মানুষ একে অন্যের প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করে। এগুলোর বেশিরভাগই ঘটে থাকে কথার আঘাতের কারণে। একজন কথা বলছে, হঠাৎ করে অন্য কেউ আপত্তি করে বসে। তার কথার মাঝে বাধা সৃষ্টি করে। একটু ভেবেও দেখে না, বক্তা তার কথা শেষ করেছে কিনা, কিংবা বক্তা কী বলতে চাচ্ছে। পরিণামে সৃষ্টি হয় তর্ক-বিতর্ক, আর সবশেষে পরস্পরে বিদ্বেষ-মনকষাকষি। আপনি পৃথিবীর সব মানুষকে সংশোধন করতে, সবাইকে ইসলামী শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করতে এবং সবাইকে উন্নত-উত্তম আচরণ ও উচ্চারণে অভ্যস্ত করতে পারবেন না।

আসুন আমরা ভাববাদী মানসিকতা ত্যাগ করি। কিছু কিছু মানুষ সারাক্ষণ কেবল ভাবে, আর বলে, 'মনে করুন, মানুষ এমন করে। মনে করুন, মানুষ এমন করে অভ্যস্ত'—ইত্যাদি। আসুন আমরা এ ধরণের কথা ও ভাবনা পরিত্যাগ করি। উপস্থিত লাশের জানাযা আগে আদায় করে নিই! অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, কেউ যখন আমার সঙ্গে কোনো ভুল করবে তখন তার কী করণীয় সে চিন্তায় ব্যস্ত না হয়ে, আমার নিজের করণীয় কী—তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো।

আপনি কাউকে নতুন বা আশ্চর্যজনক কোনো সংবাদ জানাতে যাবেন, তখনই কিছু কিছু লোক আপত্তি করে বসবে। তখন আপনার করণীয় হলো, সংবাদ প্রদানের পূর্বেই আপনি তাদের আপত্তির পথ বন্ধ করে দেবেন।

শুরুতেই আপনি ভূমিকা হিসেবে এমন কিছু কথা বলে নেবেন, যাতে সম্ভাব্য সকল আপত্তির উত্তর থাকে, তাদের মনে এসব প্রশ্ন উদয়ই না হয়, বিষয়টি যেন তাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে না হয়। কিছু কিছু মানুষ চমৎকারভাবে এ কাজটি করতে পারেন। তারা নিজে আপত্তি করার পূর্বে শ্রোতার আপত্তির পথ বন্ধ করে নেন।

এ মুহূর্তে আমার জনৈক বয়োবৃদ্ধের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একটি মজলিসে তিনি তার নিজের দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। ফিলিং স্টেশনে দু'জন লোকের মধ্যে কীভাবে অতি সাধারণ একটি বিষয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি হলো, পরে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছালো এবং একপর্যায়ে তাদেরকে থানায় নিয়ে যেতে হলো—সে ঘটনা তিনি সবাইকে শোনালেন। তার বলা শেষ হতে না হতেই সেখানে উপস্থিত এক বাচাল লাফিয়ে উঠলো। সে বললো, 'ঘটনাটা ঘটেছিলো এটা ঠিক, তবে আপনি যেভাবে বললেন, ঘটনাটা আসলে সেভাবে ঘটেনি। ঘটনাটা বরং এভাবে ঘটেছিলো। আর মূলত ভুল করেছিলো অমুক।' এভাবে সে পুরো ঘটনার এমন বিবরণ দিতে লাগলো, যা মূলত ঘটেইনি!

বৃদ্ধ তার দিকে তাকালেন। আমার মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি তিনি বিস্ফোরিত হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত রাখলেন। শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে?'

'না'।

'সেখানে যারা উপস্থিত ছিলো তারা কেউ কি তোমাকে ঘটনাটি শুনিয়েছে?'

'না'।

'তাহলে কি কোনো সংবাদ-মাধ্যম কিংবা তদন্ত সংস্থার সূত্রে ঘটনাটি জেনেছো?'

'না'।

এবার বৃদ্ধ বিস্ফোরিত হলেন। চিৎকার করে বললেন, 'আজব ব্যাপার! ঘটনার ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না, তাহলে কীভাবে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে?!' বৃদ্ধের উপস্থাপনা কৌশল আমাকে মুগ্ধ করলো। তিনি আপত্তি করার পূর্বে প্রথমে ভূমিকা পেশ করলেন। এভাবে ভূমিকা পেশ না করে তিনি যদি সরাসরি আপত্তি করতেন তাহলে তার মুখ বন্ধ করতে পারতেন না। সে তখন মিথ্যা বলে কৌশলে ছুটে যেতো।

অনেক সময়ই আমরা এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। কোনো বিষয় প্রমাণ করতে চাইলে তার পূর্বে এমনভাবে ভূমিকা পেশ করতে হয়, যাতে সুযোগসন্ধানীদের আপত্তি করার সুযোগই না থাকে।

এবার চলুন, নববী জীবনাদর্শ থেকে এমনই একটি ঘটনা শুনি। বদরযুদ্ধের ঘটনা। কোরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো। তবে কোরাইশদের মাঝে এমন কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তিও ছিলো, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আগ্রহী ছিলো না। অন্যদের চাপে তারা বদর প্রান্তরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন যে, ময়দানে উপস্থিত হলেও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠাবে না। তাই রণাঙ্গনের কাছে এসে তিনি

সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে অবগত করার এবং তাদের কেউ কারো সামনে পড়ে গেলে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করার মনস্থ করলেন। কিন্তু নবীজী জানতেন, এ ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারো কারো মনে কিছু প্রশ্ন জাগবে।

‘তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে; তবুও কেন আমরা তাদেরকে হত্যা করতে পারবো না?’
‘কেন আল্লাহর রাসূল নির্দিষ্ট কয়েকজনকে পৃথক করলেন?’

এমন নানা ধরণের প্রশ্ন তাদের মনে জন্মাতে পারে। তাই এসব প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভূমিকা পেশ করলেন। এরপর বললেন মূল কথা। কীভাবে? এবার তাই শুনুন।

নবীজী সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশেম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু ব্যক্তি অন্যদের চাপে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়।’ এই হলো ভূমিকা। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘কেউ বনু হাশেমের কারো মুখোমুখি হলে তাকে যেন হত্যা না করে। কেউ আবুল বুখতারী বিন হিশাম বিন হারিসের মুখোমুখি হলে তাকে যেন হত্যা না করে। আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে দেখলেও যেন কেউ তাকে হত্যা না করে। কারণ, সে আসতে বাধ্য হয়েছে।’

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের কথা মেনে নিলেন। তবে পরস্পরের কথাবার্তায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো। আবু হুযায়ফা বিন ওতবা বিন রাবীয়া রাযি. ধৈর্য হারিয়ে বলে বসলেন, 'আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও ভাইদেরকে হত্যা করবো আর আব্বাসকে ছেড়ে দেবো! আল্লাহর কসম! আমি যদি তার দেখা পাই, আমার তরবারি তার ভাগ্যের ফায়সালা করবে।'

তার এ কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছালো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে ওমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবু হাফস!' ওমর রাযি. বলেন, 'আল্লাহর কসম! সেদিনই প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে "আবু হাফস" উপনামে সম্বোধন করেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবু হাফস! আল্লাহর রাসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে?!'

আবু হুযায়ফার উক্তি ওমর রাযি.কে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলো। তাঁর কাছে কথাটি খুব খারাপ লাগলো। আবু হুযায়ফা কীভাবে নবীজীর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করলো! সে কি মুসলমান নয়! ওমর রাযি. উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। আল্লাহর কসম! সে তো মুনাফিক হয়ে গেছে।'

আবু হুযায়ফা রাযি. সৎ মনের মানুষ ছিলেন। এ কথা বলার কারণে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। পরবর্তীতে তিনি বলতেন, 'আমি সেদিন যে কথা বলেছিলাম, তার কারণে আজও আমার বড় ভয় হয়। আজও আমি

নিজেকে নিরাপদ মনে করি না। আর আমি ততদিন ভীত-সন্ত্রস্তই থাকবো, যতদিন না শাহাদাত লাভের মাধ্যমে আমার এ অপরাধের বদলা হয়ে যায়।' পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

**একটি উপদেশ...**

বিচক্ষণ হোন... অন্যরা আপনাকে রাতের খাবার বানাতে চায়?! আপনি তাদের দুপুরেই খেয়ে ফেলুন!

## ৮৮. আপত্তি করবেন? একটু অপেক্ষা করুন!!

জনৈক আলোচকের কথা মনে পড়ছে। তিনি বিতর্ক দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনার কিছু অংশ তুলে ধরলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তেলাওয়াত করলেন:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ
৩৬ [সূরা ইউসুফ]

অর্থ: ইউসুফের সঙ্গে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন (একদিন ইউসুফকে) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, মদ (বানাতে আঙুর) নিংড়াচ্ছি। আর অপরজন বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, মাথায় করে রুটি বহন করে চলছি। আর পাখিরা তা থেকে (ঠোকর মেরে) খাচ্ছে।

সম্মানিত আলোচক কিছুক্ষণ চুপ থেকে উপস্থিত সকলের ওপর দৃষ্টি বোলালেন। এরপর শ্রোতাদের প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর সঙ্গে দু'জন যুবক প্রবেশ করলো।' প্রশ্ন হলো, কারা আগে প্রবেশ করলো? ইউসুফ, নাকি দুই যুবক? প্রশ্ন শুনে শ্রোতাদের একজন উচ্চ স্বরে বলে উঠলো, 'ইউসুফ'। তার উত্তরের প্রতিবাদ করে জোর গলায় আরেকজন বললো, 'না, না, বরং দুই যুবক আগে প্রবেশ করেছে।' তৃতীয় আরেকজন বললো, 'আরে না, ইউসুফ। ইউসুফই আগে প্রবেশ করেছে।' চতুর্থ জন বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, 'তারা

সবাই একসঙ্গে প্রবেশ করেছে।' পঞ্চম একজন কিছু বলার জন্য চিৎকার করে উঠলো। শুরু হয়ে গেলো হৈচৈ-শোরগোল। এমনকি আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই সবাই ভুলে গেলো।

মনে হলো, সম্মানিত আলোচক সচেতনভাবেই এটা করেছেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের ওপর দৃষ্টি ফেরাতে লাগলেন। সময় কেটে যাচ্ছে। এবার তিনি সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ইশারায় সবাইকে নীরব হতে বললেন। এরপর বললেন, 'যুবকদ্বয় হয়তো আগে প্রবেশ করেছে অথবা ইউসুফ আগে প্রবেশ করেছে। এতে সমস্যার কী আছে? এ বিষয়টি কি এভাবে বিবাদ-বিতর্কে জড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ?'

বাস্তবেই তাই। আমাদের বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো, প্রায়ই আমরা অন্যদের কথার মাঝে অনর্থক অভিযোগ-আপত্তি করতে থাকি। পরিণামে আমাদের উপস্থিতি তাদের কাছে জগদ্দল পাথরের মতো ভারী মনে হয়। কখনো দেখা যায়, কেউ আগ্রহ নিয়ে একটি ঘটনা বলছে। কিন্তু বলা শুরু করতেই আরেকজন এমন এক আপত্তি করে বসে, যার সঙ্গে ঘটনার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বলি, কথার মাঝে হস্তক্ষেপ করে অন্যের বোঝা হবেন না। আলোচনার মাঝে আপত্তি করে অন্যের বিরক্তির কারণ হবেন না।

আমার ভাই সাউদের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। সে তখন ছোট, সাত বছরের বালক। একদিন এশার নামায পড়তে সে মসজিদে গেলো। মনে হয়, সে একটু আগেই চলে গিয়েছিলো আর ইমাম সাহেবও নামায আদায়ের

জন্য আসতে একটু বিলম্ব করছিলেন। এ বিলম্ব তার সহ্য হচ্ছিলো না। তাই সে উঠে মুআযযিন সাহেবের পেছনে চলে গেলো। মুআযযিন সাহেব ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি কানে একটু কম শুনতেন।

সাউদ মুআযযিন সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরলো এবং কণ্ঠস্বর একটু পরিবর্তন করে বললো, 'কাতার সোজা করুন!' এরপর দিলো ভোঁ দৌড়! বেচারা মুআযযিন সাহেব এ আওয়াজ শুনতেই ইকামত দিতে উদ্যত হলেন। তখন কয়েকজন মুক্তাদী তাকে প্রকৃত বিষয়টি অবগত করলো। এবার তিনি বসে পড়লেন। রাগে কটমট করতে করতে তিনি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, 'দুষ্ট বালকটিকে যদি হাতের কাছে পেতাম...!'

ঘটনাটিতে বেশ আনন্দের উপাদান আছে। কিন্তু আনন্দদানের উদ্দেশ্যে আমি ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করিনি। আমার উদ্দেশ্য হলো ঘটনার পরবর্তী ঘটনা! কিছুদিন পর এক মজলিসে আমার উপস্থিতিতেই জনৈক ব্যক্তি এ ঘটনাটি উপস্থিত সবাইকে শোনালো। ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে সে বললো, 'সাউদের বেশ তাড়া ছিলো। কারণ নামাযের পরই সে তার বাবার সঙ্গে সমুদ্রতীরে হাঁটতে যাবে। তাই সে করলো কী... মুআযযিন সাহেবের পেছনে গিয়ে...।'

তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের রিয়াদে তো কোনো সমুদ্রই নেই! রিয়াদ শহর গড়ে উঠেছে মরুভূমির মাঝে, সমুদ্র উপকূলে নয়। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, ভুল ধরে দিয়ে তার বলার আনন্দটাকে

নষ্ট করে দেবো, নাকি এ দিকে তাকিয়ে চুপ থাকবো যে, ঘটনাটিতে এই সঠিক তথ্যটির বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। অনর্থক আপত্তি করে বক্তার মনে বিরক্তি ও বিদ্বেষ উৎপাদন না করার উদ্দেশ্যে আমি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলাম এবং চুপ থাকলাম।

অনেক সময় আমরা না বুঝেই কোনো কোনো বিষয়ে আপত্তি করে বসি। অথচ হতে পারে, তার কোনো ওযর আছে। শেষে দেখা যাবে, বিনা কারণে আমরা তাকে তিরস্কার করলাম। যিয়াদ ছিলো অত্যন্ত ভালো স্বভাবের একজন লোক। সে সবসময় মানুষকে সদুপদেশ দিতে চেষ্টা করতো। গাড়ি চালানোর সময় একদিন সে ট্রাফিক সিগন্যালে আটকা পড়লো। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো হাই ভলিউমে পাশ্চাত্য পপ সঙ্গীতের আওয়াজ! সে দিশেহারা হয়ে খুঁজতে লাগলো, এ আওয়াজ কোত্থেকে আসছে? আশপাশে তাকিয়ে সে শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ দেখলো, তার পাশের গাড়ি থেকেই এ আওয়াজ আসছে। এরই মধ্যে ভলিউম আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দূরের-কাছের সবাই শুনতে পাচ্ছে এই বিকট আওয়াজ। যিয়াদ বারবার হর্ন বাজিয়ে পাশের গাড়ির চালককে সতর্ক করতে চেষ্টা করলো, যেন সে ভলিউম কমিয়ে দেয়। কিন্তু লোকটি ফিরেও তাকালো না, ভলিউমও কমালো না। মনে হলো, গানের মাঝে সে এমনভাবে ডুবে আছে যে, আশপাশের কোনো কিছুর খবরই তার নেই।

যিয়াদ তার গাড়ি এগিয়ে ড্রাইভারের চেহারা দেখার চেষ্টা করলো। ড্রাইভার তার চেহারার দু'পাশে রুমাল ফেলে রেখেছিলো। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার

পর সে ড্রাইভারের চেহারা দেখতে সক্ষম হলো। এ কী! শ্মশ্রুমণ্ডিত উজ্জ্বল অবয়ব! তার এতক্ষণের বিরক্তি ও বিহ্বলতা নিখাদ বিস্ময়ে পরিণত হলো। এমন শ্মশ্রুমণ্ডিত নেক-সুরত ইনসান তেলাওয়াতের পরিবর্তে শুনছে গান! তাও আবার এমন বিকট আওয়াজে!

ইতোমধ্যে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো। সবাই চলতে শুরু করলো। যিয়াদ নাছোড়বান্দা। সে সংকল্প করলো, যেভাবেই হোক লোকটিকে সদুপদেশ দিতে হবে। তাই সেও চলতে লাগলো গাড়িটির পেছন পেছন। কিছুদূর যাওয়ার পর সামনের গাড়িটি একটি দোকানের সামনে থামলো। ড্রাইভার নেমে এসে কিছু কেনার জন্য দোকানে ঢুকলো। যিয়াদও তার গাড়ির পেছনে গাড়ি দাঁড় করালো। সে দেখলো, লোকটি হেঁটে হেঁটে দোকানে ঢুকছে। পরনের কাপড় বেশ খাটো, আবার মুখভরা দাড়ি! যিয়াদের মনে বিভিন্ন চিন্তা উঁকি দিচ্ছিলো। মনে হয়, লোকটি দোকানে ঢুকেছে সিগারেট কিনতে। মনে হয়...

একটু পর লোকটি দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। তার হাতে একটি ইসলামী ম্যাগাজিন! যিয়াদের আর দেরি সহ্য হলো না। সে কোমল স্বরে ডাকতে লাগলো, ‘এই যে ভাই! অনুগ্রহ করে একটু শুনুন।’ লোকটা কোনো উত্তর দিলো না, ফিরেও তাকালো না। যিয়াদ এবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকলো, ‘এই যে! এই যে ভাই! অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান, একটা কথা শুনুন।’ লোকটি তার গাড়ির কাছে চলে এলো এবং গাড়িতে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসলো। সে যিয়াদের দিকে ফিরেও তাকালো না।

উত্তেজিত যিয়াদ এবার গাড়ি থেকে নেমে এলো। সে তার কাছে গিয়ে বললো, ‘ভাই! আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করুন। এতবার ডাকছি! আপনি শুনতে পাচ্ছেন না!’ এতক্ষণে লোকটি তার দিকে তাকালো এবং একটু মুচকি হাসলো। এরপর সে গাড়ি স্টার্ট দিলো! আর গাড়ি স্টার্ট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু হলো সেই বিকট আওয়াজের সঙ্গীত! যিয়াদ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গেলো। সে বললো, ‘ভাই! আপনি হারাম কাজ করছেন। মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন।’ লোকটি বরাবর মুচকি হেসে চললো। আর ওদিকে বিকট আওয়াজের সঙ্গীত তো চলছেই। যিয়াদ আরো উত্তেজিত হয়ে গেলো। রাগে-ক্রোধে তার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। লোকটি যেন তার কথা শুনতে পায়, এজন্য সে আরো উচ্চ স্বরে পূর্বের কথাগুলো বলতে লাগলো।

লোকটি যখন দেখলো, যুবক বারবার কী যেন বলছে তখন সে হাত দিয়ে কানের দিকে ইশারা করলো এবং হাত নেড়ে কিছু বোঝাতে চাইলো। এরপর সে পকেট থেকে ছোট্ট একটি খাতা বের করলো। খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা:

আমি শ্রবণশক্তিহীন একজন বধির ব্যক্তি। আমি শুনতে পাই না। আমাকে যা বলতে চান, অনুগ্রহ করে এই খাতায় লিখে দিন।

**শিক্ষণীয়...**

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا

۝১১ [সূরা বনী ইসরাঈল]

অর্থ: এবং মানুষ কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ কামনা করে। বস্তুত মানুষ বড় তাড়াপ্রবণ!

তাই সতর্ক হোন, আপনার তাড়াহুড়া-স্বভাব যেন আপনার ধীরস্থিরতার গুণকে ডিঙিয়ে না যায়।

# ৮৯. দাবীর পূর্বে সুন্দর ভূমিকা পেশ করুন

বড় কোনো দরখাস্ত পেশ করার পূর্বে যার কাছে দরখাস্ত পেশ করা হবে, তার মন-মানসিকতাকে তৈরি করে নিতে হয়। এর ফলে দরখাস্ত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করার পরিস্থিতি তৈরি হয় না। মৌখিক বা লিখিত উভয় ধরনের দরখাস্তের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

আপনি কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে আপনার প্রয়োজনের কথা লিখে জানাতে চান। তখন প্রয়োজনের কথা লেখার পূর্বেই আপনার উচিত হলো, আপনি তার মহানুভবতা, উদারতা ও কল্যাণপ্রীতির প্রশংসা করবেন। এরপর আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা লিখবেন। একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যদি আপনি আপনার পিতা বা ভাইয়ের নিকট কিংবা স্ত্রীর নিকট আপনার প্রয়োজনের কথা বলতে চান। প্রয়োজনের কথা বলার পূর্বে সুন্দর করে ভূমিকা তৈরি করুন। তার মন ও মানসিকতাকে বুঝতে সচেষ্ট হোন।

আপনার কয়েকজন বন্ধুকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছেন। আপনি চাচ্ছেন, আপনার স্ত্রী তাদের জন্য খাবার তৈরি করুন, ঘর-বাড়ি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখুন। তাহলে তাকে এ কথা জানানোর পূর্বে বলুন, 'তোমার রান্না তো খুব মজাদার। আমার বন্ধুদের দাওয়াত করলে তারা তোমার হাতের রান্না খেতে পারবে বলে বেশ খুশি হয়।' কিংবা বলুন, 'বিশ্বাস করো, আমি উন্নতমানের অনেক হোটেলে খাবার খেয়েছি। কিন্তু তোমার রান্না করা খাবারের মতো স্বাদ কোথাও পাইনি। গতকাল সফর থেকে ফিরে আসা একজন বন্ধুর সঙ্গে

সাক্ষাৎ হলো। সৌজন্যমূলকভাবে আমি তাকে খাবারের দাওয়াত করলাম। সেও রাজি হয়ে গেলো। তার সঙ্গে আরো কয়েকজনকে দাওয়াত করলাম। যদি তুমি আমাদের জন্য খাবার তৈরি করতে, খুব ভালো হতো।'

এভাবে না বলে আপনি হয়তো প্রথমেই সজোরে ডাক দিয়ে বলতে পারেন, 'অমুকের মা! কোথায়?' জবাবে আপনার স্ত্রী বলবে, 'বলুন, কী বলবেন?' সে হয়তো ভাববে, আপনি তাকে আগামীকাল কোথাও ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার কথা বলবেন! আপনি বললেন, 'জলদি! জলদি রান্নাঘরে যাও। আমার কয়েকজন বন্ধু বেড়াতে আসছে। রান্নায় যেন দেরি না হয়। আর সাবধানে রান্না করো।' এখন বলুন, দ্বিতীয় পদ্ধতিটির চেয়ে প্রথম পদ্ধতিটি কি সুন্দর নয়?

প্রতিষ্ঠান-প্রধানের কাছে ছুটি মঞ্জুর করাতে চাচ্ছেন কিংবা মা-বাবাকে কোনো সুসংবাদ দিতে চাচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করুন। সীরাতে নববীতে আপনি এর অনেক উদাহরণ পাবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শৈশবের স্মৃতিবিজরিত স্থান তায়েফের পাশেই ছিলো হাওয়াযিন গোত্রের বসবাস। তাই তিনি মনে-প্রাণে তাদের ইসলাম গ্রহণ কামনা করতেন। একবার রাসূল সংবাদ পেলেন যে, হাওয়াযিন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই রাসূল অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ রাসূলকে সাহায্য করলেন। তিনি বিজয়ী হলেন এবং গনীমত হিসেবে তাদের ধন-সম্পদ ও বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। হাওয়াযিন গোত্রের অনেকে যুদ্ধে নিহত

হয়েছে। মুসলমানদেরও কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। এ যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ময়দান! তারপরও তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলের কাছে এলো। তিনি তখন 'যিইররানা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন।

রাসূল হাওয়াযিন গোত্রের বন্দী মহিলা ও শিশুদেরকে একস্থানে রেখেছিলেন। হাওয়াযিন গোত্রের নেতৃত্বস্থানীয় ও বুদ্ধিমান কিছু লোক বন্দী মহিলা ও শিশুদেরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কথা বলতে রাসূলের কাছে এলো। তারা এজন্য বাকপটু একজন লোককে নির্বাচন করলো। লোকটির যেমন রপ্ত ছিলো কথা বলার চমৎকার শৈলী, তেমনই তার দখলে ছিলো উপযোগী শব্দচয়ন যোগ্যতা।

যুহাইর বিন সারদ নামের সেই বাকপটু লোকটি রাসূলের সামনে দাঁড়ালো এবং মূল দরখাস্ত পেশ করার পূর্বে প্রথমেই স্থানোপযোগী ভূমিকা উপস্থাপন করলো। কবিতার ছন্দে সে বললো:

ঐ যে শিকলাবদ্ধ যারা, তারা তো তবই মা ও খালা
দুধ দিয়েছে তারাই তোমায়, সয়েছে তারাই লালন-জ্বালা।
এমন যদি হতো নোমান কিংবা ইবনে আবী শামার
দুগ্ধ সন্তান তাদের প্রতিও রাখতাম আশা পূর্ণ দয়ার।
আপনি তো জানি দয়ার আধার, সর্বমুখে 'মুহাম্মাদ'
তব করুণার জ্যোতিতে তো সব হয়ে যায় ম্লান, সবই বাদ।

এরপর সে কবিতার ছন্দেই মূল দরখাস্ত পেশ করলো:

আপনি তো বড় রহমদিল, তাই দয়া চাই হে মহান
তব সকাশে যাচি যে করুণা, দয়ার আধার ওগো মহান।
বুকের রক্ত পানি করে মোরা সাজিয়েছিলাম এই জীবন
বাঁচার আকুতি মোদেরই প্রাণে, চাই মোরা সুন্দর জীবন।
ছিন্ন করে দেবেন না কভু সন্তান-মা-বাবার মাঝে
তব করুণায় চাই যে সদা সাজতে এখন নতুন সাজে।
ভোলেও যদি সবাই কভু তব দয়া আর তব ইহসান
ভুলবো না মোরা মনে রেখে সদা এ যে সত্যি মহান দান।

তার আবেগময়ী কবিতা শুনে আল্লাহর রাসূলের হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি বাচ্চা ও মহিলাদের ছেড়ে দিলেন। প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন। যুহাইর বিন সারদ তার বক্তব্য শুরু করার পূর্বে কতো চমৎকার ভাষায় একটি ভূমিকা রচনা করেছিলো। সে রাসূলকে হাওয়াযিন গোত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, ‘হাওয়াযিন গোত্রের কাছেই বনু সা'দ গোত্রে আল্লাহর রাসূল শৈশবে দুধ পান করেছিলেন।’ এরপর সে আল্লাহর রাসূলের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে বললো, ‘আমরা যদি আপনার পরিবর্তে অন্য কোনো বাদশাহর সঙ্গে এমন আচরণ করে ফেলতাম আর সেও তাঁর শৈশবের মধুর দিনগুলো আমাদের সঙ্গে, আমাদের লালনছোঁয়ায় কাটাতো তাহলে সেও আমাদের প্রতি রহমদিল হতো। আপনি তো সৃষ্টির মাঝে সবচে দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। আপনার দয়া ও অনুগ্রহ তো দুনিয়াজোড়া স্বীকৃত।’ বাস্তবেই যুহাইর বিন সারদ-এর ভূমিকা খুবই চমৎকার ছিলো।

কোরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এই আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً
۝১২ [সূরা মুজাদালাহ]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যখন রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের সেই কথার পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করো।

আরবদের অভ্যাস ছিলো, তারা কারো কাছে সাহায্য চাইতে হলে প্রথমে সুন্দর সুন্দর কথা ও কবিতার পংক্তিমালা উল্লেখ করতো। তেমনই কাউকে অপমান করতে চাইলে কিংবা বাকযুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইলে নিন্দা ও তুচ্ছতা-প্রকাশক বিভিন্ন পংক্তিমালা উল্লেখ করতো। এর ফলে তা শত্রুর অন্তরে তরবারির চেয়েও বেশি আঘাত হানতো।

এবার শুনুন আরেকটি ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহ করার জন্য মক্কায় গেলেন। ভয় পেয়ে কোরাইশরা বাধা দিলো। যদি তারা সন্ধিচুক্তির জন্য পীড়াপীড়ি না করতো, হয়তো উভয় দলের মধ্যে লড়াইয়ের উপক্রম হতো। একপর্যায়ে কোরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হলো। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা হলো। হুদাইবিয়ার সে সন্ধিতে একটি ধারা ছিলো, আরবের যে কোনো গোত্র মুসলমান বা কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে উক্ত সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

হুদাইবিয়ার চুক্তির পরপরই খোযাআ গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হলো, আর বনু বকর কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে যুক্ত হলো।

এর ফলে বনু খোযাআ মুসলমানদের এবং বনু বকর কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হলো। বনু বকর ও বনু খোযাআ—এ দুই গোত্রের মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই-ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব চলে আসছিলো। সুযোগ পেলেই একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতো। বনু বকরের সঙ্গে কোরাইশদের ছিলো সুসম্পর্ক ও গোপন বন্ধুত্ব। সেই সুবাদে আক্রমণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাইশরাও বনু বকরের সঙ্গে শরিক হতো। আর খোযাআ গোত্র যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলো তখন তাদের প্রতি কোরাইশদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ আরো বেড়ে গেলো। কিন্তু সন্ধির কারণে তারা কিছু করারও সাহস পাচ্ছিলো না। কারণ তাদের ভয় ছিলো, তারা যদি খোযাআ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে তাহলে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করায় মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে।

এভাবেই প্রায় দেড় বছর কেটে গেলো। হঠাৎ একরাতে বনু বকর 'ওয়াতির' নামক স্থানে খোযাআ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে বসে। জায়গাটি ছিলো মক্কার একেবারেই কাছে। বনু বকর কোরাইশদের কাছে সাহায্য চাইলো। কোরাইশরা ভাবলো, আমরা যদি এই গভীর রাতে বনু বকরকে সাহায্য করি মুহাম্মাদ তা কিছুতেই জানতে পারবে না। কারণ রাতের আঁধারে কেউ আমাদের চিনতেই পারবে না। কোরাইশরা জনবল, অস্ত্রশস্ত্র—সবকিছু দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করলো এবং বনু বকরের সঙ্গী হয়ে নির্মমভাবে বনু খোযাআর লোকদের হত্যা করতে লাগলো। অনেক নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নিহত হলো।

খোযাআ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিলো আমর বিন সালিম। নিজ গোত্রের এই চরম বিপদ দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে উটে আরোহণ করলো এবং কোরাইশদের ঘেরাও থেকে পালিয়ে গেলো। সে মদীনায় এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। ভীত-সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারায় সে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলো। শরীরজুড়ে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি আর পথের ধুলোবালির ছাপ। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং কবিতার ভাষায় বলতে লাগলো তাদের দুঃখ ও কষ্টের কথা:

দোহাই আল্লাহর হে নবী, স্মরণ চুক্তি প্রতিজ্ঞা

কালিমা পড়েছি, মুমিন হয়েছি, মেনেছি তব সব আজ্ঞা।১ [সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বনু খোযাআ ও বনু হাশিমের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সময় হতে চলে আসছিলো।—সম্পাদক]

সাহায্য চাই আপনার আর বলুন অন্যদের

তারাও যেন এগিয়ে আসে পাশে দাঁড়ায় আমাদের।২নবীজীর ঊর্ধ্বতন পুরুষ আবদে মানাফের মা 'হবা' ছিলো খোযাআ গোত্রের মহিলা। সেদিকে ইঙ্গিত করে নবীজীর বংশকে খোযাআ গোত্রের সন্তান বলা হয়েছে।—সম্পাদক]

সঙ্গে যেন থাকেন রাসূল ম্লান যে রাতের চন্দ্র-শ্রী

নির্যাতনে লাল হয়ে যায় শুভ্র-সাদা চেহারা যাঁরই।

সঙ্গে সমর-যোদ্ধা বাহিনী বুকেতে যাদের পুরো উচ্ছ্বাস

তরঙ্গায়িত সাগরের মতো আনবে প্রবল ঝড়-আভাস।

এরপর সে পূর্বের চেয়ে উচ্চ স্বরে বললো:

ভঙ্গ করেছে কোরাইশেরা সকল চুক্তি-অঙ্গীকার
কোদায় পেতেছে মরণ-ফাঁদ, যেন না যায় কোথাও খবর।
মধ্যরাতে সবাই যখন ছিলো অচেতন নিদ্রাসুখে
ওয়াতিরে ওরা ঢুকিয়ে দিয়েছে তরবারিগুলো মোদের বুকে।
আমরা ছিলাম কেউ রুকূতে কেউ বা সেজদাতে
হত্যা করেছে নির্মমভাবে কোরাইশ ওদের সাথে।

তার এই মর্মবিদারী কবিতা ও আহ্বান শুনে এবং এর অর্থ ও মর্ম অনুভব করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতাবোধ জেগে উঠলো। কোরাইশদের প্রতি তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, 'হে আমর বিন সালিম! অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করা হবে।' এরপর রাসূল দ্রুত বের হয়ে গেলেন এবং সবাইকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। তারা জানেনেই না, 'আসন্ন যুদ্ধ কোথায়, কাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হবে?'

মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা কোরাইশরা জেনে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কায় আল্লাহর রাসূল যুদ্ধক্ষেত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয় গোপন রাখলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যেন আল্লাহ তাআলা কোরাইশদের এ সম্পর্কে অজ্ঞ রাখেন আর অতর্কিতেই তাদের ওপর আক্রমণ চালানো যায়। কোরাইশদের এই খেয়ানতের কারণে আল্লাহর রাসূল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন এবং বললেন, 'হয়তো তোমরা এই

কিছুদিনের মধ্যেই আবু সুফিয়ানকে দেখবে। সে চুক্তি আরো দৃঢ় করতে এবং মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে আসবে।'

এরপর বুদাইল বিন ওয়ারাকাসহ খোযাআ গোত্রের আরেকটি প্রতিনিধি দল রাসূলের কাছে এলো। তারা রাসূলকে পুরো ঘটনার বিবরণ শোনালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকেও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা এখন চলে যাও এবং বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করো।' রাসূল আশঙ্কা করছিলেন যে, রাসূলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের খবর মক্কার লোকদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে তো তারা মুসলমানদের পৌঁছার পূর্বেই খোযাআ গোত্রের ওপর আবার আক্রমণ করে বসবে।

প্রতিনিধি দল নিজেদের এলাকায় ফিরে চললো। মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি 'আসফান' নামক স্থানে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। কোরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে আরো দৃঢ় করতে এবং চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে আবু সুফিয়ানকে রাসূলের কাছে পাঠিয়েছিলো। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, তাদের দুষ্কর্ম ও সন্ধিভঙ্গের অপরাধের কথা রাসূল হয়তো জেনে গেছেন।

বুদাইল বিন ওয়ারাকাকে দেখেই আবু সুফিয়ানের মনে সন্দেহ জাগলো যে, সে রাসূলের কাছ থেকেই ফিরে এসেছে এবং কোরাইশরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই সে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে ফিরলে, বুদাইল?' বুদাইল উত্তরে বললো, 'এই

উপত্যকায় খোযাআ গোত্রের লোকদের খুঁজছিলাম।’ তার কথা শুনে আবু সুফিয়ান চুপ হয়ে গেলো। বুদাইল তাকে অতিক্রম করে কিছু দূর চলে যাওয়ার পরই সে কিছুক্ষণ পূর্বে বুদাইলের উট যেখানে অবতরণ করেছিলো, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। এরপর উটের মল হাতে নিয়ে তা চূর্ণ করে দেখতে পেলো, তাতে খেজুরের বীচি রয়েছে। সে বুঝতে পারলো, এ উট মদীনা থেকেই ঘুরে এসেছে। কারণ মদীনাবাসীরাই তাদের গবাদি পশুকে খেজুরের বীচি খাওয়ায়। আবু সুফিয়ান জনান্তিকে বলতে লাগলো, ‘আল্লাহর কসম! সে মুহাম্মাদের কাছ থেকেই ফিরেছে।’

মদীনায় পৌঁছে প্রথমে সে তার মেয়ে উম্মে হাবীবার ঘরে গেলো। উম্মে হাবীবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের সহধর্মিণী। আবু সুফিয়ান ঘরে ঢুকে আল্লাহর রাসূলের বিছানায় বসতে উদ্যত হতেই উম্মে হাবীবা বিছানা ভাঁজ করে সরিয়ে নিলেন। আবু সুফিয়ান বললো, ‘বেটি! বুঝতে পারলাম না, এ বিছানা আমার উপযুক্ত নয়, নাকি আমি এই বিছানার যোগ্য নই?’ উম্মে হাবীবা বললেন, ‘এটি আল্লাহর রাসূলের বিছানা। আর আপনি তো মুশরিক ও অপবিত্র। তাই আপনার এর ওপর বসা আমার পছন্দ নয়।’ আবু সুফিয়ান হতবাক হয়ে গেলো। সে বললো, ‘বেটি! আমার কাছ থেকে এখানে চলে আসার পর তোমাকে অকল্যাণ পেয়ে বসেছে!’

এরপর আবু সুফিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার সঙ্গে আমাদের কৃত চুক্তি আরো দৃঢ় করে নিন এবং মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দিন।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, 'আপনি কেবল এ জন্যই এসেছেন? নাকি এর পূর্বে কোনো ঘটনা আছে?' আল্লাহর রাসূল শুধু এতটুকুই বললেন। কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গ এবং খোযাআ গোত্রে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোর সংবাদ যে তিনি জানেন—তা তিনি আবু সুফিয়ানের সামনে প্রকাশ করলেন না। তিনি যেন আবু সুফিয়ানকে ইঙ্গিতে বলে দিলেন, 'নতুন করে চুক্তি নবায়ন ও মেয়াদ বৃদ্ধি চাচ্ছেন কেন? তাহলে কি পূর্বের চুক্তি বাকি নেই? পূর্বের চুক্তি বাকি থাকলে নবায়ন ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন কী?'

আবু সুফিয়ান বললো, 'না, না, কী বলছেন? আমরা এখনো পূর্বের অঙ্গীকার ও চুক্তিতে পুরোপুরি অটল আছি। আমরা চুক্তিতে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটাবো না এবং চুক্তির শর্ত থেকে একটুও বিচ্যুত হবো না।' রাসূল তার এই কথা শুনে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান আরো কয়েকবার তার প্রস্তাব পেশ করলো কিন্তু আল্লাহর রাসূল কোনো জবাব দিলেন না। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে আবু বকরের কাছে এসে বললো, 'মুহাম্মাদের কাছে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। তিনি যেন চুক্তি নবায়ন করেন, মেয়াদ বৃদ্ধি করেন কিংবা অন্তত যেন আমাকে এবং আমার কওমকে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।' আবু বকর বললেন, 'আল্লাহর রাসূল যাকে আশ্রয় দেবেন আমি তাকে আশ্রয় দেবো। আমি কাউকে বাধা দেবো না। আর আমার অবস্থা তো এই যে, আল্লাহর কসম, ক্ষুদ্র পিপিলিকাকেও আমি যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে দেখি তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমি তাকে সহায়তা করবো।'

আবু সুফিয়ান ভগ্নমনে আবু বকরের কাছ থেকে বেরিয়ে এলো এবং ওমরের কাছে গেলো। সব শুনে ওমর বললেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করবো আমি?! আমি তো বরং চাই তোমাদের সঙ্গে যে চুক্তি বহাল আছে আল্লাহ সেটাকেও ছিন্ন করে দিন আর যে চুক্তি ছিন্ন হয়ে গেছে আল্লাহ তাআলা তা আর কোনো দিন ফিরিয়ে না আনুন।' ওমরের কথা শুনে আবু সুফিয়ানের আশার শেষ সলতেটুকুও যেন নিভে গেলো। ওমর যেন তার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছেন। ওমরের কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবু সুফিয়ান বলতে লাগলো, 'আপনজন ও আত্মীয়জনদের কাছ থেকে আমি এই আচরণ পেলাম!'

আবু বকর ও ওমরের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে আবু সুফিয়ান আলীর কাছে গেলো এবং বললো, 'আলী! তুমি তো বংশগত দিক থেকে আমার সবচে নিকটের। তুমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করো।' হযরত আলী বললেন, 'আবু সুফিয়ান! আল্লাহর রাসূল কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করলে কেউ তাতে বাধা দেবে না। আর বাধা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ আল্লাহর রাসূল নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। তিনি যা বলেন, আল্লাহর হুকুমেই বলেন। আপনি তো কোরাইশদের সরদার, নেতৃস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাই আপনি বরং আপনার মদীনাবাসী আত্মীয়-স্বজনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং অন্তত নিজেকে নিরাপদ রাখুন। আপনি আত্মীয়-স্বজনের মাঝে এই ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজেকে সব ধরণের বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বিরত রাখলাম। এ কথা বলে আপনি মক্কায় ফিরে যান।' আবু সুফিয়ান বললো,

'তোমার কি মনে হয় এ ধরণের কোনো ঘোষণা কাজে আসবে?' হযরত আলী বললেন, 'না, তা মনে হয় না। তবে আমার মনে যা এলো, তাই বললাম।'

আবু সুফিয়ান মদীনার খোলা স্থানে বের হয়ে চিৎকার করে বললো, 'সবাই শুনুন, আমি সকলের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমার ধারণা, কেউ আমার এই আশ্রয় প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।' এরপর সে উটে চড়ে মক্কায় চলে গেলো। মক্কায় পৌঁছলে কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী সংবাদ নিয়ে এলে? মুহাম্মাদের কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তানামা বা চুক্তিনামা নিয়ে এসেছো কি?' আবু সুফিয়ান বললো, 'না! আল্লাহর কসম, তিনি তো আমাকে এড়িয়ে গেছেন। আমি তাঁর সঙ্গীদের কাছেও গিয়েছি কিন্তু মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাঁর যেমন অনুগত, দুনিয়ার কোনো বাদশাহর প্রজারা বাদশাহর ততটা অনুগত নয়। আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে কথা বললাম। সে আমার কথার কোনো উত্তরই দেয়নি। এরপর আবু বকরের কাছে গেলাম। তার কাছ থেকেও আশানুরূপ কিছু পাইনি। তারপর ওমরের কাছে গেলাম। তাকে তো মনে হলো আমাদের সবচে বড় শত্রু। সবশেষে গেলাম আলীর কাছে। আমাদের ব্যাপারে তাকেই সবচে সহনশীল মনে হলো। সে আমাকে একটি কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছিলো। আমি সেটা করেছি। আল্লাহর কসম! জানি না, তাতে আমাদের কোনো উপকার হবে কিনা।'

কোরাইশরা জিজ্ঞেস করলো, 'সে তোমাকে কী করতে বলেছিলো?' 'আলী আমাকে বলেছিলো, আমি যেন নিজের ব্যাপারে মদীনার লোকদের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি সেটা করেছি।' 'মুহাম্মাদ কি তার বৈধতা দিয়েছেন? তুমি যে তোমার নিজের জন্য নিরাপত্তা চেয়েছো মুহাম্মাদ কি নিজে সেটা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গীদের গ্রহণ করতে বলেছেন?'

আবু সুফিয়ান বললো, 'না!'

কোরাইশরা একযোগে বলে উঠলো, 'ধিক! শত ধিক তোমাকে! এই কথা বলে তো সে তোমাকে সবার উপহাসের পাত্র বানিয়েছে। তুমি যা বলেছো, তাতে আমাদের কোনো লাভই হবে না।' আবু সুফিয়ান বললো, 'এছাড়া আমার আর কিছু করারও ছিলো না।' ভগ্ন হৃদয়ে আবু সুফিয়ান বাড়ি ফিরলো এবং স্ত্রীকে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে তার স্ত্রী বললো, 'তোমার এ প্রত্যাগমন বড়ই অকল্যাণকর। তুমি কোনো কল্যাণের বার্তা নিয়ে আসতে পারোনি।' এর কিছুদিন পরই আল্লাহর রাসূল বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

**ইঙ্গিতে...**

বড় লোকমা গলাধঃকরণের পূর্বে ভালো করে চিবিয়ে নিতে হয়।

# ৯০. সবসময়ই সফল হবেন?

ফাহাদ তার বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিলো। বন্ধুটি বড় জেদি আর একগুঁয়ে। একবার যা বলবে, তা ফিরিয়ে নেয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ। তারা বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করছিলো। হঠাৎ তারা দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে কালো রঙের কিছু একটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলো। মরু-হাওয়ায় একবার তা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পর আবার বালু সরে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ফাহাদ তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী মনে হয়? জিনিসটা কী?' তার বন্ধু বললো, 'আমি নিশ্চিন্ত, ওটা কালো রঙের একটা ছাগল।' ফাহাদ বললো, 'না, ওটা তো একটা কাক।' 'আমি বললাম তো, ওটা ছাগল। ওটা কালো রঙের একটা ছাগল।' 'ঠিক আছে। চলো আমরা কাছে যাই। তাহলেই আমরা নিশ্চিত হতে পারবো।'

তারা আরো কাছে গেলো এবং খুব তীক্ষ্ণ নজরে বস্তুটি দেখতে লাগলো। স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো, এটি কাক। ফাহাদ বললো, 'ভাই! দেখো, কাকই তো।' তার বন্ধু দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললো, 'না, এটি একটি ছাগল!' উত্তরে ফাহাদ কিছুই বললো না। তারা বস্তুটির আরো কাছে গেলো। তাদের কাছে আসতে দেখে কাকটি উড়ে গেলো। ফাহাদ তখন চিৎকার করে বললো, 'আল্লাহু আকবার! কাকই তো। দেখলে, কাকটি উড়ে গেলো।' তখন তার বন্ধুটি বললো, 'না, উড়ে গেলেও আসলে ওটা ছাগলই'!

প্রিয় পাঠক! আপনাদের এ ঘটনাটি কেন শোনালাম, জানেন? এ ঘটনা আমি একটি বিষয় বোঝানোর জন্য বর্ণনা করেছি। বিষয়টি হলো, পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে আমি যে সকল যোগ্যতা এবং দক্ষতা কাজে লাগানোর কথা বারবার বলে এসেছি, সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হলেও জীবনে চলার পথে কিছু মানুষ আপনি এমন অবশ্যই পাবেন, যাদের সঙ্গে আপনি যতই ভালো ব্যবহার করুন, যতই সুন্দর আচরণ করুন, সব ধরণের যোগ্যতা এবং দক্ষতা কাজে লাগান, তারা কিছুতেই প্রভাবিত হবে না।

মনে করুন, তাদের সঙ্গে আপনি 'অন্যের প্রশংসা করার' দক্ষতা প্রয়োগ করলেন। হয়তো কাউকে বললেন, 'মাশাআল্লাহ! আপনার পোশাকটা তো বেশ সুন্দর। আপনাকে তো দেখতে নতুন বরের মতো লাগছে।' আপনি আশা করলেন, সে মুচকি হেসে আপনার কোমল আচরণের স্বীকৃতি দেবে আর বলবে, 'জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।' কিন্তু সে এমনটি করবে না। উল্টো আপনার দিকে তীক্ষ্ণ ও বাঁকা নজরে তাকাবে আর বলবে, 'হয়েছে, হয়েছে। আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না।' অথবা এ জাতীয় এমন কিছু বলবে, যার দ্বারা বোঝা যায়—সে মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতে অভ্যস্ত নয়।

স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন রকমের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। অনেক মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা প্রয়োগ করে থাকে, সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকার চেষ্টা করে। স্বামীর সঙ্গে সবসময় হাসিমুখে কথা

বলে। কিন্তু তার স্বামী তার এ আচরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলে বসে, 'হয়েছে! জোর করে কৃত্রিম হাসি হাসতে হবে না!'

তো আপনি নিজেই যখন এ ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হবেন তখন কী করবেন? তখন আপনি নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেবেন যে, এ শ্রেণীর মানুষগুলো মূল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে না।

আমি নিজে এসব দক্ষতা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মাঝে প্রয়োগ করেছি। আল্লাহর শপথ! ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশার উচ্চপদস্থ-নিম্নপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গেও এসব দক্ষতা প্রয়োগ করেছি, এমনকি আমি আমার সন্তানদের সঙ্গেও এ সকল দক্ষতাকে প্রয়োগ করে দেখেছি। আমি এর আশ্চর্যজনক ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছি। বরং আমি বিভিন্ন জাতির নানা দেশের মানুষের সঙ্গেও এ সকল দক্ষতাকে প্রয়োগ করে দেখেছি আর তার আশ্চর্যজনক ফলাফলও লাভ করেছি।

আর তাই—প্রিয় পাঠক—আপনাকে বলছি, আপনিও এ ধরণের দক্ষতাকে প্রয়োগ করুন। খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া আশা করি সকলের মাঝেই এর আশ্চর্যজনক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহর কসম! মনে রাখবেন, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েই কথাগুলো বলেছি।

**সংক্ষেপে...**

আপনি কি আন্তরিকভাবেই চান বদলে যেতে? বদলে দিতে?

# ৯১. তাহলে সাহসী হয়ে এখনই শুরু করুন

একবার আমি একটি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম। বিষয় ছিলো—‘মানুষের সঙ্গে আচরণ সংক্রান্ত দক্ষতার সঠিক পরিচিতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতি’। আবদুল আযীয নামের একজন সেই কর্মশালায় ছিলো। কর্মশালার মাধ্যমে সে খুবই প্রভাবিত হয়েছিলো। আমি দেখেছি, খুঁটিনাটি প্রতিটি কথাই সে লিখে রাখতো। কর্মশালাটি তিনদিন ব্যাপী ছিলো। যথাসময়ে কর্মশালা শেষ হলো, সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেলো। চলে গেলো আবদুল আযীযও।

এক মাস পর আমি একই বিষয়ে আবারো কর্মশালার আয়োজন করি। প্রথমদিন উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের দিকে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম—একেবারে প্রথম সারিতে বসে আছে গতবারের সেই আবদুল আযীয! আমি খুব অবাক হলাম। সে তো জানে যে, গত কর্মশালায় আমি যা বলেছি, এবারও হুবহু তাই বলবো। তারপরও সে কেন উপস্থিত হলো?

নামাযের বিরতিতে আযান হলে সবাই হল-কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো। আমি আবদুল আযীযের হাত ধরলাম এবং এক পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। বললাম, ‘আবদুল আযীয! তুমি তো এক মাস আগেই একবার এই কর্মশালায় শরিক হয়েছিলে। তুমি আবার কেন এলে? তুমি তো জানো, গত কর্মশালার কথাগুলোই আমি আবার বলবো। তোমার হাতের খাতায় আজ যা লিখেছো, হুবহু তাই তো গতবারও লিখেছো। আর গত কর্মশালায় তুমি

যে সনদ পেয়েছিলে, এবারও সেই সনদই পাবে। এ কর্মশালায় তো তোমার কোনোই লাভ হবে না।’

সে আমাকে বললো, ‘বিশ্বাস করুন, গত এক মাস যাবৎ আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী—সবাই আমাকে বারবার বলছে, “আবদুল আযীয! গত এক মাসে তো আমাদের সঙ্গে তোমার আচরণ অনেক বদলে গেছে!” আমি তাদের এই মন্তব্য নিয়ে খুব ভাবলাম। আমি বুঝতে পারলাম, গত কর্মশালায় আমি যে সকল যোগ্যতা ও আচরণ-দক্ষতা অর্জন করেছিলাম, সেগুলো ধীরে ধীরে আমার আচরণে ও উচ্চারণে এবং কথায় ও কাজে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি বলেই আশেপাশের সবাই এ কথা বলছে। তাই গতবারের শেখা যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলো যেন আরো মজবুত হয়, আরো শানিত হয়, এ ক্ষেত্রে আমি যেন আরো উন্নতি করতে পারি—এ উদ্দেশ্যেই আমি আবারো এই কর্মশালায় শরিক হতে এসেছি।’

সুতরাং... আন্তরিকভাবেই নিজেকে বদলাতে চাইলে সাহসী হোন। আর শুরু করুন এখনই।

# গ্রন্থ পরিচিতি – গ্রন্থকারের কলমে

## সুখময় জীবনের সন্ধানে

জীবন বহুমুখী দক্ষতার সমষ্টির নাম। যুগে যুগে যাঁরা এ সকল দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁরাই হয়েছেন সফল, পেয়েছেন সুখময় জীবনের সন্ধান। আর সফল ব্যক্তিদের কাতারে সকলের শীর্ষে যাঁর নাম তিনি হলেন সায়্যিদুনা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পবিত্র জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সফলতার ঘটনাবলীকে এক মলাটে আনার দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল এই 'সুখময় জীবনের সন্ধানে'।

'সুখময় জীবনের সন্ধানে' গ্রন্থটি এক মাস কিংবা এক বছরের পরিশ্রমের ফল নয়, বরং সুদীর্ঘ বিশ বছরের অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের নির্যাস, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার ফসল। এর বাক্যগুলো কলমের কালিতে নয়, খুনরাঙা হরফে লেখা। এর প্রতিটি শব্দে, শব্দের পরতে পরতে গেঁথে আছে আমার অন্তর, আমার অন্তর-ধ্বনি। স্মৃতির নির্যাসে তৈরি এর একেকটি বাক্য, বাক্যমালা। বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে এর প্রতিটি অধ্যায়। এতে তুলে ধরা হয়েছে মানুষের সাথে আচরণ ও সার্থক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নবীজীর অসামান্য দক্ষতা ও অভাবনীয় কৌশলের কথা।

'সুখময় জীবনের সন্ধানে' এতে আছে আমার জীবনের বিভিন্ন স্মৃতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নানা পরিস্থিতির বিবরণ, যেগুলো এ গ্রন্থেই আমি প্রথম উল্লেখ করেছি। ইনশাআল্লাহ গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক উপকৃত হবেন।

'সুখময় জীবনের সন্ধানে' আমার হৃদয় নিংড়ে বের হয়েছে এর প্রতিটি শব্দ। আশা করি, আপনার হৃদয়ঝিল্লিকে তা স্পর্শ করবে। আমার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমার সবচে প্রিয়, সবচে মূল্যবান গ্রন্থ এটি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে শুধু এই মিনতি, তিনি যেন গ্রন্থটিকে কল্যাণকর করেন, কবুল ও মকবুল করেন। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশে যারা সহায়তা করেছেন, আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে দান করেন আজরে আযীম ও মহা পুরস্কার। আমীন।

**প্রকাশনায়**

১৪৩৪-৩৫ হিজরী, ২০১৩-১৪ ঈসায়ী সনের দাওরাতুল হাদীস (মাস্টার্স)
সমাপনকারী ছাত্রবৃন্দ।
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানীনগর
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১।
ফোন- ৭৬৯৩০৮৭